গোবিন্দচন্দ্র দেব রচনাবলী

[তৃতীয় খণ্ড]

ডক্টর গোবিন্দচন্দ্র দেব

সম্পাদনা

হাসান আজিজুল হক

প্রথম প্রকাশ : ১৩৬৩

GOBINDACHANDRA DEV RACHANAVALI : Works of Dr. Gobindachandra Dev, edited by Hasan Azizul Huq.

॥ সূচীপত্র ॥

পটভূমি

জীবনে পঞ্চাশের কোঠা বেশ কিছুদিন পেরিয়ে গেছি। যাঁরা আগে থেকে আমাকে জানেন না তাঁদের মধ্যে সহজবুদ্ধি কেউ কেউ আমার বয়স সাতের কোঠায়ও ফেলতে চান। তাঁরা যে বিশেষ ভুল করেন তা মনে হয় না। অনেকে মায়ের পেট থেকে বেশ কিছু বেশী বয়স নিয়ে জন্মান। চলতি বাংলায় তাঁদের বলা হয় এঁচড়ে পাকা। ছোটবেলায় যতদূর মনে পড়ে আমি সেই সৌভাগ্যবান ক্ষণজন্মা পুরুষদেরই একজন ছিলাম। সেই অকাল-পরিপক্কতার দাগ হয়তো আমার চেহারা থেকে আজও মুছে যায়নি। আমার পাকা চুলের আনাচে-কানাচে অনেকে তার পরশ দেখতে পেয়েই হয়তো আমার বয়সের সংখ্যা বাড়িয়ে ফেলেন।

ছোটবেলা ঈশ-উপনিষদে পড়েছিলাম, ভাল কাজ করে একশ' বছর বেঁচে থাকার চেষ্টা করা উচিত। "কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ"। যেদিন এই শ্লোক প্রথম পড়েছিলাম সেদিনের কথা আজও ভুলিনি। এমনি একটা স্থায়ী দাগ তা আমার অন্তরে এঁকে দিয়েছিল। পরবর্তীকালে নানা সভা-সমিতিতে আবোল-তাবোল বলা আমার এক পেশা হয়ে দাঁড়ায়। কত সভা-সমিতিতে আমার ব্যক্তিগত জীবনের আদর্শ আলোচনা প্রসঙ্গে এই শ্লোকের অবতারণা করেছি তার তালিকা রাখিনি। রাখা সম্ভবও নয়। নিজের নানা দোষ-ত্রুটি সত্ত্বেও ভাল কাজ করে বেঁচে থাকার আগ্রহ আমার ভেতরে খানিকটা সজাগ ছিলো বলেই হয়তো সভ্যলোকদের আসরে এমন কথা বার বার বলার দুঃসাহস করতে পেরেছি। যদিও দর্শনের নানা পুঁথিতে ছোটবেলা থেকে মানুষের বেঁচে থাকার স্বাভাবিক ইচ্ছার কথা পড়েছি, তবু মনে হয় আমার বেঁচে থাকার স্পৃহাটা যেনো একটু অস্বাভাবিক—যার জন্য আমার বয়সের খোঁজই আমি নিতে চাই না। এজন্যই হয়তো তরুণ সংঘের আজীবন সদস্য পদলাভে আমার এতো প্রয়াস। আবার বাল্যাবধি দর্পণের সঙ্গে প্রায় অসহযোগ। কাজেই চুলের রং দেখে বয়স মাপবার সুযোগ থেকেও আমি অনেকটা বঞ্চিত।

কবি কৃত্তিবাসের রামায়ণে পড়েছিলাম, রাবণের স্বর্ণ-লঙ্কায় ভস্মলোচন নামে এক রাক্ষস ছিল। বহু তপস্যা করে সে ব্রহ্মার কাছ থেকে বর পেয়েছিল— সে যদি তার নিজের মুখ দেখতে না পায় তবে যুদ্ধে তাকে কেউ মারতে পারবে না। নিজের মুখ নিজের পক্ষে দেখা অসম্ভব ভেবে সে ভেবেছিলো সে অমর। কিন্তু এমনি কপালের ভোগ, রাম-রাবণের যুদ্ধে লংকার রণক্ষেত্রে তার মুখের সামনে এক বিরাট দর্পণ হাজির করা মাত্রই নিজের মুখের প্রতিবিম্ব দেখে সে তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হলো। রাক্ষসরাজ রাবণের শত্রু রামচন্দ্রের এমনি রণ-কৌশল। ভক্তেরা বলেন, লীলা-খেলা। আমি সুদূর অতীতে পূর্বজন্মে ভস্মলোচন ছিলাম কি-না জানি না। জানবার উপায়ও নেই। তবে বর্তমান জীবনে দর্পণের প্রতি আমার গভীর অনাসক্তি দেখে ধূম-দর্শনে বহ্নি অনুমানের ন্যায় একথা বলা অসঙ্গত হবে না যে, সে রাক্ষস-প্রবরের সঙ্গে আমার হয়তো কিছু আত্মিক সাদৃশ্য আছে।

আজকালকার কুশলী মনোবিজ্ঞানীদের কাছে হাজির হ'লে তাঁরা আমার অবচেতন মনে সে রাক্ষসের আঁচড়ও হয়তো দেখতে পারেন। তবে খুব সৌভাগ্যের কথা, স্বপ্নজীবনেও সে রাক্ষসের সঙ্গে, অন্তত তিনি আমাকে চর্বিত রসাস্বাদ করতে উন্মুখ, এমন অভিজ্ঞতা হয়নি। হ'লে হয়তো মনোবিজ্ঞানীরা বলে বসতেন, জাগ্রত জীবনে বাহিরের পরিবেশের চাপে আমার বিরাট দেহ দ্বারা রাক্ষস-প্রবরের তৃপ্তিসাধনে অক্ষম হয়ে স্বপ্নের স্বাতন্ত্র্যালোকে কল্পনায় সে সৌভাগ্য লাভের চেষ্টা করছি।

যাই হোক, সোজাসুজি একথা বলাই যথেষ্ট, যদি বা আমার আয়ু একশ'র কোঠায় পৌঁছয় তবুও জীবনের যে এক বড় সতেজ অংশ আমি পেরিয়ে গেছি একথা অস্বীকার করার উপায় নেই। ছোটবেলা যখন স্কুলে পড়তাম তখন গণিতের শিক্ষক শিখিয়ে দিয়েছিলেন, ভগ্নাংশের মান অর্ধেকের কম হ'লে তাকে শূন্য বলেই ধরে নিতে হবে। সে হিসেবে আমার আয়ুর ভাগও আজ শূন্য এবং আমার বেঁচে থাকা না-থাকারই শামিল। অতএব যে অখণ্ডিত্ব অর্থাৎ দার্শনিক মত আস্বাদন করে আমি এতদিন বেঁচে আছি ও আরও অনেক বছর বেঁচে থাকার দুরাশা পোষণ করি তার সম্বন্ধে এলোমেলোভাবে কিছু বলার এটাই উপযুক্ত কাল।

এলোমেলোভাবে বলার কারণ দু'টি। এলোমেলো বকাই আমার মতো মাষ্টারের কাজ। সুন্দর সবুজ কচি ডাবের শক্ত খোলের ভেতর যেমন তার সার লুকিয়ে থাকে তেমনি দুনিয়ার সব ভালো জিনিসকে খোলস ছাড়িয়ে জানতে হয়। সারাজীবন মাষ্টারী করে তরুণ শিক্ষার্থীদের সংস্পর্শে এসে তাদের

অকুণ্ঠ স্নেহের বিনিময়ে এ সত্য প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করেছি। এটা হলো আমার এলোমেলো বকার এক নম্বর কারণ। দ্বিতীয় কারণটি আরও একটু গভীর। আমি সারাজীবন অল্প-বিস্তর যে শাস্ত্রের আলোচনা করেছি, যার সংস্কৃত নাম দর্শন, আজকের দিনের লোকের তা শুনলেই ঘুম পায়। সেজন্যেই পেশাদার কবিরাজ যেমন তিক্ত ঔষধ সুমিষ্ট অনুপানসহ রোগীকে সেবন করান, আমিও অনেকটা সেই নিয়মেই এলোমেলোর অনুপানে দর্শনের চোখা চোখা কথা বিদ্বজ্জন সমাবেশে পেশ করে থাকি। যাই হোক, এখানে এই দীর্ঘ ভণিতার সমাপ্তি রেখা টেনে আমার জীবন-দর্শনের গোড়ার কথা লেখায় প্রবৃত্ত হওয়া যাক।

মধ্যপথ

আমার জীবন-দর্শন আমার একলার সম্পত্তি নয়। বহুজনের হৃদয়তন্ত্রীতে তার সুর আজ বেজে উঠেছে। এ কথাই প্রকাশ করার চেষ্টা করেছি আমার দার্শনিক রচনায়। আমার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ডক্টরেট' থিসিস তার আগের কঠিন পারিভাষিক নাম পরিবর্তন করে 'আইডিয়ালিজম এ্যাণ্ড প্রগ্রেস' নাম দিয়ে যখন বের করি তখন তার ভূমিকার পাণ্ডুলিপিতে প্রথম খসড়ায় যে কথা লিখেছিলাম তার সারমর্ম আজও আমার মনে আছে। তাতে লিখেছিলাম, আমার দার্শনিক মত জনসমাকীর্ণ রাজপথের ওপরই পড়েছিল। সে অমূল্য রত্ন সেখান থেকেই কুড়িয়ে পেয়েছি। তাকে আমার নিজের বলা চলে না। আমি শুধু আমার ছেঁড়া কাপড়ে তাকে ভালো করে জড়িয়ে জনসাধারণের সামনে হাজির করেছি। পাবার কৃতিত্ব আকস্মিক, কিন্তু দেবার কৃতিত্ব মোটেই দাবী করতে পারি না। যা আমার নয়—অতর্কিতে অন্যের কাছ থেকে পাওয়া তা দান করার স্পর্ধা আমি রাখি না। যখনি এ অমূল্য রত্ন আমার বলে দাবী করে আমিত্বের ক্ষুদ্র বন্ধন তার ওপর চাপাই তখনই তার উজ্জ্বলতা হারিয়ে যায়, তখনই যেনো তার রূপান্তর হয় অকিঞ্চিৎকর কাচখণ্ডে।

আর যখনই নিজের কথা ভুলে যাই, জীবনের লাভ-লোকসানের হিসেবের খাতা ক্ষণিকের মতো মন থেকে সরে যায়, তখনই হৃদয়তন্ত্রীতে জীবন-দর্শনের নতুন সুর যেন বেজে ওঠে। আর মনে হয় ইতিহাসের এই সঙ্কটময় মুহূর্তে সব মানুষের সফল জীবনযাত্রার মূলমন্ত্র এতেই নিহিত।

আমার জীবন-দর্শনের সংগে ব্যক্তিগত অহমিকার সংযোগ অবাঞ্ছনীয় এবং অনাবশ্যক। চাঁদের আলোর মতোই এ দর্শন সবারই সম্পত্তি। তবে সবাই

এর খোঁজ নেয় না, নিতে চায় না। এইটুকুই তফাৎ। নিজের অজস্র দোষ-ত্রুটি সত্ত্বেও প্রেমের দ্বারা, ভালবাসার দ্বারা, অনুরাগের দ্বারা এ দর্শনকে নিজস্ব করে নেবার দুরাশা আজও ছাড়িনি। মেঘের উপর মেঘ জমে থাকা আকাশে বিদ্যুৎ চমকানোর মত করেই জীবনের অজস্র বেচাকেনার মধ্যে হঠাৎ যেন তার স্পর্শ পাই। আর অমনি আমার বেসুরো, বেতাল, জীবনে বেজে উঠে এক নতুন সুর। ক্ষণিকের সেই স্পর্শ, সেই প্রেরণা আকস্মিক। সেই সত্যকে পাবার জন্য, সেই আদর্শে পৌঁছনর জন্য কিছু কিছু চেষ্টা করে যাচ্ছি জীবনে নানা দুঃখ-দ্বন্দ্বের ভেতর দিয়ে। হয়তো এ উক্তি অহমিকাজাত নয়।

জীবন-দর্শন কথার পেছনে আরও একটি গভীর সত্য রয়েছে। যার দিকে এই দর্শন-বিতৃষ্ণার যুগে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন। সারাজীবন দর্শনের সঙ্গে আন্তরিক যোগ স্থাপনের চেষ্টা করে এই সত্য উপলব্ধি করেছি যে, সার্থক দর্শন মাত্রেই জীবন-দর্শন। দর্শন কথাটি তাই জীবন-দর্শন কথারই একটি প্রতিশব্দ। তথাপি এই অতিভাষণের আজ প্রয়োজন। সতেরো শতক থেকে ফরাসী মনীষী ডেকার্ট ইউরোপে যে নিছক বুদ্ধিবাদী দার্শনিক চিন্তাধারার প্রবর্তন করেছেন তার চাপে দর্শনের সঙ্গে মানুষের অন্তরের যোগ ছিন্ন হয়ে গেছে। দর্শন আজ ভাব-বিলাসীদের মগজের এক জোরালো খোরাক—তত্ত্বালোচনার নামে নানা নীরস, দুর্বোধ্য যুক্তির কসরৎ। একেই চলতি কথায় বলে, অন্ধলোকের অন্ধকার ঘরে কালো বেড়াল হাতড়ে বেড়ানো, যদিও সে ঘরে আসলে সাদা কালো কোনো বেড়ালই নেই।

আবার আজকের দিনে আর একদল দার্শনিক গা ঝাড়া দিয়ে উঠেছেন, যাঁরা আঙুর টক বলে তত্ত্বালোচনার পাশই মাড়াতে চান না। ডেকার্ট-উত্তর দর্শনে তত্ত্বালোচনার যে ন্যূনতম অংশ ছিল তাকেও এঁরা ছলে-বলে বাদ দিয়ে দিয়েছেন। তাঁদের মতে, ভাষা বিশ্লেষণই দর্শনের সব চেয়ে বড় কাজ। ভাবের আবেগে এঁরা ভুলে যান, দর্শন যদি তত্ত্বালোচনা ছেড়ে দিয়ে ভাষাতত্ত্বের আসর দখল করতে চায় তবে তা তত্ত্ব-রসাস্বাদ থেকে যেমন হবে বঞ্চিত তেমনি ভাষাতত্ত্বের আলোচনায়ও হবে অপারগ। একেই পণ্ডিতেরা বলেন "ইতো ভ্রষ্টস্ততোনষ্টঃ"। অর্থাৎ দু'কুল হারান।

বস্তুত, কাণ্ডারীবিহীন নৌকার মতো দর্শন যখন জীবনের দরিয়ায় ডুবু ডুবু তখন সফল জীবনযাত্রার তাগিদেই প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে তার যোগসূত্র আবিষ্কার করা খুবই প্রয়োজন। তাই বাহুল্য উক্তি হলেও জীবন-দর্শন কথাটা সার্থক। সংস্কৃতে একে বলে "গো-বলীবর্দ ন্যায়"। গো বা গরু বললেই বলদ বা বলীবর্দ বোঝায়। তবুও বলদের ওপর জোর দেয়ার জন্যে আমরা বলি গো-বলীবর্দ। আজকের দিনে

দর্শনের সঙ্গে মানুষের ব্যবহারিক জীবনের যে অবাঞ্ছনীয় ও অযৌক্তিক বিচ্ছেদ তার ওপর কশাঘাত করার উদ্দেশ্যেই জীবন দর্শন কথার সৃষ্টি।

অন্যের বেলা যাই হোক আমার পক্ষে এই বয়সে দর্শনের মায়া কাটানো খুবই কঠিন। ছাত্রাবস্থায় রাতের পর রাত দর্শনের পুথি মেঝের ওপর চারদিকে ছড়িয়ে রেখে, সেই পুথিরই কিছু মাথায় দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছি। আর নিজের অজান্তেই হয়তো তাই দর্শন আমার মগজের ভেতর দিয়ে অন্তর স্পর্শ করেছে। এমন লোকও যে একেবারে নেই এমন নয়, যাঁরা অহেতুক ভালবাসার আতিশয্যে মনে করেন দর্শন-শাস্ত্রে আমি এক বড় পণ্ডিত। কিন্তু যে অভিনব উপায়ে আমি সে বিদ্যা আয়ত্ত করেছি তা জানলে তাঁরা মত পালটে ফেলতে পারেন এমন আশংকা হয়তো অমূলক নয়।

পণ্ডিতেরা বলেন: "আবৃত্তি: সর্বশাস্ত্রানাং বোধাদপি গরীয়সী" অর্থাৎ কোন বিদ্যা আয়ত্ত করবার সবচেয়ে ভালো উপায় না বুঝে মুখস্থ করা। কিন্তু নিজের অভিজ্ঞতায় বলতে পারি, শেখার ভালো উপায় না বুঝে মুখস্থ করা নয় পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়া। শেখার আসল হাতিয়ার চেতন মন নয়, তার পেছনে রয়েছে যে অতি প্রতাপান্বিত অবচেতন মন, তাই। জেগে থেকে যখন আমরা পড়ি তখন আমাদের অবচেতন মন ভালো কাজ করতে পারে না, যখন আমরা ঘুমিয়ে পড়ি আর উড়ে চলি এই চেনা জগৎ ছেড়ে—অলৌকিকের এবং অপরিচিতের জগতে তখন সহজেই সবকিছু আপনার করে নিতে পারি—মনের পাখা গজায় তখন ঘুমের দেশে—তার গতি অপ্রতিহত। শেখার এমন সহজ ও সরল পন্থা আমি আবিষ্কার করেছি একথা শুনলে হয়তো মনস্তাত্ত্বিকেরা ঘাবড়ে যাবেন। কাজেই এ প্রস্তাবের বিস্তারিত আলোচনা মুলতুবী রেখে দেয়া যাক।

আমার জীবন-দর্শনের গোড়ার কথা ভাবতে গেলেই মনের সামনে ভেসে ওঠে মধ্যযুগের তের শতকের মনীষী বুরিদানের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ গাধার ছবি। এর পেছনে কোনও সাদৃশ্য-বোধ আছে কিনা জানি না। থাকলেও তা সুধী-সমাজে প্রকাশ করা হয়তো সমীচীন হবে না। দুষ্টু লোকে বলে, বানিয়ে বলে কিনা জানি না, অতি তার্কিক সূক্ষ্মবুদ্ধি বুরিদানের কাছে থেকে সঙ্গগুণে তার গাধাও হয়ে উঠেছিল এক বড় তার্কিক। তার মুখের ডাইনে-বাঁয়ে রাখা হয়েছিল ওজনে সমান আর দেখতেও ঠিক একই রকম দুটি ঘাসের স্তূপ। সে গাধাটি তর্কশাস্ত্রে এমনি পাকাপোক্ত হয়ে উঠেছিল যে, সে বিচার করে ঠিকই করতে পারল-না কোন্ দিকের ঘাসে আগে মুখ দেয়া উচিত। দু'দিকের ঘাসই যখন ওজনে সমান ও দেখতেও একই রকম (স্বাদে এক রকম কিনা তা বলতে গেলে আমাকে জাতিস্মর হতে হয়) তখন কোন্ দিকের ঘাস

আগে খাওয়া উচিত এটা তার্কিকের কাছে এক বড় সমস্যা। কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের মতে, ভট্টপল্লীর পণ্ডিতেরা তেলাধার পাত্র না পাত্রাধার তৈল এই দুরূহ তত্ত্বের সমাধান করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত তেলের বাটী উল্টিয়ে দিয়ে তেলাসক্তি বর্জন ও তত্ত্বনির্ণয়ে সক্ষম হয়েছিলেন। বুরিদানের গাধার সামনে এমন কোন উপায় হয়তো ছিল না। তাই তর্কশাস্ত্রের কেরামতির চাপে ঘাসে আর তার মুখ দেওয়াই হল না। আজকের দিনে যাঁরা চিন্তাশীল এবং পরের মুখে ঝাল খেতে নারাজ তাঁদের অবস্থা অনেকটা বুরিদানের গাধারই মতো।

একদিকে আধুনিক উগ্র জড়বাদ আর অন্যদিকে অতি পুরোনো অধ্যাত্মবাদ। প্রথমটি এক নিশ্বাসে অসংকোচে উড়িয়ে দেয় পরকাল আর ইহকালের সুখকেই মানুষের উন্নতির মাপকাঠি মনে করে। দ্বিতীয়টি তার ঠিক উল্টো। তার কাছে ইহকালের মূল্য অতি নগণ্য আর পরকালই প্রধান। সে এক নিশ্বাসে মানুষকে বলে ইহকালের সব বেচাকেনা বন্ধ রেখে সব সময় পরকালের জন্য তৈরী থাক। অথচ প্রয়োজনের নিক্তিতে এ দুটির ওজনই সমান। প্রথমটির আশ্রয় নিলে সব কিছু আধ্যাত্মিককে বিসর্জন দিয়ে দুনিয়ার কামড়াকামড়ি নিয়েই মানুষকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। আর দ্বিতীয়টির আশ্রয় নিলে আধ্যাত্মিকতার নামে বহুলোক ইহলোকের সুখ-ভোগ থেকে বঞ্চিত হয়। এই দুই পথের কোন পথেই মানুষের তৃষ্ণা মিটতে পারে না। তাই, যাঁরা ভাবুক, তাঁরা বেছে নেন মধ্যপথ ও এই মধ্যপথেই পান সত্যের সন্ধান। এই মধ্যপথই আমার জীবন-দর্শনের মধ্যমণি।

মধ্যপথ কথাটা এমন কিছু নতুন নয়। ইতিহাসের এক আদিমতম মুহূর্তে ভগবান তথাগত বুদ্ধ নির্বাণ লাভের জন্যে বছরের পর বছর কঠোর তপস্যা করে পেয়েছিলেন এই মধ্যপথের সন্ধান। উগ্র তপস্যায় তাঁর শরীর যখন একেবারে জীর্ণ ও অবসন্ন, তখন তিনি জানতে পারলেন অতিরিক্ত কায়ক্লেশ সত্যলাভের পন্থা নয়—দেহনাশই তার চরম ফল। সত্যলাভের জন্যে প্রয়োজন, কৃচ্ছ্র তপঃ আর সহজ ভোগ এই দু'য়ের মধ্যপথে পাদচারণা। সে পথে চলেই তিনি পৌঁছেছিলেন নির্বাণের জ্যোতির্ময় অমৃতলোকে। আর সিদ্ধিলাভের পর এই অমৃতের বার্তাই তিনি পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে প্রাচীন ভারতের ঘরে ঘরে প্রচার করেছেন। সেই আলোর সংকেত আজো সমুদ্রের বুকে ধ্রুবতারার মতো মানুষের জীবনতরীকে তার গন্তব্যে পৌঁছে দিচ্ছে। দ্বিজেন্দ্রলালের "আজিও অর্ধজগৎ প্রণত চরণে যাঁর" উক্তি সত্যিই সার্থক।

গীতাশাস্ত্রের বহুজনবিদিত কর্মযোগ এই মধ্যপথেরই এক বড় সংকেত। অষ্টম শতকে বা তারও কিছু আগে দার্শনিকপ্রবর আচার্য শংকর তাঁর গীতা-ভাষ্যের উপক্রমণিকায় বলেছেন, এই মধ্যপথ আবিষ্কারই গীতার মহান শিক্ষা। আচার্য শংকরের মতে একদিকে নিবৃত্তিমার্গীয় সংসারবিরতি স্পৃহা, অন্যদিকে প্রবৃত্তিমার্গীয় সংসার ভোগস্পৃহা। প্রথমটি বেদের জ্ঞানকাণ্ডের অর্থাৎ উপনিষদ ভাগের প্রতিপাদ্য, দ্বিতীয়টি কর্মকাণ্ডের বিষয়বস্তু। এ দু'য়ের মাঝখানে যে সরু পথ তাই গীতার প্রধান আবিষ্কার। তাতেই গঙ্গা-যমুনার মতো মিশে গেছে ত্যাগনিষ্ঠা আর কর্তব্যনিষ্ঠা। এদেরই প্রাচীন পারিভাষিক নাম সাংখ্য ও যোগ। গীতার মতে সাংখ্য ও যোগ দুই নয়, এক। "একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি"। সাংখ্য ও যোগকে এক দেখাই গীতার মতে সম্যকদৃষ্টি।

এই মধ্যপথের বাণী ঘোষিত হয়েছে ইসলামের ভিতর। দীন ও দুনিয়া, ধর্ম-আচরণ ও সংসারজীবন, এ দু'য়ের সামঞ্জস্য বিধান কোরানের বিশেষ নির্দেশ। যে সমস্ত সুফী সাধক সংসার ছেড়ে দিয়ে নিরালায় শুধু আল্লার জিকির করেন, অনেকের মতে ইসলামের আসল কথা তাঁদের মহৎ জীবনে মূর্ত ও রূপায়িত হয়ে ওঠেনি। হযরত ঈসার প্রচারের ফলে যখন ইহুদী পুরুতদের পেশা ভেঙ্গে যাওয়ার যোগাড় তখন তারা তাঁকে বলেছিলো "তুমি পুরনো ধর্মমতগুলো ভেঙ্গে দিচ্ছ কেন"? তিনি বলেছিলেন "পুরনো নবীদের উপদেশগুলো ভাঙবার জন্যে আমি আসি নি, আমি এসেছি গড়তে। তাঁরা যেসব মহান সত্য প্রচার করেছেন, তার পরিপূরণই আমার আসল কাজ"। এ কথা এই মধ্যপথেরই এক সংক্ষিপ্ত ইঙ্গিত।

ইতিহাসের আদি যুগ থেকে মহাপুরুষরা প্রায় এক বাক্যে যে পথের সন্ধান দিয়েছেন, আরবী ভাষায় যাকে বলা হয় সেরাতুল মুস্তাকীম—সত্যের প্রশস্ত ও উন্মুক্ত পথ, বেদ যার নাম দিয়েছে ঋত, তার পেছনে যে জীবন-দর্শন তারই একটু ইঙ্গিত-আভাস দেবার চেষ্টা করে যাচ্ছি আমার দার্শনিক রচনায়।

ভগবান বুদ্ধ এই দর্শন হাৎড়ে বেড়ানোর চেষ্টাকে নিন্দে করেছেন। থিয়োরির আলেয়ার পেছনে ছুটতে ছুটতে মানুষ তার প্রয়োজন সিদ্ধির পথ হারিয়ে ফেলতে পারে এটা ছিল তাঁর বড় আশংকা। সে গোলকধাঁধা থেকে তাকে বাঁচাবার জন্যেই তিনি জীবনযাত্রার সুনির্মল পথ উন্মুক্ত করেছেন। ব্রহ্মজাল সূত্রে আছে বুদ্ধের সময়ে প্রাচীন ভারতে বাষট্টি রকম দার্শনিক মত প্রচলিত ছিল। তাদের ভেতর শান্তির সংকেত না পেয়ে তিনি স্বতন্ত্র স্বাধীন-পথে নির্বাণের সন্ধান করেছিলেন। তাঁর শিষ্য মলুংক্যাপুত্ত তাঁর কাছ থেকে কতগুলো জটিল দার্শনিক প্রশ্নের জবাব না পেয়ে অধৈর্য হয়ে তাঁকে বলেছিলেন—

"ভগবান তথাগতের কাছ থেকে এসব প্রশ্নের সদুত্তর না পেলে আমি তাঁর সংঘ ছেড়ে আবার সংসারে ফিরে যাবো"। উত্তরে স্বভাবসুলভ শান্তকণ্ঠে দৃঢ়তার সঙ্গে বুদ্ধ তাকে বলেছিলেন, "এইসব প্রশ্নের আলোচনা নিরর্থক, কারণ, দুঃখ নিরোধের সঙ্গে এদের কোন যোগ নেই"।

অত্যন্ত বিস্ময়ের কথা তবুও বুদ্ধের মহা পরি-নির্বাণের তিন-চারশো বছর পর থেকেই এ জাতীয় দার্শনিক আলোচনা বৌদ্ধ পরিবেশে একটু একটু শিকড় গজাতে শুরু করে আর বুদ্ধের শিষ্যেরা হরেক রকমের দার্শনিক মত প্রচার করতে আরম্ভ করেন। কয়েক শো বছর ধরে সে চিন্তাধারা বেড়েই চলে এবং তার গভীরতা তাদের প্রতিপক্ষ হিন্দু দার্শনিকদেরও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। এ বিচ্যুতি বাঞ্ছনীয় কি অবাঞ্ছনীয় তা জানি না। তবে এ থেকে এ কথাই হয়তো প্রমাণিত হয় যে, শুধু জীবনের নীতিকে আঁকড়ে মানুষ থাকতে পারে না। তার পিছনে যে তত্ত্বের স্বীকৃতি রয়েছে তারও একটি ছবি সে আঁকতে চায়। বৌদ্ধপ্রতিভা তাই যুগ যুগ ধরে মধ্যপথের পেছনে তত্ত্বদৃষ্টির নানা সংকেত পেয়েছে আর তা থেকেই সৃষ্টি হয়েছে নানা রকম দার্শনিক মতবাদের।

মনে হয়, ভগবান বুদ্ধ উদাত্ত কণ্ঠে যে মৈত্রীর বাণী প্রচার করেছেন তার পেছনেও রয়েছে এক ইন্দ্রিয়াতীত তত্ত্বের গভীর অনুভূতি। পণ্ডিতেরা যাই বলুন না কেন এক সর্বব্যাপী আত্মার নিবিড় স্পর্শ মনেপ্রাণে অনুভব না করলে ত্রিভুবনের সর্বজীবের জন্য এমন সহজ সরল অনাবিল প্রেমের আবেদন ও আকুতি জানানো যায় না। বুদ্ধের আকাশের মতো উদার ও সমুদ্রের মত গভীর হৃদয় আমাদের মনে করিয়ে দেয় বৃহদারণ্যক উপনিষদে মুক্ত প্রব্রজ্যা-উন্মুখ ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের অমৃতত্বকামী পত্নী মৈত্রেয়ীর প্রতি নিম্নোক্ত নির্দেশ,

> ন বা অরে সর্বস্য কামায়
> সর্বং প্রিয়ং ভবতি, আত্মনস্তু কামায়
> সর্বং প্রিয়ং ভবতি"

"দুনিয়ার সমস্ত জিনিসকে যে আমরা ভালবাসি সেটা আসলে তাদের জন্যে নয়, তাদের পেছনে যে সর্বব্যাপী আত্মতত্ত্ব রয়েছে তারই জন্যে"। এই বিরাট আত্মতত্ত্বের কথা উল্লেখ না করে সেই অনুভূতির যা চরম ফল, পরিণতি, বুদ্ধ তাকেই রূপায়িত করেছেন তাঁর জীবনে ও বাণীতে, উপদেশাত্মক আখ্যায়িকার ভেতর দিয়ে। সেই অনুভূতির মূল কথা শুধু মানব-প্রেম নয়, বিশ্ব-প্রেম। শুধু মানুষের প্রতি নয়, বিশ্বের সকল প্রাণীর জন্য বুদ্ধের প্রাণে জেগে উঠেছিল সহানুভূতির গভীর সংবেদন। সেজন্যই তিনি অজাতশত্রুর যজ্ঞশালায় নিত্য অগণিত পশুবলির প্রতিবাদে নিজের দেহবলির আশ্বাস দিয়ে সে নিষ্ঠুর প্রথা বন্ধ করেছিলেন।

তাঁর সর্বভূতে মৈত্রীর বাণী 'সর্বে সত্তা সুখিতা হোন্তু' 'সব প্রাণী সুখী হোক' আজও আকাশে-বাতাসে ধ্বনিত হচ্ছে। এই গভীর প্রেমের আকুতির তুলনা ইতিহাসে বিরল। জীবনের ব্যবহারিক ক্ষেত্রে, এটাই অধ্যাত্মবাদের সার কথা, তার বীজমন্ত্র।

এই যুগের এক শ্রেষ্ঠ সাধক বলেছেন, 'কোন কোন গাছে ফুল থেকে ফল হয়, আবার কোন কোন গাছে ফল থেকেও ফুল হয়।' বুদ্ধের সর্বভূত মৈত্রীর সঙ্গে উপনিষদের সর্বাত্মবাদের তুলনা করলে একথাই বারবার মনে হয়। সর্বভূতে মৈত্রী যেন ফল আর সর্বাত্মভাব যেন ফুল। উপনিষদের গাছে আগেই সর্বাত্মবাদের ফুল ফুটে উঠেছে আর তা থেকে বেরিয়েছে মৈত্রীর ফল। বুদ্ধের সাধনায় মৈত্রীর এই ফল থেকেই পাওয়া যায় আত্মতত্ত্বের ফুল। ইতিহাসের চুলচেরা বিশ্লেষণে যাঁরা বুদ্ধ ও উপনিষদের ভেতরে এক বিরাট ব্যবধান আবিষ্কারের চেষ্টা করেন তাঁরা বুদ্ধ দর্শনের অপরিহার্য পরিণতি যে ফুল তার দিকে নজর দেন না। আমাদের মনে রাখা উচিত একক আত্মতত্ত্বের অনুভূতি যেমন আমাদের অন্তরে জাগায় বিশ্ব-প্রেমের সংবেদন, তেমনি বিশ্ব-প্রেমের অনুশীলনও আমাদের নিয়ে যায় একক আত্মতত্ত্বের অনুভূতিতে। যাই হোক, একক আত্মতত্ত্বের অনুভূতি অধ্যাত্মবাদের সবচেয়ে বড় কথা আর ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সর্বভূতে মৈত্রীই সে অনুভূতির ধারক ও বাহক। অন্তরে যদি এই প্রেমের সংবেদন না জাগে তবে আত্মতত্ত্ব বিশ্লেষণ শুষ্ক বিচারে পর্যবসিত হয়, তা মানুষের প্রাণে বিশেষ কোনো সাড়া দেয় না। আত্মতত্ত্বের আলোচনা যখন নিছক যুক্তির কসরতে পরিণত হয়েছিলো তখনই বুদ্ধ তাতে প্রাণ সঞ্চার করেছিলেন তাঁর প্রেমের সোনার কাঠির স্পর্শে। সেই পুণ্যস্পর্শে সেদিনের সমাজ শাসনের লৌহ শৃঙ্খল ভেঙ্গে গেল আর সর্বাত্মভাবের অতি বিপরীত ভেদ-বৈষম্য প্রেমের বন্যার গেলো ভেসে। এই হচ্ছে প্রাচীন ভারতের—হয়তো বা সারা দুনিয়ার, এক অতি বড় প্রথম রক্তবিহীন বিপ্লব।

এই অধ্যাত্মবাদকে অনেকে তর্কযুক্তির মারফৎ প্রমাণ করতে চেয়েছেন। আমার মনে হয় সে চেষ্টা একটু অস্বাভাবিক, অপ্রাকৃত। তর্কযুক্তি দিয়ে এই অধ্যাত্মবাদের বাড়ীর সীমার কাছে বড় জোর যাওয়া চলতে পারে, তবে তার অন্তঃপুরে প্রবেশ করতে হলে চাই শুদ্ধ হৃদয়, চাই অনাবিল প্রেম, চাই অন্তরের অকপট আবেগ।

ছোটবেলা থেকেই পরম হিতৈষী শিক্ষকেরা আমার কপালের উপর দর্শনের নিষ্ঠাবান ছাত্রের সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে রেখেছিলেন। তখন থেকেই দুয়ে দুয়ে কেন চার হবে, পাঁচ হবে না কেন; মুরগী আগে, না ডিম আগে ইত্যাদি

গভীর সমস্যার সমাধানে আমার প্রচুর আগ্রহ। অনেক পরে আচার্য শংকরের দার্শনিক লেখায় শুষ্কতর্কের অজস্র নিন্দা দেখতে পাই। তা থেকে বুঝতে পারি শুধু তর্কের সাহায্যে অধ্যাত্মদৃষ্টির সার্থকতা প্রমাণ করা সুদূরপরাহত। সে জন্যেই তত্ত্বানুভূতির ওপর বিশেষ জোর দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর সহজ সরল ভাবপূর্ণ ভাষায় বলেছেন, "পাঁজীতে লিখে বিশ আড়া জল কিন্তু পাঁজী টিপলে এক ফোঁটাও পড়ে না। এক ফোঁটাই পড়, তা-ও পড়ে না"।

অধ্যাত্মবাদের মূলকথা বিচার বিশ্লেষণ নয়—প্রেম। সে প্রেমের বাঁধন নেই, গণ্ডী নেই। তাতে শত্রুমিত্রের তফাৎ নেই। সে প্রেম সকলের জন্যে। এমন যে সব বিলিয়ে দেবার ক্ষমতা তার পেছনে আছে এক বিরাট সর্বব্যাপী তত্ত্বের অনুভূতি, যার সঙ্গে সারা বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সব কিছুর কোন তুলনা হয় না। এই অন্তরের অনুভূতি থেকেই ত্যাগ, সাধনা, সন্ন্যাস ও সুফীবাদের উৎপত্তি।

শ্রীমদ্ভাগবতে ধ্রুবের আখ্যান মারফৎ এই তত্ত্বই দেখানো হয়েছে। রাজা উত্থানপাদের বালক পুত্র ধ্রুব বিমাতার চক্রান্তে পিতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত হয়ে জননীর নির্দেশে শ্রীহরির সন্ধানে গৃহহারা হয়ে বেরিয়ে গেলেন। তাঁর মা তাকে বুঝিয়েছিলেন শ্রীহরির কৃপা পেলে তিনি অক্লেশে রাজ্য-সম্পদ পেতে পারেন। সরল বিশ্বাসী বালক দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর শ্রীহরির সন্ধানে তন্ময় সাধনায় কাটালেন। শেষে হৃদয়ের ঐকান্তিক ভক্তিতে তাঁর দর্শনও পেলেন। ভগবদ্দর্শনের বহু পূর্বেই রাজ্য লাভের আকাঙ্ক্ষা তাঁর মন থেকে মুছে যায়। তাঁর প্রেমাস্পদ শ্রীহরি যখন তাঁকে সে কথা স্মরণ করিয়ে দেন তখন তিনি বলেন,

"স্থানাভিলাষী তপসি স্থিতোহং।
ত্বাং প্রাপ্তবান্ দেবমুনীন্দ্রগুহ্যম্॥
কাচং বিচিন্বন্নপি দিব্যরত্নং।
স্বামিন্ কৃতার্থোঽস্মি বরং ন যাচে"॥

"হে ভগবান, আমি কাচখণ্ড খুঁজতে এসে তোমার মতো
অমূল্য রত্ন লাভ করেছি। আমি আর রাজত্ব চাই না।"

বহু আখ্যায়িকার ভেতর দিয়ে ধর্মশাস্ত্রে এই তত্ত্ব বোঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে। কৃষ্ণের বাঁশীর আওয়াজ শুনলেই শ্রীরাধা যে কুল মান সব ভুলে আকুল হয়ে যেতেন, এই চলতি আখ্যায়িকার পেছনেও আছে একই সত্যের স্বীকৃতি। এই মহাতত্ত্বের যাঁরা সন্ধান পান, সংসারের সবকিছু ধন-দৌলত, মান-সম্মান, প্রভাব-প্রতিপত্তি তাঁদের কাছে তুচ্ছ হয়ে যায়। এক অজাগতিক তত্ত্বের অনুভূতিতে তাঁরা আচ্ছন্ন, ভরপুর হয়ে যান। আর জগতের সকলের জন্যে তাঁদের অন্তর থেকে অনাবিল শুভেচ্ছা ও প্রেম বর্ষিত হয়।

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এই বিরাট আদর্শের অনুসরণ করার ক্ষমতা অতি অল্প লোকেরই আছে। অগণিত মানুষের দৈনন্দিন জীবন এই আদর্শ থেকে বহু দূরে। তাদের পক্ষে এর পরশ পাওয়া তো দূরের কথা, অনেক সময় এর ছায়াও তারা মাড়াতে পারে না। মনীষী প্লেটো সেজন্যেই বোধ হয় বলেছেন, "আমরা পৃথিবীর অগণিত মানুষ হাত-পা-বাঁধা পিঠে পাথরচাপা অবস্থায় গভীর অন্ধকারের গহ্বরে ডুবে আছি। গহ্বরের ওপার থেকে সত্যের ক্ষীণ, বিকৃত ছায়া আমাদের পিঠের ওপর পড়ছে আর তাকেই সত্য ভেবে এই বন্দীদশায় জীবনের দুঃখে আমরা সতত জর্জরিত"। ছান্দোগ্য উপনিষদ এই সত্যের নাম দিয়েছেন ভূমা। ভূমা শব্দের অর্থ বৃহৎ। যার চেয়ে বড় কিছু হয় না সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যার তুলনায় অতি তুচ্ছ ও নগণ্য, তা-ই জীবের শেষ লক্ষ্য ও চরম উপজীব্য। ছান্দোগ্য উপনিষদ তাই বলেছেন, "ভূমৈব সুখং, নাল্পে সুখমস্তি"—"ভূমাতেই সুখ। আর যা কিছু সব তার তুলনায় অল্প"। তাতে সুখ নেই আছে সুখের ছায়া প্রতিবিম্ব। কিন্তু এই ভূমার সন্ধান নেয় ক'জন, নেবার ক্ষমতাই বা আছে ক'জনের? হজরত ঈশা ঠিকই বলেছেন, "Spirit indeed is willing but the flesh is weak." মানুষের অন্তরতম আত্মা পেতে চায় সেই বৃহৎ সত্যের, ভূমার সন্ধান কিন্তু তার ভেতরের জড় সত্তা তাকে দুর্বল করে আর জীবনযুদ্ধে সেই সত্যের দিকে এগোবার ক্ষমতা সে হারিয়ে ফেলে। সুতরাং শুধু সর্বব্যাপী আত্মার কথা, শুধু ভূমাতত্ত্বের কথা, শুধু নির্বাণের কথা বললেই মানুষের জীবন-সমস্যার সমাধান হবে না। আর অত বড় জোরালো ঔষধ হজম করার ক্ষমতা সবার নেইও। সাধারণ মানুষ যে খোরাক হজম করতে পারে, তাই খাইয়ে, সুস্থ সবল করে ধীরে ধীরে তাকে নিয়ে যেতে হবে অধ্যাত্মবাদের প্রশস্ত আঙিনায়। এর ঠিক উল্টো পথে চলার জন্যেই উগ্র অধ্যাত্মবাদ তার ভাস্বর মহিমা সত্ত্বেও অতীতে বহুজনের জীবনকে পঙ্গু করেছে। তারা পরলোকের দিকে তাকিয়ে ইহজীবনের ব্যর্থতাকে বারবার অস্বীকার করবার নিষ্ফল প্রয়াস পেয়েছে। মানুষের দুর্বলতার সঙ্গে গভীর পরিচয় ছিল বলেই অতি প্রাচীন সাংখ্যদর্শন বলেছেন, প্রকৃতির অনন্ত শক্তি সম্ভোগ না করে চৈতন্যময় পুরুষের বিষয় বৈরাগ্য হয় না। ভোগ ছাড়া ত্যাগ হয় না, ভোগেরই ফল ত্যাগ।

যাই হোক, অধ্যাত্মতত্ত্বকে একেবারে বাদ দিয়ে শুধু জড়দেহের সেবায়ও মানুষের প্রভূত অকল্যাণ। এতে মানুষের ভেতর অনাবিল প্রেম জাগে না বরং অনবরত সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়। ছান্দোগ্য উপনিষদ এই দেহসেবার নাম দিয়েছেন আসুর উপনিষদ। অসুর-রাজ বিরোচন এই জীবন দর্শনের সন্ধান পেয়েই উৎফুল্ল, উল্লসিত হয়ে উঠেছিলেন। আর তাতেই অসুরদের সর্বনাশ হয়েছিল। দেবরাজ

ইন্দ্র এই দেহবাদের ভেতর শান্তি না পেয়ে বহু সাধনা ও তপস্যার পর এক বিশ্বব্যাপী চৈতন্যের আভাস পেয়েছিলেন। তাতেই দেবতাদের অভ্যুদয় হয়েছিল। কেউ কেউ মনে করেন জড়ের প্রতি অতিরিক্ত আসক্তি ও প্রণয় আজকের দিনের প্রগতিবাদীদেরই অভিনব আবিষ্কার। আসলে সৃষ্টির আদিমতম মুহূর্ত থেকেই দেহাত্মবাদের সৃষ্টি ও প্রেরণা। কেয়ামতের আগে সে প্রেরণার পরিসমাপ্তি অসম্ভব। মানুষ জড় ও চেতনের মিশ্রণ। তাদের উভয়ের প্রতি আকর্ষণ তাই তার পক্ষে অতি স্বাভাবিক। কখনও জড়ের প্রতি আসক্তি প্রবল হয় আর আধ্যাত্মিকের প্রতি আকর্ষণ একরকম অন্তর্হিত হয়। আর তার উল্টোটাও মাঝে মাঝে জীবনের তাগিদে ঘটে। তখন মানুষ ব্যবহারিককে ত্যাগ করে পারমার্থিককে আঁকড়ে ধরতে চায়। একথা ব্যক্তির জীবনে যেমন সত্য, তেমনি তার ব্যাপকতর সামাজিক জীবনেও সত্য। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় এই ওঠানামার সাক্ষাৎ প্রচুর পাওয়া যায়।

বর্তমান যুগে যেখানে যেখানে অধ্যাত্মবাদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় অভিযান সেখানে সেখানেই অধ্যাত্মবাদের নামে ধর্মব্যবসায়ীদের চেষ্টায় জনসাধারণের শোষণ, একথা ঠিকই। মানুষের অতীত ইতিহাসে পরলোকের দোহাই দিয়ে সাধারণ মানুষের জীবনের চাহিদাকে অবজ্ঞা করা হয়েছে। আর গত চারশ' বছরের ক্রমবর্ধমান বৈজ্ঞানিক সভ্যতা ঠিক তার উল্টোপথে চলেছে। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানস্পৃহার চরম পরিণতি হয়েছে বহিপ্রকৃতির ওপর মানুষের শক্তিবৃদ্ধিতে। নানা নতুন যন্ত্রপাতির আবিষ্কারে মানুষের শক্তিও যেমন বেড়েছে তেমনি তার প্রাত্যহিক জীবনের প্রয়োজন মেটাবার চেষ্টাও হয়েছে অপরিমিত ও প্রচুর। এতে পরলোকবাদী অধ্যাত্মবাদের ওপর মানুষের আস্থা কমে গেছে। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, এতেও তার জীবন-সমস্যার সমাধান হয়নি। এই অতি প্রাচুর্যের কোলাহলের মধ্যেও দুঃখের করুণ সুর মোটেই ক্ষীণ হয়নি। তাই মাত্র পঁচিশ বছরের ভেতর দু' দু'টো ভয়াল মহাযুদ্ধের তাণ্ডবলীলা পৃথিবীর বুকে ঘটল। বিজ্ঞানের এত প্রগতি সত্ত্বেও আজও জগতের কতকগুলো দেশ অর্থনৈতিক দিক দিয়ে অতি অনগ্রসর। অতি অগ্রসর ও উন্নত দেশের সঙ্গে নেহাৎ স্বার্থের খাতিরে ছাড়া তাদের হাত মিলিয়ে চলা অসম্ভব। তার ওপর অনেক ক্ষেত্রেই বহুজনের জীবনযাত্রার মান কতিপয় সৌভাগ্যবানের তুলনায় নিতান্ত নগণ্য। স্বর্গলোভাতুর প্রাচীন যুগের মানুষ তা যেন দেখেও দেখেনি। আজকের দিনের অগণিত জনগণের দৃষ্টি পৃথিবীমুখী। কবিকণ্ঠে "স্বর্গ হতে বিদায়ে'র যে বার্তা ঘোষিত হয়েছে সেটা তাদেরই অন্তরের কথা। অলৌকিক আধ্যাত্মিকতার রঙিন কাচে জীবনের দুঃখ দৈন্যকে রঙিন করে

দেখার মনোবৃত্তি তারা বহুদিন হারিয়ে ফেলেছে। তারা এই বৈষম্যের ভেতর দেখে মাৎস্যন্যায়েরই এক অভিনব অভিব্যক্তি। এখানেই আমাদের দুঃখের ফিরিস্তির সীমারেখা টানার উপায় নেই, আজ বিজ্ঞান যেসব মারণাস্ত্র আবিষ্কার করেছে ও করছে ভবিষ্যতে যদি বিশ্বযুদ্ধ বাধে আর সেইসব মারণাস্ত্র যদি ব্যবহার করা হয় তবে পৃথিবীর পিঠ থেকে মানুষের চিহ্ন একেবারে মুছে যাবে এমন আশংকা অযৌক্তিক নয়। এসব কঠিন প্রশ্নের মোকাবেলা করতে আধুনিক দেহবাদ সমর্থ নয়। অবশ্য প্রাচীন উগ্র অধ্যাত্মবাদের ভেতরেও যে এসব প্রশ্নের সমাধান মিলে না তা বলা বাহুল্য। তবে সে চিন্তা করে লাভই বা কি? আজকের দিনের ম্যালেরিয়া রোগী কুইনাইন ছেড়ে কি বুড়ো পিসিমার তৈরী গাঁদালের ঝোল খেতে চাইবে? তাই আমার জীবন-দর্শনে আমি চেয়েছি অধ্যাত্মবাদ ও দেহাত্মবাদের একটা রফা করতে। প্রাচীন অধ্যাত্মবাদের প্রেমের প্রেরণা ও আধুনিক জড়বাদের উগ্র কর্মশক্তি—এ দু'য়ের সমঝোতার ভেতরই খুঁজে বের করতে চেষ্টা করেছি অগণিত মানুষের বেঁচে থাকার, তাদের সঠিক অভ্যুদয়ের অমোঘ সংকেত।

জড়বাদ ও অধ্যাত্মবাদকে আমি পরস্পরবিরোধী মনে করি না। আজকের দিনের বৃহত্তর রাজনৈতিক পরিবেশে সহাবস্থিতির ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে। আমি সেই সহাবস্থিতির ফরমুলাই জীবন দর্শনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে চাই। অধ্যাত্মবাদ ও জড়বাদের সহাবস্থিতিই তাদের মিলনের পথ প্রশস্ত করবে এ আশা পোষণ করা খুবই স্বাভাবিক। সার্থক, সহজ সহাবস্থিতি—শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে যার নাম সহশিক্ষা, যে, প্রেম ও মিলনের প্রথম সোপান একথা আজকের দিনের তরুণধর্মী মানুষকে মনে করিয়ে দেয়াই বাহুল্য। তাই মানুষের বৃহত্তর জীবনযাত্রা সফল করার জন্যে প্রয়োজন জড়ের ভিতর চেতনের সত্তা ও চেতনের ভিতর জড়ের সত্তা খুঁজে পাওয়া। জড়ের ভিতর চেতনের অনুভূতি আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত করবে প্রেম ও অনুরাগ আর চেতনের ভিতর জড়ের অনুভূতি আমাদের মধ্যে জাগাবে কর্মশক্তি ও উদ্যম। আধুনিক শক্তিপ্রধান বৈজ্ঞানিক সভ্যতা অধ্যাত্মবাদের সোনার কাঠির স্পর্শে প্রেমমুখর হয়ে উঠবে এটাই আমার গভীর বিশ্বাস। যাঁরা মনে করেন, গরুর গাড়ীর যুগে ফিরে গেলে মানুষের মধ্যে অধ্যাত্মবাদে আসক্তি জেগে উঠবে, তাঁদের মতে আমার মোটেই আস্থা নেই। ইতিহাসের চাকাকে এমন করে ঘুরিয়ে দেয়া সম্ভব নয়। সে অতীত-পরায়ণতা অবাস্তব, অযৌক্তিক এবং অপ্রয়োজনীয়। তবে যাঁরা মনে করেন শুধু দেহবাদের ওপর আস্থা রেখে, শুধু দেহসেবার সুষ্ঠু ব্যবস্থার দ্বারা আগামী দিনের সভ্যতাকে ভাস্বর ও মহীয়ান করে তোলা সম্ভব, তাঁরাও

আবেগের আতিশয্যে ভুল পথে চলেছেন। মানুষের বৃহত্তর স্বার্থে, তার স্থায়ী কল্যাণের জন্যেই এই যৌবন জলতরঙ্গে গা ভাসিয়ে না দিয়ে তাকে সংযত ও সুপথে পরিচালিত করা প্রয়োজন। জড়বাদ ও অধ্যাত্মবাদকে পরস্পরের সহায়ক করে তুলতে পারলেই আমরা সেই বহু আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারব। তাই কপালে তিলকধারী, জ্ঞান-ভারী ভুঁড়িওয়ালা পাকা প্রবীণ কবিরাজের দাওয়াই-খানা' থেকে একটি সুপরিচিত দৃষ্টান্ত আহরণ করে বলতে ইচ্ছে করে, জড়বাদের অনুপানে অধ্যাত্মবাদের মহৌষধ সেবনেই আজকের দিনের মানুষের আয়ুর্বেদ নিহিত।

বলা হয়ত নেহাৎ অপ্রাসংগিক হবে না যে, কবিরাজের দাওয়াইখানার দিকে আমার নজর দেয়াটা খুবই স্বাভাবিক। ছোটবেলায় আমার চালচলন দেখে বাবা ঠিক করেছিলেন, আমাকে সংস্কৃত পড়িয়ে কবিরাজ করে তুলবেন। বৃদ্ধবয়সে বাবার দীর্ঘ অসুস্থতার জন্যে সে পরিকল্পনা বাস্তবে রূপায়িত হয়নি। নইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের উলেমাদের জমাটবাঁধা বিদ্যার আঘাত সহ্য না করে আমাকে অনবরত হামানদিস্তায় মুগুরের আঘাতে গাছ-গাছড়া গুঁড়ো করার আওয়াজ শুনতে হত। তাহলে অর্থাগমের জন্যে ক্যাণ্ট, হেগেল, শংকর গজ্জালীর দার্শনিক চূর্ণ অল্পমূল্যে বিক্রী না করে, আমি অবলীলাক্রমে, খুব চড়া দরে বৃহৎ ছাগলাদ্য ঘৃত ও মনোরম অট্টালিকা চূর্ণ বিক্রী করে দু'পয়সা করে নিতে পারতাম।

অর্থাগমের পন্থা আমার যাই হোক না কেন, পিতৃভক্তির আতিশয্যে আমি কবিরাজী বিদ্যা একেবারে ছেড়ে দেইনি। পিতৃসত্য পালনের জন্যে রামচন্দ্রের বনে যাওয়ার গল্প বাবার মুখে বারবার শুনেছি। তাই বাবার অভিলাষ পূরণের জন্যে, তাঁর পরলোকপ্রাপ্তির বহু পরে এবং সম্ভবত আমার পরলোকপ্রাপ্তির সন্নিকট মুহূর্তে, দর্শনের প্রসারিত ক্ষেত্রে কবিরাজী ঔষধালয় খুলে দিয়ে জড়বাদের অনুপানে অধ্যাত্মবাদের জোরালো ওষুধ বিক্রী করতে আরম্ভ করেছি। ক্রেতা জুটলে পসার ভালোই জমবে। নইলে দেউলিয়া হওয়া ছাড়া উপায় নেই। তবে এইটুকু সান্ত্বনা, সক্রেটীস যে আদর্শের অনুপ্রেরণায় হয়েছিলেন মাতৃভক্ত, তারই অনুপ্রেরণায় আমি হয়েছি পিতৃভক্ত। সক্রেটীসের মা ধাত্রী ছিলেন। তাই সক্রেটীস রহস্য করে বলতেন, দার্শনিক বিচারে তিনি তাঁর মায়ের পদাংক অনুসরণ করেছেন। সুনিপুণ ধাত্রীর কল্যাণ-হস্তের স্পর্শে মাতৃগর্ভ থেকে শিশু ভূমিষ্ঠ হয়। সক্রেটীসের মত মানব-প্রেমিক দার্শনিকের পুণ্যস্পর্শে মানুষের অন্তরের গুপ্ত জ্ঞানভাণ্ডার উন্মুক্ত হয়। ধাত্রী ও দার্শনিক দু'জনেরই কাজ এক, তবে ক্ষেত্র ভিন্ন। দার্শনিক আলোচনায় কবিরাজী বিদ্যার প্রয়োগে সক্রেটীসই আমাকে প্রেরণা দিয়েছেন। তিনিই আমার পথিকৃৎ, দিশারী।

আত্মপক্ষ

অভিজ্ঞতার আলোকে এবার আমার জীবন-দর্শন যাচাই করে দেখবার পালা। যে সমস্ত মহাপ্রাণ পুরুষদের কাছ থেকে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে শুভপ্রেরণা পেয়েছি, তাঁদেরকে সশ্রদ্ধ প্রণতি জানাচ্ছি। তাঁদের জীবন ও বাণী সব সংকীর্ণতার, জাতি-বর্ণ-সম্প্রদায়ের ক্ষুদ্র গণ্ডীর বহু উর্ধ্বে—তাঁদের বাণী, জীবন সব দেশের সব মানুষের সম্পত্তি। পৃথিবীর অগণিত সাধারণ মানুষেরই একজন আমি, সে বাণীতে আর দশজনের মত আমারও সমান অধিকার। সবার মতো আমিও তাঁদের জীবনকে, বাণীকে শ্রদ্ধা করি। আর তা থেকেই সফল, সার্থক জীবন-যাত্রার অনুপ্রেরণা পেতে চাই। এই অর্থেই আমার কাছে গীতার উক্তি,

"যে ভজন্তি মাং ভক্ত্যা
ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্"

—"আমার প্রতি যাদের অনুরাগ আমি তাদের ভেতর রয়েছি এবং তারাও আমার ভেতর রয়েছে।"

অর্থপূর্ণ।

সচলতীর্থ মহাপ্রাণ মহাপুরুষদের বাণীর মর্ম ঠিক ঠিক অনুভব করা আমাদের সাধ্যাতীত। জড়সত্তা আমাদের জীবনের এক বড় উপাদান। আমরা সাধারণ মানুষ অনেকটা স্থূল জড় পদার্থ ছাড়া আর কিছুই নই। আমাদের চেতনসত্তা যেন ঘুমন্ত। রূপকথার রাক্ষসীর নাতনীর মতো আমরা তাকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে দিয়েছি। তাই জড় জগৎ থেকেও আমি আমার আদর্শ বেছে নেবার চেষ্টা করেছি। আমার সে আদর্শের কথা শুনলে অনেকে হয়তো শিউরে উঠবেন।

জড়-জগতের আলোকে আমার দর্শনের নাম 'আলু দর্শন'। বঙ্কিমচন্দ্রের উদর-দর্শনের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক আছে কিনা জানি না। তবে আলু দর্শনের অর্থ আমার কাছে অত্যন্ত পরিষ্কার। 'গোল আলু যেমন সমস্ত তরকারীর সঙ্গে—আমিষই হোক আর নিরামিষই হোক, স্থলজ হোক জলজ হোক অথবা উভজ-ই হোক না কেন, অক্লেশে মিলে-মিশে তাদের স্বাদ বাড়িয়ে তোলে, তেমনি, আমার এই অতি প্রিয় আলু-দর্শন যাঁরা মনে-প্রাণে অনুসরণ করবেন তাঁরাও সকলের সঙ্গে মিশে, সব ভাবের রসিক হয়ে মানুষের জীবনে সমৃদ্ধি, শান্তি, সমঝোতা নিয়ে আসবেন। আলু-দর্শনের এমনি মহিমা। গোলাকার আলু দেখলেই অতি প্রয়োজনীয় পরম হিতকর আলু-দর্শনের কথা আমার মনে পড়ে। তাই এই আলুর উপর আমার আকর্ষণ এত গভীর।

শোনা যায়, এক বৈষ্ণব বাবাজী কোদাল দেখে ভাবাবিষ্ট হয়ে পড়েছিলেন। ভাবের অবসানে যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, কোদাল দেখে তাঁর ভাবাবিষ্ট হওয়ার কারণ কি? তিনি বলেছিলেন, 'ভাখ, এই কোদাল মাটি কাটে, সেই মাটিতে খোল হয়, আর সংকীর্তনে সেই খোলের সঙ্গে হয় হরিনাম। সেই হরি হচ্ছেন সবার চেয়ে সুন্দর, জগতের সার। আহা—কোদাল, কোদাল!" আলু দেখে শেষে আমিও না একদিন এমনিভাবে বিহ্বল হয়ে পড়ি এ আশংকা একেবারে অমূলক নয়। তবে একথা অনস্বীকার্য যে, আলুর অন্যের সঙ্গে মিশে যাবার অসাধারণ ক্ষমতার ভেতর রয়েছে আজকের দিনের জটিল জীবনযাত্রার নানা সংঘর্ষের, নানা বিরোধের সমাধানের এক অব্যর্থ সংকেত। তাই জড়জগতে আমার এক নম্বর আদর্শ এই অসাধারণ সংযোগ-শক্তিশালী ডিম্বাকৃতি আলু।

এই আলু-দর্শন জীবনে রূপায়িত করতে হলে প্রয়োজন অশেষ ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা। নিজের আদর্শের জন্যে অক্লেশে হাসিমুখে অকুণ্ঠিত চিত্তে অশেষ যাতনা সহ্য করতে না পারলে, অজস্র লাঞ্ছনা ও অপমান বরণ না করলে কেউ কখনও এ আদর্শে পৌঁছতে পারে না। তাই আমি অশেষ ধৈর্য ও অপরিসীম সহিষ্ণুতার এক আদর্শ জড়-জগৎ থেকে বেছে নিয়েছি, যার নাম প্রকাশ করলে আজকের দিনের রুচিসম্পন্ন লোকের কাছে আমাকে হাস্যাস্পদ হতে হবে। এই রকেট, স্পুটনিকের দিনে অত্যন্ত লজ্জার সঙ্গে ভয়ে ভয়ে আমাকে বলতে হচ্ছে যে, আমার এই দ্বিতীয় আদর্শ, গরুর গাড়ী। আমার নিজের জীবনকে আমি একটি জীবন্ত গরুর গাড়ীতে রূপান্তরিত করার আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছি। কোন দ্রুত পরিবর্তনই জগতে স্থায়ী ফল প্রসব করতে পারে না। তার বড় উদাহরণ ফরাসী বিপ্লব। মানুষের মুক্তির এমন আদর্শবাদী আন্দোলন খুব কমই দেখা গেছে। অথচ, মাত্র পনের বছরের ভেতরেই তার পরিণতি হল সাম্রাজ্যবাদের পুনঃ প্রতিষ্ঠায়। তাই মনে হয় মানুষের স্থায়ী উন্নতি, স্থায়ী কল্যাণ ঘটে ধীরে ধীরে, কচ্ছপগতিতে, প্রশান্ত ধীর পদক্ষেপে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে গরুর গাড়ীর নৈতিক মূল্য আমার কাছে অজস্র। কেউ যদি সত্যি সত্যি পরের কল্যাণ করতে চায়, সকলের মঙ্গলের জন্যে নতুন দুনিয়ার গোড়াপত্তন করতে সত্যিই অভিলাষী হয়, তবে তাকে সর্বংসহা পৃথিবীর মতোই সহনশীল হতে হবে। আমি দিনরাত সেই সহিষ্ণুতার শিক্ষা পাই গরুর গাড়ীর কাছ থেকে। তার ওপর যতই বোঝা চাপাও সে কখনও না বলবে না। চাপাতে পারলেই হল।

আলু-দর্শনের সঙ্গে আর যার নিকট যোগ সেটি গরুর গাড়ীর মত একেবারে নিষ্প্রাণ পদার্থ না হলেও প্রাণীজগতের নিম্নস্তরের একটি অতি তুচ্ছ নগণ্য জীব। তার চলতি নাম 'পিঁপড়ে'। দুনিয়াকে গড়েপিটে, বদল করে তৈরী করা কারো একার সাধ্য নয়। সেজন্যেই দেখি, হাদিসের বর্ণিত একলাখ চব্বিশ হাজার নবী, মানুষ অক্লেশে হজম করে নিল। অথচ দুনিয়ার উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন এখনও হল না। এই পরিবর্তনের জন্যে চাই সমবেত চেষ্টা। সেই সমবেত চেষ্টার উজ্জ্বল উদাহরণ পিপীলিকা। একটু সুস্বাদু জিনিসের কণিকা কোথাও ফেল, অবলীলাক্রমে মুহূর্ত মধ্যে হাজার হাজার পিঁপড়ে সেখানে হাজির। সকলে মিলে সেটাকে নিঃশেষ না করা পর্যন্ত স্থানত্যাগ তাদের পক্ষে অসম্ভব। সংক্ষেপে আমার জীবন দর্শন থেকে এটুকু জেনেছি, আলুর মত সকলের সঙ্গে মিশে যাবার ক্ষমতা, গরুর গাড়ীর মত ধীর ও স্থির গতিতে অশেষ সহনশীলতার সঙ্গে সে আদর্শের দিকে এগিয়ে যাওয়া এবং পিঁপড়ের মত সমবেত চেষ্টায়, মানুষের সঠিক অভ্যুদয়ের ব্রহ্মাস্ত্র নিহিত।

আমার অধ্যাত্মবাদ ও জড়বাদের জগাখিচুড়ী অনেকেরই মুখে রোচে না। যাঁরা অধ্যাত্মবাদী তাঁরা মনে করেন, জড়বাদের ছোঁয়াচ লাগিয়ে আমি অধ্যাত্মবাদেরই জাত মেরেছি। আর যাঁরা জড়বাদী তাঁরা মনে করেন, জড়বাদের আবরণে আমি পুরনো দিনের অধ্যাত্মবাদেরই সাফাই গাইছি। সোজা কথায়, আমি ইমিটেশন সিল্কের বেপারী। আমার অবস্থা তাই পশুপক্ষীর যুদ্ধে বাদুড়েরই মত। দর্শন থেকে যদি আমি মতবাদের জোরাল খোরাক সংগ্রহ করতে চাইতাম তাহলে আমি হয়তো এই দু'দলের একদলে মিশে যেতাম। কিন্তু আমার পরিবেশ হয়তো তাতে বড় একটি বাধা। তাই নিজের জীবনের দু'চার পৃষ্ঠা এলোমেলোভাবে উল্টিয়ে এ বিষয়ে কিছু আলোকপাত করতে চাই।

যাঁরা উগ্র অধ্যাত্মবাদের পৃষ্ঠপোষক তাঁরা আমাদের আলো-হাওয়ার দুনিয়াকে মহাশূন্যে বিলীন করে দিতে চান। জগতের মূল যে এক অধ্যাত্মতত্ত্ব, তার সত্তা যখন আমরা অনুভব করি, তখন দুনিয়া আমাদের কাছে থাকে না। আমরা তখন সে বিরাট সত্তায় নিজের ক্ষুদ্র সত্তা হারিয়ে ফেলি—সাগরের ঢেউ যেমন সাগরে তার অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলে। বেদান্তদর্শনে একেই বলে পারমার্থিক দৃষ্টি। যতক্ষণ সে এক অদ্বৈততত্ত্বের জ্ঞান থেকে আমরা বঞ্চিত ততক্ষণ অধ্যাত্মতত্ত্ব আমাদের কাছে অলীক জগতই সত্য। তাই সেই অধ্যাত্ম-অনুভূতি ও জগতের জ্ঞান এই দু'য়ের গোঁজামিল দেয়ার চেষ্টা করা বৃথা। সোজা কথায় এই চলমান জগতের সত্তার স্বীকৃতির নামই জড়বাদ, আর এই

চলমান জগতের অতীত এক অধ্যাত্মতত্ত্বের স্বীকৃতির নামই অধ্যাত্মবাদ বা ব্রহ্মবাদ। এরা আলো-অন্ধকারের মতই পরস্পরের বিপরীত। এদের সমন্বয় সোনার পাথরের বাটীর মতোই অসম্ভব। এটাই হল আমার পূর্বপক্ষ অর্থাৎ বিরুদ্ধবাদীর বক্তব্য।

এই প্রসঙ্গে দু'একটি মজার কথা মনে পড়ছে। পাকিস্তান দর্শন কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনে করাচীতে, উনিশ শ' পঞ্চান্ন সালে, Synthetic Idealism বা সমন্বয়ী অধ্যাত্মবাদ নাম দিয়ে একটি প্রবন্ধ পড়ি। তার মূল বক্তব্য প্রবন্ধের নামকরণ থেকে সহজে অনুমান করা যায়। তাতে আমি দেখাবার চেষ্টা করেছিলাম, বহু ঋষি-মুনি, সুফী-সাধকের বর্ণিত ব্রহ্মতত্ত্বের সংবিৎই যুক্তির শেষ লক্ষ্য। যুক্তি এই একক তত্ত্ব পেতে চায় কিন্তু সেখানে পৌঁছবার ক্ষমতা তার নেই। বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে, তত্ত্বজিজ্ঞাসু গার্গী ব্রহ্মজ্ঞ যাজ্ঞবল্ক্যকে এই একক তত্ত্ব বুদ্ধির দ্বারা বুঝিয়ে দেয়ার জন্যে অনুরোধ করেছিলেন। সে প্রশ্নের উত্তরে বুদ্ধির অসামর্থ্য দেখানর জন্যে যাজ্ঞবল্ক্য বলেছিলেন :

"গার্গি মাতিপ্রাক্ষীর্মা তে
মূর্ধা ব্যপপ্তদনতিপ্রশ্ন্যাং
বৈ দেবতামতিপৃচ্ছসি।"

"গার্গি, এ তত্ত্ব প্রশ্নের অতীত, একে তুমি প্রশ্নের দ্বারা জানার চেষ্টা করো না। এ নিষ্ফল প্রয়াস করলে কোনও লাভ হবে না। শুধু তোমার মূর্ধা ভূলুণ্ঠিত হবে"।

যাই হোক, যুক্তি যে তত্ত্বকে চায় এবং যে তত্ত্বকে পাবার ক্ষমতা তার নেই, সেই তত্ত্বই যে অতীন্দ্রিয় অধ্যাত্ম-অনুভূতিতে আমাদের কাছে প্রকাশিত হয় এই ছিল আমার এক নম্বর বক্তব্য। প্রবন্ধের দু'নম্বর বক্তব্য ছিল : এই অধ্যাত্ম-অনুভূতির দোহাই দিয়ে আমাদের প্রাত্যহিক অনুভূতির জগতের সত্তা অস্বীকার করাও চলে না। অচঞ্চল একক ব্রহ্মের সঙ্গে চঞ্চল বহুর জগতের যে অচিন্তনীয় সম্বন্ধ তারই নাম আমি বলেছিলাম মায়া। বেদান্তদর্শনে 'মায়া' শব্দের পারিভাষিক অর্থ 'থেকে না থাকা'। 'থেকে না থাকা' কথাটা বুদ্ধির অগম্য। কাজেই একে অনির্বচনীয়ও বলা হয়। আমরা যে জগতে বাস করি, জন্মমৃত্যুপ্রবাহ যার স্বভাব, সত্যি তা ব্রহ্মের ভিতর না থেকেও অনন্তকাল আমাদের অনুভূতিগম্য হয়ে রয়েছে। এই দুরধিগম্য অনির্বচনীয় সত্যের স্বীকৃতিই মায়াবাদের মূল বক্তব্য। বিবেকানন্দ তাই বলেছেন, "মায়া কথার মানে কোনও থিয়োরী নয়। মায়া জগতের স্বরূপের একটি সঠিক বিবৃতি মাত্র।" থেকে না থাকাটা নিশ্চয়ই একটা বড় হেঁয়ালী। কিন্তু হেঁয়ালীই যদি সত্য

হয়, সেই হেঁয়ালীকে উড়িয়ে দেয়া অত্যন্ত অযৌক্তিক ও অবৈজ্ঞানিক। যাঁরা মনে করেন, বেদান্তদর্শনের মায়াবাদে দুনিয়াকে ঘোড়ার ডিম বা খরগোসের শিং-এর মত আকাশ-কুসুম কল্পনায় পরিণত করা হয়েছে আমার মনে হয় বেদান্তের অদ্বৈতবাদের কঙ্কালই তাঁরা দেখেছেন, তার মর্মস্থলে তাঁদের প্রবেশ হয়নি।

পুরনোকালের বৈদান্তিকদের কেউ কেউ যে এ ভুল করেননি, তা বলা চলে না। সেকালেও দৃষ্টি স্বষ্টিবাদ প্রচলিত ছিল। তার মূল কথা : আমরা যতক্ষণ জগৎ দেখেছি ততক্ষণই জগৎ আছে, আমরা যখন জগৎ দেখব না তখনই জগৎ নিঃশেষ হয়ে যাবে। সহজ কথায়, এক অদ্বয় ব্রহ্মই একমাত্র সত্য। জগৎ ব্যক্তিমনের নিছক কল্পনা। ব্যক্তিমনেই জগতের সৃষ্টি এবং ব্যক্তি-মনেই তার লয়। যুগ যুগ ধরে বহু বৈদান্তিক মনীষী এই দৃষ্টি-সৃষ্টিবাদের প্রতিবাদ করেছেন। বৈদান্তিক শিরোমণি আচার্য শংকর বৌদ্ধ-বিজ্ঞানবাদ খণ্ডন প্রসংগে ব্যক্তির অনুভূতির বাইরে যে একটি জগৎ আছে সেদিকে সুস্পষ্ট অঙ্গুলি-সংকেত করেছেন। কাজেই অদ্বৈত বেদান্ত বলতে যাঁরা ব্যক্তির অজ্ঞান দশায় জগতের সৃষ্টি এবং জ্ঞানদশায়ই জগতের লয় বোঝেন, তাঁরা বেদান্তের মায়াবাদের একটা স্বরুচিসম্মত ব্যাখ্যা আবিষ্কার করেন একথা বলা হয়তো অসঙ্গত হবে না। অন্যপক্ষে যাঁরা আচার্য রামানুজের মত বলেন, 'থেকে-না-থাকাটা' একটা অদ্ভুত খেয়ালপ্রসূত কল্পন', তাঁরাও বেদান্তমতের মর্ম বুঝতে পারেননি।

সহজ ইন্দ্রিয়ানুভূতির মারফত জগৎ যে আছে আমরা একথা ভাল করে জেনে দুনিয়ার দরিয়ায় চিরদিনের জন্যে নোঙর ফেলে বসে আছি। কিন্তু যখন এ দুনিয়ার বেচাকেনায় আমাদের মনের চাহিদা মেটে না তখন আমরা আমাদের নিজেদের অজ্ঞাতেই জগতের অতীত আর এক অনুভূতির দিকে অগ্রসর হই। বহু সাধনায়, সে অনুভূতি যখন আমাদের আয়ত্ত হয় তখনি আমরা এত কালের চেনা পৃথিবীকে হঠাৎ হারিয়ে ফেলি। আচার্য শংকর এ তত্ত্ব বোঝাতে গিয়ে তাঁর 'বিবেকচূড়ামণি'তে অতি সুন্দরভাবে বলেছেন :

"ক্ব গতং কেন বা নীতং
কুত্র লীনমিদং জগৎ।
অধুনৈব ময়া দৃষ্টং
নাস্তি কিং মহদদ্ভুতম্ ।।"

"আমাদের এতদিনের চেনা দুনিয়া কোথায় চলে গেল ?

কে তাকে চুরি করে নিয়ে গেল? কোথায় সে হারাল?
কী ভয়ানক রহস্য! একটু আগে যাকে দেখেছি তাকেই
এখন আর খুঁজে পাই না"।

জগৎ যে থেকেও নেই এ সত্যের স্বীকৃতি আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের অনুভূতির সঙ্গে অধ্যাত্ম-অনুভূতির একটা যোগসূত্র স্থাপনের চেষ্টারই অপরিহার্য ফল। তত্ত্বনির্ণয়ে যাঁরা একচক্ষু হরিণীর মত এ দুটি অনুভূতির একটির প্রতি পক্ষপাত প্রদর্শন করেন, 'থেকে না থাকার' অদ্ভুত রহস্য হৃদয়ঙ্গম করতে তাঁরা অপারগ। এজন্যে চাই উভয়মুখী দৃষ্টি, চাই অধ্যাত্ম-অনুভূতি ও সহজবুদ্ধির সামঞ্জস্য।

তাই আমি সে প্রবন্ধে বলেছিলাম, ইন্দ্রিয়ানুভূতির সঙ্গে অধ্যাত্ম অনুভূতির একটা রফা-নিষ্পত্তি করতে পারলেই সমঞ্জসী অধ্যাত্মবাদ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। সে সমন্বয়ে জড়-চেতনের দ্বন্দ্ব থাকবে না। তা যেমন চেতনে জড়ের সত্তা দেখতে পাবে, তেমনি জড়ের ভেতরও চেতনের শাশ্বত প্রকাশ দেখতে পাবে। কাজেই আধুনিক জড়বাদ ও প্রাচীন অধ্যাত্মবাদ এ দুয়ের সমঝোতার ভিত্তিতে মানুষের ভাবী প্রগতির, সার্বিক কল্যাণের ইমারৎ গড়ে তুলতে হবে।

পাকিস্তান দর্শন কংগ্রেসের করাচী অধিবেশনের অনেক পর এক আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন দার্শনিক পত্রিকায় এই প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। সে পত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদক বেদান্ত-দর্শনের এক স্বনামধন্য ব্যাখ্যাতা। তাঁর সম্পাদকীয় স্তম্ভে আমার আলোচনার গভীরতা সম্বন্ধে মন্তব্য প্রসঙ্গে তিনি বলেন "যদিও ইন্দ্রিয়ানুভূতির সঙ্গে অধ্যাত্ম অনুভূতির সামঞ্জস্য কখনও হয় না, তথাপি এ চেষ্টার মূল্য অস্বীকার করা যায় না। কারণ জগতের সব জিনিসেরই কিছু না কিছু মূল্য আছে"। উদাহরণস্বরূপ তিনি সিন্থেটিক রবার-এর কথা উল্লেখ করেন। সিন্থেটিক রবারের কথা শুনেছি, অজান্তে হয়তো দেখেও থাকতে পারি। আমার মতে যখন জগৎ থেকেও নেই তখন জগতের অনেক জিনিসের খবর আমি রাখি না। বিনা প্রয়োজনে শুধু কৌতুহলের বশবর্তী হয়ে জ্ঞান আহরণের প্রবৃত্তি আমার মধ্যে নেই। সিন্থেটিক রবার-এর ভেতর রবার ছাড়া আরও অন্যান্য উপাদান আছে এবং তার দ্বারা কিছু প্রয়োজনও সিদ্ধ হয়। সম্পাদক মহাশয়ের মতে আমার অধ্যাত্মবাদকে নিছক অধ্যাত্মবাদ বলা চলে না, তা খাঁটি ঘি নয়, অতি প্রয়োজনীয় ভেজিটেবল ঘি।

বেদান্তে অদ্বৈতবাদ বা মায়াবাদ আমি যেমন বুঝেছি তার বিস্তারিত আলোচনা আমার "আইডিয়ালিজম এ্যাণ্ড প্রগ্রেস" এর তৃতীয় অধ্যায়ে করেছি। এই বেদান্ত ব্যাখ্যায় আমি প্রথম প্রেরণা পাই মহাসাধক শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী

ও বাণী থেকে। সে ধারণা আরও পরিস্ফুট হয় শ্রীরামকৃষ্ণের বিশ্ববিখ্যাত শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দের লেখার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যতম শিষ্য তাঁর দার্শনিক জীবন-চরিতকার, স্বামী সারদানন্দ ও স্বামী বিবেকানন্দের বিদেশী শিষ্যা ভগিনী নিবেদিতার লেখা থেকেও এ বিষয়ে অনেক সাহায্য পেয়েছি। এঁদের লেখা ঠিক দার্শনিক ছাঁচে ঢালাই করা নয়, তবে তাতে দার্শনিক চিন্তার উপাদান যথেষ্ট। চলতি দর্শনের ঢং এ ঢালাই করে সহজ জিনিসকে দুর্বোধ্য করায় আমার বিশেষ আস্থাও নেই। কাজেই এ জাতীয় লেখার ওপর আমার আকর্ষণ প্রচুর।

তাছাড়া আমি যেসব খ্যাতনামা বৈদান্তিক দার্শনিকের কাছ থেকে তাঁদের অজান্তে এমন কি অনেক সময় আমার নিজেরও অজান্তে বেদান্তের অদ্বৈতবাদ এভাবে বোঝার প্রেরণা পেয়েছি তারও সংক্ষিপ্ত উল্লেখ প্রয়োজন।

এ প্রসঙ্গে প্রথমেই বর্তমান যুগের প্রখ্যাতনামা দার্শনিক, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সুধী ও মনীষী অধ্যাপক ডাঃ রাধাকৃষ্ণনের নাম কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করা উচিত। তাঁর লেখা থেকে আমার দার্শনিক মত গড়ে তোলার প্রচুর উপকরণ পেয়েছি। আর একজন প্রবীণ দার্শনিক ও বড় বৈদান্তিক এ বিষয়ে আমাকে যথেষ্ট প্রেরণা দিয়েছেন—খুব বেশী বই তিনি লেখেননি আর তাঁর লেখা অত্যন্ত বিশ্লেষণমূলক। তাই সাধারণ পাঠক তো দূরের কথা, দর্শনের নিপুণ ছাত্রেরাও তাঁর দার্শনিক লেখার অর্থ আবিষ্কারে অনেক সময় গলদঘর্ম হয়ে যেতেন। তিনি যে একজন মনীষী এবং তাঁর চিন্তাধারায় যে মৌলিকত্ব আছে একথা সকলেই স্বীকার করেন। তিনি পরলোকগত অধ্যাপক কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য। তারপর মনে পড়ে ঋষিপ্রতিম সুধী ডাক্তার মহেন্দ্রনাথ সরকারের কথা। তাঁর শান্ত প্রসন্ন মুখ দেখলেই যেন মনে হত দর্শন জীবনের বস্তু, শুধু থিয়োরীই নয়। আমার দার্শনিক চিন্তায় তাঁর প্রভাব প্রচুর। কারণ তাঁর নিকটতম সংস্পর্শে আসবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। এঁরা সকলেই আমার পরম শ্রদ্ধেয় আচার্য।

তবুও একথা বলা প্রয়োজন যে, আমি অদ্বৈতবাদের যে ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করেছি সেটা তাঁদের মতের পুনরাবৃত্তি নয়। নিজের অক্ষমতা সত্ত্বেও তাঁদের কাছ থেকে যে বহুমূল্য দার্শনিক উপাদান পেয়েছি তা নিজের মতন করে সাজিয়ে গুছিয়ে লেখার চেষ্টা করেছি। তাঁদের ষোল আনা অনুকরণ করতে পারার দাবী করলে আমার অবস্থা হবে সেই দাঁড়কাকের মতো, যে নিজের কুৎসিৎ পালকের সঙ্গে সুন্দর ময়ুরপুচ্ছ এঁটে নিজেকে ময়ুর প্রতিপন্ন করতে চেয়েছিল। যাই হোক, আমার দার্শনিক চিন্তায় আমার কৃতজ্ঞী

আচার্যগণের প্রভাব সকৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করার জন্যেই এ প্রসঙ্গের অবতারণা। এখানে মনে পড়ে, ছোটবেলা 'কেন-উপনিষদে' পড়া একটি সার্থক উক্তি :

"ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং,
যে নস্তদ্ ব্যাচচক্ষিরে"

শান্ত, সংযত আচার্যদের কাছ থেকে তত্ত্ব-সম্বন্ধে যে ইঙ্গিত পেয়েছি তারই বিশদ আলোচনা আমরা করার চেষ্টা করছি।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি কৌতুকোদ্দীপক কথা মনে পড়ছে। আমার অদ্বৈত-বাদের ব্যাখ্যার ওপর সেটি হয়তো কিছুটা আলোকপাত করতে পারে। মাদ্রাজের এক প্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক পত্রিকায় এক সুপণ্ডিত অদ্বৈতবাদী লেখক আমার "আইডিয়্যালিজম এ্যাণ্ড প্রগ্রেসের" এক দীর্ঘ সমালোচনা করেন। তাতে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ছিল প্রচুর। তার কয় বছর পর, অদ্বৈতবাদের সামাজিক জীবনে প্রয়োগের ওপর বিশেষ জোর দিয়ে, নানা চলতি গল্পের সাহায্যে তার মূল বক্তব্য সহজ ও সরল করে তোলার বিশেষ চেষ্টা করি আমার পরবর্তী গ্রন্থ "আইডিয়্যালিজম: এ নিউ ডিফেন্স এ্যাণ্ড এ নিউ এ্যাপ্লিকেশন"-এ। দুটি বইয়ের দৃষ্টিভঙ্গী এক, প্রকাশভঙ্গীতেই যা তফাৎ। যে দার্শনিক আমার প্রথম বইটির সমালোচনা করেছিলেন, দ্বিতীয় বইটিরও সমালোচনার ভার তাঁর ওপর পড়ে। বিজ্ঞ সমালোচক এবারে আমার মতের বিরুদ্ধে রায় দেন। তিনি বলেন, আমার দেয়া বেদান্তের ব্যাখ্যা কষ্টকল্পিত এবং কষ্টকল্পিত হওয়ার কারণ, বেদান্তদর্শনের ওপর, 'জগৎ সত্য' আমার এই মত ছলে-বলে চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা। আগেই বলেছি, দার্শনিক তত্ত্বকে আমি শুধু বুদ্ধির কসরৎ বলে মনে করি না, তা থেকে আমি অফুরন্ত শুভপ্রেরণা পেতে চাই। যতদিন এই জীবন-দর্শন আমাকে সে প্রেরণা দেবে ততদিন তার সঙ্গে অসহযোগ আমার পক্ষে অসম্ভব। কাজেই শুধু যুক্তির নিক্তিতে আমার মতের ওজন আমি করতে চাই না। মানুষের বৃহত্তর জীবনের প্রসারিত ক্ষেত্রেও তার মূল্য যাচাই করতে চাই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস তার মূল্য সেখানে অজস্র ও অপরিমিত। অতএব এই ক্রমবর্ধমান খাদ্যসংকটের দিনে আমার ঘোড়ার ডিম যদি আমার কাছে হাঁসের ডিমের চেয়ে সুস্বাদু লাগে, শুধু বাক্যবিনিময়ে এর রসাস্বাদ থেকে আমাকে বঞ্চিত করা হয়তো সম্ভব হবে না আর সে রকম করা হয়তো বাঞ্ছনীয়ও নয়।

এখানে বলা উচিত যে, অদ্বৈতবাদকে আমি কোন সম্প্রদায় বিশেষের মত বলে মনে করি না। আবাল্য বেদান্তশাস্ত্র অধ্যয়নে অল্পবিস্তর অভ্যস্ত, তাই বেদান্তের দৃষ্টিকোণ থেকে অদ্বৈতবাদকে হয়তো দেখার চেষ্টা করেছি নিজের

অজ্ঞাতে। এবং অনিবার্যভাবেই এ আলোচনায় বেদান্তের দার্শনিক পরিভাষা কিছু ব্যবহৃত হয়েছে। তবে বিভিন্ন ধর্মের মূলতত্ত্ব আলোচনায় আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ যেভাবেই হোক না কেন, প্রত্যেক ধর্মের পেছনেই একক অধ্যাত্মতত্ত্বের স্বীকৃতি রয়েছে। এই সার্বভৌম সার্বজনীন সত্যর উপর কোন সংকীর্ণ ভৌগোলিক বা ঐতিহাসিক সীমানা চাপিয়ে আমি তাকে শৃঙ্খলিত করতে চাই না। কেননা তাতে বিপদ যথেষ্ট। সে পথ সংকীর্ণ জাতীয়তা, প্রাদেশিকতা ও স্বাদেশিকতার পথ, আমার বিবেচনায় মানুষের ভবিষ্যৎ রয়েছে তার উল্টো পথে। কাজেই আমি যাকে অদ্বৈতবাদ বলি, তার নাম যদি কেউ "ডাল-ভাতবাদ"-ও দেন, আমার আপত্তি নেই। সেক্সপীয়রের কথায় বলা যায়, গোলাপকে যে নামেই ডাকা হোক না কেন, তাতে তার সুগন্ধের তারতম্য ঘটবে না। প্রাচীন দার্শনিকরাও বলেছেন "নামভেদো ন বস্তুভেদঃ" অর্থাৎ নাম বদলালেই বস্তু বদলায় না।

আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের জগতের সঙ্গে সেই একক অধ্যাত্মতত্ত্বের সম্বন্ধ বের করবার চেষ্টা করলে একথা স্বীকার করতেই হবে যে, সেই একতত্ত্ব থেকেই বহুর উৎপত্তি। আর সেই একের সঙ্গে বহুর বিশ্লেষণেরই দার্শনিক সংজ্ঞা অদ্বৈতবাদ। এর ভেতর আছে জড়বাদ ও অধ্যাত্মবাদের মিলনের সূত্র। চলমান বস্তুর নাম অচেতন। আর যা চলমান নয়, স্থির তার নামই চেতন। জগৎকে আমরা অলীক বলে উড়িয়ে দেই না। কাজেই আমরা জড়বাদ স্বীকার করি। কিন্তু জড়বাদ আমার জীবন দর্শনের শেষ কথা নয়। জড়ের মূলে রয়েছে চৈতন্য। অতএব চেতনবাদ বা অধ্যাত্মবাদই আমাদের শেষ কথা। জড়বাদ বা দেহবাদ তার ভূমিকা, তার প্রথম সোপান। চেতনের সাহায্যে জড়ের রূপান্তর ও জড়ের চরম পরিণতির মধ্যে চেতনের সন্ধান, গঙ্গা-যমুনার মত এই দুই ভাবধারার মিলনই আমার জীবন-দর্শনের সার কথা।

বড় বড় পণ্ডিতেরা লম্বা লম্বা দার্শনিক শব্দ দেখলে অনেক সময় সে মতের মূল্য যাচাই না করেই তাঁদের সুপারিশপত্রে তার উচ্চ প্রশংসা করে থাকেন। আর সেই একই কথা যখন সহজ সরলভাবে তাঁদের সামনে হাজির করা যায় তখন তাঁদের বিচারের মানদণ্ডে তার মূল্য কমে যায়। আমার দার্শনিক মতের জটিল ব্যাখ্যার প্রশংসা ও সরল ব্যাখ্যায় সমালোচনা একই সুধী ব্যক্তির মারফৎ হওয়াতে এই সত্যের সমর্থন পাওয়া যায়।

আমার দার্শনিক মতের কথা যতই ভাবি ততই আমার ছাত্রজীবনের দুটো বিপরীত ভাবধারার পারস্পরিক সংঘাতের কথা মনে আসে। তার বিশদ আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হলেও অন্তত তার সংক্ষিপ্ত উল্লেখ প্রয়োজন।

আমার জন্মস্থান শহর নয়, পাড়াগাঁ। আমার পিতাও খুব শিক্ষিত লোক ছিলেন না। তবে তাঁর সহজবুদ্ধি ছিল অত্যন্ত প্রখর। তিনি ছিলেন পরিশ্রমী, স্বাবলম্বী এবং কর্মদক্ষ। নিজের চেষ্টায় তিনি সেই পাড়াগাঁয়ের মাপকাঠিতে একটি মোটামুটি রকমের বড় সম্পত্তির অধিকারী হয়েছিলেন। আমার এখনও মনে আছে, খুব ছোট বয়সে বাড়ীতে দোল-দুর্গোৎসব, দান-দক্ষিণা ও বিষয় সংরক্ষণের বড় হাতিয়ার মামলা-মোকদ্দমার হিড়িক লেগেই থাকত। আমি যখন বিদ্যালয়ের সবে ঢুকেছি, সরস্বতীর সঙ্গে যখন আমার অতি প্রাথমিক পরিচয়, তখনই বাবার বিষয়-সম্পত্তিতে এক বড় ফাটল দেখা দিল। বলাই বাহুল্য, আমার ভাগ্যের দোষই এর জন্মে দায়ী।

তবুও আমার ছাত্রজীবনের সুখ-দুঃখের, মিলন-বিচ্ছেদের কথা যখন মনে পড়ে তখন মনে হয়, আমার এই আকস্মিক দারিদ্র্য নিঃসন্দেহে এক মহাভাগ্যেরই নামান্তর। কারণ যে সমস্ত কৃতী পুরুষের আন্তরিক স্নেহ, শুভেচ্ছা, সহমর্মিতা ও সহানুভূতি আমার সেই দুঃখের দিনের জীবনের মোড় ফিরিয়ে দিয়েছিল তা হয়তো এই দারিদ্র্যেরই এক বড় পুরস্কার। যাই হোক, অবস্থার আকস্মিক বিপর্যয়ে অল্প বয়সেই গৃহহারা নিরাশ্রয় হয়ে পড়েছিলাম সমস্ত আত্মীয়-পরিজন সহ। সেই নিদারুণ দুঃখের দিনে আর্তজনের বন্ধু ও সেবক মিশনারীরাই হয়েছিলেন আমার চালক, দিশারী ও সুহৃদ। তাঁদের দরদী হৃদয়ের সংস্পর্শে এসে ভুললাম নিজের পুঞ্জীভূত দুঃখ দৈন্য। তাঁরা আমার অন্তরে সঞ্চারিত করলেন অনাবিল বিশ্বাসের প্রবাহ। এত দুঃখের ভেতরেও আমার জীবনে শান্তি এবং প্রসন্নতা ফিরে এলো। ছাত্রজীবনের অবসানে জীবনের বৃহত্তর পরিবেশে এসে তাঁদের মহিমার কথা যতই ভাবি, ততই মনে হয় আমার মনে সেদিন যে শান্ত-প্রসন্ন ভাব, যে অটল বিশ্বাস ছিল, তা আমার মনের আয়নায় প্রতিফলিত তাঁদেরই অন্তরের ছবি। যাই হোক, জড়বাদ ও অধ্যাত্মবাদের সমঝোতা স্থাপনের জন্মে আমি যে কোমর বেঁধে লেগেছি তার জন্মে দায়ী আমার ছাত্র-জীবনের দুই পরস্পর-বিরোধী স্মৃতি। বাল্য ও যৌবনের সন্ধিক্ষণে বাবার সম্পত্তি নষ্ট হওয়ার ফলে আমাকে যদি পথে এসে দাঁড়াতে না হত, তাহলে আজ এই বৈজ্ঞানিক সভ্যতার সমৃদ্ধির যুগেও অগণিত নিপীড়িত মানুষের সঙ্গে চিন্তায় অন্তত এক হতে পারতাম না। আমার গত জীবনকে যেমন আমি ভুলতে পারি না, তেমনি আমি ভুলতে পারি না সেইসব হতভাগ্য মানুষের কথাও। কবি বলেছেন, "চক্রবৎ পরিবর্তন্তে, সুখানি চ দুঃখানি চ"—"সুখ ও দুঃখ চক্রের মতোই ফিরে ফিরে আসে। আর সেজন্যেই হয়তো বহু বছরের অক্লান্ত চেষ্টায় শেষ-পর্যন্ত বড় লোকের ভোজের আসরের পেছনের বেঞ্চে একটু

জায়গা করে নিতে পেরেছি। সে সৌভাগ্যই বা ক'দিন টিকে তাও জানি না। কিন্তু আমার সেই ছোটবেলার কঠোর দারিদ্র্যের অনুভূতি এতই প্রবল যে বছরের পর বছর সভ্যতার রাসে নিজেকে মেজে-ঘষে আজও আমি তার স্পর্শ থেকে মুক্তি পাইনি। আর পেতেও হয়তো চাই না। কারণ সে স্পর্শ আমার অন্তরকে বড় করে তোলে। সে স্পর্শ আমাকে বারবার মনে করিয়ে দেয় আমি অগণিত অবহেলিত জনগণেরই একজন। ছোটবেলায় সেই আচমকা ধাক্কা আমাকে জীবনকে চিনতে শিখিয়েছে, চিনতে শিখিয়েছে তার দুর্দশাকে। তাই আমি কখনও মনে করি না যে জড়বাদ বা দেহাত্মবাদ শুধু একটি মতবাদ। উগ্র অধ্যাত্মবাদে জর্জরিত হয়ে আমরা যখন ইহজীবনের তাগিদ মেটাতে অপারগ হই, তখনই সফল জীবনযাত্রার তাগিদে জড়বাদীদের খাতায় আমরা নাম লেখাই। যৌবনে যে পরিবেশে বাস করেছিলাম, সেটা মূলত মায়াবাদেরই পরিবেশ। সেখানে কানের কাছে বারবার বলা হত সারা দুনিয়াটাই মায়া, অর্থাৎ নিছক কল্পনা। সে বাণীর প্রচারকরা ছিলেন সংসার ভোগে বিরত, মানব-সেবক সন্ন্যাসী। আমার প্রথম জীবনের বিপর্যয়ের তীব্রতা এত বেশী যে মায়াবাদের কথা এত শুনেও পৃথিবীতে সুখে-স্বচ্ছন্দে ও শান্তিতে সকলের বেঁচে থাকার প্রয়োজনীয়তা আমি মোটেই অস্বীকার করতে পারিনি এবং আজ সে অনুভূতিই আমার জীবন-দর্শনের এক অপরিহার্য উপাদান। কাজেই জড়বাদের মাহাত্ম্য আমি অসংকোচে স্বীকার করি। আমার বাবাই তাঁর নিজের অজ্ঞাতে এবং আমারও অজ্ঞাতে শৈশবের সেই অর্থনৈতিক দুরবস্থার মধ্যেই আমার চিত্তে জড়বাদের বীজ বপন করেছেন। সে বীজ থেকে আস্তে আস্তে যে ছোটগাছ বেরিয়ে আজ মনের ভেতর শিকড় গজিয়ে ডালপালা বিস্তার করেছে, তাকে কেটে ফেলার সামর্থ্য আমার নেই। অন্যদিকে, যে মহানুভব পুরুষদের সংস্পর্শে এসে বাল্য-যৌবনের সন্ধিক্ষণে অধ্যাত্মবাদে বিশ্বাস দানা বেঁধে উঠেছিল তাও আমার জীবনের এক বড় পাথেয়। কাজেই জড়বাদ ও অধ্যাত্মবাদের দ্বন্দ্বকে যে আমি অলীক বলি, আর কখনও কখনও বা বলি জড়বাদ আর অধ্যাত্মবাদ একই জীবন-দর্শনের এপিঠ আর ওপিঠ, তার মূলে রয়েছে আমার বাল্যের ও যৌবনের অনুপ্রেরণাদায়ক এই দুটি পরস্পরবিরোধী মনোবৃত্তি ও অনুভূতি। নিরপেক্ষ সমালোচক যদি শুধু লজিকের কষ্টিপাথরে আমার এই জীবন দর্শনের মূল্য যাচাই করেন, তবে আমি মনে করি তিনি তার আসল কারণ সম্বন্ধে অজ্ঞই থেকে যাবেন। যাই হোক, আশার কথা এই যে, জীবনের যে দ্বন্দ্ব আমাকে এই জীবন দর্শনের দিকে টেনে নিয়েছে, বাইরের বৃহত্তর জগতেও যেন আজ তার সার্থকতা দেখতে পাচ্ছি। এই অনুভূতি আমার চিত্তবৃত্তির বা মনের দৃঢ় সংস্কারের প্রতিফলন কি-না জানি না এবং সেটি আলোচনা সাপেক্ষ।

ইতিহাস, দর্শন ও জীবন

অল্প কিছুদিন আগে আমাদের দেশের এক বড় শিক্ষাবিদের সঙ্গে মানব-জীবনে দর্শনের উপযোগিতা নিয়ে ঘরোয়া আলোচনা করছিলাম। কথিত শিক্ষাবিদ বিজ্ঞানের একজন অনুরাগী ছাত্র। জীবনে দর্শনের উপযোগিতা সম্বন্ধে অতি সন্দিহান। আমি তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করছিলাম—সপ্তদশ-শতকোত্তর আধুনিক ইউরোপীয় দর্শন বুদ্ধিপ্রধান, তাতে হৃদয়ের স্থান অতি নগণ্য। এর ফলে দর্শনের সঙ্গে মানুষের বৃহত্তর জীবনের বিচ্ছেদ ঘটেছে। ইতিহাসের আদি ও মধ্যযুগে দর্শন জীবনযাত্রারই ছিল এক বড় হাতিয়ার। সেই বিজ্ঞান অনুরাগী শিক্ষাবিদ আমার কথায় মোটেই সায় না দিয়ে বলছিলেন, "ওটা ঐ অতীতযুগের অবৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তিরই ফল। আজ বিজ্ঞান যেভাবে এগিয়ে চলেছে, তাতে মানুষের জীবনে দর্শনের কোন প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না।"

ছোটবেলা থেকেই এ ধরনের কথা শুনতে আমি অভ্যস্ত। এই প্রসংগে প্রায় ত্রিশ বছর আগেকার একটি কাহিনী মনে পড়ছে। দর্শনের একঘেয়ে ভাল ছাত্র হিসেবে খেতাব নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের আংগিনা থেকে সবে বেরিয়ে এসেছি। তার কিছুদিন পরেই আমার এক ছাত্রীর কাকার সঙ্গে কলকাতার কোনো এক মেডিকেল মেসে দেখা হয়। আমার পরিচিতি স্বরূপ আমার এক বন্ধু সেই ভদ্রলোকের কাছে আমার গুণপনার ছোটখাটো এক তালিকা পেশ করলেন। আমি যে দর্শনের একজন ভাল ছাত্র একথায় এসে পরিচয়-পর্ব শেষ হোলো। কথিত ভদ্রলোকটি আমার দর্শনরোগের কথা শুনে বিলক্ষণ অস্বস্তি প্রকাশ করলেন এবং শেষে, অত্যন্ত অসংকোচে, আমার মতো একজন অপরিচিত অতিথির অনাগত ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাঁর অভিমত প্রকাশ করলেন,—'One more loss to the world'. তাঁর সে উক্তি ও হাসি আজও ভুলিনি। সেদিন এ কথা শোনার পর থেকে বারবার আমার মনে এই প্রশ্ন জেগেছে যে, গৌতম, কপিল, সক্রেটীস, প্লেটো, এরিষ্টটল, শংকর, গজ্জালী, টমাস এ্যাকুইনাস, ইবনে রোস্‌দ, ইবনে সিনা এঁদের নাম কি মানব-সভ্যতার হিসাবের খাতায় খরচের কোঠায় লিখতে হবে? আমার জীবনে কি হল না হল সেটা বড় কথা নয়, তবে আশংকার কথা এই যে, জীবনে দর্শনের উপযোগিতা সম্বন্ধে মানুষের মনে যদি শ্রদ্ধা না থাকে তবে বিবর্তনের চাকা উল্টোদিকেও ঘুরে যেতে পারে।

আমার আর কিছু থাক আর না থাক দর্শনের ওপর প্রগাঢ় আসক্তি আছে। জীবনের নানা ঝড়-ঝঞ্ঝায় এই আসক্তিই আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। সেজন্যেই আমার ছাত্রীর সেই আত্মীয় আমার তথাকথিত ছাত্রজীবন শেষ হবার একটু পরেই শুভেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে যে খেদোক্তি করেছিলেন, তা আমার মনে গভীর রেখাপাত করেছে এবং বারবার আমি তাঁর সেই সংশয়ের সার্থক সফল উত্তর আবিষ্কারের চেষ্টা করেছি। আমার সম্বন্ধে তিনি যে সহজ মন্তব্য করেছিলেন, সেটা তাঁর একলার মন্তব্য নয়, এবং আমার একলার প্রাপ্যও নয়। তা আজকের দিনের বহু শিক্ষিত লোকের দর্শন সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণারই অপরিহার্য ফল। অত্যন্ত বিস্ময় ও পরিতাপের কথা এই যে, সে ভ্রান্ত ধারণার সৃজনে ও পরিবেশনে অনেক তথাকথিত দর্শনের ছাত্রের দানও নেহাৎ নগণ্য নয়। মাত্র দু'শ বছর আগে দার্শনিক হেগেল বলেছিলেন, "দর্শন ছাড়া সভ্যতার সুঠাম, সুন্দর কাঠামোই গড়া যায় না। দর্শনবিহীন সভ্যতা প্রার্থনা-মন্দিরবিহীন পূজামণ্ডপেরই সামিল"। কিন্তু "তে হি নঃ দিবসা গতাঃ"—"আমাদের সে দিন ফুরিয়েছে"।

মানুষের শাশ্বত মঙ্গল ও সফল জীবনযাত্রার জন্যে পূর্ণাবয়ব জীবন-দর্শন তাই আজ খুঁজে বের করা দরকার। সে দর্শনের সন্ধান আমরা তখনই পাব যখন দর্শনকে ব্যক্তির জীবনের ক্ষুদ্র পরিধি থেকে সরিয়ে এনে তার পরিবেশের সঙ্গে যোগ করে দেখতে শিখব। এটাই হল দর্শনের আসল চেহারা। যাঁরা তাকে ব্যক্তির চিন্তার হেঁয়ালী বলে মনে করেন, তাঁরা তার আসল চেহারা দেখেননি। মুখোস দেখে ভয়ে আঁতকে উঠেছেন অথবা বিরক্তিতে ভরপুর হয়ে তার কাছ থেকে সরে পড়েছেন।

মানুষের ইতিহাসের আলোকে তার জীবন-দর্শন বিশ্লেষণ কিছু নতুন নয়। চতুর্থ শতকে সেণ্ট অগাষ্টিনের স্বর্গরাজ্যের পরিকল্পনা থেকেই তার শুরু। অগাষ্টিনের ঐতিহাসিক বিশ্লেষণে ধর্মীয় সংস্কার ও পৌরাণিক মনোবৃত্তির ছাপ নগণ্য নয়। তার হাজার বছর পর ইবনে খালদুন থেকেই ইতিহাসের অর্থ আবিষ্কারে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রথম প্রয়োগ। তিনিই তাই ইতিহাস-দর্শনের প্রবর্তক, এ জ্ঞানযজ্ঞের প্রথম ঋত্বিক।

আজকের দিনের দর্শনের এক বড় উপাদান মানুষের ইতিহাস। তারই আলোকে তত্ত্ব-নির্ণয়ের চেষ্টা চলেছে। হেগেল তাঁর বুদ্ধির জোরালো মুগুরে মানুষের ইতিহাসকে গুঁড়ো করে অধ্যাত্মবাদের ফরমূলায় ফেলবার চেষ্টা করেছেন। কার্ল মার্কস্ তার ঠিক উল্টো চেষ্টা করেছেন। তিনি ইতিহাসের ব্যাখ্যা খুঁজে পেয়েছেন তাঁর দ্বন্দ্বমূলক জড়বাদে। মানুষের ইতিহাসের বিভিন্ন

ধারাকে দুটি অতি বিপরীত ফরমূলার ভেতর ফেলবার এমন চেষ্টা চিন্তাজগতে খুব বেশী হয়নি। অধ্যাপক টয়েনবী মাত্র সেদিন মানুষের ইতিহাসের যে বিশ্লেষণ করেছেন তা নিছক ইতিহাস নয়, ইতিহাস ও দর্শনের এক সুন্দর সংমিশ্রণ। যাই হোক, মানুষের জীবন-দর্শন যে তার ইতিহাসের দ্বারা বিশেষ প্রভাবিত এ সত্য আজ অনস্বীকার্য। যে ঐতিহাসিক পরিবেশের প্রয়োজন মেটানোর জন্যে দর্শনের উৎপত্তি, প্রসার ও পরিণতি তার সঙ্গে নিকট যোগ রেখে আমরা যদি দর্শনকে দেখতে অভ্যস্ত হতাম, তাহলে, আজকের দিনের শিক্ষিত মানুষের মনে দর্শনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে যে অকারণ, অহেতুক সংশয়, তা অঙ্কুরেই নির্মূল হয়ে যেত।

মানুষের ইতিহাসের সঙ্গে তার দার্শনিক চিন্তাধারার যোগ এমন নিবিড় যে, এক যুগের চিন্তাধারাকে হুবহু আর এক যুগের চিন্তাধারার সঙ্গে খাপ খাওয়ান যায় না। সেণ্ট অগাষ্টিনের স্বর্গরাজ্যের পরিকল্পনার কথাই ভেবে দেখা যাক না। রোমে খ্রীষ্টধর্মের প্রসারের কিছু পরেই মধ্য ইউরোপের দস্যু গথরা রোম লুণ্ঠন করল। সেদিনের নতুন খ্রীষ্টানদের মনে এতে সংশয় উপস্থিত হল। প্যাগানেরা তাদের বোঝালো পুরনো দেবদেবীর পূজো ছেড়ে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণের জন্যেই তাদের এই বিপত্তি। সংশয়ের এই সংকটময় মুহূর্তে সেণ্ট অগাষ্টিন যুক্তির সাহায্যে খ্রীষ্টানদের বোঝাতে চেষ্টা করলেন যে, তাদের আদর্শ বাসভূমি পৃথিবীর বহু ঊর্ধ্বে—স্বর্গরাজ্যে। রোম নগরী পুড়ে ছাই হয়ে গেলেও তাতে তাদের কিছুই আসে যায় না। যারা খ্রীষ্টধর্মে বিশ্বাসী, প্রলয়ের দিনের বিচারে তাদের জন্যে অনন্ত স্বর্গের ব্যবস্থা হবে। তাই রোম লুণ্ঠিত হওয়াতে খ্রীষ্টানদের ধর্মবিশ্বাস শিথিল হওয়ার কোন কারণ নেই।

পৌরাণিক যুগে মিথিলার রাজা জনক এই নিরাসক্ত মন নিয়েই বলেছিলেন "মিথিলায়াং প্রদীপ্তায়াং ন মে দহতি কিঞ্চন"—"রাজধানী মিথিলা পুড়ে গেলেও আমার দেহাতীত আত্মার কোনও ক্ষতি হবে না।" অবশ্য ঘরবাড়ী পুড়ে ছাই হয়ে গেলে অথবা দুর্ভিক্ষের সময়, আজকের দিনের মানুষকে যদি এমন আশ্বাস দেয়া যায় তবে তার ফল কি হবে বলা বাহুল্য।

সেণ্ট অগাষ্টিনের প্রায় হাজার বছর আগে গৌতমবুদ্ধ উদাত্তকণ্ঠে নির্বাণের বাণী প্রচার করেছিলেন। স্নেহপরায়ণ জনক-জননী, পরমাসুন্দরী পত্নী, নবজাত পুত্র এবং রাজ্যসুখ পেছনে ফেলে তিনি নির্বাণের সন্ধানে বেরিয়ে গেছিলেন। বাসনার নিবৃত্তির ভেতর তিনি পেয়েছিলেন মানুষের মুক্তির অমোঘ মন্ত্র। সে নির্বাণের বাণীতে আকৃষ্ট হয়ে অসংখ্য নরনারী সেদিন সংসারের দুঃখ-সুখ পেছনে ফেলে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিল। বুদ্ধের বাণীর ভেতর যে পরলোকপরায়ণতা ও

ত্যাগের বার্তা, আজকের দিনের মানুষের তার উপর আকর্ষণ বিশেষ নেই। কিন্তু দর্শনের কচকচিকে যে তিনি নিন্দা করেছেন, অতীন্দ্রিয় ঈশ্বরের স্থান যে তাঁর ধর্মে সাক্ষাৎভাবে নেই, অন্ধ কুসংস্কারকে তিনি যে সমর্থন করেননি, আধুনিক মনোবৃত্তি নিয়ে যে তিনি অনেক ক্ষেত্রে জীবন সমস্যার সমাধান ও তত্ত্বের স্বরূপ নির্ধারণের চেষ্টা করেছেন, সবার উপরে তিনি যে বিশ্ব মৈত্রীর বার্তা প্রচার করেছেন, তা-ই আজকের দিনের মানুষের মনে বড় আশা ও উদ্দীপনার এক নতুন শিহরণ জাগায়। এগুলি সবই ইহজগতে সফল জীবন-যাত্রার জন্যে প্রয়োজন, অপরিহার্য। সেজন্যেই জাতকের গল্পে—যেখানে ভগবান বুদ্ধের পূর্ব পূর্বজন্মের সাধনার কাহিনী আছে তা সত্যাই হউক আর মিথ্যাই হোক, কল্পনাই হউক আর দুইয়ের মিশ্রণই হোক, আমাদের মনে তেমন সাড়া জাগায় না। কারণ, আমাদের মনোবৃত্তি পরলোকমুখী নয়, ইহপর। বুদ্ধের সম্বন্ধে যে কথা বলা হল যীশুখৃষ্ট সম্বন্ধেও সেকথা অনেকটা বলা চলে। মানুষের মঙ্গলের জন্যে তাঁর অতুলনীয় আত্মদান, পাপীতাপীর প্রতি গভীর সহানুভূতি, অপরিসীম ক্ষমা, সংসারের ক্রমবর্ধমান স্বার্থসংঘর্ষের নিষ্ঠুরতা ও নৃশংসতার এক বড় প্রতিবাদ। এক মহান বিপ্লবের প্রথম অধ্যায়। বিশ শতকের মানুষ বুদ্ধ-যীশুকে ইহজীবনের প্রয়োজনেই আন্তরিক শ্রদ্ধার্ঘ অর্পণ করে। তাতে পরলোকের প্রলোভন এমন কিছু নেই। কবির সঙ্গে সুর মিলিয়ে তাই বলতে সাধ হয়—

"দেব কি মানব পরিচয়ে আজ
হেন প্রেমিকের বল কিবা কাজ।
শুধু লয় মনে রাতুল চরণে
করিতে জীবন দান"।

এক যুগের দার্শনিক চিন্তা যে আর এক যুগের মনের কাঠামোর সঙ্গে পুরোপুরি খাপ খায় না এ কথা আর একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করা যাক। খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের প্রথম যুগে যুক্তি-বিচারের ওপর মোটেই গুরুত্ব আরোপ করা হয়নি। তখন এই নতুন ধর্মে আস্থাবান হয়ে যাঁরা এর ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছিলেন তাঁদের ভিতর বিশ্বাসের জোর খুব প্রবল ছিল। নবানু-রাগের প্রেরণায় তাঁরা নতুন ধর্মের প্রচারিত সব কথাই এক রকম বিনা বিচারে মেনে নিয়েছিলেন। হৃদয়ের গভীর আবেগের প্রাবল্যে যুক্তি বিচারের স্পৃহা ভেসে গেছিল। কালক্রমে, অতি স্বাভাবিকভাবেই এ বিশ্বাসের বন্যায় ভাঁটা পড়ল। নিছক বিশ্বাসের চাপে মানুষ জর্জরিত হয়ে উঠল। তখনও স্বাধীন যুক্তি আপন অধিকার প্রতিষ্ঠা করবার সুযোগ পায়নি। তবে বিশ্বাসের পাশে তার জন্যে

সংকীর্ণ একটু স্থান করে দেবার প্রয়োজনীয়তা সেদিনকার ধর্মপ্রচারকেরা অনুভব করেছিলেন। চার্চীয় দর্শনের স্কলাস্টিসিজমে এই ভাবেরই অভিব্যক্তি ঘটেছিল। আপ্তবাক্যে বিশ্বাসের সঙ্গে যুক্তির একটা আপোষ করার চেষ্টাই স্কলাস্টিসিজমের মূল কথা। যুক্তির সাহায্যে বিশ্বাসের সাফাই গাওয়াই এ আপোষের উদ্দেশ্য। তের শতকে খ্রীষ্টা চার্চের প্রখ্যাতনামা দার্শনিক সেণ্ট টমাস এ্যাকুইনাস এই দুকর কার্য সম্পন্ন করে সেদিনের খ্রীষ্টান জগতে এক মস্ত বড় আলোড়ন নিয়ে এসেছিলেন। আজও চার্চীয় দর্শনে তার প্রভাব প্রচুর। এগার শতকে ইসলামের চিন্তাধারায় ঠিক একই কাজ করেছেন ইমাম গজ্জালী। যুক্তি ও বিশ্বাসের দ্বন্দ্বে ইসলামী জীবনধারায় যখন ভাঙন দেখা দিয়েছিল তখন নিছক স্বাধীন চিন্তার বিরুদ্ধে অভ্রধারণ করে বিশ্বাস ও যুক্তির বিরোধ মীমাংসার চেষ্টা করেছেন তিনি। সেজন্যে সাধারণত তাঁকে বলা হয় 'হুজ্জতুল ইসলাম' বা ইসলামের রক্ষক। এরও বহু আগে মধ্যযুগীয় ভারতীয় চিন্তাধারায় এ কাজ করেছেন আচার্য শংকর। বেদান্তের অদ্বৈতবাদ যে বৈদিক চিন্তাধারার শেষ কথা, শাস্ত্রের অবিরোধী তর্কের সাহায্যে নানা শাস্ত্র বিশ্লেষণ করে ও মনোগ্রাহী ভাষায় নানা উপাদেয় গ্রন্থ রচনা করে তিনি একথা প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছেন।

স্বাধীনচিন্তাপ্রবণ আধুনিক ইউরোপীয় দর্শনের জনক ফরাসী মনীষী ডেকার্টের কথা আগেই বলেছি। তাঁর চিন্তাধারায় স্কলাস্টিসিজমের প্রভাব প্রচুর। তিনি নতুন বোতলে পুরনো মদ যথেষ্ট ঢেলেছেন। তার প্রমাণ তাঁর দর্শনের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায়। দর্শনের রঙ্গমঞ্চে প্রথমে সংশয়বাদের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে তিনি দর্শকদের বিস্মিত করেছেন সন্দেহ নেই। তবে যবনিকা পতনের পূর্বে তিনি ভূমিকা পরিবর্তন করে যা পরিবেশন করেছিলেন তা সংশয়বাদ নয়, বিশ্বাসবাদ। প্রথমে স্বাধীন যুক্তির সাহায্যে সব কিছুকে উড়িয়ে দিয়ে পরে ঈশ্বর-বিশ্বাসের দোহাই দিয়ে তার এক রকম সবটাই ডেকার্ট গলাধঃকরণ করেছেন। ঈশ্বরে ও আত্মার অমরত্বে, দেহ ও আত্মার ভিন্নত্বে বিশ্বাস—খ্রীষ্টানধর্মের মূল কথা, ডেক্যার্ট শেষ পর্যন্ত অম্লানবদনে মেনে নিয়েছেন। চার্চীয় বিশ্বাসের পুরনো ইমারত চুরমার হয়ে যাওয়ায় যুক্তির দ্বারা সাক্ষাৎভাবে ধর্মশাস্ত্রের কথা তিনি সমর্থন করতে পারেন নি। একেই বলে 'শির ঘূর্ণনে নাসিকা স্পর্শ'।

রেনেসাঁসের সময় থেকে বিশ্বাসের বিরুদ্ধে যে জেহাদ ঘোষণা হয়েছিল তা আস্তে আস্তে খুব জোরালো আকার ধারণ করে। ডেকার্টের দর্শনে যে সংশয়বাদ সেটা এই বিদ্রোহেরই অভিব্যক্তি। সন্দেহ না করে আগে থেকে অসন্দিগ্ধ কিছু আছে একথা মানবো না, নিঃসংশয়ে প্রমাণ না পেলে চোখের

সামনের জগতকেও উড়িয়ে দেব, গণিতশাস্ত্রের সহজ সরল সিদ্ধান্তও যতক্ষণ না বুঝতে পারব তাদের সন্দেহ করা অসম্ভব, ততক্ষণ মানব না। ডেকার্টে'র এই সব উক্তি ব্যক্তি-মনের চিন্তার ফল বলে মনে করলে তাদের যথার্থ মূল্য এবং মান নির্ণয় করা কখনো সম্ভব হবে না। চার্চের বিশ্বাসবাদের চাপে শতকের পর শতক জর্জরিত হওয়ার পর যে প্রতিবাদ দানা বেঁধে উঠেছিল, ডেকার্টে'র মননের প্রথম অধ্যায়ে তারই অভিব্যক্তি। তিনি তাঁর পরিবেশেরই বার্তাবহ। এখানেই তাঁর কৃতিত্ব।

ডেকার্টে'র চিন্তার ঝুড়ির ওপরে যে লেবেল মারা রয়েছে তার চলতি নাম, স্বাধীন চিন্তা। কিন্তু সেই ঝুড়িতে প্রকৃতপক্ষে লুকনো রয়েছে প্রাচীন বিশ্বাস-বাদেরই পুটুলী। অবস্থা অনুকূল থাকলে স্কলাস্টিক দার্শনিকদের মত তিনিও সাধারণ মানুষের সামনে সেই পুটুলী খুলে ধরতেন। এমন কি হয়তো যুক্তির সাহায্যে তার সাফাইও গাইতেন। নতুন যুগের চাহিদা অনুসারেই তিনি স্বাধীন চিন্তার সাহায্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও আত্মার অমরত্ব প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। এতে পরোক্ষভাবে স্কলাস্টিসিজমই সমর্থিত হয়েছে। এ থেকেই আমাদের বোঝা উচিত, বড় বড় দার্শনিক মতের সঙ্গে তাদের বৃহত্তর সামাজিক পরিবেশের যোগ কত নিকট, কত নিবিড়।

যে গতিবাদী দ্বন্দ্বমূলক জড়বাদ আজ সর্বত্র প্রচারিত, তার মূলেও রয়েছে আমাদের পরিবেশের তাগিদ। কতকগুলি ঐতিহাসিক কারণেই তার উৎপত্তি ও প্রসার। প্রথমতঃ, চার্চের মারফৎ যুগ যুগ ধরে মানুষের স্বাধীন চিন্তার উপর যে আঘাত হানা হয়েছিল, তার ফলেই ধর্মবিশ্বাসের ওপর সাধারণ মানুষের আস্থা কমে যায়। চার্চের সঙ্গে সামান্য মতবিরোধেও কত লোককে কঠোর শাস্তি পেতে হয়েছে। নিরপেক্ষ ধর্মবুদ্ধিসম্পন্ন লোক যে মত অতি সঙ্গত ও নির্দোষ বলে মনে করেন তা প্রচারের জন্যেও সেদিনের চার্চ ট্রাইব্যুনালের কঠোর দণ্ড তাদের বরণ করে নিতে হয়েছে। চতুর্দশ শতকে ইটালীর ভাবুক মনীষী ব্রুনো বলেছিলেন, "জগতের সমস্ত বস্তু ঐশী চেতনায় পরিব্যাপ্ত"। প্রায় সমস্ত ধর্মের এই মূলতত্ত্ব প্রচারের জন্যে ব্রুনোকে চার্চের বিচারে আগুনে পুড়িয়ে মারার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। শান্তভাবে, বিনা রক্তপাতে নিরপরাধ ব্যক্তির মৃত্যুর ব্যবস্থার জন্যেই নাকি এই বিধান। চার্চের মহাপ্রাণ সাধকদের স্বার্থহীন আত্মাবদানের মূল্য অজস্র। কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের স্বাধীন চিন্তাকে পিষে ফেলবার যে চেষ্টা চলেছিল তার ফলেই বিশ্বাসবাদের বন্যায় ভাঁটা পড়েছিল। দ্বিতীয়ত, চার্চের নির্দ্দিতে পরলোকের তুলনায় ইহলোকের মূল্য অতি তুচ্ছ, নগণ্য। মধ্যযুগের অনেক ধর্মপ্রচারক, সাধারণ মানুষকে ইহকাল

নদীর জলে ভাসিয়ে দিয়ে পরকালের অনন্ত সুখের জন্যে বোঁচকা-বুঁচকি বেঁধে তৈরী থাকার উপদেশ দিতেন। বলতেন, বিষয়ে নিরাসক্ত হয়ে পরলোকের সেবা করাই কর্তব্য। রোমের অগণিত শ্রমিকেরা যে খ্রীষ্টধর্মের আদিযুগে দলে দলে খ্রীষ্টান হয়েছিল তার কারণ, পরলোকে স্বর্গীয় অনন্ত সুখের প্রতিশ্রুতির মধ্যে তারা পেয়েছিল ইহজীবনের নির্যাতন থেকে মুক্তির আশ্বাস। কিন্তু এভাবে শুধু পরলোকে স্বর্গসুখের লোভ দেখিয়ে মানুষের ইহজীবনের তাগিদ মেটানো যায় না। কবি ঠিকই বলেছেন, "শুধু সুরের খাদ্যে মিটে না মা নরের ক্ষুধা"। তাই আজকের দিনের মানুষ পরমাত্মা, পরলোক, আত্মা, রসুল, কেয়ামৎ নিয়ে খুব বেশী মাথা ঘামাতে চায় না। শুধু দেহের ক্ষুধা মেটানোর জন্যেই তার অনবরত চেষ্টা। বৈজ্ঞানিক ভাষায় একেই বলে ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার সাম্য।

জনমনে চার্চের অতি-জাগতিক জীবন-দর্শনের বিরোধিতার সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানের জয়যাত্রা শুরু হ'ল। ফলে, নতুন নতুন দেশ আবিষ্কৃত হ'ল, মানুষের জীবনকে সুখময় করবার অসংখ্য নতুন উপায় উদ্ভাবিত হ'ল, কল-কারখানার দৌলতে দুনিয়ার চেহারা বদলে গেল, পরলোকের প্রলোভনে জর্জরিত এবং শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ইহসুখে বঞ্চিত মানুষ পার্থিব জীবনের অচিন্তনীয় এবং অননুভূতপূর্ব স্বাদ পেয়ে অকস্মাৎ স্তব্ধ মুগ্ধ ও বিস্মিত হয়ে গেল। তারা আস্তে আস্তে অধ্যাত্মবাদেরই বিরুদ্ধে বেঁকে দাঁড়াল। এটাই হ'ল আজকের দিনের ইহসর্বস্বতা ও পরলোক-বিরোধিতার এক বড় কারণ।

এর ওপর আবার বিজ্ঞানের আলোকে, স্বাধীন চিন্তায় জাগ্রত ও উদ্বুদ্ধ মানুষ দেখতে পেল ধর্মের যাঁরা প্রচারক, পরলোকের শাশ্বত সুখের বাণী যাঁরা কানের কাছে অনবরত উচ্চারণ করেন, তাঁদের অনেকেই ভোগ-সুখের প্রাচুর্যে বর্ধিত। শুধু তাই নয়, তাঁদের কেউ কেউ আবার পরলোকের প্রলোভন দেখিয়ে সাধারণ মানুষকে ইহলোকের সুখ-ভোগ থেকে বঞ্চিত করার উপায় আবিকারেও তৎপর।

ইতিহাসের আদিযুগ থেকে স্বর্গে সোনার পেয়ালায় আঙুরের রস সেবন, কল্প-বৃক্ষের ফল ও কামধেনুর দুগ্ধ আস্বাদনের কথা বার বার শুনে ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক সাধারণ মানুষ পরলোকের প্রতি খানিকটা আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিল। কিন্তু সে যখন বহু শতকের নির্যাতনের পর স্বাধীন চিন্তার অধিকার ফিরে পেয়ে বিজ্ঞানের উজ্জ্বল আলোয় ঐহিক সুখসম্ভোগের বৃহৎ সম্ভাবনা দেখতে পেল, তখন তার মনে হ'ল, তথাকথিত পরলোকপর ধর্ম এক ব্যবসায়েরই নামান্তর, আর সেই ব্যবসায়ের মুনাফাদাররা প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে তাকে শোষণ করছে। তখন তার ধর্মের ওপর ও ধর্মের যমজ সহোদর অধ্যাত্মবাদী

দর্শনের ওপর আস্থা অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই কমে গেল। এবং ধর্ম মানুষের শোষণের এক বড় হাতিয়ার এই কথাই প্রচারিত হ'ল। এই ঐতিহাসিক পরিবেশেই দ্বন্দ্বমূলক গতিবাদী জড়বাদের আবির্ভাব। আধুনিক জড়বাদ যে গতিবাদী তার মূলেও রয়েছে যুগের প্রয়োজন; বৈজ্ঞানিক সভ্যতা যে কর্মচঞ্চল তার মূলেও রয়েছে ইহলোকপরায়ণতা। গতিই ক্রিয়ার প্রাণ, তাই আধুনিক জড়বাদ গতিবাদী; পুরনো কালের জড়বাদের মত স্থিতিবাদী নয়। যুগের গতিশীলতায় উদ্বুদ্ধ হয়েই কবি বলেছেন,

"শব্দময়ী অপ্সর রমণী,
গেল চলি স্তব্ধতার তপোভঙ্গ করি'।
দিল আনি·· পুলকিত নিশ্চলের অন্তরে অন্তরে
বেগের আবেগ।"

আগেই বলেছি, জড়বাদ বা দেহবাদ যার আর একটু লম্বা নাম দেহাত্মবাদ, তা অধুনিক যুগের সৃষ্টি নয়। মানুষের স্বাভাবিক বিষয়াসক্তি যখনই উগ্র হয়ে উঠবে, তখনই জড়বাদকে সে তার জীবন-দর্শন হিসাবে গ্রহণ করবে। উগ্র অধ্যাত্মবাদ সম্বন্ধেও এ উক্তি সমভাবে প্রযোজ্য। আর উগ্র অধ্যাত্মবাদ ও জড়বাদের বিরোধে মানুষ যখন জর্জরিত হয়ে ওঠে তখনই এদের ভিতর সমঝোতা স্থাপনের প্রয়োজন হয়। এই প্রয়োজনবোধ থেকেই সমঞ্জসী জীবন-দর্শনের উৎপত্তি। মানব-সভ্যতার এই সংকটময় মুহূর্তের পেছনে রয়েছে এই সমঞ্জসী দৃষ্টির শুভলগ্নের এক অস্পষ্ট ইঙ্গিত। যাঁরা এসব দার্শনিক মতকে শুধু যুক্তির কসরৎ বলে মনে করেন, তাঁরা মস্ত বড় ভুল করেন। প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর আগে—আমি যখন দর্শনের অনার্স ক্লাসের ছাত্র, তখন আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক—দর্শনের বিশ্ববিখ্যাত অধ্যাপক পরলোকগত ডঃ সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত, যুক্তির খেলা সম্পর্কে আমাদের যে কথা বলেছিলেন তা আজও ভুলিনি। তিনি বলেছিলেন, "বিক্রমাদিত্যের তাল-বেতালের গল্প জান তো? তাল-বেতাল নামে দুটি অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন দৈত্য বিক্রমাদিত্যের আজ্ঞাবহ ছিল। তবে তাদের একটি বড় বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, তারা যখন যার হাতে থাকত, তখন তারই আদেশ পালন করত। একদিন একথা ভুলে গিয়ে বিক্রমাদিত্য তাদের অন্যের হাতে দিয়ে দিলেন এবং অন্যের হাতে থাকা অবস্থাতেই তাদের কিছু করতে আদেশ করলেন। তারা তাঁর সে আদেশ মোটেই পালন করল না। অপ্রতিভ হয়ে তিনি তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, তাল-বেতাল কার? তখন তারা উত্তর করল, যার হাতে তার। অমনি তিনি তাদের নিজের হাতে ফিরিয়ে আনলেন। আর তারা, আগের মতই তাঁর আদেশ পালন করতে লাগল।

তর্ক-যুক্তির অবস্থা অনেকটা বিক্রমাদিত্যের তাল-বেতালেরই মত। যে যে ভাবে তাকে মোচড় দিতে পারে, তারা তার কাছে সেই চেহারাই নেয়। তাদের নিজস্ব কোন স্থায়ী চেহারা নেই।"

সেই পণ্ডিতপ্রবরের কথা আমার অন্তরে আজও গাঁথা হয়ে রয়েছে। ছোট-বেলা থেকেই দর্শনের পুথি পড়াকে জীবনের এক ব্রত বলে বেছে নিয়েছিলাম। দর্শন-সাগর যেন আমাকেই গ্রাস করে ফেলেছে। আমি তার এক গণ্ডূষও পান করতে পারিনি। তবে আন্তরিক অনুরাগের নিবিড় স্পর্শে, সার্থক দর্শনমাত্রই যে জীবনের প্রয়োজনের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত, একথা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছি। সে প্রয়োজনের তাগিদেই জড়বাদের উৎপত্তি, অধ্যাত্মবাদেরও উৎপত্তি। আর এই দুই-এর ভিতর আপোষ করার চেষ্টাও সেই একই প্রয়োজনে। আজকের দিনের মানুষের বৃহত্তর ঐহিক জীবনকে সার্থক ও সুন্দর করবার জন্যে এই সমন্বয়ী দর্শনের বিশেষ প্রয়োজন একথা আর অস্বীকার করবার উপায় নেই। যাদের কানের কাছে এই সত্যের অস্ফুট ধ্বনি এসে পৌঁছেছে আমি সেই অগণিত মানুষেরই একজন। তাই আমি যুক্তিবাদ অস্বীকার করি না, বিশ্বাসবাদকে অবজ্ঞা করি না —জীবনবাদই আমার প্রধান উপজীব্য, আমার জীবন-দর্শনের শেষ কথা।

অতীতে শতাব্দীর পর শতাব্দী উগ্র অধ্যাত্মবাদ সাধারণ মানুষের আশা-ভরসাকে নস্যাৎ ও নির্মূল করেছে। তেমনি আজকের দিনের উগ্র জড়বাদও তার জীবনযাত্রাকে সফল করতে পারেনি। আশায় বুক বেঁধে সাধারণ মানুষ আজকের দিনের বৈজ্ঞানিক জড়বাদের দিকে তাকিয়ে ছিল, তার সে আশা এই অল্প সময়ের মধ্যেই খানিকটা নির্মূল হয়েছে। শোষণহীন সমাজব্যবস্থার পরিবর্তে সে চারপাশে দেখছে জাতিতে জাতিতে, দেশে দেশে, গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে সংঘর্ষ। এই সংঘর্ষের সমাধানের মহৌষধ জড়বাদে নেই। যে ঐক্যবোধ জাগলে স্বাভাবিক স্বার্থবুদ্ধি সংযত হয়, মানুষের কল্যাণস্পৃহা জাগে, জড়বাদ তার উল্টো পথেই চলে। জড়বাদ সেই একত্ব স্বীকার করে না। বহুত্ববুদ্ধি ও ভিন্নত্ববোধই তার কর্ম-প্রেরণার মূল উৎস। জড়বাদ বৈজ্ঞানিক সভ্যতায় যে প্রাণ-চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে, তার প্রয়োজন খুব বেশী। সেই প্রাণ-চাঞ্চল্য, কর্মমুখরতা ছাড়া নতুন পৃথিবী গড়ে তোলার উপায় নেই। তবে সে পৃথিবীকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে শুধু শক্তির ভিত্তিতে নয়, প্রেমের ভিত্তিতে। এই শক্তি ও প্রেমের মিলনের নামই জড়বাদ ও অধ্যাত্মবাদের সমঝোতা। এই সমঝোতা ছাড়া ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, সমাজে সমাজে, শ্রেণীতে শ্রেণীতে, দেশে দেশে সংঘর্ষ দূর করার অন্য উপায় নেই। সেজন্যে আধুনিক জড়বাদ তার অজ্ঞাতসারে অধ্যাত্মবাদের মিলন-মন্ত্রকেই আহ্বান জানাচ্ছে। আর প্রাচীন অধ্যাত্মবাদও

সুদূর স্বর্গ থেকে পৃথিবীর বুকে নেমে আসতে চাইছে সব মানুষের জীবনকে প্রেমে, কল্যাণে ও সমৃদ্ধিতে পূর্ণ করার জন্যে। ত্রিশঙ্কুর মতই মধ্যপথে তারা মিলিত হবে। আর সেই মিলনের ফলে জড়বাদ ও অধ্যাত্মবাদের তথাকথিত দ্বন্দ্বের সমাধান হবে। এই নতুন জীবন-দর্শনের ভিত্তিতেই আগামী দিনের সব মানুষের সুখ-সমৃদ্ধির ইমারৎ গড়ে তুলতে হবে।

বিপর্যস্ত বিজ্ঞান

মানুষের বৃহত্তর পরিবেশের চাহিদা এবং তাগিদ এত জরুরী যে দু'শ বছরের বেশী সময় ধরে জড়বাদের দিকে একটু একটু করে এগোবার পর, বিজ্ঞানও যেন আজ থমকে দাঁড়িয়েছে। নিজের অজ্ঞাতেই যেন বিজ্ঞান আজ জড়বাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে নিতে চাইছে। আর অধ্যাত্মবাদ তারই পাশে দাঁড়িয়ে আবছায়ার মধ্যে উঁকি দিচ্ছে। মনে হচ্ছে, এটা যুগ পরিবর্তনের এক অমোঘ সংকেত।

সতের শতক বিজ্ঞানের সুবর্ণযুগ। এই সময়েই মহাবিজ্ঞানী নিউটনের আবির্ভাব হয়েছিল। বিজ্ঞানের এবং বৈজ্ঞানিক সভ্যতার দ্রুত প্রগতি এবং প্রসার তখন থেকেই শুরু হ'ল। শুধু পদার্থবিদ্যায় নয়, বিজ্ঞানের অন্যান্য বিভাগেও, যেমন, যন্ত্রবিদ্যায় ও দেহবিজ্ঞানে, এ যুগে অনেক নতুন আবিষ্কার হয়েছে। নিউটনই হচ্ছেন এ যুগ-পরিবর্তনের নায়ক। তাঁর আবিষ্কারে, সারা দুনিয়া প্রাকৃতিক নিয়মে চলছে, এ কথা স্বীকৃতি লাভ করল। ফলে, ধর্মের নামে যে সমস্ত অলৌকিক ঘটনা অস্বাভাবিকভাবে সংঘটিত হয় বলে সাধারণ মানুষ এতদিন বিশ্বাস করত, সে ধারণা পাল্টে গেল। কিন্তু ঈশ্বরে বিশ্বাস অটুটই রইল। নিউটন বোঝালেন, প্রকৃতির নিয়মগুলো ঈশ্বরের ইচ্ছারই প্রকাশ। জগতের আদি কারণ ঈশ্বর খেয়ালবশে কিছু করেন না। তাঁর নিজের গড়া নিয়ম তিনি মেনে চলেন। তাতে তাঁর স্বাধীনতার ব্যাঘাত হয় না। তিনি স্বেচ্ছায় নিজের গড়া নিয়মের শিকল নিজের পায়ে পরিয়েছেন। তিনি খেয়ালী বিধি নন, নিয়মের রাজত্বের অধীশ্বর। কাজেই সতের শতকের বিজ্ঞানের সঙ্গে ঈশ্বর-বিশ্বাসের বিরোধ ছিল না। তার বিরোধ অস্বাভাবিকের ও অলৌকিকের সঙ্গে—যার ইংরেজি নাম 'মিরাকল'। এতে মিরাকলের লেবেল-মারা ধর্মের ভিত্তি বেশ খানিকটা শিথিল হয়ে গেল আর তার স্থান অধিকার করল বিজ্ঞানসম্মত কার্য-কারণের নিয়মে আস্থাবান ধর্ম।

কিন্তু দু'শ বছর যেতে না যেতেই বিজ্ঞানের ক্রমিক বিবর্তনের ফলে এই বিজ্ঞানসম্মত বিশ্বাসবাদের ভিত্তি আস্তে আস্তে ভেঙ্গে শিথিল হ'ল। চার্ল'স ডারউইন ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে যখন তাঁর 'অরিজিন অব স্পিসিজ' ও ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে 'ডিসেণ্ট অব ম্যান'-এ নানা গবেষণার পর মানুষকে বানরেরই অধস্তন পুরুষ বলে ঘোষণা করলেন, তখন সে বৈজ্ঞানিক বিশ্বাসের নতুন ইমারৎ ধ্বসে পড়ল ও ধর্মযাজক সম্প্রদায়ে বিশেষ চাঞ্চল্য জাগল। নিউটনের অনেক আগে ১৫৪৩ খ্রীষ্টাব্দে কোপারনিকাস যখন অত্যন্ত সন্তর্পণে, ভয়ে ভয়ে চার্চের প্রচলিত মতের বিরুদ্ধে তাঁর পুথিতে লিখেছিলেন—সূর্য পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে না— পৃথিবীই সূর্যের চারদিকে ঘোরে, সেদিন এর অর্ধেক চাঞ্চল্যও জাগেনি। ইহুদী-পুরাণে আছে, ঈশ্বর ছয় দিনে পৃথিবী সৃষ্টি করে সপ্তম দিনে সৃষ্টির আনন্দমুখর ক্লান্তি বিশ্রামের দ্বারা দূর করেছিলেন। তাঁর ইচ্ছায় জগতের বিভিন্ন প্রাণীজাতি সৃষ্ট হয়েছিল—এক জাতি অন্য জাতিতে রূপান্তর হয়নি। আর সে সৃষ্টির মধ্যে মানুষই সেরা। ডারউইনের বিবর্তনবাদ ইহুদী-পুরাণের সৃষ্টিকাহিনীকে উড়িয়ে দিয়েছিল। ইহুদী-পুরাণের সৃষ্টিকাহিনী প্রচলিত খ্রীষ্টধর্মেরও ভিত্তি। ডারউইনের ক্রমবিকাশবাদ প্রাণীজগতে সীমাবদ্ধ ছিল—এক প্রাণীজাতির অন্য প্রাণীজাতিতে-রূপান্তর, তাঁর মূল বক্তব্য। ডারউইনের প্রায় সমসাময়িক হার্বার্ট স্পেনসার সমগ্র বিশ্বের ওপর বিবর্তনবাদ প্রয়োগ করলেন। বিজ্ঞানে যার ক্ষেত্র অত্যন্ত সংকীর্ণ ছিল, বিজ্ঞানঘেঁষা দার্শনিক দৃষ্টির সাহায্যে স্পেনসার তার ক্ষেত্র বহু বিস্তৃত করে ফেললেন এবং দেখাতে চেষ্টা করলেন, সারা বিশ্বই ক্রমবিকাশের পরিণতি। যাই হোক, এইভাবে উনিশ শতকে স্রষ্টা ঈশ্বর সৃষ্টিকাহিনী থেকে বাদ পড়ে গেলেন, এবং উগ্র জড়বাদের পত্তন হল।

স্পেনসার অবশ্য বিশ্বের বিবর্তনের পেছনে অজ্ঞেয় তত্ত্ব কিছু স্বীকার করেছিলেন কিন্তু বিবর্তনবাদীদের জড়বাদে এমনি ঝোঁক যে, বিবর্তনের ব্যাখ্যায় তাঁরা স্পেনসারের অজ্ঞেয়বাদের ওপর বিশেষ কোন গুরুত্ব আরোপ করলেন না। ফলে স্পেনসারের অজ্ঞেয়বাদ অরণ্যে রোদনের সামিল হল। এভাবে উনিশ শতকে বিজ্ঞানে জড়বাদের জয় ঘোষিত হল। আর এ যুগেই হেগেলীয় অধ্যাত্মবাদের আওতা থেকে বেরিয়ে এসে কার্ল মার্কস্ গতিবাদী দ্বন্দ্বমূলক জড়বাদ ও বিপ্লবের সাহায্যে শ্রেণীবিহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার কথা প্রচার করলেন।

বিশ শতকের বিজ্ঞানে আরেক পরিবর্তন ঘটল। নিউটনের সময় থেকেই ইউরোপে, যার চলনশক্তি নেই তাকে 'জড়' আর যার চলনশক্তি আছে তাকে 'চেতন' বলা হত। জড় যে পুরোপুরি ক্রিয়া-শক্তি রহিত একথা বোঝাবার জন্যে নিউটন বলেছেন, জড়কে না চালালে চলতেও পারে না, আবার চালিয়ে

দিলে নিজে থামতেও পারে না। জড় এমনই নিষ্ক্রিয়, পরাধীন। উনিশ শতকের প্রথম দিকে বিজ্ঞানীরা জড়বস্তুর আদি উপাদান ছোট ছোট স্থির নিশ্চল পরমাণু এই অভিমত প্রকাশ করেন। এরই নাম এ্যাটমিক থিওরী, যা নিউটনের মতেরই স্বাভাবিক পরিণতি। কিন্তু বিশ শতকের প্রথম দিকে বিজ্ঞানীরা যখন জড়ের আদি উপাদান বৈদ্যুতিক শক্তি বলে প্রচার করতে আরম্ভ করলেন তখন থেকেই সে পুরোনো মত একেবারে বদলে গেল। স্থির নিশ্চল পরমাণুর স্থান অধিকার করল পজিটিভ বৈদ্যুতিক শক্তির আধার ইলেক্ট্রোন আর নিগেটিভ বৈদ্যুতিক শক্তির আধার প্রোটোন। এই সময় আবার মহাবিজ্ঞানী আইনষ্টাইন দেশ ও কালের বিচ্ছেদ সরিয়ে দিয়ে আমাদের সহজ বুদ্ধির জগতের গোড়া কেটে দিলেন। তিনি দেখালেন, আমরা যাকে দেশ বলি তার যেমন দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও দূরত্ব এই তিনটি ধর্ম আছে ঠিক সে রকমই তাদের একটি চতুর্থ ধর্মও আছে, তারই নাম কাল। গতিশীল কাল জগতের সমস্ত তথাকথিত স্থির বস্তুর এক প্রধান উপাদান। আজকের দিনের বিজ্ঞানে তাই জড় বস্তু ও স্থির দেশ এ দুটো জিনিসকে খুঁজে পাওয়া যায় না। যা কিছু আছে সবই অস্থির, অশাশ্বত ও ক্ষণিক। বৌদ্ধ ক্ষণিকবাদ ও গ্রীক দার্শনিক হেরাক্লিটাসের স্রোতস্বতীসদৃশ জগৎ-প্রবাহবাদই পদার্থবিজ্ঞায় আজ স্বীকৃতি ও সমর্থন লাভ করেছে।

এর ফলে, বিজ্ঞানীরা কেউ কেউ অধ্যাত্মবাদের দিকে ঝুঁকে পড়েছেন। জগতের অধ্যাত্ম-ভাবপ্রধান প্রাচীন দর্শনে, আমাদের সহজ স্বাভাবিক অভিজ্ঞতার জগৎ, তার পেছনের এক চরম তত্ত্বের আভাস বা ছায়া বলে বর্ণিত হয়েছিল। মানুষের সীমিত ও দোষযুক্ত বুদ্ধিতে সেই স্থির শাশ্বত অনুপম সত্যের যে চঞ্চল ও ক্ষণভঙ্গুর প্রতিবিম্ব তারই নাম এই ক্ষণিক পৃথিবী—যার জন্যে এত মনকষাকষি মান-অভিমান, হাসি-কান্না, হানাহানি। সহজ বুদ্ধির স্থির বস্তু-গুলোর ওপর মুগুরের ঘা দিয়ে বিজ্ঞান সেই পুরনো চরম সত্য ও আপেক্ষিক সত্যের তফাৎই সমর্থন করল। জ্যোতির্বিদ ও গণিতজ্ঞ এডিংটন এই দুর্বোধ্য তত্ত্বের ওপর আলোকপাত করে বলেছেন, "আমি যে চেয়ারের ওপর বসে টেবিলে বই লিখছি এ টেবিল ও চেয়ার ছাড়া বিজ্ঞানের আর একটি টেবিল ও চেয়ার আছে। বিজ্ঞানের টেবিল ও চেয়ার বৈদ্যুতিক উপাদানে তৈরী।" এডিংটনের মতে, আমাদের স্বাভাবিক অভিজ্ঞতায় স্থির টেবিল-চেয়ার যেমন আমাদের মনের সৃষ্টি, ঠিক সেই রকমই বিজ্ঞানের টেবিল-চেয়ারও আমাদের মনেরই সৃষ্টি। বিজ্ঞান ও সহজবুদ্ধি আমাদের অভিজ্ঞতারই দুটি স্তর, শেষ কথা নয়। বুদ্ধির অতীত অতীন্দ্রিয় অনুভূতির সাহায্যে আমরা যখন জগতের

চরম সত্যকে প্রত্যক্ষ করব তখনই এই বিজ্ঞানের জগতের ওপারে চলে যাব। তখন আমরা বুঝতে পারব, সারা জগতের পেছনে রয়েছে এক বিরাট বিশ্বমন। এভাবে বিজ্ঞানী এডিংটন বৈজ্ঞানিক জ্ঞান থেকে প্রেরণা নিয়ে অধ্যাত্মবাদ প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা করেছেন। অনেক বিজ্ঞানী বলেন, আর সে কথা হয়তো ভুলও নয় যে, এডিংটনের বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক সিদ্ধান্তের মাঝখানে একটি ব্যবধান রয়ে গেছে। সে যাই হোক, আমাদের স্বাভাবিক প্রাত্যহিক বেচাকেনার জগৎ আমাদের মনের সৃষ্টি এই পুরনো সিদ্ধান্ত বৈজ্ঞানিক গবেষণায় দিনের আলোর মতোই পরিষ্কার হয়ে উঠেছে। অধ্যাত্ম-অনুভূতির দৃষ্টিতে গতিশীল বিদ্যুতের উপাদানে তৈরী ইলেকট্রোন ও প্রোটোন, আর চিরচঞ্চল স্পেইস-টাইমের জগৎ আমাদের মনের কল্পনারই যে সৃষ্টি, একথাও অস্বীকার করার উপায় নেই। তাই বলতে ইচ্ছা হয়, এমন ঘরবাড়ী, মটরগাড়ী, ডিনার-লাঞ্চ, চা-চক্র, মনপ্রাণ-সুশীতলকারী পানীয় আস্বাদনের আর কূটনৈতিক ভাববিনিময়ের বৈজ্ঞানিক হাতিয়ারে গড়া জগতই যদি আমাদের মনের সৃষ্টি হতে পারে তবে আজকের দিনের পদার্থবিদ্যার ইলেকট্রোন প্রোটনের ধোঁয়াটে জগৎ—যাতে স্পেইস-টাইমের টাগ অব ওঅর লেগেই আছে, তা আমাদের মনের সৃষ্টি হলেই বা কী আর না হলেই বা কী।

বিজ্ঞানের সূক্ষ্ম গাণিতিক বিশ্লেষণ থেকে প্রেরণা পেয়ে আজকের দিনের আর একজন বিজ্ঞানী স্যার জেমস্ জীনস্ প্লেটোর অধ্যাত্মবাদের দিকে বিশেষ আকৃষ্ট হয়েছেন। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের অতীত যে ভাস্বর, শাশ্বত কল্পলোকের বার্তা প্লেটোর দর্শনে বিঘোষিত গণিতে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণই তাতে পৌঁছবার প্রশস্ত পথ। গণিতশাস্ত্রের সাহায্যে আজকের দিনের বিজ্ঞানও অসাধ্য সাধন করছে। গণিতের দুর্বোধ্য ফরমূলার মারফৎ পদার্থবিদ্যার বড় বড় সিদ্ধান্তকে রূপ দেওয়া হয়েছে। গণিতশাস্ত্রের সঙ্গে অধ্যাত্মবাদের এই নিকট যোগ দেখে আত্মহারা হয়ে স্যার জেমস্ জীন্স্ বলেছেন, "আমাদের অতি পরিচিত প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতার জগৎ এক অনন্ত শক্তিমান গণিতজ্ঞের মনের চিন্তা ছাড়া আর কিছুই নয়"। এইভাবে বিজ্ঞানীরা বর্তমান পদার্থবিদ্যার বায়বীয় যানে আরোহণ করে প্রাচীন অধ্যাত্মবাদের শূন্য-মার্গে যাত্রা শুরু করেছেন। কোথায় যে তার শেষ জানি না।

এখানে বলতে ইচ্ছা হয়, জগতের আদি কারণ ঈশ্বর, আর যাই হোন, ভাল গণিতজ্ঞ যে নন তা অস্বীকার করার উপায় নেই। ভালমন্দের হিসাবের জ্ঞান যদি তাঁর থাকত, তবে তাঁর নিজে গড়া দুনিয়া অগণিত মহাপ্রাণ-

পুরুষের আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও এমন অবস্থায় থাকত না। অবশ্য এ আমার ব্যক্তিগত উচ্ছ্বাসের কথা। এর মূল্য তাই অতি তুচ্ছ, অতি অকিঞ্চিৎকর।

কোরআন শরীফে আছে, আল্লাহতায়ালা যখন ফেরেশতাদের কাছে তাঁর খলিফা হিসেবে মানুষ সৃষ্টির প্রস্তাব করেন, তখন ফেরেশতারা জোর আপত্তি জানিয়েছিলেন। তাঁরা বলেছিলেন, "আপনি যে মানুষ সৃষ্টি করতে চাইছেন সে পৃথিবীতে কলহ-বিবাদ, যুদ্ধ-বিগ্রহ, মারামারি ইত্যাদি অজস্র অনর্থ সংঘটিত করে আপনি যা চাইছেন তার উল্টো কাজই করবে।" আল্লাহতায়ালা ফেরেশতাদের সে কথা শোনেন নি। ফেরেশতাদের আশংকা যে সত্য মানুষের অতীত ও বর্তমান ইতিহাস তাই প্রমাণ করছে। আল্লার বাণী মানুষ এখনও সফল ও সার্থক করে তুলতে পারেনি, ভবিষ্যতে করবে এই আশা পোষণ করেই খোদাতায়ালা ও ফেরেশতাদের প্রাচীন মতবিরোধের একটা মীমাংসা আমার জীবন-দর্শন মারফৎ করার চেষ্টা করেছি। কারণ, সব সময় সব অবস্থায় জোড়াতালি দিয়ে চলাই আমার প্রধান কাজ, আলু-দর্শনের অপরিহার্য কর্তব্য।

প্রকৃতির নিয়মগুলো যে অপরিবর্তনশীল গত শতকের বিজ্ঞানের এই সিদ্ধান্ত আজকের দিনের বিজ্ঞানীদের মতে অচল। কার্য-কারণের নিয়মে আজকের দিনের বিজ্ঞান বিশ্বাস করে না। তাই কারণ থেকে যে কার্য উৎপন্ন হবেই হবে এ কথা জোর করে বলা চলে না। কার্য-কারণের নিয়মের নিগড়ে হাত-পা-বাঁধা দুনিয়ায় স্বাধীনতা বলে কিছু থাকতে পারে না। সেখানে যা ঘটে তা ঘটতে বাধ্য, যেমন দু'য়ে দু'য়ে চার। আজকের দিনের বিজ্ঞান কার্য-কারণের নিয়মে বাধ্যবাধকতা স্বীকার করে না। কাজেই জগতে স্বাধীনতার স্থান প্রচুর। আর স্বাধীনতা আত্মধর্মী। তাই এডিংটন কার্য-কারণের নিয়মের নিষেধের ভেতর বহির্বিশ্বে আত্মসত্তারই ইংগিত দেখতে চেয়েছেন।

আইনস্টাইন কিন্তু মনে করেন যে, প্রকৃতির ভিতর একটা সামঞ্জস্য আছে এবং প্রাকৃতিক নিয়মগুলো সে সামঞ্জস্যেরই প্রকাশ। এটাই ধর্মবিশ্বাসের মূল কথা। বিজ্ঞান আবার এই বিশ্বাসের দিকে ফিরে আসবে আইনস্টাইন এই আশাই পোষণ করেন। তাই দেশ ও কালের স্বরূপ ও মাধ্যাকর্ষণের নীতি সম্বন্ধে নিউটনের সঙ্গে তাঁর যতই মতবিরোধ থাকুক না কেন ধর্মবিশ্বাসে আইনস্টাইন নিউটনের অনেকটা কাছাকাছি। আইনস্টাইন তাঁর দার্শনিক লেখায় সত্য-শিব-সুন্দরের জয়গান বারবার করেছেন। তা-ই তাঁকে আজকের দিনের হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীতে শান্তিকামী অহিংসা মন্ত্রের উপাসক করে তুলেছিল। পরলোকের সত্তা স্বীকার না করলেও, আর চার্চের বাঁধাধরা ধর্মমতে আস্থা না থাকলেও আইনস্টাইন যে গভীর ধর্মবিশ্বাসী এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

এ যুগের আর একজন বড় বিজ্ঞানী স্যার অলিভার লজও নানা কারণে পরলোকে বিশ্বাসী হয়ে উঠেছিলেন। বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তে বিপর্যয়ই এর একমাত্র কারণ নয়। তাঁর প্রিয় পুত্র রেমণ্ডের প্রথম বিশ্বযুদ্ধে আকস্মিক মৃত্যুও এ ভাবান্তরের এক বড় কারণ। শুধু স্যার অলিভার লজ নন, অনেক বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তিসম্পন্ন লোক তাঁদের জর্জরিত অন্তরাত্মার আধ্যাত্মিক খোরাক পাবার জন্যে প্রেততত্ত্বের গোলকধাঁধায় পরলোকের ইঙ্গিত পাবার চেষ্টা করছেন, এটা তাঁদের জড়বাদে অত্যাসক্তিরই সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া। আজকের দিনের অনেক দার্শনিকও এই বিজ্ঞান-বিপর্যয়ে বেশ মুশকিলে পড়েছেন। বিজ্ঞানের চাপে তাঁরা না পারছেন জড়বাদের সঙ্গে হাত মেলাতে, না পারছেন অধ্যাত্মবাদের দিকে ঝুঁকতে। নিউটনের কাছ থেকে তাঁরা শিখেছেন, জড়ের ধর্ম না চলা। আর, আজ বিজ্ঞানের আলোকে তাঁরা দেখতে পাচ্ছেন যাকে আমরা জড় বলি, আসলে অনবরত চলাই তার ধর্ম। কাজেই জড়বাদের ঘাটেও তাঁরা স্থান করে নিতে পারছেন না আর অধ্যাত্মবাদের গোয়ালে ঢুকতেও তাঁদের একান্ত অনিচ্ছা। কাজেই ঘাট ও গোয়ালের মাঝখানে তাঁরা এক স্বকপোলকল্পিত স্বল্প পরিসর মতবাদ খাড়া করে তুলেছেন। এরই নাম নিউট্র্যালিজম। এটি যে আন্তর্জাতিক নিউট্র্যালিজম নয়, একথা বলাই বাহুল্য। এঁরা বলেন, তত্ত্ব জড়ও হতে পারে না আর মানসও হতে পারে না। কাজেই জড়বাদ ও অধ্যাত্মবাদ দু'টোই ভুল পথে চলেছে। এক নিরপেক্ষ বস্তুই এক অবস্থায় জড় আর অন্য অবস্থায় চেতন বলে অনুভূত হয়। এ দার্শনিক মতের বাইরের চেহারা অনেকটা আমার উভচর অধ্যাত্মবাদী জড়বাদ ও জড়বাদী অধ্যাত্মবাদেরই মত। তবে আমার মত একত্ববাদ আর এদের মত নির্জলা বহুত্ববাদ। একত্ববাদ স্বীকার করলে পাছে অধ্যাত্মবাদের ঘূর্ণিবাত্যায় হাবুডুবু খেয়ে তাঁদের সহজ বস্তুবাদী অন্তরাত্মা জর্জরিত হয়, এই আশংকায়ই এঁরা নিরপেক্ষ সত্তার ওপর বহুত্ববাদের লেবেল ভাল করে এঁটে দিয়েছেন।

আজকের দিনের নিরপেক্ষ সত্তাবাদী বস্তুতান্ত্রিকদের দিকে তাকালে, ছোটবেলায় শোনা এক চটকদার উক্তি মনে পড়ে: বকো আর ঝকো আমি কানে দিয়েছি তুলো, মারো আর ধরো আমি পিঠ করেছি কুলো। যেন তেন প্রকারেণ, অধ্যাত্মবাদের হাত থেকে অব্যাহতি পাবার জন্যেই এঁরা এক অদ্বয়-তত্ত্বের পাশ মাড়াতে একেবারেই নারাজ। একে স্বীকৃতি দিলে যেন তাঁদের দর্শনের মহাভারত একেবারে অশুদ্ধ হয়ে যাবে। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে এই নিরপেক্ষ-সত্তাবাদ জার্মান দার্শনিক শেলিং প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর মূলকথা একত্ববাদ এবং তা হেগেলের অধ্যাত্মবাদের রূপায়ণে প্রচুর প্রেরণা দিয়েছে।

শেলিং-এর দার্শনিক পরিবেশ অধ্যাত্মবাদের উগ্রতায় জর্জরিত ছিল। বস্তুসত্তার ক্ষীণ স্বীকৃতিই তাই তাঁর কাম্য ছিল। আধ্যাত্মিক ঐক্যের সঙ্গে বস্তুসত্তার সামঞ্জস্য বিধান করতে গিয়ে শেলিং এক অজড় ও অমানস নিরপেক্ষ-সত্তার ভেতর তত্ত্বলোকের সন্ধান পেয়েছিলেন। আজকের আবহাওয়া তার ঠিক বিপরীত। সহজ অভিজ্ঞতার বহুত্ব-বোধের প্রভাব আজকের দিনের নিরপেক্ষ সত্তাবাদের ওপর প্রচুর।

অধ্যাত্মদৃষ্টিই একত্ববোধের জনক। শুদ্ধ-হৃদয়ই সে অনুভূতির উৎস ও আকর। অনুরাগই তার বড় পাথেয়। আধুনিক বিজ্ঞানের বিপর্যয় সে অনুরাগের প্রয়োজনীয়তাবোধ মানুষের মনে জাগিয়ে দেবে এ আশা পোষণ করা নিশ্চয়ই অযৌক্তিক ও অস্বাভাবিক নয়।

বিপর্যস্ত বুদ্ধি

পরিবেশের চাপে মানুষের দার্শনিক চিন্তায় এক এক যুগে মনের এক এক দৃষ্টিভঙ্গী প্রাধান্য লাভ করেছে। ফলে, দর্শন প্রায়ই এক চোখো ও এক-রঙে রঙিন হয়ে গেছে। মানুষের আত্মিক প্রয়োজনের সামগ্রিক প্রতিফলন তাতে বিশেষ দেখা যায় না।

মধ্যযুগের চার্চীয় দর্শনে ও তারও আগের ধর্মপ্রভাবিত দার্শনিক চিন্তায় হৃদয়ের আবেদন অতি প্রধান। বুদ্ধি সেখানে নীরব, নিস্তব্ধ, শ্লথ ও পরাভূত। সে পরিবেশ বুদ্ধির অতীত অনুভূতির জয়গানেই মুখর। এই অনুভূতিতে উদ্বুদ্ধ ও আত্মহারা হয়েই উপনিষদের ঋষি আশ্বাসবাণী উচ্চারণ করেছেন:

"যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য
মনসা সহ।
আনন্দং ব্রহ্মেতি বিদ্বন্ ন বিভেতি
কুতশ্চন॥"

"যেখানে বাক্য ও মনের প্রবেশ নেই, সেই আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মকে
জেনে মানুষ ভয়রহিত হয়"।

অন্তরাত্মার এই উদাত্ত আহ্বান সে যুগের সাধারণ মানুষ উপেক্ষা করতে পারেনি। তাতে তার আন্তরিক বিশ্বাস ছিল এবং এই বিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ হয়েই সে ঈশ্বরের বাণীকে তার জীবন দর্শন করতে চেয়েছিল। মানুষ সসীম জীব, তার বুদ্ধি সীমিত, ভুল করা তার স্বভাব। তাই শুধু বুদ্ধি দিয়ে সে তত্ত্ব-নির্ণয়ে সক্ষম

নয়। তাই বুদ্ধিভিত্তিক দর্শনের আলেয়ার পেছনে সে যুগের লোক ছোটেনি। যে বাণী ঈশ্বরের কাছ থেকে নেবে এসেছে বা নাজেল হয়েছে, অথবা ঈশ্বরকে জেনেছেন যিনি এবং তাঁর যা পাওয়ার পেয়ে গেছেন, এমন পুরুষের বাক্যই সত্য নির্ণয়ে তার পাথেয় ছিল। অজ্ঞানের সমুদ্রে সেই বাক্যই ছিল তার কাছে জীবনতরী চালনায় ধ্রুবতারার সংকেত। সে হৃদয়ের প্রেরণা তাকে বুঝিয়ে দিয়েছিল ঈশ্বর অনন্তকল্যাণের আধার। কাজেই তাঁর জগতে অশুভ বুদ্ধির কাছে শুভবুদ্ধি পরাভূত হতে পারে না। "যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ" —"যেখানে ধর্ম বা সৎবুদ্ধি সেখানে জয় আর যেখানে অসৎবুদ্ধি সেখানে পরাজয়"। এটাই ছিল তার দৃঢ় ধারণা।

এ তত্ত্ব বোঝাবার জন্যেই দেবাসুর সংগ্রামের রোমাঞ্চকর কাহিনীর সৃষ্টি। যাতে অশুভ বা অসুরশক্তি পরিণামে শুভ বা দেবশক্তির কাছে পরাভূত। ইহুদী শাস্ত্রে বর্ণিত প্রচণ্ড প্লাবনবন্যায় অসাধুদের সমূলে বিনাশ ও নোয়ার আর্কে ভাবী শুভসৃষ্টির বীজ সংরক্ষণ, ঈশ্বরের ইচ্ছায় ব্যভিচারীদের ওপর জলন্ত অঙ্গার বর্ষণ ও তাদের সামগ্রিক ধ্বংস প্রভৃতি আখ্যায়িকার মূলে এই একই প্রেরণা। আজকের দিনের মানুষের কাছে সে-সব কাহিনী কল্পনা। কারণ, শুভবুদ্ধির অপরাজেয়তায় মানুষের সে বিশ্বাস আজ নেই। এই প্রাচীন নীতিপ্রবণ আধ্যাত্মিক সাহিত্যেরই নাম পুরাণ। অসংখ্য উপদেশাত্মক ও অনুপ্রেরণামূলক আখ্যায়িকার সাহায্যে পুরাণে ধর্মের গৌরব ও নীতিবোধের মাহাত্ম্য নানাভাবে প্রচারিত হয়েছে।

কালক্রমে বুদ্ধির সঙ্গে পূর্ণ অসহযোগের ফলে হৃদয়ের বাণীর বিকৃতি ঘটল, এবং স্বার্থান্বেষীদের হাতে স্বাধীন চিন্তার নিপীড়ন চলল দীর্ঘকাল ধরে। অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই মানুষ শেষে হৃদয়ের আবেদন ও আকুতিকে অবজ্ঞা ও উপেক্ষা করে স্বাধীন চিন্তার সাহায্যে জীবন-দর্শনের ইমারৎ গড়ে তুলতে আরম্ভ করল। কিন্তু এ ইমারৎ বেশী দিন স্থায়ী হ'ল না। কারণ, এই বুদ্ধিবাদ মূলত ধ্যাননিষ্ঠ এবং কর্মবিমুখ ছিল। চঞ্চলের পশ্চাতে অচঞ্চল, অনিত্যের পশ্চাতে নিত্য, ক্ষণিকের পশ্চাতে শাশ্বত সত্যের সন্ধানই এর লক্ষ্য ছিল। যান্ত্রিক সভ্যতার চাপে মানুষ এই ধ্যাননিষ্ঠা গেল ভুলে আর তার দার্শনিক চিন্তাও গতিপ্রবণতা এবং কর্মচঞ্চলতায় হ'ল চিহ্নিত।

সতেরো শতক থেকেই এই বুদ্ধিপ্রধান দার্শনিক চিন্তাধারার বিশেষ প্রচার। উনিশ শতকের শেষ দিক থেকেই এই বুদ্ধিবাদে ভাঙ্গন দেখা দিল। যার জন্যে আজকের দিনের দর্শন গতিবাদের প্রশস্তিতে মুখর। ক্রিয়াশীলতাই আজকের দিনের জীবন-দর্শনের মুখ্য উপাদান, ভাবালুতার স্থান তাতে খুবই নগণ্য।

আজ যদি এরিষ্টটলের দর্শনের কাঠামোতে ঢালাই করা শুধু জ্ঞানের জন্যে জ্ঞান আহরণে আস্থাবান কর্মবিমুখ চোখবুঁজে-চলা ভাবুক দার্শনিক আমাদের কাছে হাজির হন, তবে বাস্তব জীবনে তার পরিণাম কি হবে তা সহজেই অনুমেয়। আমার অজ্ঞাতসারে আমি নিজেকে হয়তো সে কাঠামোতে ঢালাই করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু অবস্থার তাগিদে হঠাৎ চোখ মেলে দেখি কর্মদানব বিকট দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। অনেক অনুনয়-বিনয়ের পর আমার বিশাল দেহের প্রায় সবটুকুই সে উদরস্থ করে নিল, শুধু মস্তক অবশিষ্ট রাখল, যাতে আমি দার্শনিকের কল্পনা-বিমানে ইচ্ছামত উড়ে বেড়াতে পারি। সে আপোষের ফলেই আমার এ অদ্ভুত কিম্ভুতকিমাকার অবস্থা। দার্শনিকের বহুবাঞ্ছিত স্বর্গের স্পর্শও পেলাম না আর অহেতুক কর্মব্যস্ততাকেও তথাকথিত কৃতকার্যতায় উজ্জ্বল ও ভাস্বর করতে পারলাম না। যাইহোক, সে ভণিতা বাদ দিয়ে একথা বলা চলে, আজকের দিনের দর্শনকে যাঁরা নিছক বুদ্ধিবাদী মনে করেন, তাঁরা আধুনিক বুদ্ধিবাদের মুখোশের পেছনে যে কর্মতৎপর অন্তরাত্মা রয়েছে তার সন্ধান পাননি।

এইভাবে দার্শনিক চিন্তার চাকা পরিবেশের প্রয়োজনে ও তাগিদে অনবরত ঘুরে চলেছে। নিকট অতীতে হৃদয়কে বাদ দিয়ে মানুষ ছুটেছিল বুদ্ধির পেছনে, আর আজ বুদ্ধিকে সামনে শিখণ্ডি দাঁড় করিয়ে সে চলেছে কর্মব্যস্ততার সীমাহীন পথে। তাই হৃদয়হীন, অনুরাগ বর্জিত জটিল কর্মব্যস্ততাই আজকের দিনের মানুষের সবচেয়ে বড় সমস্যা।

যে সমন্বয়-দর্শন আমি সারা জীবন খুঁজে বেড়াচ্ছি—মানুষের সার্বিক কল্যাণের জন্যে যার প্রয়োজন অপরিমিত, তাকে পেতে হলে সমস্ত অন্তঃকরণ দিয়ে তাকে গ্রহণ করার জন্যে উন্মুখ হতে হবে। ইহুদীদের ঈশ্বর তাদের আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন, "তারা যেন শুধু তাঁকেই ভালবাসে, কারণ অন্য কারো প্রতি আসক্তি ভগবান বরদাস্ত করেন না"। সমন্বয়-দর্শনের সম্বন্ধেও এ উক্তি হয়তো প্রযোজ্য। বুদ্ধি-বর্জিত হৃদয়াবেগের সাহায্যে তাকে আঁকড়ে থাকার চেষ্টায় যথেষ্ট বিপদ, অতি সহজেই সে ভাবালুতায় ভেজাল ঢোকে। মানুষের অতীত ইতিহাসের পাতায় পাতায় তার প্রচুর সাক্ষ্য। আর শুধু বুদ্ধির দ্বারা সে তত্ত্বে পৌঁছবার তো উপায়ই নেই। যে বুদ্ধির সঙ্গে হৃদয়ের অনুভূতির যোগ নেই, প্রাত্যহিক জীবনে যার প্রমাণ পাওয়া যায় না, সে বুদ্ধির মার-প্যাঁচ মানুষের জীবন-যাত্রাকে কখনও সফল করতে পারে না, আর তত্ত্ব নির্ণয়েও অন্ধের মতো অন্ধকারে হাতড়ে বেড়ায়। হৃদয়হীন কর্মতৎপরতার কথা আগেই বলেছি। কাজেই সমগ্র অন্তর দিয়ে, হৃদয়ের সমস্ত অনুরাগ দিয়ে, বুদ্ধি ও ইচ্ছাশক্তির

সহযোগে তত্ত্বকে জানবার চেষ্টা করতে হবে। এবং তারই ভিত্তিতে গড়ে তুলতে হবে পূর্ণ জীবন-দর্শন।

মানুষ যে হৃদয়ের আবেদন অবজ্ঞা করে বুদ্ধির দিকে ঝুঁকেছিল তার নিশ্চয়ই কতকগুলো কারণ আছে। তার কথা কিছু কিছু আগেই বলেছি। এক বড় মনীষীর লেখায় পড়েছিলাম: অতীন্দ্রিয় অনুভূতির নাম করে কত যে শঠ-প্রবঞ্চক ব্যবসায় জুড়ে দিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। তবুও যে অনুভূতির দাবীতে ভণ্ড ব্যবসায়ীদের এই প্রসার-প্রতিপত্তি তার মূলে নিশ্চয়ই কিছু সত্য আছে। ধর্মের নামে সহজ সরল জনসাধারণকে ঠকাবার যত কৌশল আবিষ্কৃত হয়েছে তা যে মানুষের এই হৃদয়ের আবেদনেরই অপব্যবহার, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

সমস্ত ঐতিহাসিক ধর্মের মূল কথা প্রেম। ধর্মের যাঁরা আদি প্রচারক তাঁদের হৃদয়ের এক গভীর অনুভূতিই এই প্রেমের অফুরন্ত প্রেরণার উৎস। পরবর্তীকালে ধর্মসম্প্রদায়ে বাহ্য আচার-আচরণই এই অনুভূতির স্থান অধিকার করে ফেলে ও অনেক ধর্মপ্রচারক ক্ষমতা বজায় রাখা ও দলবৃদ্ধির জন্যে ধর্মের দোহাই দিয়ে অনেক নিষ্ঠুর কাজ করতেও বিশেষ সংকোচ বোধ করেননি; তাঁরা ধর্মের নামে পুঞ্জীভূত কুসংস্কার মানুষের ওপর চাপিয়ে দিয়েছেন। আবার নিজের ধর্মের লোক পাপ কাজ করেও অতি সহজে পরলোকে অনন্ত স্বর্গের অধিকারী হতে পারবে এ রসাল কথা নানাভাবে তাঁরা প্রচার করেছেন। একথা যে ধর্মের মূলনীতির সম্পূর্ণ বিপরীত তা বলাই বাহুল্য। আবার সব ধর্মের মূলতত্ত্ব যে এক, ধর্মের যাঁরা প্রথম প্রচারক তাঁরা সকলেই একথা স্বীকার করেছেন। তবুও আমার ধর্ম বড়, না তোমার ধর্ম বড় এটা প্রমাণ করার জন্যে কত যুদ্ধ-বিগ্রহ, কত হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে ইতিহাসে তার নিদর্শন যথেষ্ট। ইংরেজী লজিকে একেই বলে আর্গুমেণ্টাম এড বেকুলাম অর্থাৎ গদাপর্ব। যদিও ধর্মের সামাজিক লক্ষ্য সমস্ত মানুষের মধ্যে এক সার্বজনীন, সার্বভৌম আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা জাগিয়ে তাদের ভেতর সংহতি স্থাপন তবুও ধর্মের নামে শ্রেণী-সংঘর্ষকেও কঠিন করে তোলার চেষ্টা খুব কম হয়নি। নানা অজুহাত, অনু-শাসনের অচলায়তন গড়ে তুলে শুধু নিজের ধর্মগোষ্ঠী ও অন্য ধর্মগোষ্ঠীর ভেতর গভীর ব্যবধান সৃষ্টি করা হয়নি, কখনো কখনো আবার এই একই অজুহাতে নানা বিভেদ সৃষ্টি করে একই ধর্মগোষ্ঠীকে নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। কোথাও কোথাও ধর্মের নামে শুধু ভাবের জগতে নয়, বাইরের জগতেও মানুষ হয়ে গেছে মানুষের অস্পৃশ্য। আবার মানুষের স্বাধীন চিন্তাকে অবজ্ঞা করে, শুধু পরলোকের প্রলোভন দেখিয়ে ধর্মের নামে তাকে দুর্বল করা হয়েছে। নিজের স্বাধীন ইচ্ছাকে প্রত্যা-খ্যান করে জীবনের যাত্রাপথে অদৃষ্টের কাছে আত্মসমর্পণে অভ্যস্ত হবার শিক্ষাই

সে পেয়েছে। তাই কোনও আসন্ন বিপদে অন্যের সাহায্য না পেলে আকাশের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকাই তার স্বভাব হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রায় সব দেশে ও সব ধর্মেই এ সমস্ত প্রচারকার্য যাঁরা চালাতেন তাঁদের নিজেদের একটা দল গড়ে উঠেছিল। অনেক ক্ষেত্রে অন্যের হাড়ভাঙা পরিশ্রমের বিনিময়ে সহজে স্বচ্ছন্দে নিজেদের গ্রাসাচ্ছাদনের একটা ব্যবস্থা তাঁরা করে নিয়েছিলেন। তথাকথিত ধর্মের এই ব্যবসায়ে মুনাফাও ছিল প্রচুর। আজও যে একেবারে নেই তা বলা যায় না। ধর্মের এই অপব্যবহার এবং বিকৃত ব্যাখ্যার ফলেই আধুনিক বৈজ্ঞানিক সভ্যতার অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীন চিন্তার দাবীতে বুদ্ধিবাদ মাথা তুলেছিল। যাই হোক আগেই বলেছি, সতেরো শতকে যদিও বুদ্ধিবাদের গোড়াপত্তন তবুও উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকেই তার প্রায় নির্বাসনের সূচনা। আজকের দিনের মানুষের চিন্তায় স্বাধীন যুক্তির বিশেষ কিছু মূল্য নেই, মূল্য আছে সেই সত্যের, যাকে ব্যবহার করে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের তাগিদ মেটানো যায়। দর্শনে যাকে আমরা নির্জলা বুদ্ধিবাদ বলি তা দু'শ' বছরের বেশী আপন প্রতিষ্ঠা বজায় রাখতে পারেনি। কিন্তু হৃদয়ের বাণীকে অবলম্বন করে যে ধর্মবিশ্বাস সাধারণ মানুষের কাছে প্রচারিত হয়েছিল নানা অপব্যবহার সত্ত্বেও তাতে মানুষের বিশ্বাস শতকের পর শতক অটুট ছিল। একমাত্র ইউরোপীয় চার্চের আলোচনায় জানা যায়, হাজার বছরেরও অনেক বেশী এ বিশ্বাসবাদ ইউরোপীয় জীবনে বিপ্লব সাধন করেছে। এ থেকেই বোঝা যায়, নিছক বুদ্ধির বাণী তা যতই নিরপেক্ষ হোক না, হৃদয়ের আবেদনের কাছে দাঁড়াতে পারে না। হৃদয়ের উৎফুল্ল আবেগ যখন বন্ধনহারা স্রোতস্বতীর মত উচ্ছলবেগে গন্তব্য পথে অগ্রসর হয় তখন যুক্তির ছোট ছোট বাঁধ তার গতিপথ সংযত করতে পারে না। ভাবরাজ্যে, বুদ্ধি হৃদয়ের কাছে সূর্যের সামনে জোনাকী পোকার মতই নিষ্প্রভ।

আজ আবার সম্ভবত মানুষ সেই হৃদয়ের বাণীর দিকেই ঝুঁকে পড়ছে। কারণ, আজকের দিনের বিজ্ঞান, রাজনীতি, সমাজনীতি, সংস্কৃতি, সবই মানুষের জীবনকে জটিলই করে তুলেছে। তাকে সত্যিকার শান্তির ও সুখের সন্ধান দিতে পারেনি। বিজ্ঞানের অপূর্ব প্রাচুর্যের ভিতরও তাই সামাজিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জীবনে ব্যাপক অশান্তি এবং বিশৃঙ্খলা। তার মধ্যে আবার বিজ্ঞানের কৃপায় ইস্রাফীলের প্রলয়ের শিঙা বাজার সম্ভাবনা অত্যন্ত নিকট বলে মনে হচ্ছে। এই বিষম সংকট থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্যে আজকের দিনের মানুষ দিশাহারা হয়ে অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াচ্ছে।

তবে অত্যন্ত আশার কথা, এই ক্রিয়ানিষ্ঠ বুদ্ধিবাদের জোরালো আবহাওয়ার মধ্যেও কেউ কেউ হৃদয়ের বাণীতে আলোকের সংকেত পাচ্ছেন। আজকের দিনের দার্শনিকদের মধ্যে ফরাসী মনীষী বের্গসোঁ হচ্ছেন এই বাণীর একজন বড় সমর্থক। মানুষের সহজবুদ্ধি বস্তুর স্বরূপ প্রচ্ছন্ন রেখে তাকে ভুল পথে নিয়ে যাচ্ছে। এ ভুল থেকে অব্যাহতি পেতে হলে, হৃদয়ের অনুভূতি ও প্রেমের দ্বারা বস্তুর সঙ্গে এক হয়ে তাকে জানতে হবে। তা-ই হল ঠিক ঠিক জানা। তা-তেই আমাদের কর্মপ্রধান সভ্যতা সফল এবং সার্থক হবে। এটাই বের্গসোঁর দর্শনের সবচেয়ে বড় কথা।

অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয়, যদিও আজকের দিনের তথাকথিত বুদ্ধিবাদী দার্শনিকরা বলে থাকেন যে, দর্শনের কাজ মানুষের অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ তবুও টম, ডিক, হ্যারী, যদু, মধু, আবদুল, গফুর প্রভৃতি সাধারণ মানুষের অনুভূতি ও আজকের দিনের বৈজ্ঞানিকদের থিয়োরী বিশ্লেষণ ক'রেই তাঁরা মনে করেন, তাঁদের অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণের কাজ শেষ হয়ে গেছে। সাধারণ মানুষের অনুভূতির মূল্য নিশ্চয়ই আছে। উচ্চ আধ্যাত্মিক অনুভূতির ওপর জোর দিতে গিয়ে সাধারণ মানুষের অনুভূতিকে উড়িয়ে দেয়া কোন অবস্থাতেই বাঞ্ছনীয় নয়। সাধারণ মানুষের জীবন-দর্শন তার অনুভূতিকে একেবারে বাদ দিয়ে বের করা যায় না। সে অনুভূতির সঙ্গে তার প্রয়োজনের যোগ অত্যন্ত নিবিড়। তত্ত্ব-নির্ণয়ে বিজ্ঞানের থিয়োরীর মূল্যও অপরিসীম। আমাদের সভ্যতা মুখ্যত বৈজ্ঞানিক। তাই আমাদের মনোবৃত্তিও বৈজ্ঞানিক। অতএব আজকের দিনে বিজ্ঞানের ভিত্তিতে আমাদের জীবন-দর্শন গড়ে তোলা প্রয়োজন।

কিন্তু অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি বিশ্লেষণই যদি বুদ্ধিবাদী দর্শনের আসল কাজ হয়, তবে জগতের ধর্মাচার্যেরা ও আধ্যাত্মিক মনীষাসম্পন্ন বহু ব্যক্তি যে সত্য তাঁদের অন্তরতম সত্তায় অনুভব করেছেন তাকে অবজ্ঞা করা কোনমতেই যুক্তি-পূর্ণ নয়। উপনিষদের ঋষিরা তাঁদের অন্তরের গভীরে একত্বের সন্ধান পেয়ে প্রভাতের সুশ্রী, সুন্দর বাল-সূর্যের দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করে গভীর আবেগে বলেছিলেন :

"হিরন্ময়েণ পাত্রেন সত্যস্যাপিহিতং মুখং।
তৎ ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে॥
... ...
যৎ তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি
যোসাবসৌ পুরুষঃ সোহমস্মি"॥

"হে সূর্য, তোমার সুবর্ণময় আচ্ছাদন সরিয়ে নাও এবং তার পশ্চাতে যে সত্য, তাকে আমার কাছে প্রকাশ কর। আর তোমার কাছে আমি কোন করুণা ভিক্ষা করছি না, কারণ তোমার পেছনে যে সর্বব্যাপী বিশ্বচৈতন্য রয়েছেন আমি আর তিনি ভিন্ন নই, আমরা এক।"

এই অনুভূতি কি অনুভূতি নয়? রাজকুমার সিদ্ধার্থ রাজ্যসুখভোগে জলাঞ্জলি দিয়ে ছয় বৎসর কঠোর তপস্যার পর বোধিদ্রুমতলে পূর্ণিমার চন্দ্রালোকে জন্ম-মৃত্যুর রহস্য অবগত হয়ে নির্বাণের যে অমৃতরসের আস্বাদন পেয়েছিলেন সেটা কি প্রকৃতপক্ষে কোন অনুভূতি নয়? হজরত ঈশা যে মানুষের প্রেমে আত্মহারা হয়ে তাদের পাপ প্রশমনের জন্যে শান্তভাবে ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন এটাও কি একটা বড় ঐতিহাসিক অনুভূতি নয়? ধ্যানের প্রশান্ত মুহূর্তে হেরা পর্বতের গুহায় আরব দুলাল হজরত মোহম্মদ এই একই তত্ত্বের সন্ধান পেয়ে কিভাবে নির্ভয়ে, অবিচলিত বিশ্বাসে সে সত্যের প্রচার করেছিলেন, সে তথ্য ইতিহাসের এক অবিস্মরণীয় অধ্যায় হয়ে রয়েছে। এ সমস্তই অতি বড় অনুভূতি। দর্শনে এরও বিশ্লেষণ প্রয়োজন, অতি প্রয়োজন সন্দেহ নেই।

সংস্কৃতে একটি কথা আছে, "ফলেন পরিচিয়তে"। এটা আমগাছ, কাঁঠাল গাছ, না ভেরেণ্ডা গাছ, তা শুধু থিয়োরী আউড়ে স্থির করা যায় না, গাছের ফল চোখে দেখে ও খেয়ে স্থির করতে হয়। টম-ডিক-হ্যারী, যদু-মধু-আবদুল-গফুরের অনুভূতি বড় না বৈজ্ঞানিকদের থিয়োরী বড় সেটা ফল দেখেই ঠিক করা উচিত এবং বাস্তবক্ষেত্রে ঠিক করাও হয়েছে। বিজ্ঞানের থিয়োরীর দৌলতে দুনিয়ার চেহারা বদলে গেছে। মানুষ আকাশে উড়তে শিখেছে, জলে সাঁতার দিতে শিখেছে। তবুও এর চেয়েও বড় অনুভূতির মানুষের জীবনে আজ প্রয়োজন। এবং তা ছাড়া অন্তত এই বৈজ্ঞানিক যুগে মানুষ পৃথিবীতে মানুষের মতো সুখে-শান্তিতে বাস করতে পারবে না। সে অনুভূতির, সে হৃদয়ের বাণীর নামই একত্ব-প্রতীতি, বোধি ও প্রজ্ঞা—যা অনাবিল বিশ্বপ্রেমের অফুরন্ত উৎস। আঙ্গুর টক বলে আজকের দিনের যুক্তিবাদীরা যদি এর স্পর্শ সহ্য করতে না চান, তবে মানুষের ভবিষ্যৎ হবে ভয়াবহ এবং ভয়ঙ্কর। শুধু বুদ্ধিবাদ ও গতিবাদী কর্মপ্রবণতা, মানুষের জীবনের তাগিদ আজ আর মেটাতে সক্ষম নয়। সেজন্যে চাই একত্বানুভূতিতে, এই প্রেমের নীতিতে বিশ্বাস। আজকের দিনে যুক্তিবাদ ও কর্মবাদকে, এই বিশ্বাসবাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে মানুষের বৃহত্তর জীবনে সমঝোতা, শৃঙ্খলা ও শান্তি আনতে হবে।

কেউ কেউ হয়ত বিজ্ঞের মত বলবেন যে, ধোঁয়াটে একত্বানুভূতি তো দু' একজনেরই হয়ে থাকে, তার সাহায্যে আবার মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের সমস্যার সমাধান কি করে সম্ভব? এর উত্তর ইতিহাসে প্রচুর। শুধু ধর্মের ক্ষেত্রে নয় বড় বড় বিপ্লবের বেলায়ও অনেক সময়ই দেখা যায়, ভাবের আদিম উৎস একজন বা অতি অল্পসংখ্যক লোক। আসল কথা হচ্ছে, এই তত্ত্বে বিশ্বাস চাই, সেই পুরনো বিশ্বাস যদি এই বৈজ্ঞানিক যুগে আমরা খানিকটা ফিরিয়ে আনতে পারি, তবে আমাদের জীবন-ধারায় যে ভাঙনের সুর প্রকট, সেটা থেমে গিয়ে মানুষের মিলনের রাগিনী আবার আমাদের কানে বেজে উঠবে।

আর সত্যি যে আমাদের বুদ্ধির মৌলিক দাবীর সঙ্গে এই হৃদয়ের বাণীর, একত্ববোধের একটা সংঘর্ষ রয়েছে তা-ও মনে হয় না। আমরা সাধারণত যাকে বিচারবুদ্ধি বলি তার প্রধান কাজ হচ্ছে আমাদের সহজ অভিজ্ঞতার মধ্যে কোন ভুল-ভ্রান্তি আছে কি-না তা একটু যাচাই করে দেখা। বড় বড় দার্শনিকরা আবহমান কাল থেকে দেখিয়ে এসেছেন: আমরা যে দুনিয়ায় চলাফেরা করি যেখানে আমাদের জীবনের সব বেচাকেনা, যুক্তির বিশ্লেষণে তার মধ্যে প্রচুর অসঙ্গতি খুঁজে পাওয়া যায়। যে পরিবর্তনপ্রবাহ নিয়ে আমাদের জীবন, তাদের অনেকের মতে তা সোনার পাথরের বাটীর মতই একটি স্ব-বিরুদ্ধ বস্তু। আমরা সব সময়ই বলি: বস্তু চলে যায়, কিন্তু চলে যাওয়া জিনিসটা যে কী তা আমরা সাধারণত বিশেষ তলিয়ে দেখি না। চলার স্বরূপ বিশ্লেষণ করে বৌদ্ধ দার্শনিকরা বলেছেন শুধু চলে যাওয়াই আছে, তার পেছনে স্থির অচল কিছু নেই। বৌদ্ধ সাহিত্যে ভিক্ষু নাগসেন ও গ্রীক রাজা মিলিন্দারের ভেতর যে অতি প্রসিদ্ধ ও মনোরম কথোপকথন দেখা যায় তাতে চলে যাওয়ার স্বরূপ এভাবেই নিরূপণ করা হয়েছে। অথচ চলে যায় এমন কিছু না থাকলে "চলা" কথার কোন অর্থই হয় না।

এই একটি উদাহরণ দিয়েই দেখিয়ে দেয়া যায় আমাদের সহজাত অভিজ্ঞতার জগতের আনাচে-কানাচে কত পরস্পরবিরোধী সত্য রয়েছে। অবশ্য এতে আমাদের কর্মজীবনে কোন অসুবিধে সৃষ্টি হয় না। যাই হোক, জগতে স্ববিরোধী ধর্ম আছে কিনা সেটা বের করা আমাদের লক্ষ্য নয়। আমরা চাই আমাদের জীবন-দর্শনের দ্বারা জগতকে সুন্দর ও সুঠাম করে গড়ে তুলে ভূ-স্বর্গ তৈরী করতে। এটাই হল প্রয়োজনবাদীদের মূল বক্তব্য। বুদ্ধিবাদের পক্ষ থেকে বলা যেতে পারে, আর বার বার বলাও হয়েছে, যুক্তির সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে বিশ্বজগতে যে সব পরস্পরবিরোধী ধর্ম ধরা পড়ে তার মূল কারণ বিশ্বের গতিশীলতা ও

বহুত্ব। যেখানেই বহু, যেখানেই চাঞ্চল্য সেখানেই বিরোধ, সেখানেই দ্বন্দ্ব। এ বিশ্লেষণ থেকেই পরোক্ষভাবে জানা যায় যে, জগতের বাইরে যদি কোন গতি-রহিত, স্থির, শাশ্বত একক সত্য থাকে তবে তা-হবে সর্বতোভাবে বিরুদ্ধ ধর্ম-বর্জিত। বিরোধের বীজ বহুত্ব ও চাঞ্চল্য যেখানে নেই, সেখানে আছে শুধু একত্ব, স্থৈর্য ও প্রশান্তি। এটাই হ'ল বুদ্ধির চরম লক্ষ্য, কারণ এখানেই সমস্ত বিরোধের, সমস্ত দ্বন্দ্বের সমাধান ও পরিসমাপ্তি। অতএব বুদ্ধির যা শেষ লক্ষ্য, যাকে বুদ্ধি অনেক কসরৎ করেও পায় না, কখনও পেতেও পারে না, সে তত্ত্বই প্রকাশিত হয় অধ্যাত্ম-অনুভূতিতে। বুদ্ধি ও হৃদয়ের, বিচার ও অনুভূতির এই মহামিলনই মানুষের আজ পরম কাম্য।

তাই বলা চলে, মানুষের মুক্তির মন্ত্র তার অব্যর্থ অমোঘ জীবন দর্শনের সন্ধান ও সংকেত তখনই পাওয়া যাবে, যখন শুদ্ধ ও সুসংস্কৃত বুদ্ধির দাবীকে আমাদের হৃদয়ের গভীর অনুভূতি মিটিয়ে দেবে। আর সে অনুভূতি অভিব্যক্ত হবে কর্মজীবনে প্রেম ও শান্তির ভিত্তিতে, মানব-সমাজের ভবিষ্যৎ গঠনের নিরলস চেষ্টায়। কর্ম, জ্ঞান ও প্রেম এই ত্রি-ধারার সম্মেলনেই সফল, সার্থক ও কল্যাণের অফুরন্ত প্রেরণাদায়ক জীবন-দর্শনের সৃষ্টি ও রূপায়ণ সম্ভব।

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি
ও
মানব-সমাজের ভবিষ্যৎ

আমার জীবন-দর্শন সম্বন্ধে সাধারণভাবে বলা এখানেই শেষ। তবে মানুষের বৃহত্তর জীবনের সঙ্গে তার যে যোগের ইঙ্গিত আগে করেছি, সে বিষয়ে বিশদ আলোচনা করতে গেলে ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়, আন্তর্জাতিক রাজনীতির গোলকধাঁধায় একবার ঢুকতেই হবে। যে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির সঙ্গে সারা জগতের সাধারণ মানুষের স্বার্থ অতি নিকট সম্বন্ধে জড়িত, মানবনীতির একজন নগণ্য সমর্থক হিসেবে আমারও হয়তো সে সম্বন্ধে কিছু বলার থাকতে পারে। আমার জীবন-দর্শন নিছক তত্ত্বজিজ্ঞাসা নয়, কল্যাণ জিজ্ঞাসায় তার আরম্ভ এবং কল্যাণ সাধনেই তার শেষ। তাই আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির আলোচনা এখানে একেবারে মুলতুবী রাখা অসম্ভব।

নির্জলা রাজনীতির দিক থেকে এ আলোচনা করতে গেলে আমার অবস্থা হয়তো পঞ্চতন্ত্রের কীলোৎপাটী বানরের মতই হবে। করাত দিয়ে কাঠের

খানিকটা চিরে মিস্ত্রীরা তাতে খিল পুরে রেখে দিয়েছিল, (সংস্কৃতে খিলের নাম কীল)। পরে এসে এই খিল খুলে বাকীটুকু চিরবে। কোথা থেকে এক বানর এসে সেই কাঠের উপর বসলো ও সে খিলের সাথে লেজ জড়িয়ে, দিল জোরে টান। তার লেজ চেরা কাঠের ফাঁকে আটকে গেল অমনি। পরিণাম কি হল বলাই বাহুল্য। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে মানুষের বেশ খানিকটা কল্যাণ নিশ্চয়ই হয়েছে। যেটুকু খিল তাতে ধরেছে তা ধুরন্ধর রাজনীতিকরাই আস্তে আস্তে বের করে নিতে পারবেন। সে পথে তাঁরা হয়তো আস্তে আস্তে এগোচ্ছেনও। তবে এগোতে এগোতে তাঁরা যে আবার পেছিয়েও পড়েন এটাই যা আতংকের ও আশংকার কথা। আন্তর্জাতিক আকাশে আশার আলো বিদ্যুৎ চমকানোর মত জ্বলছে আর নিভছে। আলো জ্বলার পেছনেই আবার থাকে দুর্যোগের আভাস, এই যা দুঃখ। এই অনিশ্চয়তা দূর করতে হলে মানব-সমাজের ভবিষ্যৎ শুধুমাত্র দু'চারজন বিশিষ্ট লোকের হাতে ফেলে রাখলে চলবে না। যে জীবন-দর্শনের ভিত্তিতে মানুষের ভবিষ্যৎ গড়ে উঠবে তার পেছনে থাকা চাই অগণিত জনগণের সমর্থন। তাই যে জীবন-দর্শন থেকে সব মানুষের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার প্রেরণা পাওয়া সম্ভব তার দিকেই সকলের সজাগ দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে।

মানুষের আজ সবচেয়ে বড় প্রয়োজন ঐক্য ও সংহতি। মাত্র কয়েক বছর আগে আণবিক শক্তি আবিষ্কারের পূর্বে সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল শ্রেণী-সংঘর্ষের সুষ্ঠু সমাধান। সে সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে তখন রাজনৈতিক মতবিরোধ দেখা দিয়েছিল। কিন্তু আজ মানুষের সমস্যা এক ভিন্ন আকার নিয়েছে। বড় বড় বৈজ্ঞানিক বলছেন: আণবিক শক্তি যদি উৎপাদন কার্যে ব্যবহৃত হয় তবে অদূর ভবিষ্যতে জগৎ থেকে দারিদ্র্য ঘুচে যাবে। এশিয়া ও আফ্রিকার অনুন্নত জাতিসমূহ আজ স্বাধীনতা পেয়েছে বা পেতে চলেছে, সে স্বাধীনতা তখনই সফল ও সার্থক হবে যখন অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করে তারা তাদের অগণিত জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে সমর্থ হবে। আজও কেউ কেউ সাদার জন্যে একটা সুন্দর চকচকে জগৎ ও কালোর জন্যে একটা কুৎসিৎ কুচকুচে জগৎ তৈরী করে রাখার পক্ষপাতী। তবে এ পণ্ডশ্রম যাঁরা করছেন তাঁদের সংখ্যা খুব বেশী নয়, এটাই আশার কথা। দুনিয়ার সব দেশের সব মানুষেরই ভালভাবে বেঁচে থাকার অধিকার আছে। সে অধিকার ক্ষুণ্ণ হলে যে অশান্তি লেগেই থাকবে একথা আজ সারা জগতের সহৃদয় চিন্তাশীল মনীষীরা বেশ বুঝতে পেরেছেন। এ অবস্থায় আণবিক শক্তির সাহায্যে দুনিয়ার চেহারা শীঘ্রই বদলে দেয়া যেতে পারে, যদি সে চেষ্টার পেছনে সৎবুদ্ধি ও সদিচ্ছা থাকে।

দারিদ্র্য দূর হয়ে গেলে অনেকটা স্বাভাবিকভাবেই অগণিত জনগণের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হবে ও শ্রেণীসংঘর্ষও কমে যাবে এ আশা করা অমূলক ও অহেতুক নয়। শুধু নীতিশাস্ত্রের অতি পরিচিত বুলি আওড়ানোর জন্যেই সংবুদ্ধি ও সদিচ্ছার কথা বলছি না; সংঘর্ষের ভার মানুষের মন থেকে যতটা সম্ভব দূর করা আজ তার বেঁচে থাকার জন্যেই অপরিহার্য প্রয়োজন।

আণবিক যুদ্ধের সম্ভাবনা দূর করাই আজ সবচেয়ে বড় প্রয়োজন। তাই আন্তর্জাতিক স্তরে সমঝোতার এত চেষ্টা। একদিন ছিল, যখন যুদ্ধে একজনের জয় আর একজনের পরাজয় হত। সে কানুন আজ উল্টে গেছে। আণবিক যুদ্ধের সম্ভাব্য ফল উভয় দলের পরাজয় ও বিনাশ। এমনকি তার ফলে সব মানুষেরই বিনাশও অসম্ভব নয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কিছু পরে ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কিছু আগে পদার্থবিজ্ঞানী আইনস্টাইন ও মনোবিজ্ঞানী ফ্রয়েডের ভিতর, যুদ্ধের ভয়াবহ ফল সম্বন্ধে সজাগ ও সচেতন হয়ে মানুষ কি করে যুদ্ধ একেবারে বন্ধ করে দিতে পারে, এই বিষয়ে এক পত্রবিনিময় হয়। তাঁরা দু'জনেই বর্তমান যুগের অতি বড় মনীষী। তাঁরা দুজনেই শান্তিকামী, শান্তিবাদী অর্থাৎ তাঁদের দু'জনেরই যুদ্ধবিরোধী মনোভাব। আইনস্টাইন খুব আবেগভরে ফ্রয়েডের কাছে লিখেছেন যে, ফ্রয়েড তাঁর মনস্তাত্ত্বিক গবেষণার আলোকে মানুষের অন্তর থেকে ঘৃণা ও জিঘাংসা-প্রবৃত্তি মুছে দেবার কোন উপায় আবিষ্কার করতে পেরেছেন কিনা। আইনস্টাইন বলেছেন যে জাতীয়তার সাফাই গাওয়ার প্রবৃত্তি তাঁর মোটেই নেই। তিনি চান দুনিয়ার ভিন্ন ভিন্ন জাতি একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠন করে তুলুক যার কাজ হবে জাতিতে জাতিতে, দেশে দেশে যে সব বিবাদ-বিসংবাদের সম্ভাবনা, শান্তিপূর্ণভাবে তার মীমাংসা করা। তিনি বড়ই দুঃখ করে বলেছেন: যারা শিক্ষিত লোক তারাও অতি সহজেই এই ঘৃণা ও অহিংসার প্রবৃত্তি চরিতার্থ করতে কুণ্ঠিত হয় না। বরং স্বার্থের খাতিরে, বিবেক-দংশনের কোন জ্বালা অনুভব না করেই তারা অগণিত অশিক্ষিত জনগণকে ঘৃণা ও হিংসার প্ররোচনা দেয়। যাই হোক,' এই কারণেই হয়তো সৃষ্টির আদিমতম মুহূর্তে মানবের আদিপিতাকে বিধাতাপুরুষ জ্ঞানবৃক্ষের ফল আস্বাদন করতে নিষেধ করেছিলেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর অতি ক্ষণস্থায়ী ও দুর্বল লীগ অব নেশনসের মারফত ফ্রয়েড ও আইনস্টাইনের ভিতর এই ভাবের আদান-প্রদান হয়েছিল। সেদিনের অবস্থায় বিচলিত হয়ে আইনস্টাইন বলেছিলেন; যে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের কথা তিনি ভাবছেন, তার হাতে এমন ক্ষমতা নেই, যার সাহায্যে যারা অকারণে স্বার্থের খাতিরে যুদ্ধ বাধাতে চায় তাদের শায়েস্তা করা সম্ভব। তিনি তাই

নিজেই বলেছেন: জাতীয়তাবোধ-অতিক্রমকারী যে বিশ্বসংস্থার কথা তিনি ভাবছেন তা মানুষের শান্তিসমস্যার খোলস নিয়েই নড়াচড়া করতে পারে। তার একটা নির্ভরযোগ্য সমাধান সে-পথে খুঁজে পাওয়া সত্যই কঠিন। গভীর নৈরাশ্যের ভেতর আলোর সংকেত পাবার আশায়ই ফ্রয়েডের সঙ্গে তাঁর পত্র-বিনিময়।

মনস্তাত্ত্বিক ফ্রয়েড যুদ্ধের পেছনে মানুষের অন্তর্নিহিত এক মারণীপ্রবৃত্তির প্রকাশ দেখতে পেয়েছেন। এই প্রবৃত্তি অন্যকে ধ্বংস করতে চায়। তাতে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে, জাতিতে জাতিতে বাধে সংঘর্ষ। এবং তারা একে অন্যের বিনাশ কামনা করে। মানুষের ভিতরে এর বিরোধী প্রবৃত্তিও একটি আছে, সেটা মানুষে মানুষে মিলন ঘটাতে চায়। প্লেটোর অনুকরণে ফ্রয়েড তার নাম দিয়েছেন ইরস। সংস্কৃতি বা কালচার যত প্রসার লাভ করবে ফ্রয়েড আশা করেন, ততই মানুষ তার বিচারবুদ্ধি বা বিবেকের দ্বারা এই জিঘাংসা-প্রবৃত্তিকে সংযত করবে। যতই দিন যাবে ততই যুদ্ধ আরও ভয়ঙ্কর ও ধ্বংসাত্মক রূপ নেবে। একদিকে কালচারের বৃদ্ধি ও প্রসার, অন্যদিকে যুদ্ধের ব্যাপক ধ্বংসকারী ফলাফল সম্বন্ধে সচেতনতা, মানুষকে আস্তে আস্তে শান্তিকামী করে তুলবে। এবং এই ভাবেই মানুষের ইতিহাসে যুদ্ধ বন্ধ হয়ে যাবে। শান্তিবাদী ফ্রয়েড এই আশাই পোষণ করেছেন।

উনিশ শ' চৌদ্দ সালের পয়লা আগষ্ট প্রথম বিশ্বযুদ্ধের যে তাণ্ডবের সূচনা আর উনিশ শ' আঠারো সালের এগারোই নভেম্বর যার পরিসমাপ্তি, তার ব্যাপক কুফল স্মরণ করেই উনিশ শ' বত্রিশ সালে এই দুই মনীষীর পত্র-বিনিময়। তার প্রায় পঁচিশ বছর পর উনিশ শ' উনচল্লিশ সালের পয়লা সেপ্টেম্বরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের চেয়ে তার প্রচণ্ডতা অনেক বেশী। উনিশ শ' পঁয়তাল্লিশ সালে জার্মেনীর আত্মসমর্পণে তার আংশিক পরিসমাপ্তি ঘটে। তার প্রায় চার মাস পরে নাগাসাকি ও হিরোসিমাতে আণবিক বোমা বর্ষণের পর জাপানের আত্মসমর্পণ ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মারণযজ্ঞের পূর্ণাহুতি। আণবিক শক্তি আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধের ধ্বংসকারী সম্ভাবনা এত বেড়ে গেছে যে, তাতে আইনস্টাইন প্রমুখ বৈজ্ঞানিক এবং আরও অনেক মনীষী মনে করেন, আবার যদি বিশ্বযুদ্ধ বাধে তবে মানব-সমাজ পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে। মানুষের এই সামগ্রিক ধ্বংসের সম্ভাবনায় অত্যন্ত ত্রস্ত ও বিচলিত হয়ে মানবদরদী আইনস্টাইন বলেছেন: তিনি যদি আগে জানতেন যে, আণবিক শক্তির এমন অপব্যবহার হতে পারে তাহলে সে শক্তি আবিষ্কারের চেষ্টা না করে তিনি বরং একটা সামান্য ছুতোর হয়ে থাকতেন। উনিশ শ' উনচল্লিশ সালে ফ্রয়েডের মৃত্যু হয়। কাজেই

দ্বিতীয় যুদ্ধের ধ্বংসতাণ্ডব তিনি দেখেন নি। তবুও ভাবী আশংকা তাঁর সৃজনী মনে যে ভীষণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল, পত্রে তারই অভিব্যক্তি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ই আমেরিকার রিপাব্লিকান পার্টির নেতা প্রসিদ্ধ জননায়ক উইণ্ডেল উইল্কি প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের অনুরোধে সারা দুনিয়া ঘুরে যুদ্ধের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করেন। আমেরিকা থেকে রাশিয়ার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত মধ্যপ্রাচ্য ও চীনে উড়োজাহাজে ঘুরে বেড়াতে উইল্কির মাত্র এক শ' ষাট ঘণ্টা সময় লাগে। বিশ্বযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে মধ্যপ্রাচ্য ও এশিয়ার অনুন্নত দেশগুলোর সংস্পর্শে এসে উইল্কির রাজনীতিক দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ বদলে যায়। এতে আমেরিকার রিপাব্লিকান পার্টির বাইরের জগতের ব্যাপার থেকে সরে দাঁড়ানোর নীতির যথেষ্ট পরিবর্তন হয়। তাঁর অতি জনপ্রিয় গ্রন্থ 'ওয়ান ওয়ার্ল্ড'-এ বিশ্বযুদ্ধের পরিবেশের এই অভিজ্ঞতা উইল্কি অতি সহজ ও সরলভাবে উপন্যাসের মত চিত্তাকর্ষক করে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আজকের দিনের জগতে আবাদের সব সার্থক চিন্তাই সার্বভৌম ও সার্বজনীন হওয়া প্রয়োজন, কারণ সব মানুষের স্বার্থ আজ আসলে এক। রাজনৈতিকের সূক্ষ্ম ক্ষুরধার দৃষ্টির সঙ্গে সংস্কারকের অকপট, অকৃত্রিম অনুরাগ মিশিয়ে উইল্কি বলেছেন: শুধু রাজনৈতিক স্তরে আন্তর্জাতিকতাকে মেনে নিলেই চলবে না। অর্থনীতির স্তরেও তার বুনিয়াদ দৃঢ় করতে হবে। আন্তর্জাতিকতার অর্থনৈতিক কাঠামো যদি দুর্বল হয় তবে তা বালির ভিত্তিতে গড়া প্রাসাদের মতই ধ্বসে পড়বে।

যাই হোক, মনস্তাত্ত্বিক ফ্রয়েড এই আন্তর্জাতিক সম্ভাবনাকে দেখেছেন মনস্তত্ত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে। সংস্কৃতির প্রসারের ভেতরই তিনি দেখতে পেয়েছেন আগামী দিনের শান্তিকামী সভ্যতার ইঙ্গিত। বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইন তাঁর দরদী মন নিয়ে অতিজাতীয়তার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত এক আন্তর্জাতিক সংস্থার মারফত মানুষের ভবিষ্যৎকে দৃঢ় ও উজ্জ্বল করতে চেয়েছেন। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই তার মৃত্যুর কিছুকাল আগে তিনি এক বিশ্বরাষ্ট্রের বার্তা প্রচার করেছেন। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনের সঙ্গে তার নিবিড় পরিচয়ের মাধ্যমে উইল্কি চেয়েছেন, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আন্তর্জাতিকতার সংযোগে আগামী দিনের জগতে শান্তির মিলন-প্রয়াগ সৃষ্টি করতে।

আমি আজীবন দর্শনেরই সেবক, একনিষ্ঠ সেবক বলেও অনেকে আখ্যা দিয়ে থাকেন। সে নিষ্ঠার চাপে দর্শনের পেছনে ছুটতে ছুটতে আমি নিজের ঘর-বাড়ীর খোঁজ খবর রাখতে পারিনি। দর্শনের নুন খেয়ে নিমকহারামী করা আমার পক্ষে একান্তভাবেই অসম্ভব. তাই আমি এক পূর্ণাবয়ব জীবন-দর্শনের ভিতরই আগামী দিনের মানুষের শান্তিপূর্ণ উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সংকেত দেখতে পাই।

আগেই বলেছি, দারিদ্র্যের কঠোর নির্যাতনে যৌবনের আদিপ্রান্তে, বাল্য-যৌবনের সন্ধিক্ষণে যখন নিকট আত্মীয়স্বজনসহ প্রায় পথের ভিখারী হয়ে পড়েছিলাম, তখন ধর্মবিশ্বাস এবং জনসেবার এক শান্ত আবহাওয়াই আমাকে আত্মভোলা করে বাঁচিয়ে রেখেছিল। কাজেই আমার জীবন-দর্শনে বিশ্বাসবাদ ও জনসেবার ছাপ থাকবেই। অতি অনিবার্য মনস্তাত্ত্বিক কারণেই হয়তো আমি আজকের দিনের সংকটময় রাজনৈতিক আবহাওয়ায় মানুষের সার্থক ও সফল ভবিষ্যতের আলোর সংকেত দেখতে পাই আমার অধ্যাত্মবাদ জীবন-দর্শনে যার সঙ্গে জড়বাদেরও মৈত্রী প্রচুর।

এ ধারণার কারণ যে কেবলমাত্র মানসিক ভাবাবেগ তা আমার মনে হয় না। আমাদের বাইরের পরিবেশও এর এক বড় কারণ। ফ্রয়েড খুবই আশা করেছেন সংস্কৃতির প্রভাবে ও প্রসারে মানুষ তার মারণী-প্রবৃত্তিকে সংযত করে তুলতে পারবে। একদিক থেকে একথা খুবই ঠিক। বিচারবুদ্ধি বা বিবেকশক্তির সাহায্যে সহজ প্রবৃত্তিকে সংযত করে চলাই যদি সংস্কৃতির ধর্ম হয় তবে সে সংস্কৃতি মানুষকে যুদ্ধের মারফত বিরাট ধ্বংসের আয়োজনে নিশ্চয়ই প্রেরণা দেবে না। কিন্তু সারা দুনিয়ায় আমরা আজ যে কাল্চার বা সংস্কৃতি দেখছি সেটা কি তা-ই? এই বৈজ্ঞানিক যুগে সারা জগৎ যখন ঐক্যের পথে এগিয়ে চলেছে তখনও জাতিতে জাতিতে, দেশে দেশে, ধর্মে ধর্মে বিভেদ সৃষ্টি করে কত রকম কাল্চারের উন্মত্ত প্রচার চলছে। অথচ মানুষের সাংস্কৃতিক জীবন ভাল করে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, সব সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যই মানুষের সঙ্গে মানুষের হৃদয়ের সংযোগ স্থাপন। যে যুগে মানুষের সামনে ধ্বংসের সম্ভাবনা যত বেশী, সে যুগে মানুষে মানুষে প্রেমের সম্বন্ধ স্থাপনের প্রয়োজনও তত বেশী। বলা বাহুল্য, বর্তমান আণবিক বোমা, উদ্‌যান বোমা, নিউক্লিয়ার এনার্জি, স্পুট্নিক্, ল্যুনিক ও রকেটের যুগে মানুষের সামগ্রিক ধ্বংসের সম্ভাবনা যেভাবে প্রকট হয়ে উঠেছে আগে কখনও এমন হয়নি। এ দৃষ্টিকোণ থেকে বলা চলে প্রয়োজনের তাগিদে, সুখে-শান্তিতে বেঁচে থাকার জন্যেই মানুষের ভেতরে প্রেমের সম্বন্ধ এ যুগে সবচেয়ে বেশী স্থাপিত হবে। কালচারের ভেতরের সত্তাকে ভুলে গিয়ে শুধু তার খোলস হাত্ড়ে মানুষের ইতিহাসের ঘড়ির কাঁটাকে যাঁরা পেছিয়ে দিতে চাইছেন, তাঁরা এ সত্য সম্পর্কে মোটেই সচেতন নন। যাই হোক, হাটে মাঠে হরেক রকমের কালচারের ছড়াছড়ি দেখলে মনে হয় কালচারের লক্ষণ তিনটি। তার প্রথম লক্ষণ: ভাল পোষাক-পরিচ্ছদ পরা ও ভাল খাওয়া-দাওয়া। দ্বিতীয় লক্ষণ: পোষাকী বক্তৃতা, নাচ গান ইত্যাদিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ। তৃতীয় এবং সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ: অন্যের মাথায়

কাঁঠাল ভেঙ্গে তার কল্যাণ করার অনলস চেষ্টা। প্রকৃতপক্ষে এই কালচারই আজকের দিনের সভ্যতাকে গ্রাস করে ফেলেছে। ফ্রয়েড যে কালচার চান সেটা আসল কালচার। সেটি পেতে গেলে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী নতুন জীবন দর্শনের আলোকে বদলে ফেলতে হবে।

তথাকথিত কালচার যেমন মানুষকে এক করতে না পেরে তার ভিতর বিভেদ সৃষ্টি করেছে, তেমনি, যে রাজনীতি আজকের দিনের সভ্যতার সবচেয়ে বড় হাতিয়ার তা-ও মানুষের ভিতর সৃষ্টি করেছে অজস্র বিভেদ। আজকের দিনের রাজনীতি জাতীয় স্বার্থের ক্ষুদ্র গণ্ডী এড়িয়ে সব মানুষের স্বার্থ এক করে দেখতে এখনও শেখেনি। অবশ্য জাতীয়তার প্রয়োজন আজকের দিনের জগতেও আছে, বিশেষত এশিয়া ও আফ্রিকার অনুন্নত দেশসমূহে। যারা অনেক দুর্যোগের পর, অনেক সংগ্রামের পর সবে আজাদী পেয়েছে, জাতীয়তায় তাদের দরদ থাকা অত্যন্ত স্বাভাবিক। এরা কেউ কেউ এখনও ঔপনিবেশিকতার নাগপাশ থেকে অব্যাহতি পায়নি। কিন্তু তাহলেও একথা মনে রাখা উচিত যে, আজকের দিনের অনুন্নত দেশসমূহের উন্নতির জন্যে জাতীয়তার যেমন প্রয়োজন, আন্তর্জাতিকতার প্রয়োজনও তার চেয়ে কিছু কম নয়। বিজ্ঞানের দৌলতে সারা দুনিয়া বাইরের দিক থেকে মানুষের কাছে এক হয়ে গেছে। এতে সাংস্কৃতিক গণ্ডী, সমাজবিধানের গণ্ডী, এমন কি ধর্মবিধানের গণ্ডীও মুছে যাবে। উড়োজাহাজ যত বেশী চালু হবে, ততই বিভিন্ন ভাবের বিচিত্র সংমিশ্রণ দ্রুততর গতিতে সম্পন্ন হ'তে থাকবে। তার ওপর স্পুটনিক্ ল্যুনিক আবিষ্কারের পর মানুষের জগতকে বিজ্ঞান এক প্রকার ছাড়িয়েই যেতে আরম্ভ করল। কাজেই যে পরিবেশে চারশ' বছর আগে জাতীয়তার শিকড় গজিয়েছিল, সে পরিবেশ আজ আর নেই। সেজন্যে আজ জাতীয় স্বার্থের খাতিরেই জাতির উন্নতির সঙ্গে অন্য দেশের অন্য জাতির উন্নতির কথাও চিন্তা করা প্রয়োজন হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। যে নিয়মে পুরানা কালের নগর-রাষ্ট্র ও মধ্যযুগের ফিউডাল ব্যবস্থা পেরিয়ে আমরা জাতীয়তা ও স্বাদেশিকতার ভিত্তিতে রাষ্ট্র-ব্যবস্থা পরিচালনা করতে গিয়েছিলাম, আমাদের বৈজ্ঞানিক সভ্যতার গত চারশ' বছরের দ্রুত প্রগতি তার শক্তি ও ক্ষমতা কমিয়ে তাকে করেছে পঙ্গু। এই পরিবেশের পরিবর্তনের সাথে মানুষের অন্তর যদি তাল মিলিয়ে চলতে পারে তবে অদূর ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিকতা জাতীয়তাকে গ্রাস করে মানুষকে আইনস্টাইন প্রভৃতি মনীষীর পরিকল্পিত বিশ্বরাষ্ট্রের পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে, এমনতর আশা পোষণ করা খুবই যুক্তিযুক্ত। সে যুগ কবে আসবে তা নির্ভর করে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ও হৃদয়ের বিস্তারের উপর। যতদিন না সে নতুন যুগ আমাদের কাছে উপস্থিত হচ্ছে, ততদিন জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতার

মধ্যে একটা আপোষ করে নিয়ে আমাদের উন্নতির পথে অগ্রসর হতে হবে। আর যে কারণে উগ্র জাতীয়তা আজকের দুনিয়ায় অচল তার কথা আগেই বলেছি। সংকীর্ণ জাতীয়তার সংঘর্ষের ফলে মানুষ আজ বিশ্বযুদ্ধে সামগ্রিক ধ্বংসের ভয়ঙ্কর সম্ভাবনায় সম্মুখীন। তার বেঁচে থাকার জন্তে সে সমস্যার মোকাবিলা তাকে করতে হবে।

মানুষের মধ্যে প্রেমের সম্বন্ধ স্থাপনের জন্তে আধুনিক সংস্কৃতিকে সমস্ত ক্ষুদ্র গণ্ডী থেকে মুক্ত করে যেমন মানুষের সংস্কৃতিতে রূপান্তরিত করা প্রয়োজন, তেমনি আজকের দিনের জাতীয়তাবাদী রাজনীতির বিভেদকারী দৃষ্টিকেও সংযত করে তাকে মানব-নীতিতে রূপান্তরিত করাও অপরিহার্য প্রয়োজন। আগামী দিনের সভ্যতায় মানব-সংস্কৃতি ও মানব-নীতিকেই মুখ্য স্থান দিতে হবে। ক্ষুদ্র সংস্কৃতির গণ্ডী আর পায়রার খোপের মতো সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের কোটরে মানুষকে আর আটকে রাখা চলে না কারণ সে পথ জীবনের অগ্রগতির পথ নয়; পিছনে চলার পথ, মৃত্যুর পথ। মানব ইতিহাসের গতিপথের সংকেত এগিয়ে চল, বেদের ভাষায় "চরৈবেতি"। দুঃখের বিষয়, যদিও ঐতিহাসিক ধর্মসমূহের লক্ষ্য সমস্ত মানব-সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করা, তবু কালক্রমে কুসংস্কার ও যুক্তিবিরোধী বিশ্বাস প্রচার করে তারা মানবসমাজকে বরং শতধাবিভক্তই করেছে। তাই ধর্মগুলোর ভিতরে কে বড়ে, কে ছোট এ নিয়ে অনবরত ঝগড়া। আসলে, ধর্ম যে মতের ব্যাপার নয়, আচরণের এবং জীবনের ব্যাপার, তথাকথিত ধর্মপ্রচারকগণ সে কথা যেন ভুলেই গেছেন। সব ধর্মের মূল উদ্দেশ্য, সব মানুষের ভিতরে যে প্রেমের সম্বন্ধ স্থাপন, তথাকথিত ধর্মপ্রচার চলছে ঠিক তার উল্টো পথে। এইজন্যেই আধুনিক বৈজ্ঞানিক জগতে নাস্তিকতার সম্মান বেড়ে গেছে। এ উক্তি যে আসল ধর্ম সম্বন্ধে প্রযোজ্য নয় তা বলাই বাহুল্য। পাড়াগেঁয়ে অশিক্ষিত লোকের বিশ্বাস, সরষে দিয়ে ভূত তাড়ানো যায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সে সরষের ভিতরেই যদি ভূত ঢুকে থাকে তবে যতই সরষে ছড়ানো যাবে, ভূতের সংখ্যা ততই বেড়ে যাবে। মানব-প্রেমিক ধর্মাচার্যেরা নিজেদের জীবনের বিনিময়ে ধর্মের সরষে ছিটিয়ে বিদ্বেষের ভূতকে মানুষের জগৎ থেকে সরিয়ে নেবার চেষ্টা করেছিলেন। কালক্রমে তাঁদের অনুগামীদের ভ্রান্ত চেষ্টায় সে ধর্মের সরষের ভিতর ঢুকে পড়লো বিদ্বেষের ভূত। ফলে যতই তথাকথিত ধর্মের প্রচার হচ্ছে, ততই বিদ্বেষের ছড়াছড়ি।

বিজ্ঞানের অফুরন্ত শক্তি ও মহিমা অনস্বীকার্য। বিজ্ঞান শুধু দূরকেই নিকট করেনি, আমাদের পৃথিবীর সীমানা ছাড়িয়ে সৌরলোকের অন্যান্য প্রদেশেও গমনাগমনের রাস্তা খুলতে সে আজ সচেষ্ট। মানুষের জীবনকে বিজ্ঞান

নানাভাবে সমৃদ্ধ করেছে। বিজ্ঞানের দৌলতে সুখে-স্বচ্ছন্দে, পরিমিত শ্রমে সব মানুষের সুদীর্ঘ জীবনযাত্রার সম্ভাবনাও আজ প্রচুর। এমন যে তীব্র খাদ্যসংকট, আণবিক শক্তির সাহায্যে উৎপাদন বাড়িয়ে বিজ্ঞান তারও সমাধান করতে সক্ষম। জনসংখ্যা বৃদ্ধি হেতু খাদ্যসংকটের সম্ভাবনা রহিত করার উদ্দেশ্যে জন্ম-নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি আবিষ্কার করে পরিবার পরিকল্পনার ভিত্তিতে জনসংখ্যাকে আয়ত্তে আনার কৌশলও বিজ্ঞান মানুষকে শিখিয়েছে ও শেখাচ্ছে। তবুও এত সংঘর্ষ, এত অশান্তি। তবুও এমন পারস্পরিক অবিশ্বাস ও সন্দেহ। তার কারণ, বিজ্ঞানের ধ্বংসাত্মক শক্তিকে আয়ত্তে আনার মতো মানসিক সংযম মানুষের নেই। এখানে তার অবস্থা অনেকটা মহাভারতের দুর্যোধনেরই মতো। দুর্যোধন অনেক দুঃখ করে বলেছিলেন :

"জানামি ধর্মং ন চ মে প্রবৃত্তিঃ।
জানাম্যধর্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ।।"

"ধর্ম কি আমি জানি, তবু ধর্মে আমার মন নেই, অধর্ম কি
তা-ও আমি জানি, তবু তা হতে আমার নিবৃত্তি নেই।"

এইজন্যেই মনে হয় অধ্যাত্মবাদী দর্শনের মূলে মানুষের যে ঐক্যের তত্ত্ব নিহিত, যার মূলকথা বিশ্বপ্রেম, তাতে মানুষের বিশ্বাস আবার জাগিয়ে তুলতে হবে। বিজ্ঞানের অফুরন্ত শক্তির সঙ্গে অধ্যাত্মবাদের এই অফুরন্ত প্রেমের সামঞ্জস্য ও সংযোগ স্থাপনের উপরই মানুষের ভবিষ্যৎ নির্ভরশীল। তা থেকেই উৎপন্ন হবে সে কালচার, ফ্রয়েডের মতে যা মানুষের মারণী-প্রবৃত্তিকে দাবিয়ে রাখতে পারে! এ থেকেই গড়ে উঠবে অতি জাতীয়তাবাদী মানুষের রাষ্ট্র—আইন্‌স্টাইন যা চেয়েছিলেন এবং অনেক মনীষীই যা চাইছেন। তাই মনে হয় উইল্কি যে পথে চলেছিলেন সে পথে আর এক ধাপ অগ্রসর হওয়া মানুষের পক্ষে আজ একান্ত প্রয়োজন। আগেই বলেছি, উইল্কি চেয়েছেন, জগতের সমস্ত জাতির অর্থনৈতিক উন্নতির ব্যবস্থা করে আন্তর্জাতিক রাজনীতির বুনিয়াদ দৃঢ় করতে। আমার মতে, উইল্কির অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আন্তর্জাতিকতার ইমারত পারস্পরিক বিরোধ ও সংঘর্ষের ফলে ধ্বসে পড়বে, যদি তাকে মানুষের আধ্যাত্মিক ঐক্যের ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত করা না হয়। অতএব আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও অর্থনীতির সঙ্গে অধ্যাত্মবাদের উদার মানব-নীতির সম্মেলনেই গড়ে উঠবে আগামী দিনের আদর্শ সভ্যতা। আবার বলি, মানুষের ঐহিক প্রয়োজনে এই অধ্যাত্মবাদ শুধু পরলোকপ্রবণ হতে পারে না আর যুক্তিবিরোধী বিশ্বাসবাদের সাফাই গাওয়াও এর উদ্দেশ্য নয়। এই

অধ্যাত্মবাদের ভিতরে আছে বিজ্ঞানের নিরপেক্ষ মনোবৃত্তি ও মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের দৈহিক প্রয়োজনের পূর্ণ স্বীকৃতি। ধর্মের মূল নীতি ও বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি, অধ্যাত্মবাদ ও জড়বাদের সামঞ্জস্য বিধান করে, সারাজগতের অগণিত জনসাধারণের কল্যাণের অফুরন্ত প্রেরণা জোগানই আমার জীবন দর্শনের উদ্দেশ্য।

অনেকেই এই কথা শুনে মনে করেন এটা অতি অবাস্তব কল্পনা, অস্থির-মস্তিষ্ক দর্শনের ছাত্রের চিন্তার জগাখিচুড়ি। বাস্তব জীবনের সঙ্গে এর কোন যোগ নেই। আমি যখন এই দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিজ্ঞান ও দর্শনের মিলনের, বিশ্বসভ্যতা ও বিশ্বরাষ্ট্রের কথা বলি তখন অনেকেই মনে করেন আমি এক নিশ্বাসে জাতীয়তাকে উড়িয়ে দিচ্ছি, ও জগতের নানা দেশের নানা সংস্কৃতি ও ধর্মকে নস্যাৎ করতে চাইছি। তাঁরা মনে করেন, এ উদ্ভট অলীক কল্পনা তখনই বাস্তব হতে পারে যখন সমস্ত মানুষ দেবত্বের পর্যায়ে উন্নীত হবে। তাঁরা সোজা কথায় বলেন এ কখনও সম্ভব নয়। আমাদের আশা ও আকাঙ্ক্ষা ঠিক এ রকমের কিনা সে বিষয়ে আমার নিজের যথেষ্ট সন্দেহ আছে। এই বৈজ্ঞানিক যুগে মানুষের ঐহিক জীবনে যে বিরাট পরিবর্তন, যার ফলে সারা জগতের মানুষ বাইরের দিকে এক হয়ে গেছে বা হতে চলেছে, তার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের হৃদয়ের সমুচিত বিস্তার না হওয়ায় সে এক সংকটময় অবস্থায় পড়েছে, কিভাবে তার জীবন-দর্শনের পরিবর্তন সাধন করে সে এই অবস্থা থেকে অব্যাহতি পেতে পারে বর্তমান আলোচনায় তারই ইঙ্গিত দেবার চেষ্টা করেছি। একে উদ্ভট-কল্পনা বলে উড়িয়ে দেওয়াই এক বড় অবাস্তব কল্পনা। একথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয় যে রাতারাতি দুনিয়া থেকে ধর্ম ও কৃষ্টির ভেদ চলে যাবে, জাতীয় রাষ্ট্রসমূহ উঠে গিয়ে তাদের পুরোপুরি হজম করে এক সর্বগ্রাসী বিশ্বরাষ্ট্রের পত্তন হবে। বিজ্ঞান যে বাহ্য ঐক্য মানুষের ভিতর নিয়ে এসেছে, আধ্যাত্মিক ঐক্যের ভাব ছড়িয়ে মানুষের হৃদয়ের বিস্তারের সাহায্যে তাকে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করাই আমার উদ্দেশ্য। জাতীয়তাবাদী রাজনীতি জগতে চালু হওয়ার ফলে যেমন সমস্ত মানুষ দেবতা বা পয়গম্বর হয়ে যায়নি, তেমনি আন্তর্জাতিকতার প্রসারেও হতে পারে না। তবে আজ যেমন জাতীয়তাকে মানুষ তার ঐহিক উন্নতির এক বড় হাতিয়ার বলে মনে করে, বিজ্ঞানের প্রভাবে তেমনি আন্তর্জাতিকতাকে সে মূল্য দেবে, দিতে বাধ্য হবে। কারণ সুষ্ঠু আন্তর্জাতিক দৃষ্টিই আজ তার ঐহিক উন্নতির সবচেয়ে বড় হাতিয়ার। বিজ্ঞানের ভৌগোলিক আন্তর্জাতিকতার সঙ্গে মানুষের আত্মিক ঐক্যের যোগ সাধনই আজ বিশেষ প্রয়োজন। তাতেই সব দেশের নির্যাতিত মানবতার স্থায়ী কল্যাণ, তাতেই মানুষের সার্বিক অভ্যুদয়। যে ঐতিহাসিক

প্রয়োজনে বৈজ্ঞানিক সভ্যতার এমন প্রসার ও প্রতিপত্তি, যা থেকে আন্ত-র্জাতিকতার উৎপত্তি ও বিস্তার, যা অগণিত জনগণের ঐহিক কল্যাণে আস্থাশীল, সুষ্ঠু অধ্যাত্মবাদী জীবন-দর্শন তাকে দেবে কল্যাণের অফুরন্ত প্রেরণা এবং তার ফলেই যথাসময়ে যথাকালে মানুষ সংকীর্ণ গণ্ডির বাঁধন কাটিয়ে মানুষের কালচারে, মানুষের রাষ্ট্রনীতিতে আস্থাবান হয়ে উঠবে। তা থেকেই আগামী দিনের সভ্যতার অগ্রগতির এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হবে। সে প্রয়োজন মানুষকে কি ভাবে ঠিক কোন্ পথে নিয়ে যাবে, সে সম্বন্ধে আমি কোন ভবিষ্যদ্বাণী করতে চাই না—ত করার ক্ষমতাও আমার নেই। মানুষ যদি সেই আলোর সংকেত পায় তবে তা-ই তাকে নিয়ে যাবে তার লক্ষ্যপথে।

উদাহরণ স্বরূপ বলতে পারি, আজকের দিনের সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ভিতর তার দোষত্রুটি সত্ত্বেও এক মহৎ ও বৃহৎ সম্ভাবনার বীজ নিহিত। শুধু রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও বৈজ্ঞানিক পরিপ্রেক্ষিতে সে আদর্শকে না দেখে তাকে যদি আমরা সফল জীবনযাত্রার প্রেরণায় সজীব ও প্রাণবন্ত করে তুলতে পারি তাহলে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জই হবে সেই মহামিলনের দিশারী ও পথিকৃৎ। মহাকবি কালিদাসের সঙ্গে সুর মিলিয়ে সে মহান আদর্শের পুনরাবৃত্তি করে বলতে চাই ঃ

"সর্বস্তরতু দুর্গাণি সর্বো ভদ্রাণি পশ্যতু।
সর্বঃ সদ্বুদ্ধিমাপ্নোতু সর্বঃ সর্বত্র নন্দতু।।"

"সকলের সংকট দূর হোক। সকলের দৃষ্টিপথ সুন্দর হোক,
সকলের মনে শুভবুদ্ধি জাগ্রত হোক। যে যেখানে আছে,
সকলে সুখী হোক।"

এক প্রাচীন প্রেরণাদায়ক প্রার্থনামন্ত্র এখানে মনে পড়ছে ঃ

"কালে বর্ষতু পর্জন্যম্
পৃথিবী ভবতু শস্যশালিনী।
সর্বে সন্তু নিরাময়ঃ।।"

"কালে সুবৃষ্টি হোক, পৃথিবী শস্যশালিনী হোক, সব
মানুষের দুঃখ চলে যাক।"

এই মহান আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে, বাস্তবজ্ঞান হারিয়ে প্রাচীন পৌরাণিকরা ব্যাঘ্র-মেষের প্রেমালিঙ্গনের পরিকল্পনা করেছিলেন। বিজ্ঞানের বাঘ নিজের শক্তিতে দিশাহারা হয়ে আজ ধর্মের মেষকে সপ্রেম আলিঙ্গন করতে উদ্যত, এটাই হয়তো সে উক্তির নিগূঢ় অর্থ। ধর্মের সঙ্গে মেষের তুলনায় আশা করি ধার্মিক

ব্যক্তিরা ব্যথিত হয়ে আমাকে ধর্মবিদ্বেষী নাস্তিকের দলে ফেলবেন না। ধার্মিক-শ্রেষ্ঠ হজরত ঈশা মেষের নম্রতার সঙ্গে আধ্যাত্মিক জীবনের শান্তভাবের তুলনা করেছেন। ধর্মের নামে গো-জাতি ভক্তি পৌরাণিক যুগের হিন্দুধর্মের এক বিশেষ দান। দেবতার কাছে উৎসৃষ্ট পশুমাংস ভক্ষণে দেবত্বপ্রাপ্তি ধর্মের আদিপর্বের এক বড় কথা। ধর্মালোচনায় পশুর কাহিনী অবতারণায় যদি কিছু অপরাধ হয়, তবে তার মূল অনেক প্রাচীন। অন্তত সেজন্যে আমাকে দোষী সাব্যস্ত করা চলে না।

শেষ কথা

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সম্বন্ধে যে আশাবাদ আমি পোষণ করি, তার মূলে রয়েছে, মানুষের বৃহত্তর জীবনে আমার জীবন-দর্শনের প্রয়োজন ও উপযোগিতাতে আন্তরিক বিশ্বাস। সে বিশ্বাস সহেতুক অথবা অহেতুক এ বিবেচনার ভার আমার ওপর নয়, নিরপেক্ষ সমালোচকের ওপর। আমার নিজের জীবনে এ বিশ্বাসের মূল্য অজস্র ও অপরিমিত। কল্পনার তুলিকায় ভাবের যে রঙীন ছবি আঁকলে, মানুষের জীবন আনন্দে তখনকার মতো ভরপুর হয়ে ওঠে ও সে নিজের দুঃখ-দৈন্য, অসামর্থ্য, অসাফল্য ও অকৃতকার্যতার কথা ভুলে যায়, প্রাত্যহিক জীবনে সে বিশ্বাস সে মরণ কামড়ে আঁকড়ে ধরে। তা-ই তার কল্পতরু, তা-ই তার কাম্য। তার আশার স্বর্গ, কল্পনার বেহেস্ত। সে তাকে ছেড়ে থাকতে পারে না, থাকতে চায়ও না। আমার অবস্থাও হয়তো তাই। শুধু বাস্তব জ্ঞান আমার চাহিদা মেটাতে পারে না, কঠোর বাস্তবকে আঁকড়ে থাকলে অনেক আগেই জীবন-যুদ্ধে আমার মৃত্যু হয়ে যেত। আমার স্বপ্নই আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে ও রাখবে। আমি স্বাপ্নিক, আমি ভাব-বিলাসী।

অল্প বয়স থেকেই খানিকটা সংস্কারবশে, খানিকটা অনুরাগের আতিশয্যে, ইংরেজি বিদ্যা আয়ত্ত করবার চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত দর্শনের পুঁথি নিয়ে টোলের পণ্ডিত মশাইদের পদপ্রান্তে বসবার সৌভাগ্য হয়েছিল। তাঁদের কাছ থেকে পুরনো দিনের দর্শনের যেসব উপদেশাত্মক রসালো কথা শুনেছিলাম তা এখনও কিছু কিছু মনে আছে। সে শুভ প্রেরণার মূল্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের বহু ঊর্ধ্বে। এখানে মনে পড়ে মহাকবি কালিদাসের 'মালবিকাগ্নিমিত্র' অর্থাৎ তদানীন্তন মালবদেশীয় অগ্নিমিত্র নাটকের এক প্রারম্ভিক সার্থক উক্তি :

"পুরাণমিত্যেব ন সাধু সর্বং
নাপি কাব্যং নবমিত্যবদ্যং।
সন্তঃ পরীক্ষ্য অন্যতরদ্ভজন্তে
মূঢ়ঃ পরপ্রত্যয়নেয়বুদ্ধিঃ ॥"

"যা কিছু পুরাতন তা-ই ভাল নয়, আর যা কিছু নতুন তা-ই মন্দও নয় নতুন ও পুরাতন দুই-ই ভাল-মন্দে মেশানো যাঁরা বুদ্ধিমান তাঁরা দুটোকে পরীক্ষা করে দেখে তার ভালটা গ্রহণ করেন। আর যারা মূঢ় তারা বিনা বিবেচনায় পরের মুখে ঝাল খায়।"

সমালোচনী মনোবৃত্তির এই অকুণ্ঠ সমর্থনের রূপান্তর করে আজ বলতে ইচ্ছা করে বিদ্যা কিছু ইংরেজীনবীশদের একচেটিয়া সম্পত্তি নয়। টোলের পণ্ডিত মশায় ও মাদ্রাসার মৌলবী সাহেবদের বিদ্যারও যথেষ্ট মূল্য, কারণ তাঁরাই সঞ্চিত প্রাচীন জ্ঞানের ধারক ও বাহক।

সে আট-পৌরে চাদর গায়ে দিয়ে খাটের ওপর আসন করে তার নীচে চটিজুতো ফেলে তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বসে, মাঝে মাঝে ছোটো নস্যির কৌটো থেকে নাসারন্ধ্রে উত্তেজক চূর্ণ প্রেরণ, কপালে চন্দনের তিলক ও প্রলেপ, ভাবের ঘোরে অনবরত মাথায় দোল আর তার সঙ্গে সঙ্গে পুরনো সংস্কৃত পুঁথির একের পর আর এক লাইন মুখস্থ বলে যাওয়া ও তার আনাচে কানাচে কি আছে তার টীকা-ভাষ্য করা, এই প্রাচীন পাঠন-পদ্ধতির এমন একটা শ্রী, মাধুর্য, সৌন্দর্য ও মাদকতা আছে যেটা নেকটাই আঁটা, শক্ত কোট-প্যাণ্ট পরা, গুডমর্নিং, ব্যাডমর্নিং, থ্যাঙ্ক ইউ বলাতে অভ্যস্ত ইংরেজী পড়া অধ্যাপকের হয়তো নেই। আজও মনে পড়ে ন্যায়ের পণ্ডিত মশাই বিশ্বনাথের ভাষাপরিচ্ছেদের দুর্বোধ্য সিদ্ধান্তমুক্তাবলী টীকা তন্ময়ভাবে খানিকটা ব্যাখ্যা করে যখন বলতেন, 'তাবদত্র তিষ্ঠতু' (আজকের পড়া এখানেই শেষ), তখন যেন মনে হত বিধাতাপুরুষ বর্ষার বারিধারা বর্ষণের সমাপ্তিরেখা যেন অপ্রত্যাশিতভাবেই টেনে দিলেন। যাই হোক, সে পুরনো কাসুন্দি এখানে ঘাঁটতে চাই না। সেই প্রাচীন পণ্ডিতদের কাছ থেকে দর্শনশাস্ত্রের উপযোগিতা সম্বন্ধে একটি মনোরম আখ্যায়িকা শুনেছিলাম। আমার জীবন-দর্শন সম্বন্ধেও তা প্রযোজ্য।

সে পুরনো দিনে মিষ্টি ওষুধ পাওয়া যেত না। অসুখ হলে গাছ-গাছড়ার শিকড় ও পাতার তিতো রস খাওয়ানোই ছিল রেওয়াজ। ছোটবেলা ম্যালেরিয়া ও রক্ত আমাশয়ে বছরের পর বছর ভুগেছিলাম। মা-বাবার স্নেহাতিশয্যে সে

রোগ ভোগের পুরস্কার স্বরূপ যে বিবিধ তিক্তরস দিনের পর দিন উদরস্থ করেছিলাম তার কথা আজও স্মরণ হলে জন্মনিবৃত্তিই যে মানুষের চরম লক্ষ্য সে বিষয়ে অন্তরে আর কোনও সংশয় থাকে না। আজকের দিনের সভ্যজগতে মধুর ভাষণের যে অপরিমিত মূল্য, অর্ধশতক আগে আমাদের শৈশবাবস্থায় তিক্তরস সে মূল্যেরই অধিকারী ছিল। গুরুভক্তির আতিশয্যে আকন্দের পরম হিতকর রস আস্বাদন করতে গিয়ে ঋষি আয়োদধৌম্যের কোনও শিষ্যের জীবনে যে বিপর্যয় ঘটেছিল আমার শৈশবে তা যে ঘটেনি তার কারণ গুরু-জনদের অজস্র শুভেচ্ছা ও অনন্ত শক্তিমান ঈশ্বরের অপার করুণা।

শোনা যায় একটি ছোট্ট মেয়ের প্রায় বার মাসই অসুখ লেগে থাকত। আর তার মা জোরজবরদস্তি করে তাকে যত সব তিতো ওষুধ খাওয়াতেন। ওষুধ যত তিতো হতো, মায়ের আদরও হতো তত বেশী। দৈববশে একদিন সে নিয়মের ব্যতিক্রম হল। হঠাৎ একদিন তার মা বাজার থেকে তাকে খাওয়ানোর জন্যে একটু ভাল মিষ্টি গুড় নিয়ে এলেন। সে গরুর গাড়ীর যুগে পাড়াগাঁয়ে রসনার তৃপ্তির জন্যে হরেক রকমের মিষ্টি খাবার পাওয়া যেত না। কাজেই সেদিনের এক সুস্বাদু খাবার ছিল গুড় আর ছেলে-মেয়েদের গুড় খাওয়ানো ছিল স্নেহের এক বড় অভিব্যক্তি। যাই হোক, স্নেহময়ী মা তার ছোট্ট মেয়েকে গুড় খাওয়াতে গিয়ে মহা মুশকিলে পড়লেন। যতোই মেয়েকে আদর করেন ততোই সে দূরে চলে যায়। মা যতো বেশী আদর করেন আর বলেন, "লক্ষ্মী মেয়ে আমার, এ তিতো জিনিস নয়, এ মিষ্টি গুড়" ততোই মেয়ে লাফিয়ে ওঠে। কারণ, তার পূর্ব অভিজ্ঞতা হচ্ছে খুব তিতো জিনিস খাওয়াতে গেলেই মায়ের আদরের মাত্রা পঞ্চমে ওঠে। এই মুশকিলে পড়ে মা হঠাৎ এক কৌশল উদ্ভাবন করলেন। তিনি তাঁর আঙুলের ডগায় একটু গুড় লাগিয়ে রাখলেন। পরের বার মেয়ে যখন খাবে না বললো অমনি মা অতর্কিতে তার জিহ্বায় আঙুলের ডগা দিয়ে সে গুড়ের কণিকা লাগিয়ে দিলেন। জিহ্বার সঙ্গে গুড়ের আকস্মিক সংযোগে মেয়েটির ওজর-আপত্তি ভেঙে গেল। তিতো জিনিস খেতে খেতে মিষ্টিকে যদি কেউ তিতো ভাবে, তবে মিষ্টির ঈষৎ রসাস্বাদ তাকে করিয়ে দেওয়াই সব চেয়ে বড় প্রতিকার। সংস্কৃত-দর্শনে মঙ্গলকর বস্তুর প্রতি আসক্তি জাগাবার এই সুচিন্তিত পদ্ধতির নামই "গুড়-জিহ্বা-ন্যায়"। এখানে ন্যায় কথার অর্থ আখ্যায়িক থেকে আবিষ্কৃত উপদেশ।

আজকের দিনের মানুষ যখন বিজ্ঞানের প্রাচুর্যের ভিতর অন্তরের সুখ শান্তি থেকে বঞ্চিত, এই প্রাচুর্যের ভিতরও অগণিত জনগণ যখন অভাবের তাড়নায়

অস্থির এবং বড় বড় মনীষীরা মানুষের সামগ্রিক ধ্বংসের সম্ভাবনা চিন্তা করে বিচলিত ও ত্রস্ত, তখন আমাদের বৃহত্তর জীবনে দর্শনের উপযোগিতার কথা চিন্তা করলে, এই প্রাচীন গুড়-জিহ্বা-ন্যায়ের কথাই বারবার মনে পড়ে। যদি কোন উপায়ে আজকের দিনের মানুষকে তার ব্যক্তিগতও সামাজিক জীবনে এই জীবন-দর্শনের সুফল একটু উপলব্ধি করিয়ে দেয়া যায়, তবে সে আপনা থেকেই সে পথের সন্ধান আরও ভাল করে নেবে। মাত্র বেঁচে থাকার স্বাভাবিক ইচ্ছা ছাড়া এর স্বপক্ষে মানুষের আকর্ষণের নির্ভরযোগ্য কোনও কারণ দেখা যায় না। কবি বলেছেন, "সাধে কি বাবা বলি, গুঁতোর চোটে বাবা বলায়"। সৃষ্টির আদিযুগ থেকে এত পীর-পয়গম্বর, এত ঋষি-মুণি, এত ভাবুক মনীষী আপ্রাণ চেষ্টা করে অধ্যাত্মবাদের দিকে মানুষকে তেমন টানতে পারেন নি। কিন্তু শুধু বেঁচে থাকার তাগিদে বিজ্ঞানের মারণাস্ত্রের গুঁতোয় তার দিকে ঝুঁকতে মানুষ আজ বাধ্য হবে। এটা কি উপনিষদে বর্ণিত অমৃতত্বের পিপাসা, না দৈহিক জীববৃত্তি? না উভয়ই? এই প্রশ্নের উত্তর কোথায় পাওয়া যাবে? যাই হোক, এতেই হয় তো অবশেষে সে বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধতে সক্ষম হবে। এটাই তার বড় লাভ।

বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধার গল্প সকলেই জানেন। দুঃখের বিষয় অনেক গবেষণার পরও অত্যাচারী বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বেঁধে দেওয়ার জন্যে কোনও দরদী সমাজসেবী মূষিক পাওয়া গেল না। তা সত্ত্বেও মূষিক জাতি যে আজও বেঁচে থেকে মানুষের গার্হস্থ্য জীবনের বহু মূল্যবান জিনিসের অনবরত কল্যাণ করে যাচ্ছে, তার কারণ আল্লার রহম না হজরত ডারউইনের বিবর্তনবাদের কেরামতি তা জানি না।

আজকের দিনের আন্তর্জাতিক জীবনেও বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধার সমস্যা বার বার ভীষণ আকার ধারণ করছে। এ বিড়াল হচ্ছে জাতি-বিদ্বেষ, মতবিদ্বেষ ও পারস্পরিক ঘৃণার বিড়াল। সে অনবরত তার বৃহৎ উদরে নিক্ষেপ করছে ক্ষুদ্র মূষিকের মতোই অগণিত সাধারণ মানুষের ও মানব দরদী মনীষীদের অশেষ শুভেচ্ছা, ভালবাসা ও প্রেম। মাঝে মাঝে মনে হয়, আন্তর্জাতিক রাজনীতির সজল শক্তিমান রঙীন গেলাসের দৌলতে বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধা পর্ব শেষ হয়ে গেল। আবার খানিক পরে দেখা যায় বিদ্বেষের বিড়াল গা ঝাড়া দিয়ে উঠেছে। সে বিরাটকায় দৈত্য ডিপ্লোমেসির হাত বুলানোতে মাঝে মাঝে ঘুমিয়ে পড়ে, কিন্তু মরে না, আবার তার সমস্ত শক্তি নিয়ে জেগে ওঠে।

এই মহাসঙ্কট থেকে মানুষকে বাঁচতে হলে তার আজকের দিনের শিক্ষা-পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন। মানুষের বৃহত্তর জীবনের প্রয়োজনে জোর

হাতুড়ি পিটিয়ে সে পদ্ধতির রূপ পাল্টিয়ে দিতে হবে। বিজ্ঞানের দৌলতে, ইতিহাসের তাগিদে আমাদের বহু ধারণা বদলে গেছে। যেমন বৈজ্ঞানিক সভ্যতার প্রসারে প্রাচীন ধর্মীয় বিশ্বাসবাদের ইমারত ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে ও জড়বাদ গা ঝাড়া দিয়ে জেগে উঠেছে। উগ্র জড়বাদের এই সমর্থনও প্রতিক্রিয়াত্মক। শুধু ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়ার দ্বারাই মানুষের জীবনের সমস্যার স্থায়ী সমাধান করা যায় না। প্রতিক্রিয়ার দ্বারা কতক কতক সমস্যার সমাধান হয় সন্দেহ নেই, কিন্তু তা থেকে আবার অনেক নতুন সমস্যারও সৃষ্টি হয়। ইতিহাসে এর সাক্ষ্য প্রচুর। জড়বাদের এই প্রতিক্রিয়া আমাদের ভিতরে যে সন্দেহ ও সংঘর্ষের সৃষ্টি করেছে তাকে রুখে দাঁড়াতে হলে আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন দরকার। শুধু অধ্যাত্মবাদের বিরোধিতা দ্বারা এই উদ্দেশ্য সফল হবে না। সেজন্যে চাই সমঝোতা, সেজন্যে চাই নতুন দৃষ্টিভঙ্গী।

আজকের দিনের শিক্ষা পদ্ধতি আলোচনা করলে একশ বছর আগেকার এক জমিদারের নায়েবের অদ্ভুত আচরণের কথা মনে পড়ে। তখন জমিদারী প্রথা সবে প্রবর্তিত হয়েছে। প্রজাদের ওপর জমিদারের অখণ্ড প্রতাপ। সে যুগের এক অতি অমিতব্যয়ী জমিদারের সেরেস্তা ছিল বাড়ী থেকে অনেক দূরে। গরুর গাড়ীই ছিল সেখানে যাতায়াতের একমাত্র বাহন। আর তাতেও সেখানে যেতে লেগে যেত বেশ কয়েকদিন। জমিদারের মূর্খ নায়েব সেই সেরেস্তাতে বসে পাইক-পেয়াদার মারফত নির্দোষ নিঃস্ব প্রজাদের ওপর অনবরত নির্যাতন চালাত। হঠাৎ অমিতব্যয়ী জমিদার ঋণের দায়ে দেউলিয়া হয়ে গেলেন আর খাজনা না দেওয়ার জন্যে তাঁর জমিদারী নিলামে উঠল। অজ্ঞ দাম্ভিক নায়েবের কাছে সে খবর তখনও পৌঁছয়নি। সে তখনও আগেকার মতো গদাপর্ব চালিয়েই যাচ্ছে। নতুন জমিদার শেষে অবশ্য তার মুখে চুণ-কালী লেপেছিলেন। এই আণবিক বোমা, স্পুটনিক ও ল্যুনিকের যুগে যাঁরা ষোল শতকের বৈজ্ঞানিক ধারণার আলোকে ধীরস্থির ভাবে শিক্ষা ব্যবস্থা চালিয়ে যাচ্ছেন তাঁদের অবস্থাও সেই অজ্ঞ দাম্ভিক নায়েবেরই মতো। তাঁরা অনেক ক্ষেত্রেই মানুষের ভিতর উগ্র জাতীয়তাবোধ, তথাকথিত কালচারের অহমিকা এবং সেই পুরনো দিনের ভৌগোলিক দেশাত্মবোধ জাগিয়ে তুলছেন, যদিও সে প্রচেষ্টা আজকের দিনের পরিবেশের অনুপযোগী। তাঁরা ভুলে যান যে, আজ জাতীয় উন্নতির জন্যে, নিজের দেশের মঙ্গলের জন্যে, নিজের কালচারের সঙ্গে ভাল করে পরিচিত হওয়ার জন্যেই সারা জগতের সব মানুষের কালচারকে ভাল করে শিকড় গজাতে দিতে হবে, যাতে জগতের সব দেশের ও সব মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি সম্ভব হয়।

কিন্তু সে সব করা তো দূরের কথা, আমরা এখনও শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর আপন ব্যক্তিত্বের বিকাশকে আমাদের শিক্ষা-দর্শনের মূলকথা বলে মেনে নিচ্ছি। এবং সেই প্রসঙ্গে শিক্ষার্থীর সংকীর্ণ পরিবেশ ও বংশধারারও চুলচেরা বিশ্লেষণ করে যাচ্ছি। শিক্ষায় ব্যক্তিত্বের বিকাশ হোক এটা নিশ্চয়ই কাম্য। যে ব্যক্তির ভাল উকিল হওয়ার সম্ভাবনা আছে, শিক্ষার কারখানায় ছাপড়ে ফেলে তাকে একটা নতুন ধরনের ভাল রেষ্টুরেণ্টে রাঁধুনী করা কখনও কাম্য হতে পারে না। যার ভিতর কবিত্বপ্রতিভা রয়েছে, যে প্রতিভা জাগিয়ে তুললে সে একজন বড় কবি হতে পারে, তাকে এমন শিক্ষা কখনও দেয়া উচিত নয়, যাতে সে শেষ পর্যন্ত একটা বড় মুদীর দোকানের পাকাপোক্ত হিসাব-রক্ষক হতে পারে।

তবে ব্যক্তিত্বের এই উল্টো বিকাশের প্রভাবে মানুষ আজ একদিক দিয়ে হয়তো একটু লাভবান হয়েছে। শিক্ষার গুণে আমাদের প্রেমিক তরুণরা খানিকটা তরুণী ভাবাপন্ন হয়ে পড়েছেন। আর প্রেমিক তরুণীরা অনেক ক্ষেত্রে তরুণ-ধর্মকেই তাঁদের লোভনীয় আদর্শ বলে মনে করেছেন। যাই হোক, এটা হয়তো একটা সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম। এ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলতে চাই না। বলা হয়তো উচিতও নয়।

মানুষের ব্যক্তিত্বের বিকাশ খুবই প্রয়োজন। নিজস্ব ব্যক্তিত্ব চাপা পড়লে মানুষের জীবন কিছুতেই সুন্দর ও সফল হয় না। এটা আজকের দিনের সব শিক্ষা-বিজ্ঞানী ও তাঁদের মুরিদদের জানা। তবে অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয়, এ দৃষ্টিভঙ্গীর পেছনের ইতিহাস অনেক সময়ই তাঁরা মনে রাখেন না। ইউরোপের মধ্যযুগীয় চার্চ অনেক সময় সাধারণ মানুষের ওপর বিশ্বাস ও নিয়মশৃঙ্খলার যে ভারী জগদ্দল পাথর চাপিয়ে দিয়েছিল তারই প্রতিক্রিয়া-স্বরূপ শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব-বিকাশের প্রয়োজনীয়তার ওপর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। এর কুফল আজ আমরা প্রাণে প্রাণে অনুভব করছি। ব্যক্তিত্বের বিকাশের ওপর অতিরিক্ত জোর দেয়ার ফলে আজ মানুষ তার মনের কাঠামোতে একে অন্যের কাছ থেকে এতদূর সরে গেছে যে, পরস্পর মিলনের সূত্রই সে আজ খুঁজে পাচ্ছে না। স্বামী স্ত্রীকে বুঝতে চায় না, স্ত্রী স্বামীকে বুঝতে চায় না। পারিবারিক জীবনের এই ভুল বুঝাবুঝি বৃহত্তর সমাজ জীবনে তার প্রতিফলন ঘটায়। জাতের দোহাই দিয়ে, ধর্মের ও কালচারের দোহাই দিয়ে, মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা হয়েছে। তার ফলে অনবরত সংঘর্ষ, সমঝোতার অভাব ও ভুল বুঝাবুঝি। এর এক প্রধান কারণ শিক্ষা-বিজ্ঞানীদের পেছনঘেঁষা-দৃষ্টি। যে রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে তাঁদের সংগ্রাম তা-কেই জীইয়ে রাখার জন্যে তাঁদের

এত চেষ্টা। তাঁরা আণবিক যুগের মানুষকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাইছেন চারশ' বছর আগেকার রেনেসাঁসের পরিবেশে। আজকের দিনের মানবপুরাণ যে বেদব্যাস লিখবেন তাঁকে এর উল্টো পথেই চলতে হবে। কালানতিক্রমণ দোষ থেকে অব্যাহতি পাবার সংকেত মানুষকে তাঁকে শেখাতে হবে।

ব্যক্তিত্বের বিকাশ বন্ধ করে, জাতীয়তাকে পিষে ফেলে, কালচারের তফাৎ উঠিয়ে দিয়ে সারা দুনিয়ার মানুষকে এক নিশ্বাসে, একরঙা ও একচোখো করার প্রস্তাব আমি করছি না। তবে আমার মনে হয়, মানুষের নিজের ব্যক্তিত্বের, জাতীয় সংস্কৃতির ও বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন যেমন আজকের দিনের শিক্ষা-ব্যবস্থায় প্রচুর, ঠিক তেমনি তার সঙ্গে সঙ্গে সব মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার, সব মানুষের জীবন-দর্শনের, সব মানুষের কালচারেরও প্রতিফলন তাতে থাকা উচিত। কারণ সব মানুষের মূল সত্তা এবং তাদের মৌলিক স্বার্থ এক। এই একত্ববোধ মানুষের ভেতর জাগাতে না পারলে অতি অল্প দিনের আণবিক যুদ্ধে হয় সারা দুনিয়া চুরমার হয়ে যাবে অথবা মানুষে মানুষে যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে জাতে জাতে, দেশে দেশে, ধর্মে ধর্মে সৃষ্টি হবে আকাশ-পাতাল ব্যবধান অথাৎ এক বিশ্বব্যাপী ব্যাবেলের টাওয়ার।

ইহুদীদের পুরাণে আছে হজরত ইয়াকুব প্রায় রাবণ রাজার মতোই সকলে যাতে স্বর্গে যেতে পারে তার জন্যে বহু লোক দিয়ে এক টাওয়ার তৈরী করছিলেন। টাওয়ার খানিক দূর তৈরী হবার পর ইহুদীদের ঈশ্বর জিহোবা আতংকিত হয়ে পড়লেন। কারণ পৃথিবী ও স্বর্গের ভিতর যদি একটা সহজ যোগাযোগের পথ নির্মিত হয়, তাহলে কেবল পুণ্যাত্মাদের জন্যে স্বর্গে আসন নির্দিষ্ট রাখা যাবে না। পাপী তাপীরাও দলে দলে সেখানে গিয়ে হাজির হবে ও স্বর্গে বাসস্থান সমস্যা তীব্র আকার ধারন করবে। আর পুণ্যাত্মার পুরস্কার ও পাপীর দণ্ড বিধানের ব্যবস্থা যদি খোদার হাত থেকে চলে যায় তবে তিনিও দেউলিয়াই হয়ে যাবেন। তাই ইয়াকুবের কাজে বাধা দেওয়ার জন্যে জিহোবা এক বড় কৌশল উদ্ভাবন করলেন। যে টাওয়ার তৈরীর জন্যে যে সব মজুররা খাটছিল তিনি তাদের ভাষা আলাদা করে দিলেন। তখন গ্রীক, রোমান, হিব্রু নানা ভাষায় ভাবের আদান-প্রদান আরম্ভ হল। কেউ কারো কথা বোঝে না। আধুনিক যুগের ইন্টারপ্রেটারও কেউ সেখানে ছিল না। কাজেই জিহোবার প্যাঁচে ইয়াকুবের স্বর্গে যাবার টাওয়ার রচনার চেষ্টা অসমাপ্তই থেকে গেল, অঙ্কুরেই তার বিনাশ ঘটল। ব্যাবেল নামক জায়গাতে এই টাওয়ার তৈরী করা আরম্ভ হয়েছিল বলে এই টাওয়ারের নাম ব্যাবেলের টাওয়ার।

শুধু লৌকিক বিজ্ঞানের সাহায্যে, শুধু ব্যক্তিত্বের বিকাশ করে মানুষকে খুব কাজের লোক তৈরী করা হচ্ছে সন্দেহ নেই। কিন্তু এতে সে তার ঐক্যকে যাচ্ছে ভুলে আর তাই সে হয়ে যাচ্ছে গাছ-গাছড়ার মতো। এ প্রবাহ অব্যাহত থাকলে সারা পৃথিবী বিশৃঙ্খলা ও বিভ্রান্তির এক বিরাট ক্ষেত্র, এক অতি বড় ব্যাবেলের টাওয়ার হয়ে দাঁড়াবে। এ ভুল থেকে বাঁচতে হলে চাই ধর্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের যোগ। সেজন্যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মানুষকে শুধু কারিগরী শিক্ষা দিলেই চলবে না। হৃদয়ের শিক্ষা দিয়ে তার ভিতর প্রেমের প্রেরণাও জাগাতে হবে। ধর্মের সব কথা ভুল হতে পারে কিন্তু ধর্মের একটি কথা অত্যন্ত সত্য ও প্রয়োজনীয়, তা হচ্ছে, তার ঐক্যের বার্তা। সে ঐক্যের ভাব জাগাতে হলে মানুষকে তার হৃদয়ের বিস্তারের কৌশল শেখাতে হবে, যাতে তার জীবনের সব সমস্যাকে সব মানুষের স্বার্থের সঙ্গে সে যোগ করে দেখতে পারে। মানুষের আধ্যাত্মিক ঐক্য ও তার অপরিহার্য ফল প্রেমের সাধনাই শিক্ষার্থীকে এ প্রেরণা দিতে পারে। এর ফলে বৈজ্ঞানিক কর্ম প্রেরণা মানুষকে ঘৃণা, বিদ্বেষ ও ধ্বংসের পথে না নিয়ে সমাজ-সংহতির দিকে নিয়ে যাবে। মানুষের মধ্যে আবার ফিরে আসবে পারস্পরিক সমঝোতা ও প্রেম। আগামী দিনের শিক্ষা-দর্শনের এই অপরিহার্য কর্তব্যের ইঙ্গিত মাত্র করেই বর্তমান আলোচনার উপসংহার করতে চাই।

তার আগে উল্টো পথে চলার সমূহ বিপদ পূর্ব-পাকিস্তানের একটি চলতি গল্পের সাহায্যে বোঝাতে চাই। শোনা যায়, বর্ষা মাসে এক পণ্ডিত নৌকোয় করে মেঘনা পাড়ি দিচ্ছিলেন তাঁর পুরনো পুঁথির পুঁটুলি নিয়ে। তাঁর সহযাত্রী ছিল এক বিচক্ষণ মাঝি। ভরা নদীর মাঝখান দিয়ে মাঝির নৌকা চলছে। আর আত্মভোলা পণ্ডিত নৌকার ভিতর বসে তার পুঁটুলি খুলে একের পরে এক পুঁথি পড়ছেন। প্রথমে হাতে নিলেন এক জটিল ব্যাকরণের পুঁথি। খানিক দূর তার পাতা উল্টিয়ে হঠাৎ কৌতূহলবশে একমাত্র সঙ্গী মাঝির দিকে তাকিয়ে বললেন, "মাঝি, তুমি ব্যাকরণ পড়েছো?" নিরক্ষর মাঝি ব্যাকরণের বাড়ীর কাছ দিয়েও যায়নি। কাজেই তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল, "আজ্ঞে না।" ব্যাকরণের গোলকধাঁধায় সমাচ্ছন্নবুদ্ধি পণ্ডিত মাঝিকে বললেন, "তাহলে তোমার চার আনা জীবন বৃথা।" মাঝি অসহায় ও বিমর্ষভাবে পণ্ডিতের দিকে তাকিয়ে নৌকা বেয়ে চলে যেতে লাগল। খানিকক্ষণ পরে ব্যাকরণের পুঁথি রেখে পণ্ডিত পড়তে আরম্ভ করলেন অলঙ্কার-শাস্ত্র। ভাষা ব্যবহারের বিভিন্ন কৌশল পাঠে উল্লসিত হয়ে পণ্ডিত আবার মাঝির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন "তুমি কি অলঙ্কার শাস্ত্র পড়েছো?" গরীব মাঝি তার স্ত্রীর

কাচের গয়না ছাড়া অন্য কোনও অলঙ্কারের খবরই রাখে না। কাজেই বোকার মতো সহজ উত্তর দিল. "আজ্ঞে. না।" অলঙ্কারের রসাস্বাদে অসমর্থ মাঝির প্রতি এবার পণ্ডিত রায় দিলেন, "তোমার আরও চার আনা জীবন বৃথা।" এভাবে কিছুক্ষণ কেটে যাওয়ার পরে পণ্ডিত পড়তে আরম্ভ করলেন সাহিত্যের পুঁথি। সাহিত্যচর্চায় মগ্ন হয়ে তিনি আগের মতোই মাঝির দিকে তাকিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, সে সাহিত্য পড়েছে কি-না। মাঝিও আগের মতোই বলল, "না"। তিনটি জ্ঞানগর্ভ শাস্ত্র না-পড়ার বিরাট অপরাধস্বরূপ এবার ভাল করেই যোগ অঙ্ক সমাধা করে পণ্ডিত রায় দিলেন, মাঝির বারো আনা জীবনই বৃথা। এমন সময় বর্ষার আকাশ মেঘে ছেয়ে এল। আকাশ যেন নুয়ে পড়লো মাথার ওপর, আর মেঘনার বুকে উঠল প্রবল ঝড়। মাঝি অনেক কষ্টে সেই ডুবুডুবু নৌকা নিয়ে চেষ্টা করল তীরের কাছাকাছি আসতে, কিন্তু পারল না। তখন বিমর্ষ হয়ে পণ্ডিত মশায়ের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, "পণ্ডিত মশাই, আপনি কি সাঁতার দিতে জানেন?" নৌকাডুবিতে মরণোন্মুখ আত্মবিস্মৃত পণ্ডিত দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, "না"। অতি দুঃখের সঙ্গে মাঝি রায় দিতে বাধ্য হলো, "পণ্ডিত মশাই, আজ আপনার ষোল আনা জীবনই বৃথা।" আর কার্যত ঘটলোও তাই।

আজকের দিনের মানুষের বিজ্ঞানের জ্ঞানভারে ভরা জীবনতরী একত্বজ্ঞানের অভাবে বিদ্বেষের ঝঞ্ঝাঘাতে উদ্বেলিত অজ্ঞান-সমুদ্রে না চিরতরে ডুবে যায়, এটাই সবচেয়ে বড় আশংকার কথা। তার বেঁচে থাকার তাগিদেই শিক্ষাব্যবস্থার আমূল সংস্কার করে মানুষ মর্ত্যলোকে অমৃতত্বের আভাস পেয়ে শান্তি ও প্রগতির পথে এগিয়ে যাবে এ আশাই দৃঢ়ভাবে পোষণ করি।

তত্ত্ববিদ্যা-সার

পরিচালকের নিবেদন

বাংলা আমাদের মাতৃভাষা। এই কারণে বাংলা আমাদের অন্যতর রাষ্ট্র ভাষা বলিয়াও নীতিগতভাবে সরকারী স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। এতৎসত্ত্বেও, আমরা আজ পর্যন্ত জীবনের সর্বস্তরে বাংলা-ভাষাকে চালু করিতে সমর্থ হই নাই। নিঃসঙ্কোচে স্বীকার করি, আমাদের অক্ষমতার কারণ বহু। তন্মধ্যে বোধ হয় সর্বপ্রধান কারণটি এই : এতদিন আমরা অত্যধিক ভাবালুতাবশে কাজটি খুব সহজ বলিয়া মনে করিয়া আসিতেছিলাম ; হঠাৎ ব্যবহারিক ক্ষেত্রে নামিয়া দেখিতে পাইলাম যে, কাজটিকে যেমন পানির মতো তরল বলিয়া মনে হইয়াছিল, আসলে ইহা তাহা নহে ; জীবনের সহিত বিজড়িত বলিয়া, ইহা জীবনের ন্যায় বিশাল ও জটিল।

বলিতে কি, দেশের শিক্ষা-ক্ষেত্রে, বিশেষ করিয়া উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বাংলা-ভাষার প্রচলনের কথা চিন্তা করিতে গিয়া আমাদের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্‌গণ এই সত্য সম্যকভাবে উপলব্ধি করেন। তাঁহারা যে তাহা করেন, 'জাতীয় শিক্ষা কমিশনে'র রিপোর্টই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

এই রিপোর্টে বলা হয় যে, উচ্চশিক্ষাক্ষেত্রে বাংলা-ভাষাকে চালু করিতে গেলে শিক্ষার বর্তমান মানের দ্রুত অবনতি ঘটার সম্ভাবনা অত্যধিক। কারণ, দেশের অন্যতর রাষ্ট্রভাষা বাংলা সমুন্নত জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধারক ও বাহক নহে। সুতরাং, এই ভাষা যাহাতে পৃথিবীর উন্নততম জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধারক ও বাহক হইবার শক্তি অর্জন করে, সর্বাগ্রে তাহার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে হইবে। সেই লক্ষ্যে পৌঁছিতে হইলে, এই ভাষায় উন্নততম জ্ঞান-বিজ্ঞান ও কারিগরি-বিদ্যার অপর্যাপ্ত বই-পুস্তক রচনা করিতে হইবে। তবেই, এই ভাষা যথোপযুক্ত শক্তিশালী হইয়া উঠিবে এবং শিক্ষার মানের কোন অবনতি না ঘটাইয়া ইহাকে জ্ঞানের উচ্চতর ও উচ্চতম স্তরে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে চালু করা যাইবে।

বলা বাহুল্য, এমন একটি মহাদায়িত্বপূর্ণ কাজ সুসম্পন্ন করার জন্য যথোপযুক্ত প্রস্তুতি আবশ্যক এবং সে প্রস্তুতি গ্রহণের জন্যই বাংলা-উন্নয়ন-বোর্ড সংস্থাপিত (১৯৬৩) হইয়াছে। ফলে, শিক্ষার উচ্চতম স্তরে ব্যবহর্তব্য বাংলা পুস্তক রচনা ও প্রকাশনা এই বোর্ডের একটি প্রধান কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয়। এই কর্তব্যের আহ্বানে সাড়া দিতে গিয়া বোর্ড কলা, বিজ্ঞান ও কারিগরি বিষয়ে উন্নতমানের মৌলিক গ্রন্থ রচনায় মনোনিবেশ করিয়াছেন।

কলাবিভাগীয় 'তত্ত্ববিদ্যা-সার' দর্শন-শাস্ত্রের একটি মৌলিক গ্রন্থ। খ্যাতনামা দার্শনিক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর গোবিন্দচন্দ্র দেব এই গ্রন্থের প্রণেতা। ইংরেজীতে যাহাকে Metaphysics বলে, বাংলায় তাহাকে 'পরাবিদ্যা' বলা চলে। ডক্টর দেবের 'তত্ত্ববিদ্যা সার' দর্শন-শাস্ত্রের পরাবিদ্যাসম্বন্ধীয় উচ্চতর মানের একখানি মৌলিক বাংলা গ্রন্থ। বাংলা-ভাষায় দর্শন-শাস্ত্রীয় গ্রন্থের দারুণ অভাব না থাকিলেও, এই জাতীয় পরাবিদ্যা-বিষয়ক দার্শনিক গ্রন্থের অভাব অত্যন্ত প্রকট। আমাদের বিশ্বাস, ডক্টর দেবের গ্রন্থটি দর্শনের ক্ষেত্রে আমাদের এই অভাব কথঞ্চিৎ মোচন করিবে।

এই গ্রন্থের রচনা ও মুদ্রণে ডক্টর দেব আমাদের সহিত যেভাবে অকপটে সহযোগিতা করিয়াছেন, তাহা অন্য কাহারও কাছ হইতে পাইতাম বলিয়া মনে হয় না। আমি বোর্ডের পক্ষ হইতে গ্রন্থকারকে এইজন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। এখন গ্রন্থটি যে-উদ্দেশ্যে রচিত, তাহা আংশিক পূর্ণ হইলেই আমাদের শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক বলিয়া মনে করিব। ইতি—

বিনীত
মুহম্মদ এনামুল হক
পরিচালক,
কেন্দ্রীয় বাঙ্‌লা-উন্নয়ন-বোর্ড।

ভূমিকা

কেন্দ্রীয় বাঙলা-উন্নয়ন বোর্ডের নির্দেশ ও তাগিদে নানা কর্মব্যস্ততার ভিতর 'তত্ত্ববিদ্যা-সার' লেখা শেষ করা হলো। এতে যে ভুল-ত্রুটি কিছু থেকে গেলো তাতে সন্দেহ নাই। সন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে ভুল করার দুঃসাহসই আমাকে গত পঁচিশ বছর দার্শনিক সাহিত্য-সৃষ্টির প্রেরণা জুগিয়েছে, তারই এক যোগফল এই লেখা। শুভঙ্করের গাণিতিক পন্থের ধরাবাঁধা নিয়মের কিছুটা ব্যতিক্রম এতে থাকা তাই খুবই স্বাভাবিক।

জ্ঞানপিপাসু সাধারণ পাঠক ও দর্শনের ছাত্র ছাত্রী উভয়েরই প্রয়োজন সামনে রেখে এ-বই লেখা হয়েছে। অনেকে হয়তো এ-চেষ্টাকে কাঁঠালের আমসত্ত্ব তৈরীর মতো একটা উপভোগ্য, আজগুবী ব্যাপার বলে মনে করতে চাইবেন। তাঁদের ধারণা: কারণে অকারণে কঠিন পরিভাষায় জগদ্দল পাথর নতুন শিক্ষার্থীর কাঁধে চাপিয়ে দেয়াই দার্শনিকের আসল কাজ। সাধারণ পাঠকের গতিবিধি ঠিক এর উল্টো পথে।

তাই অনেকের মতে দুর্বোধ্যতা দর্শনের এক অপরিহার্য লক্ষণ। যা সুখবোধ্য, তা যেন অদর্শনেরই নামান্তর। এটা যে একটা বড় কুসংস্কার, বড় বড় দার্শনিকদের অনেকের লেখা পড়লে তা বারবার মনে হয়। এ-কুসংস্কার দূর করার চেষ্টা বর্তমান আলোচনায় কিছুটা করা হয়েছে। তাতে কতটা সফল হয়েছি জানি না।

দর্শন যে মানুষের ইতিহাসের এক বড় দান, ব্যক্তির ও মানবগোষ্ঠীর সার্থক জীবন যাত্রার রূপায়ণে দর্শনের দান যে মোটেই সীমিত নয়, এ-সত্য আমরা আজ বিস্মৃত। এর ফলেই এ-বৈজ্ঞানিক যুগের অভাবনীয় সমৃদ্ধি ও সম্ভাবনার ভিতর মানুষের মনে ভয় ও আতঙ্ক, ইসরাফিলের শিঙ্গার অতর্কিত, অপ্রত্যাশিত হুঙ্কার। এই ভয়াবহ পরিস্থিতি থেকে অব্যাহতি পাবার জন্যে প্রয়োজন দর্শন ও বিজ্ঞানের সমঝোতার, এ-কথা আমরা এ-আলোচনায় বার বার দেখবার চেষ্টা করেছি।

দর্শনের আসল রূপ নোট-বইয়ের মাধ্যমে চেনা যায় না। নোট-বইয়ের সাহায্যে দর্শন শিক্ষা অনেকটা কপিবুকের উপর প্রথম শিক্ষার্থীর হাতের আঁচড়ের মতো। দর্শনের সত্যিকার রূপের সঙ্গে পরিচিতির জন্যে চাই দার্শনিকদের লেখার, তাঁদের জীবনের সঙ্গে যোগ। ফটোগ্রাফের সাহায্যে অরিজিন্যালকে বোঝার চেষ্টা তাই এ-লেখার আরেক লক্ষ্য।

এতকাল আমাদের দার্শনিক শিক্ষায় সত্তেরো শতক-উত্তর আধুনিক য়ুরোপীয় দর্শনকে আমরা প্রাধান্য দিয়েছি। এ-ভাবধারা যে দার্শনিক চিন্তার এক গৌরব-ময় শিক্ষাপ্রদ অধ্যায়, তাতে সন্দেহ নাই! কিন্তু শুধু এর সাথে পরিচিতিকেই যদি আমরা দর্শন-পরিচিতি বলে ধরে নেই, তা'হলে দর্শনের ব্যাপক ঐতিহ্যের এক-চোখা দৃষ্টিকেই আমরা দর্শন বলে ভুল করতে বাধ্য: আর এ-ভুলই দর্শনের প্রায় সব ছাত্র-ছাত্রী আজও ক'রে যাচ্ছেন।

এ ভুল শোধরাবার উদ্দেশ্যে তত্ত্ববিদ্যা আলোচনায় আমরা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় দর্শনকে সমভাবে গুরুত্ব দেবার চেষ্টা করেছি।

মুসলিম দার্শনিক চিন্তার যে গৌরবময় অধ্যায় থেকে আধুনিক য়ুরোপীয় দর্শনের সূচনা, তার প্রতিও আমরা জিজ্ঞাসু পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণের বিশেষ চেষ্টা করেছি।

আমার লেখার মাধ্যমে দর্শনের প্রতি সাধারণ পাঠক ও ছাত্র-ছাত্রীদের অনুরাগ বৃদ্ধি হলে খুবই আনন্দিত হবো, তাতে সন্দেহ নাই। নিজের নানা অক্ষমতা সত্বেও দর্শনের জনপ্রিয়তার ভিতরই আমি নাড়ীর স্পন্দন খুঁজে পাবার চেষ্টা অনবরত ক'রে যাচ্ছি।

আমার প্রাক্তন ছাত্র, অধুনা সহকর্মী অধ্যাপক আমিনুল ইস্‌লাম সাহেব এ গ্রন্থ প্রণয়নে নানাভাবে সাহায্য করেছেন, তার জন্য তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

পরিশেষে, কেন্দ্রীয় বাঙলা-উন্নয়ন-বোর্ডের পরিচালক ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক্ সাহেব, প্রকাশন বিভাগের অধ্যক্ষ আবদুল কাদির সাহেব ও অন্যান্য কর্মী এ-গ্রন্থ সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে প্রকাশের জন্য যে যত্ন ও শ্রম স্বীকার করেছেন, সেজন্য তাঁদের সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানিয়ে আমার লেখার আদিপর্ব শেষ ক'রে দিতে চাই।

গোবিন্দচন্দ্র দেব

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

দর্শনের স্বরূপ

দর্শনের দুর্বোধ্যতা

কারণেই হোক আর অকারণেই হোক, দর্শন কথাটির অর্থ সাধারণ মানুষের কাছে সত্যই কিছুটা দুর্বোধ্য। এটা সাধারণ মানুষের দোষ, না দর্শনের দোষ, না দর্শনের বাহক ও পরিবেশক দার্শনিকদের দোষ, এ আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

বহু বৎসর দর্শনের আলোচনা ক'রে এক ভাবুক ব্যক্তি বলেছেন, দর্শনের কোনও গ্রহণযোগ্য সরল সংজ্ঞা তিনি আবিষ্কার করতে পারেন নি। বোধ হয় এই জন্যেই অনেক দার্শনিক বুদ্ধির নিক্তিতে মাপা-জোঁকা দর্শনের কোন সংজ্ঞা সরাসরি না দিয়ে, সৃষ্টির আদিযুগ থেকে দর্শন যেসব সমস্যার সমাধানে তৎপর তারই আলোকে দর্শনের স্বরূপ বোঝাবার চেষ্টা করেছেন।

এটা কিছু দোষের নয়। বানরকে যদি ধরতে-ছুঁতে না পাওয়া যায়, তবে তার লেজের স্পর্শকেই তার সত্তার স্পর্শ বলে মেনে নে'য়াই বুদ্ধিমানের কাজ। হয়তো ঠিক এই নিয়ম অনুসরণ করেই পুরানো দিনের পণ্ডিতেরা বিধান দিয়েছেন : "মধ্বভাবে গুড়ং দদ্যাৎ।" [মধু যদি দুর্লভ হয় তা'হলে গুড়ের দ্বারাই তার কাজ সেরে নে'য়া উচিত]। সুতরাং দর্শনের আসল রূপ যদি সত্যই সহজ বুদ্ধিতে দুরধিগম্য হয়, তবে দার্শনিক সমস্যার মাধ্যমে তার সম্পর্কে একটা আবছায়ার মতো ধারণা ক'রেই দর্শনের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

দার্শনিক সমস্যা

পাশ্চাত্য দর্শনের এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক আঠারো শতকের জার্মানীর ইমানুয়েল ক্যাণ্ট (১৭২৪-১৮০৪) বোধ হয় এইভাবেই ভাবিত হয়ে বলেছেন : আমাদের জ্ঞানের পরিধি কত দূর, কর্মজীবনে আমাদের করণীয় কি এবং কর্তব্য সম্পাদনের ফলে পরিণামে আমরা কী অভীষ্ট বস্তু লাভ করার আশা করতে পারি—এই তিনটি প্রশ্নের সুচিন্তিত সদুত্তর আবিষ্কার করাই দর্শনের আসল কাজ। দর্শনের থিওরী ও প্রয়োগ-বিস্তার এমন সুষ্ঠু, সার্থক ও সহজবোধ্য সার-সংক্ষেপ খুবই বিরল।

একটি উদাহরণের সাহায্যে ক্যান্টের কথার অর্থ একটু বিশ্লেষণ ক'রে দেখা যেতে পারে। আমরা যদি সুদূর অতীতের দেহবাদী চার্বাকের মতো অথবা তাঁর সোদরপ্রতিম আধুনিক বস্তুবাদীদের মতো মনে করি যে, মৃত্যুতেই আমাদের সত্তার শেষ, জগতের নিয়ন্তা ও পরিচালক আল্লাহ্‌তালা বা ঈশ্বর বলে কেউ নেই, তা'হলে এ-কথা ভেবে আমরা মোটেই আতঙ্কিত হবো না যে, রোজ-কেয়ামতে ইস্রাফিলের ধ্বংসের শিঙ্গা বাজার সঙ্গে সঙ্গে পাপীরা সব তাদের সঞ্চিত পাপের ফলে দোজখের জলন্ত আগুনে পুড়ে মরতে শুরু করবে, আর পুণ্যাত্মারা তাঁদের সঞ্চিত পুণ্যের বিনিময়ে বেহেশ্‌তের সুশীতল নির্ঝরিণীর তীরে মনোরম কুঞ্জবনে পরম সুখ উপভোগ করতে থাকবে। যারা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের অতীত কোনও সত্তা মানে না, তাদের পরম বাঞ্ছিত অভীষ্ট বস্তু ইহকালের সুখ ভোগ, তাদের কাছে পরকালের পাপের শাস্তি ও পুণ্যের পুরস্কার উপহাসের বস্তু। আজকের দিনের এক বড় দার্শনিক বার্ট্রেণ্ড রাসেল-ও দর্শনের সংজ্ঞা নির্ণয়ে ক্যান্টেরই অনুকরণ ক'রে দেখাবার চেষ্টা করেছেন যে, কোনও কেতাবী সংজ্ঞার চেয়ে দর্শনের বিশেষ সমস্যার আলোচনা দ্বারাই তার স্বভাব ও স্বরূপ অনেক ভালো বোঝা যায়।

স্বরূপ-লক্ষণ ও তটস্থ-লক্ষণ

একদল বুদ্ধিমান দার্শনিক বলেছেন, বস্তুর স্বভাব বুঝিয়ে দেবার পদ্ধতি দু'রকমের। বস্তু যদি সহজবোধ্য হয়, তার স্বরূপ সরাসরি বের ক'রে ফেলা সম্ভব। এভাবে বস্তুর স্বরূপ বর্ণনের পারিভাষিক নাম 'স্বরূপ-লক্ষণ'। কিন্তু কোনও বস্তুর তত্ত্ব এভাবে আবিষ্কার করা যদি সম্ভব না হয়, যদি অবস্থার চাপে রূপকথার অপরূপ রূপসী রাজকন্যার সাতপর্দা কাপড়ে ঢাকা মুখের মতো তার সত্তা আমাদের আড়াল হয়ে থাকে তবে আকারে-ইঙ্গিতে তার স্বভাব হয়তো বুঝিয়ে দে'য়া যেতে পারে। বস্তুর স্বরূপ বিশ্লেষণের এ কার্যকরী পদ্ধতির পারিভাষিক নাম 'তটস্থ-লক্ষণ', অর্থাৎ বস্তুর আসল স্বভাবের কাছাকাছি সহজ বোধগম্য স্থূল কিছুর সাহায্যে তার স্বরূপের সঙ্গে পরিচিতি।

'তটস্থ-লক্ষণ' কথাটি নদীতটের উপমা থেকে আবিষ্কৃত। সুদূর অতীতের যানবাহনহীন যুগে এক অদম্য সাহসী পর্যটক কোনও অজ্ঞাত দেশ আবিষ্কারে উদ্যত হন। তিনি লোক-পরম্পরায় জানেন যে, সে দেশ এক নদীবিশেষের তীরবর্তী। বহু সোজা ও ঘোরালো পথ অতিক্রম ক'রে তিনি সে দেশের উপকণ্ঠে এসে যখন হাজির, তখনও তিনি বুঝতে পারলেন না যে, এটাই তাঁর গন্তব্যস্থল। তাই ব্যাকুলচিত্তে সেখানকার জনসাধারণের কাছে তিনি জানতে চাইলেন সে

নদীর কথা। তা'রা তখন তাঁকে বললো ঃ "আপনি উত্তর দিকে আরও কিছু পথ এগিয়েই দেখতে পাবেন এক জলপ্রবাহের তীরে সারি সারি বটবৃক্ষ ও তার শাখায় অগণ্য পক্ষীর কলরবমুখর কুলায়। নিশ্চিত জানবেন এই সেই নদী, যার তীরে পৌঁছাবার জন্য আপনার এই উদ্যম।" বিলাতের টম, ডিক, হ্যারী ও তাদের সমগোত্রীয় আমাদের হরি, কেষ্টা, পঞ্চা ও আবদুল, রুস্তম ও আসকরের কাছে দর্শনের স্বভাব সহজবোধ্য নয় বলেই আবহমান কাল থেকে দর্শন যে সব প্রশ্নের সদুত্তর আবিষ্কারে সচেষ্ট, তারই সাহায্যে অর্থাৎ তটস্থ-লক্ষণের মাধ্যমেই ক্যাণ্ট ও রাসেলের মতো বড় বড় দার্শনিকদের দর্শনের স্বরূপ বোঝাবার চেষ্টা।

মতভেদ ও স্বকীয়তা

দর্শনের স্বরূপ যে সহজবোধ্য নয়, তার এক বিশেষ কারণ ইতিহাসের আদিযুগ হ'তে দার্শনিকদের বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দর্শনকে দেখার অনলস চেষ্টা। মহাভারতের এক প্রসিদ্ধ উক্তি—"নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নং।" [যাঁর নিজস্ব ভিন্নমত নেই, যিনি শুধু পরের মুখে ঝাল খান, তিনি কখনও মুনি বা মনীষী হতে পারেন না।] —এই উক্তিটি বিশ্বের দার্শনিক চিন্তার ইতিহাসে আক্ষরিক অর্থে সার্থক হয়ে ওঠেছে। মানব-সৃষ্টির আদিকাল থেকে আজ পর্যন্ত এমন দু'জন পাকাপোক্ত দার্শনিক খুঁজে পাওয়া কঠিন—যাঁরা দু'জনেই পুরোপুরি এক কথা বলেন।

দর্শনের এই বৈচিত্র্যই যারা দর্শনের অদর্শন-কামী, সত্যিকার দর্শন-পিপাসা যাদের নাই, তাদের কাছে গোলক-ধাঁধার মতো ঠেকে। মানুষের স্বকীয়তাকে ফুটিয়ে তোলার যে অনলস চেষ্টা দার্শনিকরা স্মরণাতীত কাল থেকে ক'রে আসছেন, তার রহস্যভেদ করতে না পেরে অনেকে মনে করেন, দর্শন অন্ধ লোকের অন্ধকারময় কালোবিড়ালহীন কক্ষে কালোবিড়াল হাতড়ে বেড়ানোর ব্যর্থ চেষ্টারই নামান্তর। ব্যক্তিকে স্বাধীন চিন্তার ও স্বাধীন চেষ্টার পূর্ণ সুযোগ দিয়ে তার স্বকীয়তার অভিব্যক্তিই যদি সভ্য মানুষের কাম্য হয়, তা'হলে বলা চলে ঃ দর্শন মানব-সভ্যতার এক অনবদ্য, অনাবিল ভাস্বর সৃষ্টি। তাই যেদিন মানুষ দর্শনের কালোবিড়ালের সন্ধান একেবারে ছেড়ে দেবে, সেদিন তার সঙ্গে তার ঊর্ধ্বতন পূর্বপুরুষ মর্কট-প্রবরের কিছু তফাৎ থাকবে কি-না ভেবে দেখা প্রয়োজন।

দর্শনের সহজ বুদ্ধিগম্য অর্থ

দর্শনের স্বরূপ সহজ বুদ্ধিতে দুর্বোধ্য হলেও অতি প্রাচীন যুগ থেকে খুব সাদাসিধা, সহজ, সরলভাবে দর্শনের সংজ্ঞা নির্ণয়ের চেষ্টা চলেছে। খ্রীস্টপূর্ব যুগের গ্রীক দার্শনিকরাই এ বিষয়ে আমাদের দিশারী ও পথিকৃৎ। জ্ঞানপিপাসাই

দর্শনের বৈশিষ্ট্য, এ-কথা মনে রেখেই তাঁরা দর্শনের নাম রেখেছিলেন: 'ফিলজফি'। ব্যুৎপত্তিগত বিশ্লেষণে 'ফিলজফি' কথাটির ভিতর 'ফিলজ' ও 'সোফিয়া'—এই দু'টি শব্দ পাওয়া যায়। এ দু'য়ের সমাসবদ্ধ নাম 'ফিলজফি'। 'ফিলজ' মানে প্রেম বা মহব্বত। আর 'সেফিয়া' মানে জ্ঞান বা 'এল্‌ম্'। সুতরাং সোজা কথায়, জ্ঞানের প্রতি অনুরাগ, 'এল্‌ম'র উপর মহব্বতের নাম ফিলজফি। খ্রীস্টপূর্ব যুগে সক্রেটিস্‌ ও প্লেটো থেকে শুরু ক'রে আজ পর্যন্ত পাশ্চাত্ত্য জগতে প্রচলিত ধারণা: ফিলজফির প্রধান কাজ জ্ঞান-আহরণ।

দর্শনে জ্ঞান-অনুরাগ

আরিষ্টটল তাঁর প্রসিদ্ধ পুঁথি 'তত্ত্ববিদ্যা'য় জ্ঞানের জন্য জ্ঞান আহরণের মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, যেহেতু মেটাফিজিক্‌স্‌ বা তত্ত্ববিদ্যা আমাদের প্রয়োজনের কোনও তাগিদ না মিটিয়ে জ্ঞান দেয়, সেইজন্য তত্ত্ববিদ্যাই সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যা। আজকের দিনের প্রয়োজনবাদী মনোবৃত্তি, যা' আমরা মদনমোহন তর্কালঙ্কারের প্রথমভাগের 'লেখা পড়া করে যে, গাড়ী ঘোড়া চড়ে সে' থেকে জানতে শুরু করি, তার সঙ্গে আরিষ্টটলের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীর আকাশ-পাতাল ব্যবধান।

দর্শন ও বিজ্ঞানের কৌলিক সম্বন্ধ

প্রাচীন গ্রীসে দার্শনিক চিন্তার শুরু থেকেই দর্শন ও বিজ্ঞানের নৈকট্য এত ঘনিষ্ঠ ছিল যে, সে দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের যমজ সহোদর বলে মনে হওয়াই স্বাভাবিক। আজকের দিনে যেমন হাটে মাঠে সর্বত্র বিজ্ঞান-প্রাধান্য, সেই যুগে তেমনি ছিল দর্শন-প্রাধান্য। কালক্রমে বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞান দর্শনের মায়া কাটিয়ে তারুণ্যের প্রাণ-চাঞ্চল্যে শুধু নিজের স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করেনি, দর্শনের সঙ্গে তার প্রাচীন কৌলিক সম্বন্ধও একরকম অস্বীকার করতে বসেছে।

এই নিকট-সম্বন্ধ ও কুলপঞ্জী এত পরিচিত হয়ে পড়েছিল যে, মাত্র পঞ্চাশ বছর আগেও বিজ্ঞানের সেরা পদার্থ-বিদ্যার নাম ছিল 'ফিলজফি অব্‌ নেচার', অর্থাৎ প্রকৃতিবিষয়ক দর্শন। একদিন বিজ্ঞানকেই দর্শন বলে আখ্যা দে'য়া ছিল রেওয়াজ, আর আজ দর্শনকেই বিজ্ঞান বলে' পরিচিত করার কত চেষ্টা!

দর্শনের নামকরণ

নাম বিশ্লেষণে বস্তু সম্বন্ধে সঠিক ধারণা সবসময় করা যায় না। খ্রীস্টপূর্ব যুগে যাঁরা দর্শনের এই আকিকা অনুষ্ঠান সাড়ম্বরে সমাধা করেছিলেন, তাঁরা এ-কথা জানতেন না যে, কালের চাকা একদিন উল্টোপথে এমনভাবে চলতে

শুরু করবে যে, তখন দর্শন ও বিজ্ঞানের এই প্রাচীন কৌলিক সম্বন্ধ মোটেই গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে না।

চুলচেরা বিচার-বিশ্লেষণ না ক'রে, সাধারণভাবে অবশ্য এ-কথা বলা চলে যে, বিজ্ঞান ও দর্শন উভয়েরই লক্ষ্য জ্ঞান আহরণ। তাই জ্ঞান-পিপাসাই দর্শনের ও বিজ্ঞানের যোগসূত্র, তাদের সাধারণ লক্ষণ। যে সুপ্রাচীন যুগে বিজ্ঞানের শৈশবের শুরু ও দর্শনের তারুণ্যের প্রথম পদক্ষেপ, সেদিন অনেকটা গোঁজামিল দিয়ে দর্শন ও বিজ্ঞানকে জ্ঞান আহরণের ভোজসভায় সমাসনে, এক পংক্তিতে বসিয়ে দে'য়া সহজ ছিল, অন্ততঃ কঠিন ছিল না, কিন্তু বিজ্ঞানের এই দ্রুত অগ্রগতির যুগে তাকে দর্শনের এক পর্যায়ভুক্ত করার চেষ্টা যে আজ নিষ্ফল ও হাস্যকর, তা' বলাই বাহুল্য।

তথাপি দর্শনের এই নামকরণকে খুব বেশী দোষ দে'য়া যায় না। কারণ এমন দৃষ্টান্ত খুব বিরল নয় যে, সন্তান-বাৎসল্যের আতিশয্যে জনক-জননী যে ছেলের নাম পদ্মলোচন রাখেন, প্রকৃতির নিষ্ঠুর বিধানে অনেক সময় হয়ত তার লোচনের স্বাভাবিক ক্রিয়াই থাকে না। আর তাঁরা যে মেয়ের নাম রাখেন নিরুপমা, তার চালচলন, আচার-ব্যবহার অনেক সময় এতই নগণ্য যে, তার উপমা খুঁজবার জন্য ঈষৎ চেষ্টারও প্রয়োজন হয় না। তাই ফিলজফির নামকরণে যদি দোষত্রুটি কিছু হয়ে থাকে তবে তা' উপেক্ষণীয়, সন্দেহ নাই। আর এ-কথাও এ প্রসঙ্গে উল্লেখনীয় যে, আজও দার্শনিকেরা ফিলজফির জ্ঞান দেবার ক্ষমতা যে কিছু আছে তা' একেবারে অস্বীকার করেন না।

দর্শন ও সক্রেটীসের জীবন

তবে সেই দর্শন-প্রাধান্যের যুগে দর্শনকে সোজাসুজি সাদাসিধাভাবে জ্ঞানদানের হাতিয়ার না বলে, জ্ঞান-পিপাসা বলে বর্ণনা ক'রে বিনয় প্রকাশ করার কারণ কি, তা' জানবার কৌতূহল চিন্তাশীল পাঠকের হওয়া স্বাভাবিক। এ প্রশ্নের উত্তর দর্শনের ইতিহাসের পাতায় স্পষ্ট হরফে লেখা আছে। দর্শনকে জ্ঞান-পিপাসা বলে আখ্যা দে'য়া হয়েছে বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম মানবতাবাদী জ্ঞানগুরু সক্রেটীসের স্বভাব-সুলভ বিনয়নম্র ভাবের প্রভাবে।

সক্রেটীসের পূর্ববর্তী দার্শনিক বাগাড়ম্বর-প্রিয় সোফিষ্টরা খুব জোরের সঙ্গেই বলতেন: পৃথিবীর সমস্ত জ্ঞানের চাবিকাঠি তাঁদের হাতে। তাঁদের এই অযৌক্তিক আস্ফালনের সদুত্তর দেবার জন্যেই সক্রেটীস আচারে-ব্যবহারে, কথাবার্তায়—এমন কি তাঁর জীবনের বিনিময়ে প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন যে, তিনি জ্ঞানী নন, জ্ঞানানুরাগী। প্রাচীন ও আধুনিক য়ুরোপীয় দর্শনে দর্শনকে

জ্ঞান-পিপাসা বলে যে বর্ণনা, তার মূলে মনীষী সক্রেটীসের এই মনোভাবের প্রভাব অপরিসীম।

হার্বার্ট স্পেন্সার ও দর্শনে সমন্বয়বাদ

চলতি দর্শনের পুঁথিতে আজকের দিনে দর্শনের যে সংজ্ঞা পাওয়া যায় তার প্রধান ব্যাখ্যাতা, এমন কি স্রষ্টা উনিশ শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী হার্বার্ট স্পেন্সার (১৮২০-১৯০৩)। তাঁর মতে, বিজ্ঞান জগতের বিভিন্ন বিভাগের যে জ্ঞান আহরণ করে, তার সমন্বয় সাধনই দর্শনের আসল কাজ। আমাদের দর্শনের ছাত্র-ছাত্রীরা দর্শনের এই সংজ্ঞার সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত। তারা প্রায় সকলেই, বুঝে হোক বা না বুঝে হোক, হার্বার্ট স্পেন্সারের দে'য়া দর্শনের এই সংজ্ঞা সচরাচর মুখস্থ ক'রে থাকেন।

সহজ বুদ্ধি, বিজ্ঞান ও দর্শন

স্পেন্সার বলেছেন: সহজ বুদ্ধির সাহায্যে জগৎকে আমরা যেভাবে জানি, তাতে আমগাছ, বটগাছ থেকে আলাদা, আলু পটোল থেকে আলাদা, মানুষ গরু থেকে আলাদা—এই ধারণাই আমাদের হয়। এক কথায়, জগতের যাবতীয় বস্তুর সম্বন্ধে নির্জলা ভেদজ্ঞানই সহজবুদ্ধি আমাদের ভিতর জাগিয়ে দেয়। জগতের বিচিত্র বস্তুরাশির পেছনে কোন নিগূঢ় ঐক্যসূত্র আছে কি-না, এ খবর সহজ বুদ্ধি রাখে না, হয়তো রাখতে চায়ও না, কারণ বস্তুর ভেদ বা ভিন্নত্ব নিয়েই তার কারবার।

জ্ঞানের পথে বিজ্ঞান আমাদের আরেক ধাপ এগিয়ে দেয়। পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা প্রকৃতির বিভিন্ন বিভাগের জ্ঞান আহরণ ক'রে বিজ্ঞান দেখিয়ে দেয় যে, প্রকৃতির অসংখ্য, অগণিত বৈচিত্র্যের পেছনে কতকগুলি ঐক্যসূত্র রয়েছে। বিজ্ঞানের পারিভাষিক ভাষায় এরই নাম 'প্রাকৃতিক নিয়ম'। কাঁঠাল গাছে যখন কাঁঠাল ফলে, আম ফলে না, আর আম গাছে যখন আম ফলে, কাঁঠাল ফলে না, তখন জানতে হবে: প্রকৃতির অসংখ্য বৈচিত্র্যের পেছনে কোনও ঐক্যসূত্র আছে। কিন্তু বিজ্ঞানের মতে সেই ঐক্যসূত্র এক নয়, বহু। জগতের বিভিন্ন বিভাগে প্রাকৃতিক নিয়ম ভিন্ন।

সোজা কথায়, সহজ বুদ্ধির জগতে শুধু নিছক ভিন্নত্ব বোধ, বহুর প্রতীতি আছে, ঐক্যের সন্ধান একরকম নাই বললেই চলে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে দেখা যায়, বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের তুলনায় সহজ বুদ্ধির জ্ঞান খুবই অসম্পূর্ণ। বুসহজ দ্ধির নিছক ভিন্নত্ব বোধ সরিয়ে দিয়ে বিজ্ঞান আমাদের ভিতর জাগিয়ে

দেয় বিশ্বের আংশিক ঐক্যবোধ, সহজবুদ্ধির অগণিত বস্তুর পেছনে বিজ্ঞান আবিষ্কার করে এক নিয়মের রাজত্ব।

হার্বার্ট স্পেন্সার মনে করেন, বিজ্ঞানের এই আংশিক একত্বকে দর্শন আরেক ধাপ এগিয়ে দেয় বিশ্বের পূর্ণ ঐক্যের ধারণা আমাদের ভিতর জাগিয়ে দিয়ে। বিজ্ঞানের অগণিত নিয়মের রাজত্বের পেছনে বিশ্বের এক মূল উপাদানের সন্ধান আবিষ্কার করাই তাই আবহমানকাল দর্শনের কাজ।

একত্ব-বিজ্ঞান : স্পিনোজা ও উপনিষদ

সতেরো শতকের ইহুদী দার্শনিক নিষ্কলঙ্ক-চরিত্র মনীষী স্পিনোজা দর্শনের এই স্বভাবের কথা স্পেন্সারের বহু আগে উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, জগৎ একদিকে এক অগণিত বস্তুপ্রবাহ আর অন্যদিকে এক অগণিত ভাবপ্রবাহ। এটা হলো তার বৈচিত্র্য বা বহুত্ব। কিন্তু এই দুই অগণিত ধারার মূল উৎস এক পরম ঐক্য। এই পরম ঐক্য আবিষ্কার করাই দর্শনের কাজ।

কথাটি খুব পুরানো। সুপ্রাচীন ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে : শ্বেতকেতু তাঁর পিতা আরুণির নিকট যখন চরম তত্ত্বের স্বরূপ জানতে চেয়েছিলেন, তখন তিনি তাঁকে বলেছিলেন : এমন এক বস্তু আছে—যাকে জানলে সব অশ্রুত জিনিস শ্রুত, সব অজানা জিনিস জানা হয়ে যায়। তা-ই বিশ্বের আদি উপাদান, তা-ই পরম সত্তা বা পরম তত্ত্ব।

আরুণি তাঁর পুত্র শ্বেতকেতুর তত্ত্বজ্ঞান উৎপাদনের জন্য সহজ বুদ্ধিগম্য যেসব উদাহরণ দিয়ে তাঁকে এই তত্ত্ব বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন, তার একটির এখানে উল্লেখ করাই হয়ত যথেষ্ট বিবেচিত হবে। আরুণি বলেছেন : শ্বেতকেতু, যেমন এক মৃত্তিকা-খণ্ডের বিশ্লেষণে সারা জগতের সমস্ত মৃন্ময় বস্তু—ঘটী, বাটী ইত্যাদি, জানা যায়, কারণ তারা মাটি ছাড়া আর কিছুই নয়, তেমনি এক চরম তত্ত্বকে জানলে দুনিয়ার অগণিত অসংখ্য বস্তুর সাধারণ স্বভাব জানা যায়। এই যে এক বিজ্ঞান—এরই নাম দর্শন। এরই আরেক নাম সর্ববিজ্ঞান, কারণ এই জ্ঞান একের মাধ্যমে জগতের সব বস্তুর একটা সাধারণ জ্ঞান জন্মিয়ে দেয়। অনুরূপভাবে উদ্বুদ্ধ হয়েই স্পিনোজা বলেছেন : একটি তৃণখণ্ডকে ভালো ক'রে জানলে জগতের পেছনে যে এক তত্ত্ব আছে তাকে আমরা জেনে ফেলতে পারি।

যাই হোক্, এই মতে সহজ বুদ্ধির দেওয়া অগণিত বৈচিত্র্য বোধই জ্ঞানের আদি পর্ব। এই অগণিত বৈচিত্র্যের পেছনে একটি নিয়মের রাজত্বের, অর্থাৎ

কতকগুলো ঐক্যসূত্রের আবিষ্কারই জ্ঞানের দ্বিতীয় পর্ব। এরই নাম বিজ্ঞান। আর এই খণ্ড খণ্ড ঐক্যসূত্রের পেছনে একটি সামগ্রিক সর্বব্যাপী ঐক্যসূত্র আবিষ্কারই জ্ঞানের অন্ত্য-পর্ব। এরই নাম দর্শন।

দর্শনে সমন্বয়-বিরোধিতা

সাম্প্রতিক কালের অনেক দার্শনিক দর্শনকে এ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে চান না। তাঁরা মনে করেন, হার্বার্ট' স্পেন্সার দর্শনকে যে সামগ্রিক জ্ঞান বলেছেন, তা' যে শুধু অতিরঞ্জিত তাই নয়, অতিমাত্রায় দোষযুক্তও বটে। তাঁরা বলেন, অনেকগুলো মানুষকে একত্র করলে যেমন আর একটা ব্যাপক মানুষ পাওয়া যায় না, ঘটী বাটী গাছ-পাথরকে একত্র করলে যেমন তা' থেকে আর একটি বড় রকমের ঘটী-বাটী জাতীয় পদার্থ খুঁজে পাওয়া যায় না. ঠিক তেমনি সমস্ত বিজ্ঞানের যোগফলও একটি অলীক অবাস্তব কল্পনা ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। পদার্থ-বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তের সঙ্গে মনোবিজ্ঞানের, আর মনোবিজ্ঞানের সিদ্ধান্তের সঙ্গে রসায়ন শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত যোগ ক'রে আর এক নতুন বিজ্ঞান খুঁজে পাওয়া যায় কি? কাজেই যাঁরা মনে করেন, এক বানর আর এক বানরের ঘাড়ে চেপে যেমন দেয়ালের শেষ সীমানায় উঠে যেতে পারে, তেমনি এক বিজ্ঞানের ঘাড়ে আর এক বিজ্ঞান চাপিয়ে আমরা জ্ঞানের শেষ সীমানায় পৌঁছে যেতে পারি, তাঁরা কল্পনা-বিলাসী ভাবুক হ'তে পারেন, কিন্তু তাঁদের বাস্তব জ্ঞান যে কিছু আছে, এ-কথা তাঁদের পরম-বন্ধুদের পক্ষেও প্রমাণ করা সুকঠিন হবে। সুতরাং বুদ্ধির সুরকি দিয়ে বিভিন্ন বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তগুলোকে ইঁটের মতো জুড়ে দিয়ে যাঁরা একত্ব-বিজ্ঞানের এক বড় ইমারত তৈরী করতে চান, তাঁরা ভ্রান্ত। এ-পথে দর্শন বলে কিছু খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। এ পথ সত্য আবিষ্কারের পথ নয়, নিছক ভাববিলাসের পথ। সংযত বস্তু-বিশ্লেষণের মাধ্যমেই আমরা তত্ত্বনির্ণয় করতে পারি, বল্গাহীন কল্পনা-বিলাসের দ্বারা নয়।

দর্শন ও বিজ্ঞানের স্বীকৃত মৌলিক ধারণা

এ মতের সমর্থকরা বলেন: দর্শন সব বিজ্ঞানের জগাখিচুড়ি হতে পারে না। বিজ্ঞানের পেছনে যে সমস্ত মৌলিক ধারণা রয়েছে, যাদের স্বরূপ বিজ্ঞান বিশ্লেষণ করে না বা করতে পারে না, তাদের স্বরূপ নির্ধারণই দর্শনের আসল কাজ। যেমন টেবিল, চেয়ার, গাছ, পাথর প্রভৃতি বস্তুর ও তাদের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, সাদা কালো রং ইত্যাদি গুণের কথা পদার্থ বিদ্যা দিন রাত বলে, কিন্তু বস্তু পদার্থটি যে কি ও তার গুণের সঙ্গে বস্তুর যে সম্বন্ধ কি, তা' পদার্থ-বিদ্যা আলোচনা করে না। আর দুনিয়ার অগণিত ঘটনা-প্রবাহের পেছনে বিজ্ঞান যেসব নিয়ম আবিষ্কার

করে, তার মূলে রয়েছে কার্য-কারণ-সম্বন্ধ-বোধ। যে পূর্ববর্তী ঘটনা থেকে পরবর্তী ঘটনার উৎপত্তি, তাকে আমরা কারণ বলি, আর পরবর্তী ঘটনাকে তার কার্য বা ফল বলি। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়: ঔষধ সেবন কারণ, আর ব্যাধি-নিরাময় কার্য। এই কার্য-কারণ-সম্বন্ধের প্রতীতি বিজ্ঞানের সব আবিষ্কারের মূলে। এই কার্য-কারণ-সম্বন্ধের প্রতীতির সাহায্যেই বিজ্ঞান প্রকৃতির অসংখ্য বৈচিত্র্যের ভিতর ভিন্ন ভিন্ন ঐক্যসূত্র বা প্রাকৃতিক নিয়ম আবিষ্কার করে। এই প্রাকৃতিক নিয়মের সাহায্যেই বিজ্ঞান বলে, জগতের সব ঘটনাই কার্য-কারণ নিয়মে ঘটে থাকে, —মোজেজা বা অলৌকিক ঘটনা বলে কিছু হয় না, হতে পারে না। কিন্তু এই কার্য-কারণ-তত্ত্ব নিয়ে বিজ্ঞান বিশেষ মাথা ঘামায় না। বিজ্ঞানের পরীক্ষা-নিরীক্ষার পেছনে এ জাতীয় যে সব আদিম সত্যের স্বীকৃতি, তারই স্বরূপ বিশ্লেষণের নাম দর্শন।

ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যবর্তী অনধিকৃত প্রদেশ

আমরা আগে বলেছি, বার্ট্রেণ্ড রাসেল দার্শনিক সমস্যার মাধ্যমে দর্শনের স্বভাব ও স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে চান। দর্শনের যে সংজ্ঞা এখানে আমরা দিলাম তার আলোকে বার্ট্রেণ্ড রাসেল দর্শনের স্বভাব ও স্বরূপ সম্বন্ধে যে কথা বলেছেন তার একটু আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হবে না মনে করে এখানে তার অবতারণা করছি। রাসেল তাঁর তথ্যপূর্ণ 'পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাসে'র প্রারম্ভেই দেখাবার চেষ্টা করেছেন: সভ্য শিক্ষিত মানুষের মনে কতকগুলো প্রশ্ন জাগে—যার যুক্তিসঙ্গত উত্তর ধর্মশাস্ত্রেও পাওয়া যায় না, আর বিজ্ঞানেও পাওয়া যায় না। যেমন আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা বলে কিছু আছে কি-না, না আমাদের ভাগ্যলিপি এমনি পূর্ব-নির্ধারিত যে, তাতে সামান্য পরিবর্তন, এমন কি একটা কমা সেমি-কোলন যোগ করার ক্ষমতাও আমাদের নাই; জড় অচেতন দেহের সঙ্গে চেতন মনের সম্বন্ধ কি, মৃত্যুর পর কোন চেতন সত্তা থাকে কি-না, জগতের অসংখ্য বৈচিত্র্যের পেছনে কোন অজ্ঞাত, কোন অদৃশ্য হস্তের সঙ্কেত আছে কি-না, না জগৎ শুধু যান্ত্রিক পদ্ধতিতে নিরুদ্দেশ যাত্রাপথে এক অনির্দিষ্ট অভিযান, এক রকম জীবনযাত্রা-পদ্ধতিকে পাশবিক আর আরেক রকম পদ্ধতিকে মহান ও দেব-সুলভ বলা চলে কি না, জীবনের সনাতন, শাশ্বত অবস্থা-নিরপেক্ষ মান আছে কি না—এ জাতীয় প্রশ্নের অতি সহজ উত্তর ধর্মশাস্ত্রে পাওয়া যায়। যাঁরা বিশ্বাসী তাঁরা ধর্মশাস্ত্রের সে সব কথা মেনে নিতে পারেন, কিন্তু যাঁদের মনোবৃত্তি বৈজ্ঞানিক, যাঁরা বিনা বিচারে কোন সত্য স্বীকার করতে নারাজ, তাঁরা জীবনের এই সব গভীর প্রশ্নের এত সহজ সরল উত্তর মেনে নিতে পারেন না। আর

দুঃখের বিষয়, বিজ্ঞান এই সব প্রশ্নের উত্তর দেয় না, কখনো দেবে কি-না তাও জানা নাই। রাসেলের মতে এই সব প্রশ্ন ধর্ম ও বিজ্ঞানের আওতার বাইরে, তাদের মাঝখানে যে সঙ্কীর্ণ সীমারেখা এরা তারই দ্যোতক। এই সীমারেখার স্বরূপ আবিষ্কারই দর্শনের প্রধান কাজ, ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যবর্তী এই অনধিকৃত প্রদেশেই দর্শনের গতিবিধি।

পাশ্চাত্য দর্শনে বিজ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে দর্শনের স্বভাব ও স্বরূপ বিশ্লেষণের যে দুই পরস্পর-বিরোধী চেষ্টা দেখতে পাওয়া যায়, তার সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানেই শেষ করতে চাই।

দর্শনে প্লেটোবাদ

য়ুরোপীয় দর্শনে প্রধানতঃ প্লেটোর প্রভাবে দর্শনের স্বরূপ ও স্বভাব সম্বন্ধে যে তৃতীয় মত প্রচলিত, তার কথা এখন একটু আলোচনা প্রয়োজন। দর্শনের স্বরূপ ও স্বভাব সম্বন্ধে প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে এ মত খুবই পরিচিত। এই মত অনুসারেই দর্শনের তত্ত্ববিদ্যা বা অধিবিদ্যা নামকরণ।

বঙ্কিমচন্দ্রের আফিমখোর কমলাকান্ত আফিমের মৌতাতে দুনিয়াকে যেমন অনেকটা নতুন চোখে দেখতো, তেমনি সৃষ্টির আদিযুগ থেকে একদল মানুষ দেখতে পাওয়া যায় (আদম-শুমারীর খাতায় তাদের সংখ্যা খুব কম হতে পারে), যাঁরা মনে করেন দুনিয়াকে আমরা সাদা চোখে যেমন দেখি, এটা তার আসল চেহারা নয়, এটা তার নকল চেহারা। তার এ রূপ চিত্রশালার ফিল্মের মতো ক্ষণে ক্ষণে বদলায়। তার যেমন কোনও শাশ্বত রূপ-ও নাই, তেমনি তার কোনও শাশ্বত মান ও নাই। যে অস্থির পরিবর্তন-প্রবাহ আলেয়ার মতো মানুষকে ঘুরিয়ে মারছে, এটাই জগতের আসল রূপ নয়। এর পেছনে জগতের এক শাশ্বত রূপ, এক শাশ্বত মান বর্তমান। তাকে আবিষ্কার করা, তার সঙ্গে পরিচিতি ও কর্মজীবনে তাকে পরম পাথেয় ও উপজীব্য ক'রে তোলাই দর্শনের স্বরূপ, স্বভাব ও লক্ষ্য। পাশ্চাত্ত্য দর্শনে প্লেটোবাদ এ দৃষ্টিভঙ্গীর অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, তার ধারক, বাহক ও সংরক্ষক।

প্রচলিত ধর্মে আমাদের দুঃখে ভরা দুনিয়ার পেছনে অনন্ত সুখে-ভরা বেহেশতের যে কল্পনা ও স্বীকৃতি, প্লেটোবাদ তাকেই দিয়েছে দার্শনিক রূপ। আমাদের চঞ্চল, দুঃখময় ও দোষবহুল জগতের পেছনে রয়েছে আর একটি জগৎ— যা শাশ্বত, সুখময় ও পরিপূর্ণ। দর্শন সে আদর্শ জগতের বার্তারই বাহক। ছোটবেলায় এক ধর্ম সংগীতে শুনেছিলাম :

"—চল যাই ভাই সে নগরে
যথা দিবানিশি পূর্ণ শশী আনন্দে বিহরে।"

প্লেটোর দার্শনিক মত ছোটবেলায় শোনা সে গানের সুর চণ্ডীদাসের ভাষায় "কানের ভিতর দিয়ে মরমে পশিয়া" প্রাণ আকুল ক'রে তোলে, তথাকথিত সভ্য সমাজে উপহাস্যাস্পদ হবার ভয় থাকলেও এ সত্য অস্বীকার করতে পারি না।

পাশ্চাত্ত্য দর্শনে দর্শনের স্বরূপ সম্বন্ধে যে তিনটি মত, সংক্ষেপে তার আলোচনা এখানেই শেষ করতে চাই। তার পেছনে যে দার্শনিক প্রেরণা, তারও একটু বিশ্লেষণ প্রয়োজন। সোজা কথায়, প্রাচীন গ্রীসে ও আধুনিক য়ুরোপে দার্শনিক গবেষণার মূলে যে মনোবৃত্তির স্বীকৃতি, তার কথা একটু না জানলে দর্শনের স্বরূপের যে ছবি পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকরা এঁকেছেন তার সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা হওয়া অসম্ভব।

পাশ্চাত্ত্য মতে দর্শনের উৎস

পাশ্চাত্ত্য দর্শনের আদিগুরু প্লেটো ও আরিষ্টটল উভয়েরই মতে দর্শনের উৎস বিশ্বজগৎকে জানার কৌতূহল। উপরে অসংখ্য গ্রহ-তারা-নক্ষত্র-খচিত অনন্ত আকাশ, আর তার নিম্নে অগণিত বৈচিত্র্যময় বাহ্যজগৎ। এর রহস্য উদঘাটনের স্বাভাবিক স্পৃহা মানুষের মনে চিরন্তন। সহজ বুদ্ধি সে স্পৃহা মেটাতে পারে না, বিজ্ঞানও সে স্পৃহা মেটাতে অপারগ। একমাত্র তত্ত্বজ্ঞানই সে স্পৃহা মেটাতে সক্ষম। এখানেই দার্শনিক-তত্ত্বজ্ঞানের প্রয়োজন ও সার্থকতা।

প্লেটোর প্রায় দু হাজার বছর পরে তাঁর মতেরই ভাষান্তর ক'রে আধুনিক য়ুরোপীয় দর্শনের জনক ডেকার্ট বলেছেন: সংশয় থেকেই দর্শনের উৎপত্তি। আমরা যা' কিছু দেখি, যা' কিছু জানি, যা' কিছু নিয়ে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের বেচাকেনা, তার সব কিছুরই সত্তা সম্বন্ধে আমরা সন্দিহান হতে পারি। স্বপ্নলোকে নিদ্রার আবরণে যে বিচিত্র জগতের অনুভূতি, নিদ্রাভঙ্গেই তার বিলোপ। কে জোর ক'রে বুকে হাত দিয়ে বলতে পারে, জন্ম থেকে মরণ পর্যন্ত আমরা জেগে স্বপ্ন দেখছি কি না? দার্শনিক বিশ্লেষণ দ্বারা এ প্রশ্নের সদুত্তর আবিষ্কার করাই আমাদের উদ্দেশ্য। সুতরাং সংশয় থেকেই দর্শনের শুরু। আর সংশয়ের সমাধানেই দর্শনের শেষ।

এবার প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষের বৈচিত্র্যবহুল দার্শনিক চিন্তার আলোকে দর্শনের স্বরূপ নির্ধারণের একটু চেষ্টা করা যাক। চুলচেরা বিশ্লেষণের ভিতর না গিয়ে সাধারণভাবে বলা চলে, প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারতীয় দার্শনিকদের

অনেকেই দর্শন সম্বন্ধে প্লেটোর মতেরই সমর্থক। যাঁরা প্রাচ্যের দর্শনকে বড় ক'রে প্রাচীন গ্রীস ও রোমের দর্শনকে ছোট করতে চান, তাঁদের মতে এ সাদৃশ্য গ্রীক-দর্শনের উপর, বিশেষতঃ প্লেটোর উপর, প্রাচ্য প্রভাবেরই পরিণতি। যাঁরা আবার প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারতের দর্শনকে খাটো ক'রে গ্রীক দর্শনকে বড় করতে চান, তাঁরা এ বিষয়ে ঠিক উল্টো মত পোষণ করেন। স্বাজাত্য-বোধ ও স্বদেশ-প্রেমে তাঁদের দৃষ্টি অতিরঞ্জিত ও বিকৃত। তারুণ্যের আধিক্যে নিজের বিবিকে সবার বিবির চেয়ে সুন্দর মনে হওয়া স্বাভাবিক; কিন্তু বার্ধক্যের তিক্ত-মধুর অভিজ্ঞতার আলোকে যখন সেই রঙ্গীন প্রেমের নেশা কেটে যায়, তখন হয়তো বোঝা যায়, বস্তুর আসল স্বরূপ যা-ই হোক্ না কেন, প্রেমের স্পর্শে প্রেমিকের চোখে তা' সত্যই সুন্দর দেখায়। তাই মনে হয়, স্থান-মাহাত্ম্যের অত্যধিক চাপে প্রাচ্য বা পাশ্চাত্ত্য দর্শন কাউকেই খাটো না ক'রে নিরপেক্ষভাবেই তাদের মূল্যায়ন করা উচিত। তারা কে কার কাছে কতটুকু ঋণী, সে প্রশ্নের উত্তর আজও ইতিহাস আবিষ্কার করতে পারেনি। স্বাজাত্য-বোধ ও স্বদেশ-প্রেমে নয়, আজকের দিনের অনাবিষ্কৃত আগামী দিনের ইতিহাসেই তার উত্তর নিহিত।

যাই হোক্, মোটামুটি প্লেটোর মতোই প্রায় সব ভারতীয় দার্শনিক মনে করেন: ইন্দ্রিয়ানুভূতির রূপ রস-গন্ধ-শব্দ স্পর্শের যে জগৎ আমাদের সামনে প্রতিভাত, যার দাপটে আমরা জন্ম থেকে মরণ পর্যন্ত জর্জরিত, তার পেছনে আর কোনও এক ধ্রুব সত্তা আছে, যার স্বরূপ নির্ণয়ই দর্শনের আসল কাজ।

প্রাচীন দর্শনে ধর্মীয় প্রেরণা

প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারতীয় দর্শনে কিছু কিছু বৈজ্ঞানিক সত্য খুঁজে পাওয়া যায় সন্দেহ নাই; তবে সে দর্শনের সঙ্গে বিজ্ঞানের যোগ খুব গভীর ও নিবিড় নয়। সে যুগ মুখ্যতঃ ধর্ম-প্রভাবিত। কাজেই হার্বার্ট স্পেনসারের ফরমুলা অনুসারে দর্শনকে বিজ্ঞানের যোগফল ব'লে বর্ণনা করা ভারতীয় দর্শনের সেকালের পরিবেশে অসম্ভব। তবে অনেক ভারতীয় দার্শনিকের মতেই দর্শন একত্ব-বিজ্ঞান। তাঁরা মনে করেন, আমরা যে চঞ্চল বহুর জগতে বাস করছি, তার পেছনে যে অদ্বয়, অচল সর্বব্যাপী তত্ত্ব, তার স্বরূপ নির্ণয়, তার সঙ্গে আমাদের সহজ অনুভূতির জগতের ও আমাদের নিজের সম্বন্ধ আবিষ্কার করাই দর্শনের কাজ। এ দৃষ্টিকোণ থেকে দর্শনকে আমাদের সহজ অভিজ্ঞতার সমন্বয় বলাও হয়তো চলে। কিন্তু আগেই বলেছি, এ একত্ববোধের মূলে সেই দিনের প্রেরণা ছিল মুখ্যতঃ, ধর্মীয়, বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টার পরিণতি হিসাবে তাকে দেখার প্রয়োজন সেদিনের মানুষ তেমন অনুভব করেনি।

প্রাচ্য মতে দর্শনের উৎস

দর্শনের স্বরূপ ও স্বভাব সম্বন্ধে প্লেটো-প্রভাবিত পাশ্চাত্ত্য দর্শনের সঙ্গে ভারতীয় দর্শনের মিল যতই থাকুক না কেন, মানব মনের যে অভাববোধ থেকে দর্শনের উৎপত্তি, তার সম্বন্ধে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য মতে প্রচুর গরমিল, আকাশ-পাতাল তফাৎ। পাশ্চাত্ত্য চিন্তায় দর্শনের সঙ্গে জ্ঞানের যোগ সাক্ষাৎ, প্রয়োজনের যোগ পরোক্ষ, প্রাচ্য চিন্তায় দর্শনের সঙ্গে প্রয়োজনের যোগ সাক্ষাৎ, জ্ঞানের যোগ পরোক্ষ। তাই প্লেটো ও আরিষ্টটল দর্শনের উৎস খুঁজে পেয়েছেন মানুষের কৌতূহল-স্পৃহায়, ডেকার্ট পেয়েছেন তাঁর ঈষৎ-পরিবর্তিত সংস্করণ—সংশয়ে। আর প্রায় সব ভারতীয় দার্শনিক, তাঁরা হিন্দুই হোন্ আর বৌদ্ধই হোন, আর যা' কিছুই হোন্, যেন-তেন-প্রকারেণ, যে কোনও ভাবেই হোক, দর্শনের উৎস খুঁজে পেয়েছেন প্রয়োজন-বোধে দুঃখ-নিবৃত্তির প্রচেষ্টায়। তাঁরা বলেন: দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি তত্ত্ব-জ্ঞান থেকেই সম্ভব।

আমরা লৌকিক উপায়ে দুঃখের হাত থেকে অব্যাহতি পাবার যে চেষ্টা করি, তা' সাময়িকভাবে আমাদের দুঃখ নিরস্ত করতে পারে; কিন্তু সে দুঃখ যে আবার আমাদের হবে না তার কোনও নিশ্চয়তা নাই। বিজ্ঞ ভেষজ্ঞের বিধানে ম্যালেরিয়া জ্বরে কম্পিত-কলেবর রোগী তিক্ত কুইনাইন সেবন ক'রে আরোগ্য লাভ করে; কিন্তু ভেষজ তাকে হলফ ক'রে বলতে পারে না যে, আর তার কখনো ম্যালেরিয়া হবে না। একে বলে দুঃখের সাময়িক নিবৃত্তি। মানুষের আসল প্রয়োজন তার সব দুঃখ এমনভাবে নিবৃত্ত করা যেন তার কোন অবশেষ থাকে না, যেন তার আর পুনরাবৃত্তি হয় না। এই যে অবশেষ-রহিত দুঃখের অবশ্যম্ভাবী বিনাশ, এরই নাম চূড়ান্ত দুঃখ নিবৃত্তি। ভগবান বুদ্ধ এরই নাম দিয়েছেন নির্বাণ, অর্থাৎ বাসনার নিবৃত্তি ও পরম শান্তি।

ভারতীয় দার্শনিকদের মতে, মানুষ এই দুঃখ নিবৃত্তির তাগিদেই তত্ত্বজ্ঞান লাভে উন্মুখ হয়। কখনও কখনও এত আবেগের সঙ্গে তাঁরা এই দুঃখ নিবৃত্তির প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করেছেন যে, সময়ের এত ব্যবধানে আজও তা' আমাদের মনে গভীর রেখাপাত করে। তাঁরা বলেছেন: দুনিয়ায় দুঃখের চাপ এত বেশী যে, যার বিবেক বা সত্যিকার বিচারবুদ্ধি আছে, দুঃখের চাপ সে এত বেশী অনুভব করে যে, তার মনে হয় তার মাথায় আগুন অনবরত দপ দপ ক'রে জ্বলছে—যার জন্য সে পানিতে ঝাঁপ দিতে চায়। "প্রদীপ্তশিরা জলরাশিমিব"। এ জ্বলন্ত আগুন দুঃখ-অনুভূতিরই আগুন, আর এ পানি সাধারণ পানি নয়, তত্ত্বজ্ঞান বারি।

বুদ্ধের দৃষ্টান্ত

ভগবান তথাগত বুদ্ধের জীবন এই বিবেক ও বৈরাগ্য অনুভূতির এক ঐতিহাসিক উদাহরণ। আর বুদ্ধই প্রেরণা যুগিয়েছেন সাক্ষাৎভাবে না হোক পরোক্ষভাবে বৌদ্ধ-দর্শনের বিভিন্ন শাখার পরিণতি ও বিবর্তনে। পরোক্ষভাবে বলার কারণ, বুদ্ধের দার্শনিক বাক্-বিতণ্ডায় প্রবল ঔদাসীন্য। কি ভাবে তিনি রাজ্যসুখ, পরম রূপসী বিদুষী ভার্যা ও নবজাত পুত্রকে পরিত্যাগ ক'রে দুঃখের হাত থেকে অব্যাহতি পাবার উপায় আবিষ্কারের জন্য বেরিয়ে পড়েছিলেন ও দীর্ঘ ছয় বছরের নিরন্তর সাধনার ফলে দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তির উপর খুঁজে বের করেছিলেন, সে ইতিহাস সর্বজনবিদিত। শুধু বুদ্ধের দৃষ্টান্ত দিয়েই বুঝিয়ে দেওয়া চলে যে, ভারতীয় দর্শন ও পাশ্চাত্য দর্শন দু'য়েরই শেষ লক্ষ্য যদিও এক, তথাপি তাদের প্রাথমিক পার্থক্য অনস্বীকার্য। প্রায় সব দার্শনিকই বলেন: আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে দার্শনিক জ্ঞানের ফল মোটেই সীমিত নয়, অপরিসীম। এখানে পাশ্চাত্ত্য ও ভারতীয় দার্শনিক চিন্তায় বিশেষ কোন পার্থক্য আছে বলে মনে হয় না। তবে তার শুরু থেকেই ভারতীয় দার্শনিক চিন্তার উৎপত্তি প্রয়োজনবোধ থেকে, আর পাশ্চাত্ত্য দর্শনের উৎপত্তি জ্ঞানস্পৃহা থেকে। এখানেই তাদের তফাৎ।

দর্শন ও ফিলজফি

বোধ হয় এই কারণেই পাশ্চাত্ত্য ফিলজফি ও ভারতীয় দর্শন এ দু'টি কথার আক্ষরিক অর্থেও প্রচুর তফাৎ। আগেই বলেছি, ফিলজফি কথার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ জ্ঞান-প্রীতি। দর্শন কথার আক্ষরিক অর্থ প্রত্যক্ষ অনুভূতি বা প্রজ্ঞা। প্রায় সব ভারতীয় দার্শনিকদের মতে, বস্তুকে যেমন দেখা যায়, তেমনি দুনিয়ার পেছনে যে শাশ্বত সত্তা, তাকেও সাধন অভ্যাসের ফলে সংসার আসক্তি-শূন্য শুদ্ধচিত্তে দেখা যায়। এই যে দ্বিতীয় প্রকারের অনুভূতি, এরই নাম দর্শন বা তত্ত্বের সাক্ষাৎ জ্ঞান। যে শাস্ত্রে এই প্রত্যক্ষ অনুভূতির আলোচনা, তাকেও আমরা গৌণ অর্থে দর্শন বলি, কারণ তার সাহায্যে আমরা সেই তত্ত্ব-অনুভূতির পথে অগ্রসর হই। এই দৃষ্টিকোণ থেকে অনেক পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকের মতকে ফিলজফি বা জ্ঞান-পিপাসা বলা চলে, কিন্তু দর্শন বা তত্ত্বজ্ঞান বলা চলে না। কারণ তাঁদের অনেকের মতে, দর্শন বুদ্ধির সাহায্যে তত্ত্ব সম্বন্ধে আমাদের পরোক্ষ প্রতীতি জাগিয়ে দেয়, কোনও প্রত্যক্ষ অনুভূতি জাগিয়ে দেয় না বা জাগিয়ে দিতে পারে না।

মুসলিম দার্শনিকদের দর্শন-সমন্বয়

আরব দেশের প্রথম দার্শনিক খ্রীস্টীয় নবম শতাব্দীর কিন্দাস উপজাতির আল্‌কিন্দি থেকে শুরু ক'রে দ্বাদশ শতাব্দীর ইবনে রুশ্‌দ পর্যন্ত মুসলিম দার্শনিকদের ভিতর একদিকে ধর্ম ও দর্শনের, আর একদিকে দর্শন ও বিজ্ঞানের একটি যোগসূত্র আবিষ্কার করার চেষ্টা দেখা যায়। প্রথমটি সম্ভবতঃ ইসলাম-প্রভাবের, আর দ্বিতীয়টি গ্রীক-প্রভাবের ফল। মুসলিম দার্শনিকদের ধর্ম-দর্শন-সমন্বয় ও দর্শন-বিজ্ঞান-সমন্বয় থেকে এ কথা মনে হওয়া খুবই স্বাভাবিক যে, তাঁদের মতে দর্শনের শেষ লক্ষ্য অধ্যাত্মজ্ঞান। আবার তাঁদের দর্শন-বিজ্ঞান-সমন্বয় থেকে এ-কথা মনে হওয়াও স্বাভাবিক যে, দর্শনের উৎস জ্ঞান-পিপাসা। দর্শনের উৎস সম্বন্ধে যে দু'টি আপাত-বিরোধী ধারণা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য দর্শনে পাওয়া যায়, তাদের দু'টির সমন্বয়ের চেষ্টা মুসলিম দার্শনিকরা যে করেছেন, এ কথা অনস্বীকার্য। দর্শনের ধর্মীয় অনুভূতিতে রূপান্তরে তাঁরা প্রাচীন ভারতীয় মতের সমর্থন, আর জ্ঞান পিপাসায় দর্শনের উৎস কল্পনায় তাঁরা পাশ্চাত্ত্য মতের সমর্থন করেছেন।

সাম্প্রতিক সংশয়

দর্শনের স্বরূপ সম্বন্ধে যে নাতিদীর্ঘ আলোচনা করা হলো তা' থেকে এ-কথা জানা গেল যে, মানব-জীবনের কতকগুলো মৌলিক প্রশ্ন—যেমনঃ এ জগতের নিয়ন্তা ঈশ্বর ব'লে কেউ আছেন কি না, আর তিনি যদি সত্যই সর্বশক্তি ও কল্যাণের আধার হন, তা'হলে ইতিহাসের আদিযুগ থেকে এ সংসারে এত অশুভ, এত অন্যায়, এত অত্যাচার কেন, যার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা ক'রে কবি বলেছেন ঃ

"মহা বিদ্রোহী রণক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত,
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না
অত্যাচারীর খড়গ-কৃপাণ ভীম রণভূমে রণিবে না।"

এ সবের উত্তর বিচার-বুদ্ধির সাহায্যে দর্শনকে দিতে হবে। আজকের দিনের সংশয়শীল সভ্য মানুষ প্রশ্ন করে : বিশ্বের স্রষ্টা অনন্ত শক্তিমান আল্লাহ্‌তালা বা ঈশ্বর যদি অনন্ত কল্যাণ-গুণেরই আধার হন তবে মাত্র পঁচিশ বছরের ব্যবধানে দু'টি বিশ্বযুদ্ধের ব্যাপক মরণ-যজ্ঞের তাণ্ডবলীলা কি ক'রে অনুষ্ঠিত হলো? যদি বলা হয়, এটা মানুষের স্বাধীন ইচ্ছারই ফল, তা'হলেও প্রশ্ন জাগে : প্রকৃতির সৃষ্ট জল-প্লাবন, ভূ-কম্পন, মহামারী ইত্যাদি ব্যাপক ধ্বংস

ঈশ্বরের শুভ ইচ্ছায় কি সম্ভব? সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে: আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা কি সত্যই আছে? আমরা কি যন্ত্রের মতো পরাধীন, প্রকৃতির হাতের ক্রীড়নক, না সত্যই আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা আছে? আর যদিই বা আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা থাকে, তবে এ জগতে পাপের এত দাপট, পুণ্যের এত পরাভব কেন? জগতের অত্যাচার ও অনাচার দেখলে মানব-দরদী যুক্তিবাদীর মনে এ ধারণা হওয়াই স্বাভাবিক যে, এ জগৎ কল্যাণময় ঈশ্বরের সৃষ্টি হতে পারে না, এ জগৎ শয়তানেরই সৃষ্টি। এইজন্য কি জরথুস্ত্র-পন্থীরা ঈশ্বর-দ্বিত্ববাদে বিশ্বাসী? পাপ-পুণ্যের সমস্যা শুধু ঈশ্বরের দোহাই দিয়ে মেটাতে না পেরে জগতে যা' কিছু ভালো তার মূলে তাঁরা দেখতে পেয়েছেন এক পুণ্যময় বিশ্ব নিয়ন্তাকে, আর জগতে যা কিছু মন্দ তার মূলে তাঁরা সন্ধান পেয়েছেন পৌনঃপুনিক দশমিকের হারে ক্রমবর্ধমান পাপের নিয়ন্তা আর এক ঈশ্বরের।

যাই হোক, যাঁরা ঈশ্বরে বিশ্বাসী তাঁরা পরকালের, রোজ-কেয়ামতের দোহাই দিয়ে দুনিয়ার পাপ-পুণ্যের সমতা বিধান করেন, এ কথা আগেই বলেছি। তবে প্রশ্ন এই: মরার পর কি মানুষের সত্তা কিছু থাকে না? যেমন এক উপনিষদে আছে:

"যেয়ং প্রেতে বিচিকৎসা অস্তীতি চৈকে
নায়মস্তীতি চৈকে।"

কেউ বলে মরার পর মানুষের সত্তা কিছু থাকে, কেউ বলে থাকে না, এ প্রশ্নের জবাব কি? আবার অনেকে মনে করেন, ইতিহাসের এক আদিম যুগে মানুষের যখন বিজ্ঞানে হাতে-খড়ি তখন ঐতিহাসিক ধর্মের প্রাণস্পর্শী অলৌকিক আজগুবী আখ্যার সঙ্গে দার্শনিক চিন্তার যোগ।

সভ্যতার সেই আঁতুড়-ঘর থেকে বেরিয়ে মানুষ আজ বিজ্ঞানের বিরাট আঙ্গিনায় এসে হাজির। বুদ্ধি ও শক্তির জোরে মানুষ আজ দেশকালকে পরাভূত করেছে, পৃথিবীকে করায়ত্ত করে আজ চন্দ্রলোকে তার গতিবিধি। সুতরাং সভ্যতার শৈশবে যে সমস্ত প্রশ্ন আমাদের কাছে অতি বাস্তব ও তাৎপর্যপূর্ণ ছিল, আজ তাদের সেই অর্থ, সেই তাৎপর্য একেবারেই অবলুপ্ত। সুতরাং, দর্শনের তথাকথিত মৌলিক প্রশ্নগুলো আমাদের কাছে আজ প্রশ্নই নয়। পুরানো দিনের মানুষ এক অবৈজ্ঞানিক যুগে কিভাবে যুক্তির ডন-কসরৎ অভ্যাস করত, তার ইতিহাসই দর্শনে তাই পাওয়া যায়।

দার্শনিককে আজ এ গুরুতর প্রশ্নেরও সদুত্তর দিতে হবে। এই বৈজ্ঞানিক যুগে দার্শনিকের তত্ত্ব-জিজ্ঞাসার কোন প্রয়োজন আছে কি-না, এটাও আজকের

দিনের মানুষের কাছে এক বড় প্রশ্ন। দর্শনের স্বরূপ আলোচনা প্রসঙ্গে এই সব মৌলিক প্রশ্নের কথাই মনে জাগে। অনেকে এ-কথা ভুলে যান: এ সমস্ত প্রশ্নের সর্বজন-গ্রাহ্য সমাধান বের করাই দর্শনের অপরিহার্য কর্তব্য নয়। এ সমস্ত প্রশ্ন মানুষের মনে জাগিয়ে তোলা এবং তার উত্তর আবিষ্কারের চেষ্টাই দর্শনের এক বড় কাজ।

দর্শনের বিবিধ শাখা

(১) দর্শন ও তত্ত্ববিদ্যা

উপরে যে আলোচনা করা হলো তা' থেকে বোঝা যায়, দর্শনের তিনটি প্রধান শাখা আছে। দর্শনের প্রধান কাজ তত্ত্ব-নির্ণয়। এ জগতের পেছনে কোন শাশ্বত চিরন্তন সত্য আছে কি-না, থাকলে তা' এক না বহু, না এক হয়েও বহু এবং বহু হয়েও এক, তা' কি আমাদের চিত্তবৃত্তির মতো চেতন, না বাহ্য ও স্থূল পদার্থের মতো অচেতন, না জড়-চেতনের মধ্যবর্তী কোন নিরপেক্ষ সত্ত্ব, তা' কি সপ্রাণ না নিষ্প্রাণ—এ সমস্ত প্রশ্ন দর্শনের যে এক বিশেষ শাখায় আলোচিত হয়, তারই নাম তত্ত্ব-বিদ্যা বা 'মেটাফিজিক্‌স্'। দর্শনের সঙ্গে তত্ত্ব-বিদ্যার সম্বন্ধ এত নিবিড় যে, অনেক সময় অনেকে দর্শন ও তত্ত্ব-বিদ্যাকে সমার্থক বলে মনে করে থাকেন।

'মেটাফিজিক্‌স্'—এই নামের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ফিজিক্‌সের পরবর্তী আলোচনা। খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয় শতকের মহাপণ্ডিত আরিষ্টটল সে যুগের প্রচলিত সর্ববিদ্যার এক সার-সংগ্রহ প্রণয়নের চেষ্টা করেন। সেই গ্রন্থে ফিজিক্‌স্ বা পদার্থ-বিদ্যা আলোচনা করার পর তিনি তত্ত্ব-বিদ্যার আলোচনা শুরু করেন। আর সেই জন্যেই 'মেটা' অর্থাৎ 'পরবর্তী' এই উপসর্গ ফিজিক্‌স্ বা পদার্থ-বিদ্যার আগে যোগ দিয়ে অতি আকস্মিকভাবে তত্ত্ব-বিদ্যার 'মেটা-ফিজিক্‌স্' নামকরণ আরিষ্টটল করেন।

তাঁর নিজেরই অজ্ঞাতে, তিনি যে সংজ্ঞা তত্ত্ব-বিদ্যার উপর তাঁর গ্রন্থের পরিচ্ছেদ-সংগতির খাতিরে চাপিয়েছিলেন, কালক্রমে সেই নামের পেছনে তাঁর অনুগামীরা একটি গভীর অর্থ আবিষ্কার করেছেন। তাঁদের মতে, ফিজিক্‌স্ কথাটি বিজ্ঞানেরই সূচক। আর যেহেতু বৈজ্ঞানিক জ্ঞানেই আমাদের জানার শেষ নয়, তার পরবর্তী ইন্দ্রিয়াতীত তত্ত্ব-জ্ঞানই আমাদের জ্ঞানের শেষ—যা' পাবার জন্যে দর্শন সচেষ্ট, তাই মেটাফিজিক্‌স্ বা তত্ত্ব-বিদ্যা কথার অর্থ বিজ্ঞানোত্তর বিদ্যা অর্থাৎ অধিবিদ্যা। সহজ কথায়, এই তত্ত্ব-বিদ্যা, যার আর এক

ইংরেজী নাম অনটোলজী—দর্শনের এক বিশেষ অংশ, একে তার প্রাণ-স্পন্দনও বলা চলে।

(২) দর্শন ও ধী-বিদ্যা

দর্শনের আর এক অংশ যা' তত্ত্ব-বিদ্যার ভিত্তি, তার পারিভাষিক নাম ধী-বিদ্যা। ধী-বিদ্যা ইংরেজী এপিস্টেমোলজী শব্দের বাংলা তরজমা। ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য জগতের পেছনে কোন তত্ত্ব আছে কি না, এ রহস্য দর্শন উদ্ঘাটন করতে চায় এটা খুব ভালো কথা। কিন্তু সে ক্ষমতা কি আমাদের আছে? আমরা চোখ দিয়ে সামনের জিনিস দেখতে পাই; কিন্তু আমাদের দেখার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। ঢাকায় বসে আমরা সাদা চোখে যদি গৌরীশঙ্কর দেখতে পেতাম, খুব আনন্দ হতো সন্দেহ নেই; কিন্তু সে গুড়ে বালি। আর যদি আমাদের পেছনের দিকে, বিশেষতঃ পায়ের তলায় একটি চোখ থাকতো, তাহলে যে খুব ভালো হতো, তা' বলাই বাহুল্য। পুরনো দিনের এক দার্শনিক সম্বন্ধে এরূপ কিংবদন্তী আছে যে, দর্শনের জটিল সমস্যার কথা ভাবতে ভাবতে তিনি এক গভীর কূপে নিপতিত হয়েছিলেন। তাঁর কূপ-উদ্ধার পর্ব শেষ হবার পর তাঁর ধীমান আচার্য এরূপ হবার কারণ জানতে চেয়ে যখন শুনলেন যে, দর্শনের প্রতি গভীর অনুরাগই এই দুর্ঘটনার মূলে, তখন তিনি কৃপা করে তাঁকে বর দিয়েছিলেন যে, সেদিন থেকে তাঁর পায়ের তলায় চোখ ফুটে উঠবে। আর বিশ্বাসী লোকেরা বলে, সেই বর সত্যই সফল হয়েছিল। কিন্তু সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই। আজ দার্শনিকদের বরে এমন অঘটন সংঘটনের সম্ভাবনা খুবই বিরল। তাই আজ এ প্রশ্ন খুবই যুক্তিসঙ্গত যে, বুদ্ধির ভেলায় দাঁড়িয়ে আমরা তত্ত্ব-সাগর অতিক্রম করার দুঃসাধ্য প্রয়াসে উদ্যত, সত্যই কি আমাদের সে ক্ষমতা আছে? অতএব আমাদের জ্ঞানের উৎপত্তি কোথা থেকে হয়, সে জ্ঞানের পরিধি কতখানি এবং সে জ্ঞান সত্যই বিশ্বাস্য কি-না, এইসব প্রশ্নের আলোচনা ধী-বিদ্যায় হয়ে থাকে। যে-কোন জ্ঞানকেই আমরা তত্ত্ব জ্ঞানের উপায় বলে মানতে পারি না। অন্ধকারের ভেতরে দড়িকে আমরা কখনও কখনও সাপ বলে মনে করে ভয় পাই। চোখের দোষে আকাশের এক চাঁদ আমাদের কাছে দু'টো চাঁদ বলে মনে হয়। পাণ্ডুরোগ হলে সাদা জিনিসকে আমরা হল্‌দে দেখি। কাজেই আমাদের কোন্ জ্ঞান ঠিক, আর কোন্ জ্ঞান বেঠিক, তা' আমাদের জানা দরকার। তা' না হলে সাত অন্ধ হাতীর চেহারা ঠিক করতে গিয়ে যে মুশকিলে পড়েছিল, আমাদের অবস্থাও ঠিক সেই রকমই হবে। তারা কেউ হাতীর শুঁড় ছুঁয়ে বলেছিল—হাতীর চেহারা মূলোর মতো, কেউ আবার হাতীর পিঠ ছুঁয়ে বলেছিল

—হাতীর চেহারা কুলোর মতো আবার তাদের কেউ কেউ হাতীর মোটা পা ছুঁয়ে বলেছিল—হাতীর চেহারা থামের মতো। কোন্ জ্ঞান সত্য, কোন্ জ্ঞান মিথ্যা, কোন্ জ্ঞান বিশ্বাস্য আর কোন্ জ্ঞান অবিশ্বাস্য, এটা আগে থেকে ঠিক না করে আমরা যদি আমাদের সব জ্ঞানকেই সত্য বলে মেনে নেই তবে তা' থেকে যে হ-য-ব-র-ল'র সৃষ্টি হবে, তা তত্ত্ব-বিদ্যা তো হবেই না, তাকে বরং তত্ত্ব-বিনাশ বিদ্যা বলা চলে। তার সুনিশ্চিত ফল হবে দর্শনের অদর্শন, হাটে-মাঠে যা' আজ দর্শন-অনভিজ্ঞ, তথাকথিত বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি-সম্পন্ন সভ্য মানুষের পরম কাম্য।

কি উপায়ে কোন্ হাতিয়ারের সাহায্যে আমরা জ্ঞান লাভ করে থাকি, তার আলোচনাও ধী-বিদ্যার এক প্রধান অংশ। যেমন, একথা যদি ঠিক হয় যে, ইন্দ্রিয়ই আমাদের জ্ঞানের একমাত্র হাতিয়ার। তা'হলে ইন্দ্রিয়াতীত তত্ত্বের জ্ঞান লাভ করার চেষ্টা অন্ধের চিত্রশালা দর্শনের মতো নিষ্ফল প্রচেষ্টা ছাড়া আর কিছু হতে পারে না।

জ্ঞানের হাতিয়ারের সন্ধান করতে গিয়ে আমরা হয়তো আমাদের অন্তরের নিভৃত কোণে ইন্দ্রিয়াতীত জগতের সত্তা আবিষ্কারের কোন হাতিয়ারের সন্ধান পেতে পারি ও অভ্যাসের দ্বারা তার শক্তি বাড়িয়ে ইন্দ্রিয়াতীত জগৎ বলে যদি কিছু থাকে, তাকে জানারও চেষ্টা করতে পারি। জ্ঞানের উৎপত্তি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আমরা নিশ্চয়ই আমাদের জ্ঞানের সীমারেখা সম্বন্ধেও একটা ধারণা করতে পারব।

চল্তি কথায় বলে, এক হাত লাফাতে পারে না—হনুমানের মতো এক লাফে লঙ্কা ডিঙ্গুতে চায়। তত্ত্ববিদ্যা যে দুরূহ কাজে প্রবৃত্ত, সমালোচনী মনোবৃত্তি নিয়ে সে দুরূহ কাজ সমাপনের শক্তি আমাদের বুদ্ধির আছে কি-না, তা' বের করাই ধী-বিদ্যার কাজ। এখানেই তার সার্থকতা। এজন্যই ক্যান্ট বলেছেন : ধী-বিদ্যা তত্ত্ব-বিদ্যার অপরিহার্য ভূমিকা, তার আদিপর্ব।

অনেক বড়লোকের বাড়ীর অন্দরমহলে যেতে হলে যেমন আগের ঘরগুলো পেরিয়ে যাওয়া প্রয়োজন হয় বা পেরিয়ে যাবার হুকুম নেবার প্রয়োজন হয়, ঠিক তেমনি মানুষের বুদ্ধির তত্ত্ব-মন্দিরে প্রবেশের অধিকার লাভ করিয়ে দেবার চেষ্টা করে ধী-বিদ্যা।

(৩) দর্শন ও নীতিশাস্ত্র

ধী-বিদ্যার চুলচেরা বিচার আর তত্ত্ববিদ্যার তত্ত্ব-স্বরূপ উদঘাটনের অপরিসীম চেষ্টা- এই সবই পণ্ডশ্রম—যদি মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের প্রয়োজনের

সঙ্গে দর্শনের কোন যোগ না থাকে। অনেকেরই ধারণা দর্শন শুধু কথার তুবড়ি রচনা করে, তার চোখা চোখা যুক্তিতর্কের হিজিবিজির সঙ্গে মানুষের জীবনের কোনও যোগ নাই। এ ধারণা খুবই ভুল। দর্শনের আদিপর্ব বুদ্ধি-বিশ্লেষণ, মধ্যপর্ব তত্ত্ব-নির্ণয় আর তার অন্ত্য-পর্ব সেই তত্ত্ব জ্ঞানের, ব্যক্তির নিজের ও ব্যক্তির সমষ্টি মানবগোষ্ঠীর জীবনে প্রয়োগ। এমনকি দর্শন অনেক সময় মানুষের স্বল্প-পরিসর জীবনকে তার বৃহত্তর, বিরাট জীবনের একটি অধ্যায় মাত্র মনে করে তার সামনে অনন্ত জীবনের, অনন্ত জীবনের অনন্ত আনন্দ সম্ভোগের সম্ভাবনাও তুলে ধরে। জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে সেই অনন্ত জীবনের আভাস পেয়ে কবি উদাত্ত কণ্ঠে গেয়েছেন :

"সম্মুখে শান্তি পারাবার
ভাসাও তরণী হে কর্ণধার।"

দর্শনের এই অন্ত্য-পর্বের, তার এই ফল-উপন্যাসের নাম নীতিশাস্ত্র বা 'এথিক্‌স্'। এর আরো ব্যাপক ও সার্থক নাম 'জীবন দর্শন।'

দর্শনের এই স্বরূপের সন্ধান পেয়েই সক্রেটাস্ তাঁর বন্ধু ক্রীটোকে বলেছিলেন, "দর্শনের স্বভাব যদি এই হয় তা'হলে অযৌক্তিক কুসংস্কার বর্জন করে দর্শনের শিক্ষকরা ভালই হোন্ আর মন্দই হোন, তুমি দর্শন-অনুরাগী হও। দর্শনের কাছে নিজেকে বিলিয়ে দাও। আর নিরপেক্ষ পরীক্ষার ফলে তুমি যদি মনে কর, দর্শন মানুষের অকল্যাণের হেতু, তা'হলে তুমি সব মানুষকে দর্শনের আওতা থেকে সরিয়ে নেবার চেষ্টা কর। আর আমার যেটা বদ্ধমূল ধারণা, অর্থাৎ দর্শন মানুষের অনন্ত কল্যাণের হেতু, তুমিও যদি সেই সিদ্ধান্তে উপনীত হও, তা'হলে আমরণ দর্শনকে অনুসরণ কর, দর্শনের সেবা কর। আর এই ক্ষণিক ছোট-খাট সুখ-দুঃখের সংঘাতে সর্বদা প্রসন্নচিত্ত হয়ে থাক।"

দ্বিতীয় অধ্যায়

সম্বন্ধ বিচার

দর্শন ও বিজ্ঞান

আজকের দিনের সভ্যতার প্রাণ-কেন্দ্র বিজ্ঞান। বিজ্ঞানের প্রভাবেই আজ মানুষের এত সুখ-সুবিধা। আর আগামী দিনের মানুষের সুখ-স্বপ্নও বিজ্ঞানের সঙ্গে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে জড়িত। অতীত যুগের মানুষের কল্পনাকেও বিজ্ঞান ছাড়িয়ে গেছে। মানুষের মৃত আত্মার অবস্থানের উপযোগী একটি স্থান খুঁজতে গিয়ে প্রাচীন কালের দার্শনিকদের দৃষ্টি চন্দ্রালোকের উপর পড়েছিল। তাঁরা এই চন্দ্রলোক থেকে মানুষের পৃথিবীতে নবজন্ম গ্রহণের নানা রকমের চিত্তাকর্ষক কল্পনাও করেছিলেন। আজ বিজ্ঞানের প্রভাবে অতীতের বহু আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে জড়িত, রহস্যময় চন্দ্রলোক মানুষের প্রায় করায়ত্ত।

বলবানের স্পর্শ কে না চায়? পঞ্চতন্ত্রের গল্পে আছে, বাঘের চামড়া গায়ে দিয়ে গাধা বাঘ সাজতে চেয়েছিল। আজ তাই বিজ্ঞানের রঙ গায়ে লাগানোর জন্য জ্ঞানের নানা বিভাগের ধুরন্ধররা গলদঘর্ম।

সায়েন্স ও আর্টস্

ছোটবেলা কলেজে ঢোকবার সময় সিলেবাসে দেখেছিলাম, সায়েন্স ও আর্টস বলে' জ্ঞানের দু'টি আলাদা শাখা। তখন ছেলে-মানুষের মতো মনে করতাম: যে বিদ্যার আলোচনার সঙ্গে লেবরেটারীর নানা রকম যন্ত্রপাতির ও নানা রঙের ওষুধপত্রের যোগ, তাকেই বলে সায়েন্স বা বিজ্ঞান। আর শুধু গলাবাজির দ্বারা যে বিদ্যার পঠন-পাঠন সম্ভব, যা বোঝাতে গেলে বড়জোর শ্বেতকায় চক খণ্ড ও কৃষ্ণকায় বোর্ডের দরকার হয় তারই নাম আর্টস।

কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখলাম, আগে বিদ্যার যে সব শাখাকে আর্টস বলে অভিহিত করেছি তারা প্রায় সকলেই এক একটি বিজ্ঞান। হঠাৎ বিজ্ঞানের এক লেফাফা-দোরস্ত সংজ্ঞাও পেয়ে গেলাম। এমতে সম্ভবতঃ অজ্ঞানের বিপরীত জিনিসের নামই বিজ্ঞান। এ মতের অনুগামীরা বলেন: জ্ঞান যেখানে সুনিয়ন্ত্রিত, এলোমেলো অর্থাৎ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত নয়, তারই নাম বিজ্ঞান।

সার্থক লক্ষণ

সংজ্ঞা বা লক্ষণ-বাক্যের আলোচনা করতে গিয়ে প্রাচীন কালের দার্শনিকরা বেশ কতকগুলো কাজের কথা বলেছেন। গরুর সঙ্গে তাঁদের খুব নিকট পরিচয় ছিল বলেই বোধ হয় গরুর দৃষ্টান্ত দিয়েই তাঁরা এ-কথার অর্থ বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। তাঁরা বলেছেন গরুর যদি এমনতরো সংজ্ঞা দেওয়া যায়—ভেড়া ছাগলেও যা প্রয়োগ করা যায়, তবে সেই সংজ্ঞা অতি-ব্যাপ্তি দোষ-দুষ্ট। আর গরুর সংজ্ঞা যদি শুধু আজকালকার ডেয়ারীর বড় বড় গরুর উপরই প্রযোজ্য হয়, গরীব লোকের বাড়ীর ছোট ছোট গরু তার আওতায় পড়ে না, তবে সেই সংজ্ঞা অব্যাপ্তি-দোষ-দুষ্ট। আর গরুর সংজ্ঞার প্রয়োগ যদি গরুতে না হয়ে কেবল ভেড়া-ছাগলই হয় তবে সেই সংজ্ঞা অসম্ভব দোষ দুষ্ট।

বিজ্ঞানের লক্ষণে অতি ব্যাপ্তি

আজকের দিনের নানা বিদ্যা বিশারদরা বৈজ্ঞানিকের যমজ সহোদর হবার যে প্রাণপাত পরিশ্রম করছেন তার ফলে বিজ্ঞানের সংজ্ঞা যে অতিব্যাপ্ত হয়ে উঠেছে তাতে সন্দেহ নেই। কপালের ফেরে কালক্রমে সেই সংজ্ঞা না অসম্ভবের পর্যায়ে পড়ে যায় এটাই আশঙ্কার কথা। বিশ্ববিদ্যালয়ে আজ পলিটিক্স্-এর নাম পলিটিকেল সায়েন্স বা রাষ্ট্র-বিজ্ঞান, ইকনমিক্স্ বা অর্থনীতির নাম অর্থ-বিজ্ঞান বা ধন-বিজ্ঞান। আর মনস্তত্ত্ব, সমাজ তত্ত্ব এরা যে সব বিজ্ঞান, সে বিষয়েও সন্দেহ করার ত কোনও উপায়ই নেই। পাছে পদার্থ-বিদ্যা ও রসায়ন-শাস্ত্রের মতো প্রকৃতি-বিজ্ঞানের সঙ্গে এদের গরমিল সাদা চোখে ধরা পড়ে, তাই এক জোরালো বিশেষণের সংযোগে এদের বিজ্ঞান-সাধর্ম্য প্রকট করার চেষ্টা চলছে। এদের ন্যাচারেল সায়েন্স্ না বলে সোসিয়্যাল সায়েন্স্ বলা হয়। আজকের দিনে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে গাণিতিক পদ্ধতির প্রয়োগ দেখে এঁরা এঁদের আলোচনার ভেতর নানা রকম হিসাবের ফিরিস্তি ও গণিতের ফরমুলাও ঢুকিয়ে দিয়েছেন।

আর এরা সবাই যদি বিজ্ঞান বলে দাবী করে, তবে ফিলজফিরই বা অপরাধ কি? গণিত বিদ্যার সঙ্গে দর্শনের নিকট-যোগ পাশ্চাত্ত্য দর্শনের পরম গুরু প্লেটো কত না দেখিয়েছেন। আর এর সূত্রপাত সম্ভবতঃ করেছেন অধ্যাত্মবাদী পিথাগোরাস। তিনি দুনিয়ার চরম তত্ত্ব সংখ্যা এই কথা বলে' তত্ত্ব-শাস্ত্র ও গণিত-শাস্ত্রকে এক পংক্তিতে বসিয়ে দিয়েছিলেন।

সেই পুরানো দিনের কাহিনী ছেড়ে দিয়েও বলা চলে যে, যে সৈনিকবরকে নিয়ে সতের শতকে আধুনিক য়ুরোপীয় দর্শনের গোড়াপত্তন, সেই বিশিষ্ট

গণিতজ্ঞ দার্শনিক ডেকার্ট' দাবী করেছেন যে, তত্ত্ব-বিদ্যার গাণিতিক পদ্ধতির প্রয়োগেই তার বৈশিষ্ট্য ও স্বকীয়তা। আজকের দিনের দু'জন বড় দার্শনিক হোয়াইটহেড ও রাসেল অনেক কষ্ট করে প্রমাণ করেছেন যে, লজিক ও ম্যাথমেটিকস্ অর্থাৎ তর্ক-বিদ্যা ও গণিত-শাস্ত্র আসলে এক।

গণিতের মাধ্যমে বিজ্ঞানের সঙ্গে দর্শনের সংযোগের ভিত্তিতে এই বিজ্ঞান-প্রাধান্যের যুগে দর্শনও যদি বিজ্ঞান বলে' হঠাৎ দাবী করে বসে, তাতেই বা বিস্মিত হবার কি আছে?

বিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য

দর্শন ও বিজ্ঞানের সম্বন্ধ আলোচনায় বিজ্ঞানকে এ রকম একটা ব্যাপক অর্থে ব্যবহার আমরা করতে চাই না। বিজ্ঞান কথাটিকে আমরা একটা বিশেষ অর্থে ব্যবহার করি সেই বিশেষ অর্থ হলো এই যে, বিজ্ঞান এই বিরাট বিশ্ব-জগতের কোন বিশেষ বিভাগের নিরপেক্ষ আলোচনার দ্বারা কতকগুলো পরীক্ষিত সত্য আমাদের সামনে হাজির করে, আর সেই সত্যগুলোকে ধর্ম-শাস্ত্রে যাকে সনাতন সত্য বা 'গোস্পেল্ ট্রুথ', বলা হয়, তার মত অপরিবর্তনশীল মনে করা হয় না। তাকে সাময়িক আপেক্ষিক সত্য বলে মনে করা হয়, আর পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা ভবিষ্যতে যদি বোঝা যায়, আজকের দিনে আমরা যাকে সত্য বলছি তা ভুল, তাকে বদলাতে বিজ্ঞানের মোটেই আপত্তি নাই। সতের শতকে যে মহাবিজ্ঞানী নিউটনের (১৬৪২-১৭২৭) মাধ্যাকর্ষণ নিয়মের স্বীকৃতির মাধ্যমে বিজ্ঞানের বিজয়-বৈজয়ন্তী শুরু, বিশ শতকের মহা-বিজ্ঞানী আইনস্টাইন (১৮৭৯-১৯৫৫) তাতেই এনেছেন আমূল পরিবর্তন। তার নিরপেক্ষ দৃষ্টি ও ক্রমিক সত্য আবিষ্কারের চেষ্টাই বিজ্ঞানের এক বড় বৈশিষ্ট্য। যাই হোক, এই পদ্ধতিতেই আধুনিক বিজ্ঞানে বিশ্বজগতের বহু সত্যের আবিষ্কার। আর বিজ্ঞানের যমজ সহোদর টেকনোলজীর মাধ্যমে সেই সব সত্যের প্রয়োগে মানুষের জীবনযাত্রা-প্রণালীতে এমন অভূতপূর্ব পরিবর্তন, এমন কল্পনাতীত আলোড়ন। শুধু থিওরী আওড়ানোতে নয়, মানুষের জীবনযাত্রা-পদ্ধতি বদলে দেওয়াতেই বিজ্ঞানের আসল বৈশিষ্ট্য, তার সত্যিকার সার্থকতা, তার প্রতি আজকের দিনের মানুষের অদম্য, অবিমিশ্র ও অকপট আকর্ষণের মূল কারণ। যদি রাষ্ট্র-বিজ্ঞান, ধন বিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান, মনো-বিজ্ঞান, তত্ত্ব-বিজ্ঞান মানুষের জীবনে এমন পরিবর্তন নিয়ে আসতে পারে, তা'হলে পদার্থ-বিদ্যা ও রসায়ন-শাস্ত্রকে বিজ্ঞান না বলে' এদের বিজ্ঞান বলতে, এমনকি মহা-বিজ্ঞান বলতেও আমরা রাজী।

দর্শনের গজদন্ত-মিনার ও বিজ্ঞান

এবার এই দৃষ্টিকোণ থেকে দর্শন ও বিজ্ঞানের সম্বন্ধ আলোচনা করে দেখা যাক। এই বৈজ্ঞানিক যুগে দার্শনিকরা প্রমাণ করতে উৎসুক যে, দর্শন ও বিজ্ঞান জ্ঞানের ক্ষেত্রে পরস্পর নির্ভরশীল। তাঁদের মতে, দর্শনের ভিত্তি বিজ্ঞান আর বিজ্ঞানের পরিপূরক দর্শন। তাঁরা বলেন, তত্ত্ব-বিশ্বার যে ইমারত দর্শন গড়ে তুলতে চায়, মাটির পৃথিবীর সম্বন্ধে বিজ্ঞান যে সব সত্য আবিষ্কার করেছে তার সাহায্য নিয়েই তা গড়ে তুলতে হবে। বিজ্ঞানের যখন বিশেষ অগ্রগতি হয়নি, তখন দার্শনিকরা মনে করতেন, আকাশচারী ভাবনার সাহায্যেই তাঁরা ইন্দ্রিয়াতীত জগতে উড়ে যাবেন আর তাঁদের ভাবনায় গজদন্ত-মিনার থেকেই তাঁরা মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের সমস্যাগুলোকে দেখবেন, তার মূল্য যাচাই করবেন। বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে যে বাস্তববাদী মনোবৃত্তি ক্রমেই বেড়ে চলেছে, তার ছোঁয়াচ দার্শনিকদের গায়েও লেগেছে। তাই দার্শনিকরা আজ মনে করেন, জগতের বিভিন্ন বিভাগে বৈজ্ঞানিকরা যে সব সত্য আবিষ্কার করেছেন তার উপর দাঁড়িয়েই তাঁরা দুনিয়ার পেছনে কোন তত্ত্ব আছে কি-না তা বের করবেন। অনেক বড় বড় বিজ্ঞানী যেমন জেমস জেন্‌স, আর্থার এডিংটন, ম্যাক্স প্লাঙ্ক বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের বিশ্লেষণের মাধ্যমেই দার্শনিক তত্ত্ব আবিষ্কারের চেষ্টা করেছেন। এমন কি, আজকের দিনের মহাজ্ঞানী আইনস্টাইনেরও দার্শনিক মতামত রয়েছে এবং তার উপর প্রসিদ্ধ "সান্ গ্রেট ফিলোজভার্স অব দি ওয়ার্লড" সিরিজে এক বড় বইও বেরিয়েছে।

দর্শন ও বিজ্ঞানের পরিপূরকতা

আগেই বলেছি, অনেক দার্শনিক দর্শনকে বিজ্ঞানের পরিপূরক বলে মনে করেন। তাঁদের ধারণা, বৈজ্ঞানিক গবেষণার পশ্চাতে কতকগুলো অপ্রমাণিত সত্যের স্বীকৃতি আছে, তাদের প্রমাণ করাই দর্শনের বড় কাজ দর্শনের স্বরূপ বিশ্লেষণে আমরা দেখিয়েছি যে, বস্তু-সত্তা, কার্যকারণ সম্বন্ধ, বস্তু ও গুণের সম্বন্ধ ইত্যাদি কতকগুলো কথা বিজ্ঞান বিনা প্রমাণে মেনে নিয়েছে। বিজ্ঞানের এই স্বীকৃতিগুলো প্রমাণিত না হ'লে নিরপেক্ষ বিচারে বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তগুলো প্রমাণিত বলে মনে করা যায় না। এ কাজের ভার বিজ্ঞানের নয়, দর্শনের। তাই বিজ্ঞানের পরিপূরক দর্শন। আবার বিজ্ঞান ছাড়া পৃথিবীর মাটিতে যার পদক্ষেপ এমন সুষ্ঠু দর্শন হয় না। সুতরাং যারা সত্যানুসন্ধিৎসু তাঁরা বিজ্ঞানকেও মানবেন, দর্শনকেও মানবেন। আজকের দিনের বাস্তববাদী

মানুষের এক-চোখ হরিণীর মতো বিজ্ঞান-প্রীতি ও তার অবশ্যম্ভাবী ফল দর্শন-বিতৃষ্ণা, তাই অবৈজ্ঞানিক, অযৌক্তিক ও দোষ-দুষ্ট।

দর্শন ও বিজ্ঞানের সমন্বয়

দর্শন ও বিজ্ঞানের সম্বন্ধ বিষয়ে এর চেয়ে জোরালো মত উনিশ শতকের বিবর্তনবাদী দার্শনিক হার্বার্ট স্পেন্সার দিয়েছেন, যার ইঙ্গিত আমরা দর্শনের স্বরূপ ও স্বভাব বিশ্লেষণে করেছি। হার্বার্ট স্পেন্সারের মতে, দর্শন বিজ্ঞানের পরিপূরক নয়, জ্ঞানের প্রসারিত ক্ষেত্রে তার চরম পরিণতি। এটাই বিজ্ঞান ও দর্শনের সম্বন্ধ বিষয়ে চলিত মত। দর্শনের প্রাথমিক পাঠ্য-পুস্তকে ও বাজারে চালু নোট-বুকে এই মতেরই হরেক রকমের বর্ণনা, নানা ভঙ্গীতে নানা ঢং-এ এরই বিশদ ব্যাখ্যা। স্পেন্সার মনে করেন, পদার্থবিদ্যা, নক্ষত্র বিদ্যা, রসায়ন শাস্ত্র, প্রাণিতত্ত্ব ও ভূ-তত্ত্ব ইত্যাদি বিজ্ঞান জগতকে ভাগ করে কেটে কেটে বিশ্লেষণ করে তার ঐক্য ও অখণ্ডতা সাক্ষাৎভাবে না হোক, পরোক্ষভাবে অস্বীকার করেছে। দর্শনকে বিশ্বের সে ঐক্য ও অখণ্ডতা ফিরিয়ে আনতে হবে।

এক ব্যক্তি-মানুষের উদাহরণ দিয়েই এই সত্য পরিষ্কারভাবে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। একটি সজীব প্রাণবন্ত মানুষ দেহ, প্রাণ ও মনের এক অপূর্ব সমন্বয়। তার দেহের যে কোথায় শেষ আর প্রাণের যে কোথায় শুরু, আর প্রাণের সীমারেখা পেরিয়ে তার চিত্ত-বৃত্তির কোথায় সূচনা তা' বলাই চলে না। কোন সার্জেনের ধারালো ছুরি দিয়ে জীবন্ত মানুষের দেহকে তার প্রাণ থেকে আর প্রাণকে তার দেহ থেকে আলাদা করা যায় না। তার মনের ব্যাপারেও এই একই কথা বলা চলে। সে যে তাদের যোগফল, তা' বলারও জো নাই। অথচ তাদের স্বাতন্ত্র্য অনস্বীকার্য। এইখানেই রসায়নের মিশ্রণ-বিস্তার পরাভব। দেহ, প্রাণ ও মনের এত নৈকট্য সত্ত্বেও দেহ-বিদ্যা, প্রাণ-বিদ্যা ও মনোবিদ্যা বিজ্ঞানের ভিন্ন ভিন্ন শাখা ও তারা তাদের গবেষণায় একে অন্যের স্পর্শ-দোষ এড়াতে সচেষ্ট ও উৎসুক।

এই কারণেই হার্বার্ট স্পেন্সার মনে করেন যে, বিভিন্ন বিজ্ঞানের আহৃত জ্ঞানের মাধ্যমে জগতের বৈচিত্র্য আলোচনা করতে গিয়ে তার যে নিগূঢ় ঐক্যসূত্র বিজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে, দার্শনিক মনীষীর সাহায্যে তাকে ফিরে পেতে হবে। এই বিজ্ঞান-প্রাধান্যের যুগে অনেকেই দর্শনকে বিজ্ঞানের চরম পরিণতি বলে' স্বীকার করতে হয়তো রাজী হবেন না। তবে একথা অনস্বীকার্য, স্পেন্সার যে বিশ্ববিবর্তনের চিত্র তাঁর দর্শনে এঁকেছেন তা' বিজ্ঞানেরই পরিণতি।

খণ্ড বিজ্ঞান ও অখণ্ড বিজ্ঞান

স্পেন্সারের মনোভাবেরই প্রতিধ্বনি করে' আলেকজাণ্ডার (১৮৫৯—১৯৩৮) বলেছেন: দর্শন ও বিজ্ঞানের পার্থক্য তাদের আলোচনার ক্ষেত্র নিয়ে, বিশ্লেষণ পদ্ধতি নিয়ে নয়। জগতের অংশ বিশেষই বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। দর্শনের আলোচনার ক্ষেত্র কিন্তু ব্যাপকতম। বিরাট বিশ্বের সাধারণ স্বরূপ আবিষ্কার করাই দর্শনের উদ্দেশ্য। বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ-পদ্ধতির সাহায্যেই দর্শন সারা জগতের স্বরূপ আবিষ্কার করতে চায়। সংক্ষেপে দর্শন ও বিজ্ঞানের তফাৎ আলোচ্য বিষয় নিয়ে, বিশ্লেষণ-পদ্ধতি নিয়ে নয়। সহজ কথায়, আলেকজাণ্ডারের মতে, প্রকৃতি-বিজ্ঞানগুলো খণ্ড খণ্ড বিজ্ঞান আর তত্ত্ববিদ্যা অখণ্ড বিজ্ঞান।

ফলিত বিজ্ঞানের প্রভাব

বিজ্ঞান ও দর্শনের সম্বন্ধ বিষয়ে আমরা নিজের মতেরও একটু ইঙ্গিত এই প্রসঙ্গে করতে চাই। বিজ্ঞান বলতে কেবল সুসংবদ্ধ জ্ঞান বোঝায়, এ ধারণা যে অতি স্থূল, তা' আগেই বলেছি। বিজ্ঞানের দেওয়া জ্ঞান শুধু জ্ঞানই নয়, সে জ্ঞান অপরিমিত শক্তিরই উৎস। কেউ কেউ জ্ঞান-অনুশীলনী বিজ্ঞান ও ফলিত-বিজ্ঞানের মাঝখানে একটি সীমারেখা টানার চেষ্টা করেছেন। যে বিজ্ঞান শুধু নিয়ম আবিষ্কার করে, প্রকৃতির নানা ঘটনার ব্যাখ্যার জন্য থিওরী বের করে, তারই নাম থিওরেটিক বা জ্ঞান পর বিজ্ঞান? আর সেই বিজ্ঞানের নিয়ম ও থিওরী যে বিজ্ঞান মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের কাজে লাগায়, তার নাম এ্যাপ্লাইড্ সায়েন্স্ বা ফলিত বিজ্ঞান, অর্থাৎ টেক্নোলজী। একথা আজ সর্বজনবিদিত যে, জ্ঞানের মাহাত্ম্য আজ থিওরী আবিষ্কারে নয়, প্রাত্যহিক জীবনে থিওরীর প্রয়োগে। তাই বিজ্ঞান বলতে আমি শুধু জ্ঞান বুঝি না। সে জ্ঞান যে শক্তি মানুষের করায়ত্ত করেছে, বিজ্ঞান বলতে আমি প্রধানতঃ সেই শক্তিকেই বুঝি। এই শক্তির সাহায্যেই বিজ্ঞান দুনিয়ার চেহারা একেবারে বদলে দিয়েছে। এই শক্তির মাধ্যমেই মানুষের সুখ-সম্পদের এত বৃদ্ধি ও প্রসার। আর এই শক্তিকে করায়ত্ত করতে না পেরেই এত প্রাচুর্যের ভেতরও ব্যাপক ধ্বংসের আশঙ্কা ও আতঙ্ক।

দর্শন ও বিজ্ঞানের সমযোগ্যতা

বিজ্ঞান তার মারণাস্ত্রের সাহায্যে অবলীলাক্রমে ধরাপৃষ্ঠ থেকে মানুষের সত্তা মুছে ফেলে দিতে পারে। এই ব্যাপক ধ্বংসের হাত থেকে পরিত্রাণ পেয়ে

মানুষ যদি বিজ্ঞানের সুখ-স্বর্গের পত্তন দুনিয়ায় করতে চায় তা'হলে বিজ্ঞানের দেয়া অপরিসীম শক্তি মানুষকে ধ্বংসের পথে না চালিয়ে কল্যাণের পথে নিয়োজিত করতে হবে। সেই জন্যে চাই প্রেম। মানুষের ভিতর যদি গভীর ঐক্যবোধ জাগানো যায় তবেই এই প্রেম তার বাস্তব জীবনে রূপায়িত হতে পারে। বিশ্বের যে মূলীভূত ঐক্যের বার্তা নানা দার্শনিক চিন্তাধারার মাধ্যমে মানুষের ইতিহাসের শুরু থেকে বিঘোষিত, তাই মানুষের ভিতর সর্বজনীন প্রেম জাগাতে পারে। তাই আমি মনে করি, মানুষের সত্যিকার কল্যাণের জন্য দর্শন ও বিজ্ঞানের সমঝোতার প্রয়োজন। এই সমঝোতা থেকেই জ্ঞান ও প্রেমের মিলনে এক কর্মমুখর শুভ প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ এক নতুন সভ্যতার অভ্যুদয় হতে পারে —যার আদর্শ হবে সার্বভৌম মানবতা। সুতরাং দর্শন ও বিজ্ঞানের মিলন মানুষের ব্যাপক ও স্থায়ী কল্যাণের জন্য অপরিহার্য প্রয়োজন।

ধর্ম ও দর্শন

এবার আমরা ধর্ম ও দর্শনের সম্বন্ধ সাধারণভাবে আলোচনা করতে চাই। ধর্ম ও দর্শনের সম্বন্ধ আলোচনার আগে অনেকেই তাদের মাপাজোঁকা সংজ্ঞা দিয়ে আলোচনা শুরু করেন। সে প্রচলিত পদ্ধতি অবলম্বন করতে চাই না। কারণ ধর্ম ও দর্শনের স্বরূপ নিয়ে নানা মতভেদ। সে মতভেদের অরণ্যে প্রবেশ করলে পাতা গুণতে গিয়ে অরণ্যকেই হারিয়ে ফেলার সম্ভাবনা প্রচুর। ধর্ম ও দর্শনের স্বভাব সম্বন্ধে সর্বজন-স্বীকৃত ধারণার ভিত্তিতেই ধর্ম ও দর্শনের আলোচনা তাই প্রয়োজন।

সভ্যতার আদিম যুগে ধর্মের কিভাবে শুরু, সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ধর্মের কিভাবে পরিণতি ও বিবর্তন, ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে ধর্ম আলোচনায় এ সব প্রশ্নের সদুত্তর পাবার আশা করা যেতে পারে। বর্তমান আলোচনায় এইটুকু বলাই যথেষ্ট : ধর্ম বলতে আমরা সেই ঐতিহাসিক ধর্মগুলোকেই বুঝব, যার উপর অগণিত নর-নারীর আজও প্রচুর আস্থা, তারা জগতের নিয়ন্তা ও কারণ এক মঙ্গলময় ঈশ্বর সত্তায় বিশ্বাস করেন ও সেই বিশ্বাস আশ্রয় করে তাদের জীবনযাত্রা-প্রণালী নিয়ন্ত্রণেরও চেষ্টা করেন। পরম কল্যাণময় ঈশ্বর পরকালে মানুষকে তার পুণ্যের পুরস্কার দেবেন ও পাপীদের পাপের শাস্তি বিধানের ব্যবস্থা করবেন, এই-ই চলতি ধর্মবিশ্বাসের মূল কথা।

বৌদ্ধ ধর্মে অবশ্য ঈশ্বরের সাক্ষাৎ স্বীকৃতি নাই, তবে পরলোকে বিশ্বাস আছে, সাধারণভাবে পাপ-পুণ্যের ফলভোগের স্বীকৃতিও আছে। আর চলতি

ধর্মে ঈশ্বরের কৃপায় পরকালে অনন্ত সুখ পাবার যে আশ্বাস, মানুষের নিজের সাধনার ফলে বৌদ্ধ ধর্মে তা' লভ্য, তারই নাম নির্বাণ। এই নির্বাণের আনন্দকে এক প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ ভিক্ষু আকাশের মতো উদার ও সাগরের মতো গভীর বলে বর্ণনা করেছেন।

ধর্ম-প্রভাবিত দর্শন

দর্শনের ইতিহাস আলোচনায় দেখা যায়, য়ুরোপে মধ্যযুগে দার্শনিক চিন্তা প্রায় হাজার বছরের মতো ক্যাথলিক চার্চের ধর্মীয় প্রভাবে প্রভাবিত ছিল। সে দর্শনের কাজ ছিল ধর্ম-বিশ্বাসের সমর্থন, তার বিরোধিতা নয়। এমনকি, বিজ্ঞান-প্রভাবিত সপ্তদশ শতকের য়ুরোপে ডেকার্ট যখন আধুনিক দর্শনের গোড়াপত্তন করেন, তখনও তিনি ধর্ম-বিশারদদের চিঠি লিখে এ-কথা জানিয়ে দেন যে, স্বাধীন চিন্তার দ্বারা তিনি যে দার্শনিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, চার্চের মতের সঙ্গে তার গরমিল নাই। ঠিক এই কথাই আরেক রকমে তের শতকের বিশিষ্ট চার্চীয় দার্শনিক সেণ্ট টমাস্ একুইনাস বলেছেন।

নাসিকা স্পর্শের দু'রকম পদ্ধতির কথা শোনা যায়। এক পদ্ধতি অনুসারে সরাসরি এদিক-ওদিক হাত না ঘুরিয়ে অঙ্গুলি দ্বারা নাসিকা স্পর্শ করা যায়। নাসিকা স্পর্শের দ্বিতীয় পদ্ধতি একটু জটিল। তার চলতি নাম শির-ঘূর্ণনে নাসিকা স্পর্শ, অর্থাৎ অঙ্গুলি দ্বারা মস্তক প্রদক্ষিণ করে নাসিকার সঙ্গে তার যোগ স্থাপন। সেণ্ট, টমাস্ যুক্তি দ্বারা চার্চীয় ধর্ম-বিশ্বাসকে সাক্ষাৎভাবে সমর্থন করে সোজাসুজি নাসিকা স্পর্শ করেছেন। আর স্বাধীন চিন্তার মাধ্যমে পরিণামে ধর্ম-বিশ্বাসকে সমর্থন করে ডেকার্ট মস্তক প্রদক্ষিণ করে নাসিকা স্পর্শ করেছেন, এ কথা বলা হয় তো অসঙ্গত হবে না।

প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারতে ধর্মীয় বিশ্বাসের সঙ্গে দার্শনিক চিন্তার যোগ খুব নিকট ও নিবিড়। ভারতীয় দর্শনের যাঁরা বেদ-পন্থী, যাঁদের পারিভাষিক নাম আস্তিক, তাঁরা বৈদিক ঐতিহ্যর অন্ততঃ সাক্ষাৎভাবে বিরোধিতা না করে' চলতি ধর্মবিশ্বাস ও দার্শনিক চিন্তার মাঝখানে কোন উল্লেখযোগ্য ব্যবধান সৃষ্টি করেন নি। এই সব দার্শনিকের অনেকে সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের সত্তাই স্বীকার করেন নি, যেমন সাংখ্য ও মীমাংসা-দর্শনের সমর্থকরা। আবার কেউ কেউ সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর স্বীকার করেও শেষ পর্যন্ত তাঁকে চরম-সত্তা বলে গ্রহণ করেন নি, যেমন অদ্বৈত বেদান্তীরা। তবুও এ-কথা বলা চলে না যে, তাঁরা সাক্ষাৎভাবে বৈদিক ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের বিরোধিতা করেছেন বা এইসব আচার-অনুষ্ঠানকে একেবারে নিরর্থক বলেছেন।

ভারতীয় দর্শনের পরিভাষায় যে সব দার্শনিকের নাম নাস্তিক, অর্থাৎ যাঁরা বৈদিক আচার-অনুষ্ঠানে বিশ্বাসী নন, তাঁদের তিন দল: চার্বাক, বৌদ্ধ ও জৈন। বেদ বিরোধিতা সত্ত্বেও বৌদ্ধ দর্শন বুদ্ধের ধর্মীয় মত দ্বারা প্রভাবিত। জৈন দর্শন সম্বন্ধেও এই উক্তি সার্থক। কারণ বৈদিক ধর্মবিরোধিতা সত্ত্বেও জৈন-দর্শনের মূলে জৈন ধর্মের প্রভাব প্রচুর।

এ দৃষ্টিকোণ থেকে প্রাচীন ভারতের একমাত্র চার্বাক-দর্শনকেই ধর্ম-সম্বন্ধ বর্জিত স্বাধীন চিন্তা বলা চলে। এটা ভালো কি মন্দ, তা' নিশ্চয় করা বিচার-সাপেক্ষ। তবে এ-কথা ঠিক যে, চাবাক-দর্শন চলতি ধর্ম-মতকে একেবারে অস্পৃশ্য বলে মনে করেছে। ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস আলোচনায় এ দর্শনের প্রভাব বুদ্ধের সময় ও প্রাক-বুদ্ধ যুগেও যে বেশ কিছুটা ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায়। এই জন্যেই তার আরেক নাম "লোকায়ত" ("লোকেষু আয়ত:") অর্থাৎ জনসাধারণের ভিতর পরিব্যাপ্ত দর্শন।

যে যুগে চার্বাক মতের প্রসার ও প্রচার, তা' যে খুব ধর্ম-প্রভাবিত ছিল তা' অনস্বীকার্য। অন্ততঃ চার্বাক-উত্তর যুগে চার্বাকের বিরুদ্ধ সমালোচনা দেখে এ-কথাই মনে হয়। ধর্মীয় দর্শনের প্রভাবে কালক্রমে এই দর্শনের স্বনামধন্য বাহকের নাম পর্যন্ত মুছে গেছে। তাই অনেকের মতে, চার্বাক নামটি পর্যন্ত অলীক। তাঁরা বলেন, সংস্কৃত 'চারু' ও 'বাক' এই দু'টি কথা একত্র করে চার্বাক নামের সৃষ্টি। সোজা কথায়, যারা আপাত মধুর কথা বলে তারাই চার্বাক। যার নামেরও খোঁজ নাই তার উপর এত আক্রমণ দেখলে মনে হয় এটা মরার উপর খাঁড়ার ঘা'রই সামিল।

তর্ক ও বিশ্বাস

বিজ্ঞান-প্রভাবিত আধুনিক য়ুরোপীয় দর্শন ধীরে ধীরে ধর্মের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে চেষ্টা করেছে। ধর্ম ও দর্শনের বিচ্ছেদের সুস্পষ্ট বিবরণ ইমানুয়েল ক্যাণ্টের দর্শনে পাওয়া যায়। তিনি তাঁর জ্ঞান-সমীকরণে দেখিয়েছেন: দর্শনের পাথেয় বিচার, আর ধর্মের পাথেয় বিশ্বাস, এ দু'য়ের ক্ষেত্র ভিন্ন; তাই তাদের মিলনও সম্ভব নয়। তবে আমাদের মনের ভিন্ন-বৃত্তির তাগিদে ধর্ম ও দর্শনের উৎপত্তি—একটির নাম বিচার-বুদ্ধি ও অন্যটির নাম নৈতিক বিশ্বাস। বিচার-বুদ্ধি আমাদের মনে যে সংশয় জন্মায়, দর্শনের মাধ্যমে তারই উত্তর পাবার আমরা চেষ্টা করি। আর নৈতিক বিশ্বাস যে অখণ্ড শুভ বুদ্ধির প্রেরণা দেয়, তারই শেষ পরিণতি ধর্মীয় বোধ, যা' আমাদের পরকালে, আত্মার অবিনশ্বরত্বে ও মঙ্গলময় ঈশ্বরে বিশ্বাস করতে বাধ্য করে।

দার্শনিক যুক্তির সাহায্যে পরকাল প্রমাণ করা যায় না, মানবাত্মা অমর, এ কথা প্রমাণ করা যায় না; আর এই ভাল-মন্দে মেশানো দুঃখময় জগতের পেছনে তার নিয়ন্তা পরম মঙ্গলময় ঈশ্বর আছেন, এ কথাও দার্শনিক যুক্তির সাহায্যে প্রমাণ করা যায় না। কিন্তু এই সমস্ত সত্যে বিশ্বাস নীতিবোধ ও শুভবুদ্ধির সারকথা।

আমাদের দেশের ভক্তিবাদী বৈষ্ণবরা ধর্ম ও দর্শনের সম্বন্ধ নির্ণয়ে ক্যাণ্টের কথারই সহজ সরলভাবে পুনরাবৃত্তি করেছেন। বৈষ্ণব কবির উক্তি: "বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ, তর্কে বহু দূর", অর্থাৎ বিশ্বাসের মাধ্যমেই কৃষ্ণ বা ভগবৎ সত্তার সঙ্গে আমাদের যোগ সাধিত হতে পারে, তর্ক সেই পরম সত্তার পাশ দিয়েও যেতে পারে না—এ-কথা অনেকেরই জানা।

এই ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে ধর্ম ও দর্শনের সম্বন্ধ নির্ণয় করা অশোভন ও অসমীচীন হবে না আশা করি।

দার্শনিক বিশ্লেষণ ও ধর্মীয় দৃষ্টি

দার্শনিক দৃষ্টি ও ধর্মীয় দৃষ্টিতে বিরাট ব্যবধান। দার্শনিকরা সংশয় নিয়েই তাঁদের তত্ত্বনির্ণয় শুরু করেছেন। সে চেষ্টায় তাঁরা কতখানি সফল হয়েছেন, সে আলোচনা আপাততঃ মুলতবী রাখা যেতে পারে। যে ডেকার্ট থেকে আধুনিক ইউরোপীয় দর্শনের শুরু, তিনি খুব জোরের সঙ্গে বলেছেন: সংশয় নিয়েই দর্শনের শুরু। বিনা বিচারে দর্শন কিছু মেনে নিতে নারাজ। এমন কি, খ্রীস্ট-পূর্ব ষষ্ঠ শতকে যে থেলিসকে নিয়ে য়ুরোপীয় দর্শনের পত্তন তাঁর সম্বন্ধেও দার্শনিকদের মত যে, তিনি বিচারের দ্বারাই পানিকে বিশ্বের আদি উপাদান এ কথা প্রমাণ করেছিলেন। গ্রীক পুরানে পানি থেকেই যে বিশ্বের উৎপত্তি, এ-কথা আছে। তথাপি তাকে দর্শন বলা হয় নি, কারণ সে সিদ্ধান্ত বিচারের দ্বারা করা হয় নি, প্রচলিত প্রবাদ অনুসারে মেনে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু সেই পুরানো কথা যুক্তির সাহায্যে যখন থেলিস্ প্রমাণ করলেন বা প্রমাণ করার চেষ্টা করলেন, তখনই তা দার্শনিক সিদ্ধান্ত হয়ে দাঁড়াল। আর তার ফলে থেলিস্ হয়ে গেলেন পাশ্চাত্ত্য দর্শনের আদি-গুরু। এ থেকেই বোঝা যায়, দর্শন যুক্তি-প্রধান। সুতরাং, যদিও পুরানো কালের অনেক দর্শনে ঈশ্বরের স্থান অতি প্রধান আর আধুনিক যুগেও একেবারে ঈশ্বরকে বাদ দিয়ে দার্শনিক মত খুব গড়ে ওঠেনি, তথাপি এ-কথা অনস্বীকার্য যে, দর্শনের ঈশ্বর-প্রমাণ পদ্ধতি আর ঈশ্বর সম্বন্ধে ধর্মীয় বিশ্বাস বা অনুভূতি, দু'রকমের জিনিস।

দর্শনের বাণী বুদ্ধি-প্রসূত আর ধর্মের বাণী হৃদয়ের অনুভূতি-প্রসূত। সেই জন্যেই যীশুখ্রীস্ট তাঁর পর্বত শিখরে বিঘোষিত প্রসিদ্ধ উপদেশ-বাণীতে বলেছেন:

"যাঁরা পবিত্র-চিত্ত তাঁরাই ধন্য, ঈশ্বরকে যে তাঁরা দেখতে পাবেন তাতে কোন সন্দেহ নাই।" উনিশ শতকের শেষের দিকে সংশয়-ব্যাকুল-চিত্ত তরুণ নরেন্দ্রনাথ (পরবর্তীকালে স্বামী বিবেকানন্দ) সাধক রামকৃষ্ণকে যখন জিজ্ঞাসা করেছিলেন ঃ "আপনি কি ভগবানকে দেখেছেন?" তখন রাককৃষ্ণ এই ভাবেই অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁকে বলেছিলেন ঃ "তোমাকে যেমন দেখছি, তার চেয়ে ভাল দেখছি।" এ-কথা এনেছিল তরুণ যুবকের মনোরাজ্যে বিশ্বাসের এক বড় আলোড়ন।

ধর্মীয় অনুভূতি ও আচার-অনুষ্ঠান

এই অনুভূতিই হলো ধর্মের সারকথা। জগতের অগণিত মানুষ, যাদের সেই অনুভূতি নাই তাদের কাছে ধর্ম শুধু একটা বিশ্বাসের ব্যাপার। তারা তাদের ধর্ম গ্রন্থের মারফত, পীর-দরবেশ, সাধু-সন্ন্যাসী ও ধর্ম প্রচারকদের মারফত ধর্মের কতকগুলো কথা শুনেছে, আর ধর্মের নামে কতকগুলো আচার-অনুষ্ঠান যান্ত্রিকভাবে যুগ যুগ ধরে বংশ-পরম্পরায় পালন করে যাচ্ছে। ধর্ম তাই তাদের কাছে অন্ধ বিশ্বাসের এক বড় পুঁটলী।

অত্যন্ত দুঃখ ও পরিতাপের বিষয় এই যে, অনেক সময় ধর্মের নামে বিভিন্ন ধর্মে অনেক পরস্পর-বিরোধী আচার প্রচলিত। সেইসব আচার অনুষ্ঠানের সার্থকতা প্রমাণ করার জন্যে ধর্মে ধর্মে কত কলহ ও কত ব্যাপক নরহত্যা। ইতিহাসে এই নৃশংসতার উদাহরণ প্রচুর। আবার অনেক চতুর লোকের ধর্মের ভিতরে যে পরকালের প্রলোভন তার সুযোগে অগণিত লোককে ইহজীবনের সুখ-সম্পদ থেকে বঞ্চিত করারও চেষ্টা ধর্মের মাহাত্ম্য প্রচারে প্রকট।

ধর্ম-বিশ্বাসের ভিতর এই যে ভেজাল ঢুকে ধর্মকে মানুষের অকল্যাণের এক বড় হাতিয়ার করে তুলেছে, দার্শনিক বিচারের সাহায্যে ধর্মকে এই পঙ্কিলতা থেকে উদ্ধার করে তার কল্যাণময়, মৌলিক রূপ এই বৈজ্ঞানিক যুগের সংশয়শীল মানুষের কাছে তুলে ধরা যেতে পারে। ধর্ম যে অযৌক্তিক নয়, ধর্ম যে একটা কুসংস্কারের পুঁটলী নয়, এ-কথা আজকের দিনের মানুষকে দার্শনিক উপায়ে বোঝানো উচিত এ চেষ্টার সার্থকতাও প্রচুর।

শক্তি ও প্রেম

আগেই বলেছি, বিজ্ঞানের শক্তিবাদকে মানুষের জীবনে সার্থক ও সফল করতে গেলে প্রেমের প্রয়োজন। ধর্মের মূলকথা প্রেম। জগতের সব মানুষের আদি কারণ এক ঈশ্বর। এ কথার নৈতিক অর্থ আমাদের ব্যবহারিক জীবনে এই : আমরা যখন মূলতঃ এক তখন পরস্পরকে ঘৃণা বিদ্বেষ না করে আমাদের সার্বিক

প্রেম অভ্যাস করাই উচিত। বুদ্ধদেব ঈশ্বরের বিশ্বাসের সমর্থন করেন নি; কিন্তু সত্যিকার ঈশ্বর-বিশ্বাস থেকে যে সার্বিক প্রেমের উৎপত্তি তাকেই মৈত্রী ভাবনা নাম নিয়ে তিনি তাঁর ধর্ম সাধনায় মুখ্য স্থান দিয়েছেন। সুতরাং আজকের এই বৈজ্ঞানিক সমৃদ্ধি ও প্রাচুর্য ও সামগ্রিক ধ্বংসের সম্ভাবনার দিনে দর্শন যদি ধর্মকে তার সত্যিকার নির্মল সংস্কারমুক্ত সার্বিক উদার রূপ দিতে পারে তা'হলে তা' মানুষের কর্মজীবনে দর্শনের এক বড় দান হবে, সন্দেহ নাই। এখানেই ধর্মজীবনে দর্শনের সার্থকতা ও উপযোগিতা।

ধর্ম ও দর্শনের মূল ঐক্য

বিশ্বের বড় বড় দার্শনিকদের মতে, ধর্ম ও দর্শনের উভয়েরই বিষয়বস্তু বিশ্বের আদি কারণ ও চরম সত্তা, ঈশ্বর বা আল্লাহ্‌তালা। তাই তাঁরা ধর্ম ও দর্শনের মাঝখানে কোন উল্লেখযোগ্য সীমারেখা টানতে নারাজ। তাঁরা মনে করেন, দর্শন যুক্তি-তর্কের সাহায্যে ঈশ্বর-তত্ত্ব আলেচনা করে তাকে বুদ্ধিজীবীদের বোধগম্য করে তোলে, আর ধর্ম অগণিত জনগণের হৃদয়ের আবেগ মেটাতে গিয়ে নানা উপমা, নানা রূপক, নানা আখ্যায়িকার সাহায্যে সেই একই সত্যের প্রতীতি মনে জাগাবার চেষ্টা করে। বার শতকের প্রসিদ্ধ মুসলিম দার্শনিক স্পেনদেশীয় ইব্‌নে রুশদ্‌ এ মতের এক বড় সমর্থক। তাঁরাও আগে ইবনে তোফায়েল তাঁর প্রসিদ্ধ রূপক আখ্যায়িকা "হাই ইবনে ইয়াকজানে" ধর্ম ও দর্শনের এই একাত্মতা খুব চিত্তাকর্ষকভাবে বর্ণনা করেছেন। ইবনে রুশদ বলেছেন: ধর্ম ও দর্শন একই সত্যকে দু'টি ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে। সাধারণ মানুষের কাছে যে সত্য ভাবাবেগে উচ্ছল স্থূল বাস্তবে রূপায়িত হয়, বুদ্ধিজীবী দার্শনিকের কাছে তাই আসে বিচারগম্য সূক্ষ্ম তত্ত্বের আকারে।

সপ্তদশ শতকে স্পিনোজা যুক্তির সাহায্যে বাইবেলের অর্থ বিশ্লেষণ করে ইবনে রুশদের কথারই প্রতিধ্বনি করেছেন। তিনি তাঁর বাইবেলের সমালোচনায় বলেছেন: যীশুখ্রীস্টকে অবলম্বন করে যে সব অলৌকিক ঘটনা ও আখ্যায়িকার অবতারণা, তা' ভাবাবেগ-প্রভাবিত জনসাধারণের জন্যে; আর যীশুখ্রীস্টের জীবনের পিছনে যে মহান সত্য, যে তত্ত্বানুভূতির প্রেরণা, তার সার্থকতা চিন্তাবিদদের কাছে। এ দু'য়েরই মূলকথা এক, শুধু প্রকাশভঙ্গীতেই তাদের পার্থক্য।

স্পিনোজার ভাবে ভাবিত হয়ে উনিশ শতকের গোড়ার দিকে হেগেল ধর্ম ও দর্শনের সম্বন্ধ এইভাবেই কল্পনা করেছেন। তাঁর মতেও ধর্ম ও দর্শনের বিষয়বস্তু এক। হেগেলের মতে, ধর্ম ও দর্শন উভয়েই যুক্তিরই প্রয়োগের ফল। তবে ধর্মীয় যুক্তি ইন্দ্রিয়ানুভূতির সাহায্যে মূর্ত ও অভিব্যক্ত, আর

দার্শনিক বিচার ইন্দ্রিয়ানুভূতির দাসত্ব থেকে পূর্ণভাবে মুক্ত। তাই সত্যকে অমূর্ত ও অব্যক্তভাবে দেখার চেষ্টারই নাম দর্শন।

পরোক্ষ জ্ঞান ও প্রত্যক্ষ অনুভূতি

দর্শন বিচারের দ্বারা যে তত্ত্ব নির্ণয় করে তা' প্রত্যক্ষ অনুভূতি নয়, পরোক্ষ অনুমান মাত্র। সেই পরোক্ষ অনুভূতি আমাদের ভিতর তত্ত্বে বিশ্বাস ভালভাবে জাগিয়ে দিতে পারে না, সংসারের ঘাত-প্রতিঘাতে সেই তত্ত্ববুদ্ধি আমরা বার বার হারিয়ে ফেলি। তত্ত্বের সাক্ষাৎ সম্বিৎ না হ'লে তাতে বিশ্বাস দৃঢ় হয় না, আর আমাদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনে তাকে আমরা সার্থক করতেও পারি না। সেই জন্য দর্শনের সার্থক পরিণতি ধর্মীয় অনুভূতিতে।

এক সুফী সাধক সহজ সরল ভাষায় বলেছেন : কেউবা দুধের কথা শুনেছে, আর কেউবা দুধ দেখেছে, আর কেউবা দুধ খেয়েছে। তত্ত্ব যদি দুধই হয়, দর্শন তার কথা শুধু শুনে থাকে, দেখে থাকে ; কিন্তু যাঁর ধর্মীয় অনুভূতি আছে তিনি সেই তত্ত্বের রস-আস্বাদ করেছেন। এই তত্ত্বরস-আস্বাদ বা তত্ত্বের সাক্ষাৎ-অনুভূতিই দর্শনের শেষ লক্ষ্য। দর্শনের সাহায্যে ধর্মকে কুসংস্কারের প্রভাব-মুক্ত করাতে ও ধর্মের সাহায্যে দর্শনের পরোক্ষ তত্ত্ববোধকে অ-পরোক্ষ অনুভূতিতে রূপান্তরিত করাতেই ধর্ম ও দর্শনের পারস্পরিক সহযোগিতা সার্থক। তাই মনে হয়, ধর্ম ও দর্শনের সত্যিকার সম্বন্ধ পারস্পরিক সাহচর্য ও সহযোগিতা। তাদের বিরুদ্ধ পথ-যাত্রায় মানুষের মহা অকল্যাণ, আর তাদের সমঝোতাতেই মানুষের সত্যিকার প্রগতি, কল্যাণের পথে সার্থক দৃঢ় পদক্ষেপ।

দর্শন ও কাব্য-অনুভূতি

এবার কাব্য-অনুভূতি ও সৌন্দর্য-বোধের সঙ্গে দর্শনের সম্বন্ধ বিশ্লেষণ করে দেখা যাক। কাব্য ও দর্শনের সম্বন্ধ যে খুব নিবিড় তা' বলাই বাহুল্য। ইতিহাসের আদি যুগ থেকে আজ পর্যন্ত অনেক মনীষীই একাধারে কবি ও দার্শনিক। আজকের দিনে ইকবাল ও রবীন্দ্রনাথের একাধারে কবি ও দার্শনিক বলে খ্যাতি। জালালুদ্দিন রূমী ও ওমর খৈয়াম, এঁরা উভয়েই কবি ও দার্শনিক। মধ্যযুগ ও রেনেসাঁর সন্ধিক্ষণে ইতালীয় কবি দান্তের কাব্যে চার্চীয় জীবন-দর্শনের এক সুন্দর রূপায়ণ। আরও অনেকের নাম এ প্রসঙ্গে করা যেতে পারে।

কাব্য ও দর্শনের লক্ষ্যের একতা

এটা খুব বিস্ময়ের কথাও নয়। ছোটবেলায় এক উপনিষদের ভাষ্যে পড়েছিলাম, কবি কথার অর্থ ক্রান্ত-দর্শী। কোন বস্তুর শেষ সীমা দেখবার যাঁর ক্ষমতা আছে তিনিই কবি, তিনিই ক্রান্ত-দর্শী। দর্শন যে চরম তত্ত্বের আলোচনা করে, উঁচুদরের কাব্যে তারই নিকট নিবিড় স্পর্শের ইঙ্গিত। বোধহয় এই কারণেই গত শতকের এক বড় কবি ও সাহিত্য-সমালোচক ম্যাথু আর্নল্ড বলেছেন: কাব্য জীবনের প্রতিফলন নয়, সমীক্ষণ।

অনেক কবি কাব্যের এই মূল লক্ষ্য থেকে ভ্রষ্ট। চরম সত্যের সন্ধান না নিয়ে, তাঁরা অনেক সময়ে তাঁদের কল্পনার তুলিকার সাহায্যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের রঙিন ছবি মানুষের সামনে এঁকে ধরেন। তাই প্লেটো তাঁর সরল সাবলীল গদ্যে নিঃসরিত অতুলনীয় সৃজনী কবিত্ব-প্রতিভা সত্ত্বেও তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'রিপাবলিকে'র দশম পর্যায়ে আদর্শ রাষ্ট্র থেকে কবিদের অকাতরে অসংকোচে নির্বাসন দিয়েছেন। প্লেটোর এই আপাত-বিরুদ্ধ চেষ্টা এ কথাই প্রমাণ করে: কাব্যে যেখানে তত্ত্বানুভূতির স্পর্শ নিকট ও নিবিড়, সেখানে কাব্য ও দর্শন প্রায় একই পর্যায়ভুক্ত আর কাব্যের কল্পলোক যেখানে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতেরই প্রতিফলন, তারই প্রশংসায় মুখর, সেখানে কাব্য ও দর্শনের ভিতর বিরাট ব্যবধান।

পদ্ধতিগত ভেদ

তথাপি কাব্য ও দর্শনের পদ্ধতিতে প্রভেদ প্রচুর। যে কল্পনার সাহায্যে কবির কল্পলোকে অবাধ গতি, তার প্রেরণার উৎস হৃদয়-আবেগ, যুক্তির বল্গা দ্বারা তার গতি পদে পদে ব্যাহত নয়। তাই তার আবেদনও প্রধানতঃ মানুষের বুদ্ধির কাছে নয় তার ভাবাবেগ-আপ্লুত হৃদয়-তন্ত্রীতে। দর্শনের তত্ত্ব-নির্ণয় প্রচেষ্টা যুক্তির নিক্তিতে বার বার পরীক্ষিত। কাজেই দার্শনিকের কল্পনা শুধু হৃদয়াবেগ-প্রসূত নয়, যুক্তির বল্গা দ্বারা তার গতি নিয়ন্ত্রিত।

প্লেটো ও সেক্সপীয়ারের তুলনামূলক আলোচনায় এই পার্থক্য খুবই ভাল বোঝা যায়। দার্শনিক হিসাবে প্লেটো খুবই কল্পনা-বিলাসী ও আকাশচারী। তথাপি পদে পদে তাঁর কল্পনা যে অতি যৌক্তিক, একথা প্রমাণ করার জন্য তাঁর আপ্রাণ চেষ্টা। সেক্সপীয়ারের কাব্যে বিশেষ করে তাঁর ট্র্যাজেডিগুলোতে যে নীতিবোধমূলক জীবন-দর্শনের উদাত্ত অভিব্যক্তি, তার মূল উৎস হৃদয়াবেগ-আপ্লুত কল্পনায়। যুক্তি দ্বারা সেই জীবন-দর্শনের সারবত্তা ও সার্থকতা প্রমাণের চেষ্টা সেখানে গৌণ।

তত্ত্বনির্ণয়ে কবি ও দার্শনিক

কবি বলেছেন :

"সীমার মাঝে অসীম তুমি
বাজাও আপন সুর।"

আমাদের লৌকিক অভিজ্ঞতার জগতের ভিতর দিয়ে অসীমের যে সীমিত অভিব্যক্তি, বুদ্ধির বিশ্লেষণের মাধ্যমে দার্শনিক তাকে অতিক্রম করে অসীম তত্ত্বকে পাবার জন্যে প্রয়াসী। আর তার কল্পনার তুলিকার সাহায্যে কবি সেই ইন্দ্রিয়াতীত ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অসীম সত্তাকে সীমার ভিতরে নাবিয়ে আনার অসাধ্য সাধনে প্রয়াসী। সীমাকে অতিক্রম করে অসীমের স্পর্শ অনুভব আর সেই অসীমের সঙ্গে সীমার যোগ সাধন, এই দুই-ই যদি তত্ত্ব-রস আস্বাদের প্রশস্ত পথ হয় তা'হলে আদর্শ কবি ও আদর্শ দার্শনিকের অনুভূতির সাহায্যে তত্ত্বের স্বরূপ অবধারণ মানুষের কাছে অপেক্ষাকৃত সহজ ও সুগম হতে পারে।

দর্শন ও সৌন্দর্য-তত্ত্ব

কাব্য ও দর্শনের সম্বন্ধ নিয়ে যে কথা বলা হলো, কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে দর্শন ও সৌন্দর্য-তত্ত্বের সম্বন্ধ আলোচনায়ও তা' বলা চলে।

অনেক দার্শনিকই দর্শনের লক্ষ্য চরম তত্ত্বকে পরম-সুন্দর বলে অভিহিত করেছেন। প্রাচীন য়ুরোপে প্লেটো ও প্লোটাইনাস আর মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষের বৈষ্ণব দার্শনিকদের নাম এ-প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আমাদের সৌন্দর্যবোধ যেখানে ইন্দ্রিয়ানুভূতির পঙ্কিলতায় আচ্ছন্ন, সেখানে সৌন্দর্যানুভূতি তত্ত্বানুভূতি থেকে বহুদূরে। আর আমাদের সৌন্দর্যবোধ যেখানে ইন্দ্রিয়ানুভূতির পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত, আর শুভবুদ্ধির সঙ্গে তার যেখানে নিকট যোগ, সেখানে দর্শন ও সৌন্দর্যতত্ত্বের লক্ষ্য এক।

তত্ত্ববিদ্যা, নীতিশাস্ত্র ও সৌন্দর্য-তত্ত্ব

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে যাকে আমরা অনন্ত সত্তা বলে মনে করি, নৈতিক বোধের প্রেরণায় যে সত্তাকে আমরা অনন্ত কল্যাণময় বলে মনে করি, আর সৌন্দর্যবোধের প্রেরণায় আমরা যাকে পরম সুন্দর বলে মনে করি, একাধারে সেই অনন্ত সত্তা, সেই পরম কল্যাণময় তত্ত্ব ও পরম সুন্দরের অনুভূতিই দর্শনের চরম লক্ষ্য। বুদ্ধির দ্বারা দর্শন একত্বের একটা পরোক্ষ সম্বিৎ লাভের চেষ্টা করে। এটা যেন অনেকটা মানচিত্রের আঁকাবাঁকা রেখাগুলোকে জেনেই মানচিত্রকে জেনে ফেলবার চেষ্টা। তত্ত্বের মানচিত্রের যে সীমারেখাগুলো আমরা দার্শনিক

বিচারের সাহায্যে জানি, ধর্মীয় অনুভূতিতে তারই পূর্ণ রূপের হয় অপরোক্ষ সম্বিৎ। তত্ত্ববিদ্যা, নীতিশাস্ত্র ও সৌন্দর্য-তত্ত্ব এই চরম সত্যেরই আংশিক অনুভূতির চেষ্টা। কবির হৃদয়-আবেগ, দার্শনিকের সূক্ষ্মবুদ্ধি ও সংস্কারকের শুভবুদ্ধি—এই তিনের সহযোগিতায় আমরা তত্ত্ব-মন্দিরে যাবার একটা প্রশস্ত পথ বের করে নিতে পারি, যার শেষ পরিণতি ধর্মীয় অনুভূতি ও আমাদের চিন্ময় আত্মসত্তার চরম বিকাশ ও পরিণতি।

দর্শন ও যুক্তিবিদ্যা

যুক্তিবিদ্যা বা তর্কশাস্ত্রের ইংরেজী নাম লজিক। গ্রীক ভাষার লোগোস কথা থেকে লজিক শব্দের উৎপত্তি। লোগোস কথার অর্থ চিন্তা বা ভাষার মাধ্যমে তার প্রকাশ। এ দৃষ্টিকোণ থেকে লজিক বা তর্কশাস্ত্রকে ভাষায় প্রকাশিত চিন্তা-বিজ্ঞান বলে বর্ণনা করা হয়।

দৈনন্দিন জীবনে আমরা যা কিছু চিন্তা করি, যা কিছু বলি ও যা কিছু করে থাকি, সাধারণতঃ তার যৌক্তিকতা আমরা যাচাই করি না। কিন্তু অবস্থার চাপে আমাদের চিন্তা, কথা ও কাজের যৌক্তিকতা বুদ্ধির কষ্টি-পাথরে যাচাই করার প্রয়োজন হয়। এই প্রয়োজন-বোধের তাগিদেই তর্কশাস্ত্রের সূচনা ও উৎপত্তি। তাই তর্কশাস্ত্রের প্রধান কাজ প্রমাণের যৌক্তিকতা পরীক্ষা দ্বারা জানা সত্যের সাহায্যে অজানা সত্যের সন্ধান।

এ হলো তর্কশাস্ত্রের সুধীজনবিদিত সাধারণ রূপ। দার্শনিকেরা অনেক সময় তাঁদের বুদ্ধির রঙিন কাচে তর্কশাস্ত্রকে নানাভাবে রঙিন করে দেখেছেন। তাই তর্কশাস্ত্রের স্বভাব ও স্বরূপ সম্বন্ধে তাঁদের মতের সঙ্গে চলিত মতের যথেষ্ট পার্থক্য।

আরিষ্টটলের লজিক

প্রখ্যাত দার্শনিক আরিষ্টটলকে য়ুরোপীয় লজিকের এক রকম স্রষ্টা বলাই চলে। তিনি তাঁর এনালিটিক্স্ বা লজিকে সত্যের সন্ধানী যে কোন চিন্তার অপরিহার্য শর্ত আবিষ্কার ও ব্যাখ্যা করাই লজিকের কাজ বলে বলেছেন।

আরিষ্টটলের এই নির্দেশ অনুসারে প্রত্যেক বিজ্ঞানের সঙ্গে লজিক-বাচক 'লোজি' শব্দ লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। যেমন দেহবিদ্যার নাম ফিজিওলোজি, অর্থাৎ দেহতত্ত্বের লজিক বা যুক্তির সাহায্যে আলোচনা। এমনি জুলোজি, অর্থাৎ জীববিদ্যা বিষয়ক লজিক, বা জীববিদ্যার যুক্তির সাহায্যে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ। অন্য আরও অনেক উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

খ্রীস্টপূর্ব যুগের শেষে অথবা খ্রীস্টীয় যুগের শুরুতে প্রাচীন ভারতে ন্যায়দর্শন বা তর্কশাস্ত্রের প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাতা বাৎসায়ন সম্ভবতঃ এই দৃষ্টিকোণ থেকেই বলেছেন: তর্কবিদ্যা সমস্ত শাস্ত্রের বা বিজ্ঞানের প্রদীপ স্বরূপ—"প্রদীপঃ সর্ব শাস্ত্রানাম।"

মধ্যযুগীয় য়ুরোপে বিশেষতঃ খ্রীস্টীয় চার্চে আরিষ্টটলের লজিকের প্রভাব অপরিমিত। আমাদের চিন্তার যৌক্তিকতা পরীক্ষার যে সব ফরমূলা আরিষ্টটল আবিষ্কার করেছিলেন, তার প্রয়োগ সেই যুগের দার্শনিক চিন্তায় প্রচুর। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, আরিষ্টটল বলেছেনঃ সত্য কখনো স্ববিরুদ্ধ হয় না। এটাই আরিষ্টটলের প্রসিদ্ধ "ল অব কনট্রাডিক্শন্" বা বিরোধ-নাশ নিয়ম। খ্রীস্টীয় একাদশ শতকে ইমাম গাজ্জালী ও তাঁর প্রভাবে প্রভাবিত ত্রয়োদশ শতকের চার্চীয় দার্শনিক সেণ্ট টমাস একুইনাস্ আরিষ্টটলের এই নীতির দ্বারা প্রভাবিত হয়েই বলেছেনঃ সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌তা'লাও স্ববিরোধ-নাশ নিয়ম ভঙ্গ করতে পারেন না।

যেহেতু বেশীর ভাগ দার্শনিকের মতে যুক্তির সাহায্যে তত্ত্ব নির্ণয় করা প্রয়োজন, সেই জন্যই তর্কশাস্ত্রকে সাধারণভাবে দর্শন শাস্ত্রের বিশ্লেষণ-পদ্ধতির সুসংবদ্ধ আলোচনা বলে। ধী বিদ্যার সঙ্গে তত্ত্ববিদ্যার সম্বন্ধ আলোচনায় আমরা এ বিষয় আলোচনা করেছি।

আধুনিক য়ুরোপীয় দর্শনে ডেকার্ট থেকে ক্যাণ্ট পর্যন্ত প্রায় দু'শ বছর যুক্তির সাহায্যে তত্ত্ব নির্ণয়ের যে চেষ্টা, তা' তর্কশাস্ত্রের মূলনীতির তত্ত্বনির্ণয়ে প্রয়োগের এক উল্লেখযোগ্য উদাহরণ।

ক্যাণ্ট ও হেগেলে লজিকের পরিণতি

ক্যাণ্ট দেখিয়েছেন, যদিও যুক্তির দ্বারা তত্ত্ব-নির্ণয় করা উচিত, তথাপি যুক্তি তত্ত্ব-নির্ণয়ে অপারগ। প্রখ্যাত দার্শনিক হেগেলের দর্শনে তর্কশাস্ত্রের এই পরাজয়ের স্বীকৃতির প্রবল প্রতিক্রিয়া। যুক্তির সারবত্তা প্রমাণ করার জন্য হেগেল খুব জোরের সঙ্গে বলেছেনঃ "যা' কিছু বুদ্ধি-ভিত্তিক তাই সত্য, আর যা' কিছু সত্য তাই বুদ্ধি-ভিত্তিক।"

অতএব তর্ক সত্য নির্ণয়ে অপারগ তো নয়ই, তত্ত্বও বুদ্ধি ছাড়া আর কিছু নয়। হেগেলের মতে বুদ্ধিই বিশ্বের আদি উপাদান। সে বুদ্ধি অখণ্ড ও অনন্ত। আমাদের সীমিত বুদ্ধি এই অখণ্ড বুদ্ধিরই প্রকাশ।

সাম্প্রতিক লজিক

আজকের দিনের তার্কিকদের মতে তর্কশাস্ত্র ও গণিতশাস্ত্র মূলতঃ এক ও অভেদ। গণিতশাস্ত্র বস্তু নিয়ে মাথা ঘামায় না, বুদ্ধি-পরিকল্পিত কতকগুলো

প্রতীকের আলোচনা ও বিশ্লেষণই তার কাজ। লজিকও চিন্তার কতকগুলো প্রতীক নিয়ে নাড়াচাড়া করে, বিষয়বস্তুর সঙ্গে তার কোন যোগ নাই। বার্ট্রেণ্ড রাসেল ও হোয়াইট হেড লজিক ও গণিতের এই ঐক্য তাঁদের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'প্রিন্সিপিয়া ম্যাথ্যামেটিকাতে' দেখিয়েছেন। রাসেল বলেন: মানুষের চিন্তার শৈশবকালে লজিক ও গণিতশাস্ত্র আলাদা ছিল। আজ তাদের পরিণতি হয়েছে তাদের একাত্মতায়।

তত্ত্ব-জ্ঞান ও দুঃখনিবৃত্তি

প্রাচীন ও মধ্যযুগের অনেক ভারতীয় দার্শনিকের মতে দার্শনিক তত্ত্বজ্ঞান ছাড়া মানুষ কখনও দুঃখের হাত থেকে পুরাপুরি অব্যাহতি পেতে পারে না। এ বিষয়ে সাংখ্য-দর্শনের মতের উল্লেখ আগেই করেছি। সোজাসুজি এ-কথা বলা চলে যে, সহজবুদ্ধি ও বিজ্ঞানের সাহায্যে আমরা যে জ্ঞান লাভ করি, জীবনে তার প্রয়োগে আমাদের অনেক সুখ-সুবিধা হয়। এই লৌকিক জ্ঞানের মূল্য তাই অনস্বীকার্য। আধুনিক বৈজ্ঞানিক সভ্যতার দে'য়া প্রচুর সুখ-সমৃদ্ধিই তার এক উজ্জ্বল উদাহরণ। কিন্তু একটু ভেবে দেখলেই একথা বুঝা যায় যে, এই লৌকিক জ্ঞানের সাহায্যে ব্যক্তিগত জীবনে শাশ্বত শান্তি ও সমষ্টি জীবনে সমঝোতা লাভ করা দুষ্কর ও অসম্ভব। এজন্যেই অনেক দার্শনিকের মতে মানুষের জীবনে তত্ত্ব-জ্ঞানের প্রয়োজন অপরিমিত।

তথাপি তত্ত্ব জ্ঞানের দিকে মানুষ কেন এগোয় না, তত্ত্ব-জ্ঞানের প্রতি কেন তার এত বিতৃষ্ণা ও ঔদাসীন্য, তার সদুত্তর স্পিনোজা তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ এথিক্‌সের উপসংহারে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন: "মুক্তি ও তত্ত্ব-জ্ঞান যে সুদূর পরাহত তা' বলাই বাহুল্য। সুদূর-পরাহত না হলে সবলেই ত তা' পাবার চেষ্টা করত। কিন্তু এতে বিস্মিত হবার কিছুই নাই, কারণ বিশ্বে যা কিছু শ্রেষ্ঠ ও বরণীয়, তা' যেমন দুষ্কর, তেমন দুর্লভও।"

দৈনন্দিন জীবনে দর্শন: প্লেটো ও ফারাবী

দর্শনের এই চির প্রসিদ্ধ প্রয়োজন ছাড়াও আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনেও তার প্রচুর উপযোগিতা খুঁজে পাওয়া যায়। আদি যুগে প্লেটো খুব জোরের সঙ্গে বলেছিলেন: আদর্শ রাষ্ট্রে হয় তার বাদশারাই দার্শনিক হবেন, আর না হয় তার দার্শনিকরাই বাদশা হবেন। এ দু'কথার ভাবার্থ এক, ভাষাতেই কেবল তফাৎ। আজকের দিনে অনেকেই হয়তো এ মত পোষণ করেন না। প্লেটোর এক হাজার বছরের বেশী পরে মুসলিম দার্শনিক, আরিষ্টটলের

প্রভাবে প্রভাবিত ফারাবী (খ্রীঃ ৮৭০-৯৫০) এ বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করে বলেছেন: 'রাষ্ট্র-পরিচালনার ক্ষমতা না থাকলে দার্শনিক শুধু দার্শনিকতার জোরে আদর্শ রাষ্ট্রের সংগঠন-কর্তা ও পরিচালক হতে পারেন না। দার্শনিকের চরিত্র যদি নিষ্কলঙ্ক হয়, আর তিনি যদি একজন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মহাপুরুষ হন, তবেই তাঁর রাষ্ট্রচালক হবার সার্থকতা থাকতে পারে।''

দার্শনিকদের নিরপেক্ষ দৃষ্টি

এত বড় দাবী দর্শনের তরফ থেকে না করেও বলা চলে, দর্শন যে নিরপেক্ষ বিচারশীল দৃষ্টি আমাদের ভিতর জাগাতে চায় তার অভ্যাস ও অনুশীলন করলে ধর্মের নামে সঙ্কীর্ণতা ও কুসংস্কার পোষণ ও নিষ্ঠুরতার অভিব্যক্তি দুনিয়া থেকে চিরদিনের মতো উঠে যেতে পারে। এই বৈজ্ঞানিক যুগে মানুষের শান্তি ও প্রগতির জন্য এক নিরপেক্ষ, উদার দৃষ্টির প্রয়োজন প্রচুর। এ থেকেই সত্যিকার মানবতা-বোধের উৎপত্তি সম্ভব।

আবার এই নিরপেক্ষ দৃষ্টির অনুশীলনের ফলে দেশে দেশে জাতিতে জাতিতে যে নানা রকম সংঘর্ষ তাও বেশ খানিকটা দূরীভূত হতে পারে। কারণ, যুক্তির কোন জিওগ্রাফী নাই আর কর্মজীবনে নিষ্ফল সংকীর্ণ আবেগের প্রেরণা জাগিয়ে যুক্তি মানুষের দৃষ্টিকে আঞ্চলিকতার বন্ধনে আবদ্ধও করে না। দর্শনের শাশ্বত আবেদন তাই সব মানুষের কাছে, সারা বিশ্বের কাছে কোনও মানব গোষ্ঠীর, কোনও সীমিত ভৌগোলিক সত্তার কাছে নয়।

দর্শন ও আগামী দিনের মানুষ

এই বৈজ্ঞানিক যুগে বিজ্ঞানের অচিন্তনীয় অগ্রগতি সত্ত্বেও মানুষ যে এক বিরাট, ব্যাপক ধ্বংসের সম্ভাবনার সম্মুখীন, তার কথা আগেই বলেছি। উদার সার্বভৌম, মানবতাই এই মারাত্মক ব্যাধির মহৌষধ। দর্শনের নিরপেক্ষ, উদার সর্বজনীন, সার্বভৌম দৃষ্টি-সঙ্কীর্ণতা, কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাস থেকে মুক্ত করে আমাদের সেই উদার মানবতা-বোধের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে, এই আশা করা যুক্তিসঙ্গত ও সমীচীন বলেই মনে করি। মানুষের আগামী দিনের ইতিহাসে এটাই হবে দর্শনের বড় দান, বড় সার্থকতা। তাই শুষ্ক জীবন-দর্শনের প্রতি বিতৃষ্ণা ও বিরাগ মানবতার বিরুদ্ধে গুরুতর অমার্জনীয় অপরাধ।

তৃতীয় অধ্যায়

তত্ত্বনির্ণয়-পদ্ধতি

দর্শনের এক প্রধান কাজ তত্ত্বনির্ণয়। এবার সেই তত্ত্বনির্ণয়ের উপায় বা পদ্ধতি কি, তার আলোচনা আমরা করতে চাই। কারণ দার্শনিক আলোচনার যথাযথ পদ্ধতি যদি আমরা আবিষ্কার করতে না পারি, তা হ'লে তত্ত্বনির্ণয়ের আশা সুদূরপরাহত। একটি প্রাচীন উক্তিতে পড়েছিলাম: "এই উপমহাদেশের দক্ষিণে যে বিরাট জলপ্রবাহ তার স্পর্শ যে পেতে চায়, সে যদি ক্রমাগত হিমালয়ের দিকে এগোয়, তাতে তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না।" তাই প্রয়োজন তত্ত্বনির্ণয়ের সার্থক পদ্ধতি আবিষ্কার ও তার প্রয়োগ। এক সাধক পুরুষ বলেছেন: সাধনের নামই সিদ্ধি, অর্থাৎ উপায়ের নামই ফল। দর্শনের ক্ষেত্রে সিদ্ধি হলো তত্ত্ব-লাভ। সেই তত্ত্ব-লাভ তখনই সম্ভব হবে, যখন তার সাধন বা উপায়কে তার সিদ্ধিরই সামিল মনে করে তার যথাযথ প্রয়োগে আমরা যত্নবান হ'ব। সাধনের যথাযথ প্রয়োগ হ'লে সিদ্ধি আপনা থেকেই করতলগত হয় আর বিনাশ সাধনায় সিদ্ধি পাওয়া যায় না। পিপাসানিবৃত্তি যদি কারো লক্ষ্য হয়, তবে তার সাধন জলপান। স্বাভাবিক অবস্থায় জলপান মাত্রেই পিপাসানিবৃত্তি। পানি খাওয়ার পর তাই পিপাসানিবৃত্তিকে সাদরে নিমন্ত্রণ জানানোরও প্রয়োজন হয় না। আবার জল বা জলীয় পদার্থ কিছু না খেয়ে শুধু ইচ্ছার আবেগে পিপাসার নিবৃত্তি করা যায় না। কাজেই তত্ত্বনির্ণয়ে দার্শনিক পদ্ধতির উপযোগিতা সর্বাধিক।

দর্শনের স্বরূপ সম্বন্ধে আগে যে আলোচনা করেছি তা' থেকে এ ধারণা হওয়াই অত্যন্ত স্বাভাবিক যে, দর্শনের মতে সত্য নির্ণয়ের অত্যন্ত বিশ্বাস-যোগ্য উপায় যুক্তি, তর্ক বা বিচার। এই যুক্তি দ্বারা পুরোপুরি তত্ত্ব-নির্ণয় করা যদি সম্ভব না হয়, তথাপি যুক্তির সাহায্যে তত্ত্বের স্বরূপ সম্বন্ধে যে কথা আমরা জানি তা' খুবই নির্ভরযোগ্য; কারণ তর্ক বা যুক্তির মূল কথা হলো সন্দেহ-সংশয় না ক'রে, বিনা দ্বিধায়, বিনা সঙ্কোচে কোন কিছু আগে থেকেই মেনে না নেওয়া। সন্দেহ করতে করতে যখন আমরা এমন অবস্থায় পৌঁছুবো, যেখানে আর আমাদের কোন সন্দেহ থাকে না, তাকেই যুক্তি মেনে নিতে পারে। দার্শনিক বিশ্লেষণে এই পদ্ধতি প্রয়োগ ক'রে ডেকার্ট

যুক্তিবাদী আধুনিক য়ুরোপীয় দর্শনের পত্তন করেন। প্রাচীন গ্রীক দর্শনেও থেলিস (খ্রীঃ পূঃ ৬২৪-৫৫০) থেকে আরম্ভ করে আরিষ্টটল পর্যন্ত দার্শনিক বিশ্লেষণে এই বিচারশীল মনোবৃত্তিরই প্রাধান্য।

নির্বিচার বিশ্বাসবাদ ও তত্ত্ব-সংশয়বাদ

দুঃখের বিষয়, যদিও এই বিচারশীলতা দর্শনের প্রয়োগ-পদ্ধতি-বলে সাধারণভাবে স্বীকৃত, তথাপি দর্শনের নতুন শিক্ষার্থীকে সাধারণতঃ শিখিয়ে দে'য়া হয় নির্বিচার বিশ্বাসবাদ (ডোগ্‌ম্যাটিজ্‌ম্) ও তত্ত্ব-সংশয়বাদ (স্কেপটিসিজ্‌ম্) দর্শনের দু'টি পদ্ধতি।

জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে দার্শনিকেরা অনেক জিনিস বিনা-বিচারে বিশ্বাস করে ফেলতে পারেন; কিন্তু তাই বলে তাঁদের সেই নির্বিচার বিশ্বাসকে দর্শনের পদ্ধতি ব'লে গ্রহণ করা নেহাৎ ভুল হবে। মুষ্টিমেয় কয়েকজন মানুষকে অন্ধ দেখে যেমন আমরা সব মানুষকে অন্ধ বলতে পারি না, আর কতকগুলো মানুষের রঙ সাদা দেখে যেমন আমরা সব মানুষের রঙ সাদা বলতে পারি না, ঠিক তেমনি কোন কোন দার্শনিকের নির্বিচার বিশ্বাসে আকস্মিক আসক্তি দেখে নির্বিচার বিশ্বাসকে আমরা দার্শনিকের তত্ত্ব-নির্ণয়ের হাতিয়ার ব'লে মনে করতে পারি না।

আর জগতের অতীত কোন তত্ত্বই যারা স্বীকার করে না, পরলোক, ঈশ্বর ইত্যাদি সত্য যারা জানে না, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎকেই যারা সত্যের সীমারেখা বলে মনে করে, তাদেরই নাম সংশয়বাদী। এই সংশয়বাদ তত্ত্বনির্ণয়ের পদ্ধতি কি ক'রে হয়, তা ভেবে পাওয়াই কঠিন। আত্মহত্যা যদি জীবনের স্থায়িত্বের কারণ হয়, চোখ উপড়ে ফেলা যদি রূপ দেখার কারণ হয়, পা, কেটে ফেলা যদি চলার আর হাত কেটে ফেলা যদি কিছু ধরে রাখার কারণ হয়, তবেই সংশয়বাদীর ইন্দ্রিয়াতীত তত্ত্বের অস্বীকৃতি তত্ত্বনির্ণয়ের পন্থা ব'লে বিবেচিত হতে পারে। নির্বিচার বিশ্বাস ও তত্ত্ব-সংশয় যে দার্শনিক পদ্ধতি ব'লে কোন কোন দার্শনিক গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, তা আসলে অতিরঞ্জিত ও অপ্রাসঙ্গিক উক্তি।

কান্ট তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ বিচার-সমীক্ষণে দেখাবার চেষ্টা করেছেন: তাঁর পূর্ববর্তী দার্শনিকেরা বিনা-বিচারে কতকগুলো সত্য মেনে নিয়ে তত্ত্বনির্ণয়ে প্রবৃত্ত হয়েছেন। সেই জন্যে তাঁদের তত্ত্বনির্ণয় পদ্ধতি বিচার-বিরোধী। উদাহরণস্বরূপ কান্ট দেখিয়েছেন, ডেকার্ট, স্পিনোজা ও লাইবনিজ—আধুনিক য়ুরোপের এই তিন দার্শনিক ধুরন্ধর—জ্ঞানের উৎস ও আকর, বুদ্ধি-ইন্দ্রিয় নয়, এ কথা বিনা প্রমাণে মেনে নিয়ে দার্শনিক আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। কাজেই

তাঁদের বুদ্ধিবাদ নির্বিচার বিশ্বাসবাদেরই নামান্তর। অন্যপক্ষে লক, বার্কলে ও হিউম—এই তিনজন বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জবাসী দার্শনিক, তাঁদের তত্ত্ব বিশ্লেষণে আমাদের সমস্ত জ্ঞান ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতা থেকেই উৎপন্ন, বুদ্ধি থেকে নয়, এ কথা বিনা-বিচারে মেনে নিয়েছেন। তাই ডেকার্ট, স্পিনোজা ও লাইবনিজের বিরোধিতা সত্ত্বেও তাঁরা তাঁদের নির্বিচার বিশ্বাসবাদেরই অনুকরণ ও অনুশীলন করেছেন। হিউম আবার দেখিয়েছেন, ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতাবাদ অনুসারে অবিনশ্বর মানবাত্মা বা বিশ্ব-নিয়ন্তা ঈশ্বর ইত্যাদি কোন অতীন্দ্রিয় সত্তা স্বীকার করা যায় না। তাই হিউমের মতে ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতাবাদের চরম পরিণতি তত্ত্ব-নাশন ও নির্বাসনে অর্থাৎ সংশয়বাদে।

নির্বিচার বিশ্বাস ও সংশয়ের ঐক্য

নির্বিচার বিশ্বাসবাদ ও সংশয়বাদের যোগসূত্র আবিষ্কার করতে গিয়ে ক্যাণ্ট এক গভীর সত্যের প্রতি তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু ও তত্ত্ব-পিপাসু মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন: সংশয়বাদ নির্বিচার বিশ্বাসবাদেরই যুক্তি-গ্রাহ্য পরিণতি। যতই বিনা-বিচারে কোন জিনিস মেনে মানুষের মগজের ভিতর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়, ততই বিনা-বিচারে সেই সব কথা না মানার প্রবৃত্তি মানুষের ভিতর জেগে ওঠে। বিনা-বিচারে মানা ও বিনা বিচারে না-মানা তাই একই মনোভাবের এ-পিঠ আর ও পিঠ। মানুষের চিন্তার ইতিহাস, তার সংস্কার প্রচেষ্টায় তার নীতিবোধ, ধর্মবোধ ও সামাজিক দায়িত্ববোধের এই উঠা-নামার থিসিস ও এন্টিথিসিসের উদাহরণ প্রচুর। সুতরাং বিনা-বিচারে মানা যেমন ভয়ানক, বিনা-বিচারে না-মানাও ঠিক তেমনি। অতীতের ধর্ম প্রভাবিত নির্বিচার বিশ্বাসের যুগে বিনা-বিচারে মানা ও তার কুফলের উদাহরণ প্রচুর। আর সাম্প্রতিক বৈজ্ঞানিক যুগে বিচার পন্থী সংশয়বাদের নামে বিনা-বিচারে না মানার উদাহরণও অজস্র, আর তার ফলও যে ভয়াবহ তা' আমরা বেশ বুঝতে আরম্ভ করেছি। তাই স্বাধীন চিন্তার জয়ডঙ্কা বাজাবার সঙ্গে সঙ্গেই ইস্রাফিলের ধ্বংসের বাঁশীও যেন বাজতে শুরু করেছে।

উপরের আলোচনা থেকে এ-কথা বোঝা গেল যে, ডোগম্যাটিজ্‌ম্ ব স্কেপটিসিজ্‌ম্ কখনও দর্শনের পদ্ধতি হতে পারে না। বিনা-বিচারে মানার ও বিনা-বিচারে না-মানার প্রবৃত্তি পরিত্যাগ করে নিরপেক্ষ সমালোচকের দৃষ্টি নিয়ে দার্শনিক আলোচনা করা কর্তব্য। এই নির্দেশই ক্যাণ্ট দিয়েছেন। অতএব দর্শনের পদ্ধতি ক্যাণ্টের মতে নির্বিচার বিশ্বাসবাদও নয়, আর নির্বিচার সংশয়বাদও নয়।

দর্শনের সত্যিকার পদ্ধতি নিরপেক্ষ বিচার বা সমীক্ষণ, এ মতেরই ইংরেজী নাম ক্রিটিসিজ্‌ম্।

ক্যান্টের বিচার-সমীক্ষণ

ক্যাণ্ট তাঁর সমীক্ষণ-পদ্ধতির সাহায্যে দেখিয়েছেন যে, ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির সহযোগিতা ও সাহচর্যেই জ্ঞানের উৎপত্তি। ইন্দ্রিয়াতীত বস্তু বা বিষয় আমাদের মনে যে সংবেদন সৃষ্টি করে, তাকেই আমরা আমাদের বুদ্ধির কাঠামোর সাহায্যে বাইরের জগতের গাছ, পাথর, টেবিল, চেয়ার ইত্যাদি বস্তুতে রূপান্তরিত করি। তাই ইন্দ্রিয়াতীত আসল বস্তুকে আমরা জানি না, জানতে পারি না। তা' আমাদের বুদ্ধির চির-অজ্ঞাত ও চির অজ্ঞেয়।

আমরা গাছ, পাথর, টেবিল, চেয়ার ইত্যাদি যে সব বস্তুকে জানি তারা হলো নকল বস্তু। আর এই নকল বস্তুকে যদি আমরা সত্যিকার বস্তু বলে ধরে নেই, তবে আমরা স্ব-বিরুদ্ধ মত পোষণ করতে বাধ্য হই। যেমন ক্যাণ্ট বলেছেন: এ জগতের মূলে ঈশ্বর বলে কেউ আছেন তা' আমরা যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করতে পারি, আর ঈশ্বর বলে কেউ নেই তাও আমরা যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করতে পারি। দুনিয়ার স্রষ্টা ও তার আদি কারণ আল্লাহ্ আছেন, এ কথা মানা খুবই দরকার। তা' না হলে দুনিয়া সৃষ্টি হলো কি করে? কিন্তু এতেই বা নিষ্কৃতি কোথায়? এক ধর্মযাজক তাঁর ছোট ছেলেকে ধর্ম শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে যখন বলেছিলেন: "স্থাখ! ভগবানই বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন।" তখন সেই ইঁচড়ে-পাকা ছেলে তাঁকে বলেছিল: "পিতঃ! ভগবান বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন বুঝলাম, তবে ভগবানকে কে সৃষ্টি করল? আর তার স্রষ্টা একজন না থাকলেও যদি ভগবান থাকতে পারেন, তা' হলে এই বিশ্বের একজন স্রষ্টা না থাকলেই বা কি আসে যায়।" সেই অকাল-পরিপক্ক ছেলে তার ধর্মযাজক পিতাকে ঈশ্বরের অস্তিত্বে সন্দিহান হবার পক্ষে যে যুক্তি দিয়েছিল তার বিচার ও সমীক্ষণে ক্যাণ্ট তারই প্রতিধ্বনি করেছেন। যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করা যায়, দুনিয়া একদিন সৃষ্টি হয়েছে। আর যুক্তি দিয়ে এও প্রমাণ হয় যে, দুনিয়া চিরকালই আছে, হঠাৎ একদিন সৃষ্টি হয়নি। ক্যাণ্ট বলেন: যুক্তির বিশ্লেষণে এও প্রমাণ হয় যে, মানবাত্মা অমর ও অবিনশ্বর। আর যুক্তির বিশ্লেষণে প্রমাণ হয়, মানবাত্মা অনিত্য, নশ্বর ও মরণধর্মী। সুতরাং দার্শনিকরা ইতিহাসের আদিযুগ থেকে যে সব তত্ত্বের স্বরূপ-নির্ণয়ে প্রয়াসী ও বদ্ধপরিকর, ক্যাণ্ট তাঁর বিচার-সমীক্ষণে দেখিয়ে দিলেন যে, তাঁদের সে চেষ্টা নিষ্ফল। অন্ধ যেমন রূপ দেখতে পারে না, বধির যেমন শুনতে পায় না, মানব-বুদ্ধি ঠিক তেমনি তত্ত্বের স্বরূপ নির্ণয় করতে পারে না। তত্ত্ব চিরতরে তার অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়।

বিচার-সমীক্ষণের অক্ষমতা

ক্যাণ্টের বিচার-সমীক্ষণ অনুধাবন করে দেখলে বারবার মনে পড়ে রামায়ণের সম্বন্ধে এক প্রচলিত উক্তি : "সপ্তকাণ্ড রামায়ণ পড়ে সীতা কার ভার্যা ?" রামায়ণের আদিকাণ্ড থেকে তার শেষ কাণ্ড পর্যন্ত সবটুকু পড়ে যদি কেউ প্রশ্ন করে সীতা কার স্ত্রী, তবে সেটা যেমন বিস্ময়কর (কারণ রাম ও তার পত্নী সীতাকে নিয়েই রামায়ণের আদ্যোপান্ত কাহিনী), ঠিক সেই রকম মানব-বুদ্ধির গতি ও প্রকৃতির চুলচেরা বিশ্লেষণ করে যদি ক্যাণ্টের মতো বলা হয় যে, তত্ত্ব সম্বন্ধে আমরা শুধু এটুকুই জানি যে, তত্ত্ব-মন্দিরের বাইরের দুয়ারে লেখা আছে : "এখানে বুদ্ধির প্রবেশ নিষেধ" তা'হলে এ আবিষ্কারও তুল্যভাবে বিস্ময়কর।

হেগেলীয় ডায়েলেক্‌টিক্

এ দার্শনিক নৈরাশ্যের উত্তর দেবার প্রবল প্রয়াস করেছেন হেগেল তাঁর দার্শনিক চিন্তায়। এ থেকেই উৎপত্তি হয়েছে এক নতুন দার্শনিক পদ্ধতির, যার নাম 'ডায়েলেকটিক', দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি বা দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ী পদ্ধতি। হেগেলের দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি আলোচনা করার আগে ডায়েলেকটিকের পূর্ব-ইতিহাস একটু বলা প্রয়োজন।

যদিও হেগেল একটি বিশেষ অর্থে ডায়েলেকটিক কথা ব্যবহার করেছেন, তথাপি ডায়েলেকটিক কথার অর্থ সূক্ষ্ম তর্ক। দুনিয়ার অহরহ বহুলোকের মৃত্যু আমরা প্রত্যক্ষ করছি। তা' থেকে আমরা যুক্তির সাহায্যে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, আমাদের সকলকেই মরতে হবে, কেউই চিরকাল বেঁচে থাকবে না। এই জাতীয় যুক্তির নাম স্থূল-যুক্তি। এর ভিত্তি বস্তু-জগতের জ্ঞান। কিন্তু বস্তু-জগতের দিকে না তাকিয়েই আমরা বলতে পারি যে, কোন মানুষ হয় বেঁচে আছে, না হয় মরেছে। মরা-বাঁচার মাঝখানে কোন তৃতীয় প্রকারের সত্য আমরা কল্পনা করতে পারি না। বস্তু-জগতের সঙ্গে সাক্ষাৎ-সম্বন্ধহীন বুদ্ধির এ জাতীয় প্রয়োগের নামই ডায়েলেকটিক।

প্রাচীন গ্রীসে ডায়েলেকটিক

প্রাচীন গ্রীসে সক্রেটিসেরও আগে এ জাতীয় সূক্ষ্মবুদ্ধি প্রয়োগের উদাহরণ দেখা যায়। সেই দিনের এশিয়া মাইনরের ইলিয়াবাসী দার্শনিক পারমেনাইডিস্ ও জেনো এ জাতীয় সূক্ষ্ম তর্কের অবতারণা তাঁদের দর্শনে করেছেন। এ জাতীয় যুক্তির সাহায্যেই পারমেনাইডিস দেখাবার চেষ্টা করেছেন : আমরা দু'রকম জিনিসের কল্পনা চিন্তার সাহায্যে করতে পারি, তাদের একটি হলো অস্তিত্ব বা থাকা, আর একটি হলো নাস্তিত্ব বা না থাকা। অস্তিত্ব কখনো বদলাতে পারে না ; কারণ যা' আছে সত্যি সত্যিই আছে, সত্তা বা থাকাই তার স্বভাব।

সে যদি বদলায় তা'হলে সে আগে যা' ছিল তা' রইল না। কাজেই তার সত্তাহানি হয়ে গেল। এই যুক্তির সাহায্যে পারমেনাইডিস্ বলেছেন : যে পরিদৃশ্যমান পরিবর্তনশীল জগতে আমরা বাস করছি তার কোন সত্তাই নাই ; আর সেটা কখনো বদলায় না, শুধু আছে।

পারমেনাইডিসের সত্তার স্বরূপ ব্যাখ্যা একটি বনেদী ভদ্রলোকের সম্বন্ধে এক চলতি গল্পের কথা মনে করিয়ে দেয়। সাধারণ সভ্য সমাজের ধারণা : ভদ্রলোকের এক কথা, তার কথা কখনো বদলায় না। এই শালীনতা ও আভিজাত্যের জোরালো দাবী করেই এক ভদ্রলোক একটি হাস্যকর কাজ করেছিলেন শোনা যায়। ভদ্রলোকের হাতে ছিল ঘড়ি। তা' দেখে আর একজন তাকে জিজ্ঞাসা করে : "আপনার ঘড়িতে ক'টা বেজেছে ?" তিনি তড়িৎ গতিতে উত্তর দিলেন : "বারোটা"। প্রায় এক ঘণ্টা পরে যখন সেই ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করা হলো : "আপনার ঘড়িতে ক'টা বেজেছে ?" তখনো তিনি অবিচলিতভাবে আগের উত্তরের পুনরাবৃত্তি করে বললেন : "বারোটা"। এ অদ্ভুত উত্তরে বিস্মিত হয়ে পার্শ্ববর্তী সকলে যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করে, "এ কি করে সম্ভব ?" তখন তিনি গম্ভীরভাবে বললেন : "জানেন না, ভদ্রলোকের এক কথা।" যাই হোক, সোজা কথায় পারমেনাইডিসের মতে যা' সত্যই আছে, ভদ্রলোকের ঘড়ির কাঁটার মতো তা' কখনো বদলায় না।

এ জাতীয় সূক্ষ্ম তর্কের সাহায্যেই পারমেনাইডিসের উপযুক্ত শিষ্য জেনো দেখাবার চেষ্টা করেছিলেন : পরিবর্তনের অভিজ্ঞতাই অলীক ও অবাস্তব। সোজা কথায়, থেকেও না থাকার নাম পরিবর্তন আর ডায়েলেক্‌টিকের সূক্ষ্ম নিক্তিতে থাকা ও না-থাকা এক সঙ্গে সম্ভব হতে পারে না।

প্রাচীন ভারতে ডায়েলেকটিক

প্রাচীন ভারতেও দার্শনিকদের ভেতর এই ডায়েলেকটিকের প্রসার ও প্রতিপত্তি প্রচুর। বৌদ্ধ ভিক্ষু নাগার্জুন এই ডায়েলেকটিকের সাহায্যেই প্রমাণ করেছিলেন : "আমরা যে দুনিয়ায় বাস করছি তার স্বভাব শূন্য। তাই তার সত্যিকার সত্তা বলে কিছু নাই ও তার প্রতি আকর্ষণ ও আসক্তি অযৌক্তিক ও অস্বাভাবিক।

জৈন দার্শনিকরা এই ডায়েলেকটিকের সাহায্যেই প্রমাণ করেছেন যে, জগতের স্বভাব একান্ত বা একমুখী নয়, অনেকান্ত বা বহুমুখী। এ মতেরই নাম অনেকান্তবাদ। সেই যুগের দার্শনিকদের অতি-পরিচিত ঘটের উদাহরণ দিয়ে তাঁরা বোঝাতে চেষ্টা করেছেন, এক দৃষ্টিকোণ থেকে ঘট জিনিসটি আছে যেমন বলা যায়, আর এক দৃষ্টিকোণ থেকে ঘটটি নাই-ও তেমনি জোরের সঙ্গে বলা

যায়। আমাদের স্থূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ঘটটি কতকগুলো অবয়বের সমষ্টি। এ সমষ্টি বা অবয়বী হিসাবে ঘটের সত্তা নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু ঘটকে যখন তার অবয়বের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যায় তখন অবয়বী ঘটকে পাওয়া যায় না। আসলে ঘটটি কতকগুলো পরমাণুর সমষ্টি। তাই সেই পরমাণুর আকারেও ঘটটি থাকতে পারে। এইভাবে নানা সূক্ষ্ম যুক্তি দিয়ে জৈন দার্শনিকরা দেখিয়েছেন যে, কোনও বস্তুর স্বভাব সাতটি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করা যায়। কাজেই বস্তুর স্বভাব একমুখী নয়, বহুমুখী।

প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারতে গৌড়পাদ ও শঙ্কর তাঁদের বেদান্ত-দর্শন ব্যাখ্যায় এ ডায়েলেকটিকের প্রয়োগ প্রচুর করেছেন। বৈদান্তিকদের মতে একমাত্র ব্রহ্ম অর্থাৎ পরমতত্ত্ব সত্য, জগৎ মিথ্যা বা মায়া। এ মায়া কথার অর্থ বেদান্ত দর্শনের অনেক সমালোচক খুব ভুলভাবে বুঝেছেন। তাঁরা মনে করেন: বেদান্ত মতে জগৎ যখন মায়া, তখন তার কোন রকমেরই অস্তিত্ব নাই। কিন্তু আসলে মায়া কথার দার্শনিক তথ এ নয়। মায়া কথার আসল অর্থ না থেকেও থাকা।

আজকের দিনের জটিল জীবনে থেকে না থাকার উদাহরণ প্রচুর। যে উপার্জনশীল ছেলে শ্বশুর-বাড়ীর প্রতি আকর্ষণের আতিশয্যে অভাবগ্রস্ত মা-বাপের দিকে তাকায় না, তার সম্বন্ধে তার মা-বাপকে নৈরাশ্যের সুরে বলতে শোনা যায়: "আমার ছেলে থেকেও নাই।" জনক-জননীর সঙ্গে পুত্র-কন্যার সম্বন্ধের ক্ষেত্রে কেন, দাম্পত্য-জীবনেও থেকে না থাকার উদাহরণ যথেষ্ট। অনেকটা এ নিয়মেই, আমাদের ব্যবহারিক জীবন থেকে থেকে না-থাকার উদাহরণ সংগ্রহ করে, জগৎ থেকেও নাই- তাই মায়া,—এই কঠিন কথার অর্থ বুঝবার চেষ্টা করছি।

বুদ্ধি বিশ্লেষণের সাহায্যে বৈদান্তিকরা দেখিয়েছিলেন: তিন রকমের বস্তু আমরা বুদ্ধির সাহায্যে কল্পনা করতে পারি। এক, যা' আছে। দুই, যা' নাই। আর তিন, যা' আছে বলে মনে হয় অথচ নাই; যেমন অন্ধকারের ভেতর দড়িকে সাপ বলে মনে হয় যদিও যখনই সেখানে আমরা দড়ি আছে এ-কথা বুঝতে পারি তখন হাজার চেষ্টা করলেও সেখানে আমরা সাপকে এনে হাজির করতে পারি না। সর্পবরের অভ্যর্থনার জন্যে নানারকম আবেদনপত্র পেশ করলেও তখন তার সন্ধান পাওয়া দুষ্কর।

ঠিক একই নিয়মে এই যে আমাদের প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতার জগৎ পুরাণের মহা অসুর রক্তবীজের মতো আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে, হঠাৎ যদি

পরমতত্ত্ব ব্রহ্মের সত্তা আমরা সাক্ষাৎভাবে অনুভব করি, তখনই সে অন্ধকারে দেখা আতঙ্ক ও ত্রাসের কারণ রজ্জু সর্পের মতো নিখোঁজ হয়ে যায়। তাই বৈদান্তিকদের মতে, জগতে স্বভাব থেকেও না থাকা।

উপরে যে-সব সূক্ষ্ম যুক্তির উদাহরণ দেওয়া হলো তা' থেকে ডায়েলেকটিকের সাধারণ স্বভাব সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা করা হয়তো সম্ভব।

প্লেটো ও সক্রেটীসের ডায়েলেকটিক

প্রাচীন গ্রীসের ইতিহাসে সক্রেটীসের আগে বাগাড়ম্বরে নিপুণ সোফিষ্টরা, সবর্জনগ্রাহ্য নীতিবোধ কিছু হতে পারে না—এ মত প্রচার ক'রে যখন গ্রীসকে নৈতিক ধ্বংসের পথে এগিয়ে দিয়েছিলেন, তখন সক্রেটীস এই ডায়েলেকটিকের সাহায্যেই সে নীতিবোধহীনতার বিরুদ্ধে জোরালো অভিযান চালিয়ে ছিলেন। সোফিষ্টরা তথাকথিত রসালো যুক্তির সাহায্যে সে সমস্ত চটকদার সিদ্ধান্ত প্রমাণ ও প্রচার করতেন, তাঁর ডায়েলেকটিকের সাহায্যে সেগুলো যে ভ্রান্ত, সক্রেটীস তা' দেখিয়ে দিতেন। তবে তিনি নিজের মত বলে সাধারণতঃ কিছু প্রচার করতেন না। তিনি বলতেন: তিনি জ্ঞানী নন, জ্ঞানপিপাসু। কাজেই সক্রেটীসের ডায়েলেকটিক নঞর্থক বা নিষেধার্থক। এই নিষেধার্থক ডায়েলেকটিকের খুব চিত্তাকর্ষক বর্ণনা পাওয়া যায় প্লেটোর ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ডায়েলোগগুলিতে। কিন্তু প্লেটোর লেখায় সক্রেটীসের ডায়েলোগ শুধু নেতিবাচক থাকেনি। প্লেটোর ডায়েলেকটিক ইতিবাচক, তার সাহায্যে চরম তত্ত্বকে জানা যায়। সেই সূক্ষ্ম ডায়েলেকটিক অনুসরণ ক'রে যার তত্ত্ব-জ্ঞান হয়, প্লেটোর মতে তিনিই দার্শনিক। ডায়েলেকটিকের সূক্ষ্ম বিচার গণিত শাস্ত্রের মাধ্যমে প্লেটো শিক্ষা দেবার চেষ্টা করেছেন। গণিতের বিভিন্ন শাখায় যে সমস্ত সূক্ষ্ম তত্ত্বের শিক্ষা, প্লেটোর ডায়েলোগে তারই সাহায্যে বিশ্বের চরম তত্ত্বের জ্ঞান দেবার চেষ্টা। কিন্তু সে জ্ঞান যার হয় তিনি বোঝেন, তত্ত্ব কি অন্যকে তা' বোঝানো যায় না। বেদান্তের ভাষায় একে বলে মূক-আস্বাদন। বোবা যেমন কোন ভাল জিনিস খেলে তার স্বাদ নিজে বুঝতে পারে, কিন্তু বাক্‌শক্তির অভাবে অন্যকে বোঝাতে পারে না, এ তত্ত্ব-জ্ঞান অনেকটা তারই মতো।

হেগেলের ত্রয়ী পদ্ধতি

যে পরিবেশে হেগেলের দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির উদ্ভব তার কথা আগেই উল্লেখ করেছি। ক্যাণ্ট তাঁর সমীক্ষণ-পদ্ধতির সাহায্যে তত্ত্বশাস্ত্রকে যে নেতিবাচক অবস্থায় ফেলে রেখেছিলেন, তা' থেকে তত্ত্বশাস্ত্রকে উদ্ধার করার চেষ্টা করেছেন

হেগেল। সেই চেষ্টায় তিনি সফলকাম হয়েছেন কি না তা' বলা কঠিন, তবে সে চেষ্টা যে তিনি করেছেন তা' নিঃসন্দেহ।

আরিষ্টটলের লজিকের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ক্যান্ট মেনে নিয়েছেন স্ববিরোধী সিদ্ধান্তের সামঞ্জস্য হয় না। কিন্তু হেগেল দেখালেন আরিষ্টটলের এই লজিকের সঙ্গে আমাদের বাস্তব জীবনের কোন যোগ নাই। মানুষের ইতিহাস আলোচনা করে তিনি দেখালেন, তাতে আগাগোড়া দ্বন্দ্ব সমন্বয়ের চেষ্টা। দর্শনের ইতিহাসেও এই একই চেষ্টা প্রকট। সাধারণতঃ আগের এক দার্শনিক যা' বলেছেন, পরের আর এক দার্শনিক তার উল্টো কথাই প্রমাণ করেছেন। আর তার পরবর্তী দার্শনিক এ দুটো বিরুদ্ধ মতকে মিশিয়ে আর একটি নতুন মত প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছেন।

মানুষের ইতিহাসে তার চিন্তায় ও কর্মে, সারা বিশ্বের বিবর্তনে, ত্রয়ী পদ্ধতির অভিব্যক্তি। এটাই হলো হেগেলের ডায়েলেকটিকের মূল কথা। তাই দর্শনের তত্ত্বনির্ণয়ের পদ্ধতি হোলো একটি প্রাথমিক সিদ্ধান্ত নিয়ে তত্ত্ব-নির্ণয়ের চেষ্টা শুরু করা। যে বুদ্ধির তাগিদে আমরা এ প্রাথমিক সিদ্ধান্তকে সত্য হিসাবে গ্রহণ করি, চিন্তার জাগ্রত দ্বিতীয় মুহূর্তে তার বিপরীত সিদ্ধান্তকেও আমরা সত্য বলে গ্রহণ করতে বাধ্য হই। এই সমস্যার সমাধান হয় চিন্তার তৃতীয় মুহূর্তে। যখন আমরা দেখতে পাই যে, এই প্রাথমিক সিদ্ধান্ত আর তার বিপরীত সিদ্ধান্ত উভয়েই আর একটি ব্যাপক সিদ্ধান্তের আংশিক অভিব্যক্তি মাত্র। সিদ্ধান্ত, সিদ্ধান্ত খণ্ডন ও সিদ্ধান্ত-সমন্বয়, এই তিনটি হলো দার্শনিক তত্ত্ব-নির্ণয়ের পদ্ধতি। ইংরেজীতে এদেরই নাম—থিসিস, এন্টিথিসিস্ ও সিনথেসিস।

হেগেলের লজিক আগাগোড়া এই ত্রয়ী পদ্ধতির ভাষ্য ও বিবৃতি। একটি সহজ দৃষ্টান্ত দিয়ে তার লজিকের শুরুতেই হেগেল এই ত্রয়ী পদ্ধতির মূল নীতি বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেছেনঃ বুদ্ধির সাহায্যে যখন আমরা চরম তত্ত্বের কথা ভাবি তখন আমাদের মনে হয় চরম সত্য নির্গুণ নির্বিশেষ সত্তা ছাড়া আর কিছু নয়; তা' শুধু আছে আর শুধু থাকা ছাড়া তার আর কোনো বিশেষণ নাই। কিন্তু আর একটুখানি চিন্তা করলেই আমরা দেখতে পাই, এই নির্গুণ নির্বিশেষ সত্তা সত্তাহীনতারই নামান্তর। ঘোড়ার ডিমের যেমন গুণ বা ক্রিয়া নাই এই নির্বিশেষ সত্তার অবস্থাও অনেকটা এই রকমই। সুতরাং বুদ্ধির যে প্রাথমিক তাগিদে আমরা নির্বিশেষ সত্তাকেই মেনে নেই, সেই একই তাগিদে পরমুহূর্তে আমরা সত্তাহীনতাকেই চরম সত্য বলে মানতে বাধ্য হই। সোজা কথায়, আমরা প্রথমে মানতে বাধ্য হই, চরম সত্য শুধু আছে। আবার তার পরমুহূর্তে মানতে বাধ্য হই চরম সত্য নাই। আর এই শুধু থাকা ও

না থাকার সমাধান ও সমন্বয় আমরা দেখতে পাই গতি বা পরিবর্তনে। পরিবর্তনের মধ্যে থাকা না থাকা এ দু'টি বস্তুই রয়েছে। বস্তু না থাকলে তো আর তার পরিবর্তন হয় না। আর পরিবর্তিত হলে বস্তুর আগের যে রূপ তা' আর থাকে না। কাজেই চরম সত্যকে যদি আমরা গতিশীল বলে মেনে নেই, তা'হলে আমরা অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব নামক দু'টি আপাতঃ-বিরুদ্ধ ধর্ম চরম তত্ত্বে আরোপ করতে পারি। এটি হলো ত্রয়ী পদ্ধতির একটি উদাহরণ, তার শেষ কথা নয়।

হেগেলের মতে, এই ত্রয়ী পদ্ধতির প্রথম প্রয়োগ হয় মানুষের চিত্তক্ষেত্রে। তারপর হয় এই মানসজগতের বিপরীত বাহ্যজগতে। তারপর হয় এই মানস-জগৎ ও বহির্জগতের সমন্বয়ক্ষেত্র ব্রহ্মতত্ত্বে। এই ব্রহ্মানুভূতির প্রথম মুহূর্ত সৌন্দর্যানুভূতি। এই অনুভূতি মানসকেন্দ্রিক, তার পরিণতি তারই বিপরীত বহির্বিশ্ব-কেন্দ্রিক ধর্মানুভূতিতে। এই মানসকেন্দ্রিক সৌন্দর্যবোধ ও বিশ্বকেন্দ্রিক ধর্মবোধ —এই উভয়েরই সামঞ্জস্য হয় ব্রহ্মতত্ত্বের অনুভূতিতে, যা আত্মকেন্দ্রিক ও বিশ্বকেন্দ্রিক উভয়ই, যা' শুধু জড়ও নয়, চেতনও নয়, জড়-চেতনের মিলন, তাদের সঙ্গম, যাতে তাদের আপাত-বিরোধী সত্তার চরম পরিণতি।

হেগেল বলেন, থিসিস, এ্যান্টিথিসিস ও সিন্‌থেসিসের মাধ্যমে এই দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি মানুষের চিত্তক্ষেত্র থেকে যায় বহির্বিশ্বে। তারপর এই দু'য়ের মিলন খুঁজে পায় পরম চেতন ব্রহ্মসত্তায়। এই তত্ত্বেই সর্ব বিরোধের অবসান, তাদের চরম সমন্বয়। এখানেই মানববুদ্ধির তত্ত্বনির্ণয় যজ্ঞের পূর্ণাহুতি।

এভাবে আরিষ্টটলের লজিকের বিরোধিতা ক'রে হেগেল তাঁর ত্রয়ী পদ্ধতির সাহায্যে দ্বন্দ্ব-সমন্বয় ক'রে তত্ত্ব-নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন।

বিশ্লেষণ ও সমন্বয়

দার্শনিক পদ্ধতির যে আলোচনা এ-পর্যন্ত করা হলো তা' থেকে এ-কথা সুস্পষ্ট যে, জগতের অধিকাংশ দার্শনিকই এক ব্যাপক অর্থে বুদ্ধিবাদী। এখানে বুদ্ধিবাদ বলতে জ্ঞানোৎপত্তির যে মত বুদ্ধিবাদ নামে অভিহিত, তার কথা আমরা বলছি না। সে বুদ্ধিবাদের মতে আমাদের সমস্ত নির্ভরযোগ্য জ্ঞানের উৎস ইন্দ্রিয় নয়, বুদ্ধি। এখানে বুদ্ধিবাদের অর্থ, মানুষের জ্ঞানের উৎস বুদ্ধিই হোক আর ইন্দ্রিয়ই হোক আর তারা দু'টিই হোক অথবা আর কিছুই হোক, আমাদের স্বাভাবিক বিচার-শক্তির সাহায্যেই আমাদের অভিজ্ঞতার মূল্যায়নের ভিত্তিতে তত্ত্ব নির্ণয় করতে হবে।

বুদ্ধির দ্বারা অভিজ্ঞতার মূল্য যাচাই করা দুই উপায়ে হতে পারে: আমাদের অভিজ্ঞতাকে তন্ন তন্ন ক'রে ভাগ ক'রে দেখে তার তাত্ত্বিক মূল্য

নির্ণয় করা যেতে পারে। এ-পদ্ধতির নাম এনালিসিস বা বিশ্লেষণ। আর বুদ্ধিবৃত্তির প্রয়োগের সাহায্যে আমাদের নানা রকমের অভিজ্ঞতার ভিতর আমরা যোগসূত্র আবিষ্কার ক'রে তাদের একত্র করতেও পারি। এ-পদ্ধতির নাম সিন্‌থেসিস বা সমন্বয়। এক কথায় বলতে গেলে, অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ ও সমন্বয় এ-দু'টি দর্শনের চিরাচরিত তত্ত্ব-নির্ণয়ের পদ্ধতি। প্রথমটির সাহায্যে জগতের পার্থক্য ও বৈচিত্র্য আবিষ্কার করার, আর দ্বিতীয়টির সাহায্যে এ-পার্থক্য ও বৈচিত্র্যের ভেতর যে ঐক্য ও যোগসূত্র তা' আবিষ্কারের চেষ্টা আমরা করতে পারি। একেই ব'লে এক থেকে বহু-তে অবতরণ ও বহু থেকে একে-তে আরোহণ। এই উঠা-নামাই বুদ্ধির সাহায্যে তত্ত্ব-নির্ণয়ের দু'টি পরস্পরের পরিপূরক পদ্ধতি।

বিশ্লেষণ ও সমন্বয়ের দ্বন্দ্ব

আধুনিক য়ুরোপীয় দর্শনে সাধারণতঃ দু'টি বিরোধী দলের দার্শনিক খুঁজে পাওয়া যায়। তাঁদের একদল বিশ্বের কোন চরম ঐক্য আছে তা' স্বীকারই করেন না। তাঁরা শুধু বহুত্বে, বিভেদ ও বৈচিত্র্যে বিশ্বাসী, তাঁদের মতে দর্শনের সত্যকার পদ্ধতি এনালিসিস বা বিশ্লেষণ। তাঁরা মনে করেন, যে-সব দার্শনিক বহুর পেছনে ঐক্য, পার্থক্য ও বৈচিত্র্যের মধ্যে একটি ব্যাপক সংযোগ-সূত্র খুঁজে বেড়ান তাঁদের বাস্তব জ্ঞান নাই, ভাবের নেশায় ভরপুর হয়ে অবাস্তব আবেগের প্রেরণায়ই তাঁরা আলেয়ার মতো এক ঐক্যের পেছনে ছুটে বেড়ান। বৈচিত্র্যেই বস্তুসত্তা, আর বিশ্লেষণই সেই বস্তুসত্তা আবিষ্কারের উপযুক্ত হাতিয়ার।

যাঁরা বিশ্বের অনন্ত বৈচিত্র্যের পেছনে একটি ব্যাপক তত্ত্ব আছে মনে করেন, সে-সব দার্শনিকের মতে দর্শনের মুখ্য পদ্ধতি বিশ্লেষণ নয়, সমন্বয়। এ-ধারণার বশবর্তী হয়েই স্পেন্সার দর্শনকে অভিজ্ঞতার ব্যাপকতম সমন্বয় বলে অভিহিত করেছেন। একথা আমরা দর্শনের স্বভাব ও স্বরূপ ব্যাখ্যায় পূর্বেই উল্লেখ করেছি।

বিশ্লেষণ ও সমন্বয়ের উপযোগিতা

যাই হোক, বস্তু-বিশ্লেষণ ও বস্তু-সমন্বয় উভয়েরই মূল্য দর্শনে সমান। বুদ্ধির মুগুরের সাহায্যে অভিজ্ঞতার জগদ্দল পাথরকে শুধু যদি ভেঙে চুরমার করা হয়, তাতে বিশ্বের স্বভাবের শুধু একদিকেরই জ্ঞান আমাদের হবে। এতে ফুলের পেছনে যে সাপ লুকিয়ে আছে, তাকেই আমরা চিনতে পারবো, ফুলকে নয়। আর যদি অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ না করেই আমরা জগতের পেছনে ঐক্য

খুঁজে বেড়াই, তবে সে-ঐক্যের সঙ্গে আমাদের বাস্তব জীবনের বিশেষ কোন সম্বন্ধ থাকবে না। তাতে আমরা ফুলকেই চিনতে পারবো, সাপকে নয়। আমাদের অভিজ্ঞতার জগতের ভালো মন্দ এ দু'দিককেই আমরা যথাক্রমে ফুল ও সাপ ব'লে বর্ণনা করেছি। দুনিয়ার সব জিনিসকে যদি আমরা আলাদা ক'রে দেখি, তাদের মধ্যে যদি কোন ঐক্য খুঁজে না পাই, তবে বৈচিত্র্যের নামে দুনিয়ার এক ভয়ঙ্কর করাল রূপই আমাদের চোখের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে। আর বৈচিত্র্য ও পার্থক্যকে উড়িয়ে দিয়ে আমরা যদি শুধু জগতে ঐক্য খুঁজে বেড়াই, তাতে আমরা ভাববিলাসী হবো বটে; কিন্তু দুনিয়ার করাল রূপের সম্মুখীন হতে পারবো না। তাই প্রয়োজন বিশ্লেষণ ও সমন্বয়—দু'য়েরই। বিশ্লেষণের দ্বারা বৈচিত্র্যের জ্ঞান লাভ করে সমন্বয়ের সাহায্যে তার মোকাবিলা করাই দর্শনের কাজ। এ-জন্যই প্রাচীন কালের মনীষীরা বলেছেন: দার্শনিকের দৃষ্টিতে পৃথিবীর ধূলিও মধুময়: "মধুমৎ পার্থিবং রজ:"। বিশ্লেষণের দ্বারা ধূলিকে আমরা ধূলি বলেই জানি, আর সমন্বয়ের সাহায্যে বিশ্বের ঐক্যসূত্রের যে সন্ধান আমরা পাই তার সংযোগে সে-অকিঞ্চিৎকর ধূলি আমাদের কাছে মধুময় হয়ে ওঠে। সুতরাং বিশ্লেষণ ও সমন্বয়—তত্ত্ব-নির্ণয়ে দু'য়েরই মূল্য সমান। প্রথমটিকে বাদ দিলে আমরা আদর্শবাদী হতে পারি, বাস্তববাদী হতে পারি না; আর দ্বিতীয়টিকে বাদ দিলে আমরা বাস্তববাদী হতে পারি, কিন্তু আদর্শবাদী হতে পারি না। সার্থক দর্শন যেমন বস্তুধর্মী; তেমনি ভাবধর্মী; যেমন বাস্তববাদী, তেমনি ভাববাদী। ইংরেজীতে একেই বলে প্র্যাক্‌টিক্যাল আইডিয়্যালইজম, অর্থাৎ সার্থক সফল আদর্শবাদ।

মিস্‌টিসিজম্

যাই হোক, এমন দার্শনিকের সংখ্যাও একেবারে নগন্য নয়, যাঁরা মনে করেন, বুদ্ধির বিশ্লেষণ ও সমন্বয়ের সাহায্যে আমরা বড়জোর তত্ত্ব-মন্দিরের কাছাকাছি হাজির হতে পারি, কিন্তু তা' থেকে সত্যিকার তত্ত্বজ্ঞান অসম্ভব। উপনিষদের ঋষিরা, খ্রীস্টীয় চার্চের ধর্মাচার্যরা, মুসলিম সুফীরা এবং প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারতের অনেক দার্শনিক, প্রাচীন য়ুরোপের প্লোটাইনাস ও তাঁর ভাবে অনুপ্রাণিত মুসলিম দার্শনিকদের অনেকেই বোঝাবার চেষ্টা করেছেন যে, বুদ্ধির দ্বারা মানুষ কখনো বিশ্বের চরম রহস্য উদ্‌ঘাটিত করতে পারে না।

মনের যে বৃত্তির দ্বারা তত্ত্ব-সাক্ষাৎ করা যায়, সে-অনুভূতির নাম অনেকে দিয়েছেন মিস্‌টিসিজম্। আমাদের মনের ভেতর বুদ্ধি ছাড়া জ্ঞান লাভের এক গোপন হাতিয়ার রয়েছে, প্রাত্যহিক জীবনের তাগিদে তার খবর আমরা

রাখি না। বাইরের জগতের আকর্ষণ থেকে মুক্ত হয়ে আমরা যখন চরম তত্ত্বের ভাবনায় তন্ময় হয়ে পড়ি, তখনই আমাদের মনের এই সুপ্ত শক্তি জেগে ওঠে আর বিশ্বের চরম তত্ত্বের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎসুনিবিড় যোগ হয়। সাধারণ মানুষের কাছে এ মনোবৃত্তি একটি দুর্বিজ্ঞেয় রহস্য বা মিস্ট্রি। তাই এ মতবাদের ইংরেজী নাম মিস্টিসিজম্। জগতের বিশিষ্ট ধর্মাচার্য বুদ্ধ, যীশু ও হজরত মুহম্মদ (দঃ) থেকে শুরু করে আজকের দিনের পীর-দরবেশ, সাধু-সন্ন্যাসী পর্যন্ত সকলেই এই জাতীয় অনুভূতির বাহক। তাই এই অনুভূতির আরেক নাম ধর্মীয় অনুভূতি।

বার্গশোঁর স্বজ্ঞাবাদ

সাম্প্রতিক য়ুরোপীয় দর্শনে বার্গশোঁ এই জাতীয় জ্ঞানের একজন বড় সমর্থক। তিনি এ-জ্ঞানের নাম দিয়েছেন ইনট্যুইশন, যার বাংলা চল্তি তরজমা স্বজ্ঞা বা বোধি, তার আরবী নাম কাশ্ফ্। বার্গশোঁ তাঁর সাহিত্যরস মণ্ডিত লেখায়, নানা উপমা ও উদাহরণের সাহায্যে এই স্বজ্ঞার স্বরূপ ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। বার্গশোঁ বলেনঃ আমাদের বুদ্ধি জ্ঞেয় বিষয়কে জ্ঞাতা থেকে আলাদা করেই জানে। জ্ঞাতা থেকে বস্তুকে আলাদা করে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে তাকে দেখা যায়, আর এই সব দৃষ্টিকোণ অনেক সময় পরস্পর-বিরোধী। কাজেই বুদ্ধির সাহায্যে যে জ্ঞান আমরা এক দৃষ্টিকোণ থেকে পাই, তার ঠিক উল্টো জ্ঞান আরেক দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা পেয়ে থাকি। এজন্যই বুদ্ধি-সৃষ্ট দর্শনে এত মতভেদ, এত সংঘর্ষ।

আমাদের যুক্তি আবার বস্তুর বৈশিষ্ট্য ও স্বকীয়তাকে জানে না, জানে অন্য বস্তুর সঙ্গে তার স্বাধর্ম্য। যেমন বুদ্ধির সাহায্যে সব মানুষকে জানতে গিয়ে আরিস্টটল বলেছেনঃ মানুষ মাত্রই একদিকে নির্বিচার পাশব-প্রবৃত্তিসম্পন্ন, আর এক দিক দিয়ে বিচারশীল। আরিস্টটলের এই প্রসিদ্ধ লক্ষণ-বাক্য থেকে ব্যক্তি-মানুষের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না, শুধু জানা যায় সব মানুষের স্বাধর্ম্য। যেমন সব মানুষের দেহ-বিশ্লেষণ করে শুধু একটা অস্থিপঞ্জর বা স্কেলিটনকে জানলে মানুষের দেহকে ঠিক জানা যায় না, তেমনি মানুষে মানুষে পাশব প্রবৃত্তিতে কত পার্থক্য, বিচারশীলতায় কত তারতম্য, এ-সব তথ্য না জেনে মানুষকে শুধু পাইকারী হিসাবে পশুধর্মী বিচারশীল বললে তাতে মানুষের আসল তত্ত্বা খুঁজে পাওয়া যায় না, তার নিষ্প্রাণ কঙ্কালকেই পাওয়া যায়। বস্তুর স্বকীয়তাকে বাদ দিয়ে অন্য বস্তুর সঙ্গে তার স্বাধর্ম্য খুঁজতে গিয়ে বুদ্ধিমান দার্শনিকরা বস্তুর নিষ্প্রাণ স্কেলিটনটিকেই তার জাগ্রত জীবন্ত স্বরূপ বলে আবহমানকাল ভুল করে আসছেন।

এ-ভুল শোধরাতে গেলে কল্পনার সাহায্যে বস্তুর সঙ্গে এক হয়ে তাকে এমনভাবে জানতে হবে যাতে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের, বিষয়ী ও বিষয়ের তফাৎ মুছে যাবে। বার্গশোঁ বলেন: কর্মজীবনের অসংখ্য তাগিদে আমরা এ-সত্যের সন্ধানে বিমুখ আবছায়ার মতো এই স্বজ্ঞা যে আমাদের ভেতর লুকিয়ে আছে তার খবরও আমরা রাখি না।

সহজাত প্রবৃত্তি ও বুদ্ধি

এই স্বজ্ঞা পশুর সহজাত প্রবৃত্তি ও মানব-বুদ্ধির যোগসূত্র। এতে তাদের দু'য়ের অপূর্ণতা নেই, সার্থকতা আছে। পশুর সহজাত প্রবৃত্তিতে স্বাভাবিকতা আছে, জীবনের কর্মক্ষেত্রে তার প্রয়োগও স্বাভাবিক। কিন্তু সে-সহজাত প্রবৃত্তি বিষয়কেই জানিয়ে দেয়, বিষয়ের জ্ঞাতাকে জানায় না। এখানেই তার অপূর্ণতা। মানব-বুদ্ধি এ স্বাভাবিকতা থেকে বঞ্চিত। চিন্তা ভাবনা না করে সহজভাবে কর্মক্ষেত্রে তার পদক্ষেপ তাই অসম্ভব। কিন্তু পশুর সহজাত প্রবৃত্তির মতো মানব-বুদ্ধি কেবল বিষয়কেই জানায় না, জ্ঞাতাকেও জানায়। এখানেই বুদ্ধির পূর্ণতা। স্বজ্ঞায় সহজাত প্রবৃত্তির স্বাভাবিকতা আছে আর বুদ্ধির লক্ষ্য আত্মজ্ঞানও আছে। বিষয়-বিষয়ীর পার্থক্য চলে গেলে মানুষ সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে এক হয়ে বিশ্ব-প্রেমের প্রেরণায় অনন্ত কর্ম-প্রবাহের কেন্দ্র হতে পারে। প্রেম-মুখর এই অদম্য কর্ম প্রচেষ্টার উদ্বোধনেই দর্শনের সার্থকতা।

স্বজ্ঞাবাদ ও বিজ্ঞান

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি বুদ্ধিবাদেরই অপরিহার্য ফল। কাজেই বার্গশোঁর মতে, বুদ্ধিবাদী বিজ্ঞান কর্মের এই শুভ প্রেরণা দিতে পারে না। এখানেই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির অপূর্ণতা। তবে স্বজ্ঞার দ্বারা বিশ্বের চরম সত্তা অনুভব করার পর মানুষ এই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকে সুপথে চালিত করতে পারে। এতেই সাধিত হবে ধর্ম ও বিজ্ঞানের সমঝোতা, আর এ সমঝোতাতেই তাদের চরম সার্থকতা।

বার্গশোঁর স্বজ্ঞাবাদে বুদ্ধির স্থান গৌণ, এমন কি নগণ্য। অনেকের মতে, বার্গশোঁর স্বজ্ঞা বুদ্ধির পুরোপুরি বিরোধী।

আমাদের মনে হয়, বুদ্ধি ও স্বজ্ঞার ভিতর শেষ পর্যন্ত কোন অচলায়তন আবিষ্কার করা যায় না। গভীর বিশ্লেষণে দেখা যায়, বুদ্ধির মৌলিক দাবীই স্বজ্ঞার আলোকে উদ্ভাসিত হয়। তত্ত্ব নির্ণয়ে আদি পদক্ষেপ বুদ্ধিই ধরে, কিন্তু তার শেষ পরিণতি হয় স্বজ্ঞায়। প্রথমটিকে যদি গাছের ফুলের সঙ্গে তুলনা করা হয়, তা' হলে দ্বিতীয়টিকে তার ফল বলে অভিহিত করা যেতে পারে।

আমাদের বুদ্ধির শেষ লক্ষ্য ঐক্য। বিজ্ঞানের নিয়মের রাজত্ব আমাদের সহজ বুদ্ধিকে সে-ঐক্যের দিকে একধাপ এগিয়ে দেয়। বিশ্বের মূলীভূত ঐক্য বিজ্ঞানের এওতার বাইরে। বুদ্ধির সৃষ্ট বিজ্ঞান যে ঐক্য পেতে চায়, কিন্তু পায় না, সে ঐক্য স্বজ্ঞার সাহায্যে আমরা পাই। দার্শনিকরা বুদ্ধির সাহায্যে সে ঐক্যের পরোক্ষ ইঙ্গিতই বড়ো জোর করতে পারেন, বুদ্ধি দ্বারা সেই ঐক্যের সাক্ষাৎ জ্ঞান তাঁরা পেতে পারেন না। সুতরাং যে-ঐক্যে বুদ্ধির চরম লক্ষ্য কিন্তু যে-ঐক্যে বুদ্ধি পৌঁছুতে পারে না, বিজ্ঞান যে-ঐক্যে পৌঁছুতে গিয়েও তার থেকে বহু দূরে—স্বজ্ঞা আমাদের সে ঐক্যে পৌঁছিয়ে দেয়। তাই মনে হয়, স্বজ্ঞা বুদ্ধি-বিরোধী নয়, বুদ্ধির চরম পরিণতি, জ্ঞান-বৃক্ষের সুপরিপক্ক ফল।

চতুর্থ অধ্যায়

জ্ঞান-উৎপত্তিবাদ

জ্ঞানের উৎপত্তি সম্বন্ধে দার্শনিকদের মধ্যে যে মতভেদ, সে-বিষয়ে এবার কিছু আলোচনা করতে চাই। এ-আলোচনা ধী বিদ্যা বা এপিসটিমোলজীর অন্তর্ভুক্ত। জ্ঞানের উৎপত্তি বিশ্লেষণ না ক'রে কোন্ জ্ঞান বিশ্বাসযোগ্য আর কোন্ জ্ঞান বিশ্বাসযোগ্য নয়, তা জানা সহজ নয়। আর কোন্ জ্ঞান বিশ্বাসযোগ্য তাই যদি আমরা বুঝতে না পারি, তা হলে যে-তত্ত্ব-জ্ঞান লাভ করা দর্শনের উদ্দেশ্য, তার সম্বন্ধে ভালো ধারণাই আমরা করতে পারব না, তা লাভ করা তো দূরের কথা। সুতরাং তত্ত্ব-নির্ণয়ের পথ সুগম করার উদ্দেশ্যেই জ্ঞান-উৎপত্তিবাদ আলোচনা করা প্রয়োজন।

জ্ঞানের উৎপত্তি সম্বন্ধে যে-তিনটি প্রধান মত আধুনিক য়ুরোপীয় দর্শনে প্রচলিত, তাদের উল্লেখ তত্ত্ব-জ্ঞানের পদ্ধতি-বিশ্লেষণে আমরা আগেই করেছি। কারণ অনেক দার্শনিকের মতে জ্ঞান-উৎপত্তিবাদের সঙ্গে দার্শনিক পদ্ধতির সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য ও অবিভাজ্য। জ্ঞান-উৎপত্তির তিনটি প্রসিদ্ধ মতের নাম: বুদ্ধিবাদ, অভিজ্ঞতাবাদ ও সমীক্ষণবাদ, এ কথাও আগে বলেছি।

বুদ্ধিবাদের ইতিহাস

ডেকার্ট'কে (১৫৯৬-১৬৫০) আধুনিক দর্শনে বুদ্ধিবাদের প্রবর্তক বলা চলে। কিন্তু তারও বহু আগে গ্রীক দর্শনে সক্রেটিস, প্লেটো ও আরিষ্টটল বুদ্ধিবাদের সমর্থন করেছিলেন। গ্রীসের সোফিস্টরা যখন আমাদের সব জ্ঞানই ব্যষ্টিকেন্দ্রিক, সর্বজন-গ্রাহ্য জ্ঞান বা সত্য বলে কিছু নেই—এ-মত প্রচার করেছিলেন, তখন তার প্রতিবাদে সক্রেটিস বুদ্ধিই মানুষের সমস্ত জ্ঞানের উৎস ও আকর ব'লে ঘোষণা করেছেন।

সোফিস্টদের সেরা প্রোটাগোরাস বলেছিলেন: মানুষই সত্যের আসল মাপকাঠি। তাই একজনের কাছে এক অবস্থায় যা সত্য, অন্যের কাছে তা সত্য নয়। যেমন একজনের কাছে যা গরম অন্যের কাছে ত ঠাণ্ডা, একজনের কাছে যা মিষ্টি, অন্যের কাছে তা টক, একজনের কাছে যা ভালো অন্যের কাছে তা মন্দ, এক অবস্থায় যা ভালো অন্য অবস্থায় তা মন্দ। অতএব অবস্থা-নিরপেক্ষ সর্বজনীন সত্য বলে কিছু নেই।

সক্রেটিস প্রোটাগোরাসের মত মেনে নিয়েই তার জবাব দেবার চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেছেন: মানুষ নিজেই সত্যের মাপকাঠি, এ-কথা অস্বীকার করা যায় না। তবে মানুষের মনে জ্ঞান লাভের দু'টি হাতিয়ার আছে—একটি ইন্দ্রিয় আর একটি বুদ্ধি। ইন্দ্রিয় তাকে যে জ্ঞান দেয়, তা অবস্থাভেদে বদলায়; কিন্তু বুদ্ধি তাকে যে জ্ঞান দেয় তা অবস্থাভেদে বদলায় না, তা সব অবস্থায় এক রকম। তাই ইন্দ্রিয় থেকে সত্যিকার জ্ঞানের উৎপত্তি হয় না। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞানকে সত্য ব'লে মেনে নিলে অবস্থাভেদে সাদাকে কালো, কালোকে সাদা, ভালোকে মন্দ, আর মন্দকে ভালো বলা নিশ্চয়ই চলে। তাই এ-জ্ঞান মোটেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। সত্যিকার জ্ঞান বিশ্বাসযোগ্য জ্ঞান, অবস্থা-নিরপেক্ষ জ্ঞান আর বুদ্ধি থেকেই তার উৎপত্তি।

ইন্দ্রিয় আমাদের যে জ্ঞান দেয় তা ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও পরিবর্তনশীল, যেমন ইন্দ্রিয় থেকে যে-সব জ্ঞান পাই তা জনে জনে ভিন্ন, পরিবেশে পরিবেশে ভিন্ন। কিন্তু বুদ্ধির সাহায্যে সকলের যে জ্ঞান আমাদের হয়, সব অবস্থায় তা এক। আবার ইন্দ্রিয় আমাদের যে জ্ঞান দেয়, তা ব্যক্তিসম্বন্ধীয়। কিন্তু বুদ্ধির সাহায্যে আমরা যে-জ্ঞান লাভ করি, তা সর্বব্যক্তিসম্বন্ধীয়। এরই নাম সার্বভৌম ধারণা বা কন্‌সেপ্‌ট্‌।

প্লেটোদর্শনের বুদ্ধিবাদ

সক্রেটিসের কাছ থেকে নির্দেশ পেয়ে মনীষী প্লেটো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞানকে নাম দিয়েছেন ব্যবহারিক জ্ঞান বা ওপিনিয়ন; আর বুদ্ধি-লব্ধ জ্ঞানকে নাম দিয়েছেন পারমার্থিক জ্ঞান বা নলেজ। সক্রেটিস সাধারণ, ব্যাপক ও সার্বভৌম ধারণাকে বুদ্ধি-লব্ধ মানসবস্তু বলেই ধরে নিয়েছেন। প্লেটো তাঁর তত্ত্ববিদ্যায় এই মানস-সত্তার অতীত অতিরূপ সার্বভৌম সত্তকেই চরম তত্ত্ব বলে মেনে নিয়েছেন: উদাহরণ দিয়ে বলা যেতে পারে: আমরা প্রতিটি গরু সম্বন্ধে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যে-ধারণা করি তা ব্যক্তিকেন্দ্রিক, আর বুদ্ধির সাহায্যে সব গরু সম্বন্ধে যে ধারণা করি, তা ব্যাপক ধারণা। আর ইন্দ্রিয়ের অতীত জগতে এই ব্যাপক ধারণার অনুরূপ সমস্ত গরুর একটি শাশ্বত, সার্বভৌম সত্তাও আছে। এইভাবেই সক্রেটিসের বুদ্ধিবাদের পরিণতি প্লেটোর তত্ত্ববিদ্যায়। এই বুদ্ধিবাদকে মেনে নিয়ে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞানকে খানিকটা প্রাধান্য দিয়ে আরিস্টটল তত্ত্বনির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন। তাই প্লেটোর তত্ত্ব-শাস্ত্রের লেজা-মুড়ো বাদ দিলেই আরিস্টটলের তত্ত্ব-শাস্ত্র পাওয়া যায়।

ডেকার্টের তিক্ত অভিজ্ঞতা

ডেকার্ট জেসুইস্ট মিশনারীদের বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর শিক্ষা সমাধা করেন। সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিতশাস্ত্র আলোচনার উপর খুব জোর দেওয়া হতো। সেখানকার মিশনারী শিক্ষকরা বলতেন, তাঁরা যে-সব কথা ছাত্রদের শেখান, সেগুলো গণিতের সিদ্ধান্তের মতোই সুনিশ্চিত সত্য। দু'য়ে দু'য়ে চারের ভিতর যেমন কোন ভুল-ভ্রান্তির সম্ভাবনা নাই, তেমনি এ-সব কথার ভিতরও কোন ভুল-ভ্রান্তি নাই, থাকতে পারে না। এটাই ছিল তাঁদের মত। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ করে ডেকার্ট যখন কর্মজীবনে প্রবেশ করেন, তখন তিনি দেখলেন তাঁর শিক্ষকেরা তাঁকে যেসব কথা অভ্রান্ত বলে শিখিয়েছিলেন, তার ভিতর প্রচুর ভুল-ভ্রান্তি। এ তিক্ত অভিজ্ঞতা ক্রমেই বেড়ে চললো। ডেকার্ট তাই ঠিক করলেন যে, কর্মজীবন থেকে অবসর নেবার পর যা কিছু তিনি জীবনে শিখেছেন, সব কিছুকেই আবার বিচারের কষ্টিপাথরে যাচাই করে নেবেন।

তিনি ছিলেন একজন উচ্চপদস্থ সৈনিক। সে-দায়িত্বপূর্ণ কাজে ভাবনা-চিন্তার বিশেষ সুযোগ-সুবিধা ছিল না। ডেকার্ট যথাসময়ে তাই তাঁর কাজ থেকে অবসর নিয়ে চিন্তার রাজত্বে এক নতুন যাত্রাপথে অভিযান শুরু করলেন। মানুষের চিন্তার ইতিহাসে একজন উচ্চপদস্থ সৈনিকের বুদ্ধিজীবী দার্শনিক হবার এ-চেষ্টা একটি স্মরণীয় ঘটনা, সন্দেহ নাই। সচল সক্রিয় তরবারি ও গুলী-গোলার সঙ্গে দার্শনিকের নিশ্চল নিষ্ক্রিয় চিন্তার যোগসাধন যে খুবই কঠিন কাজ, তা বলাই বাহুল্য।

এই অভিযান থেকেই তাঁর বুদ্ধিবাদের গোড়াপত্তন। কথায় বলে, বীরত্বের মূলনীতি হঠকারিতা নয়, স্থির-ধীর পদক্ষেপ। এ-নীতিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে ডেকার্ট ঠিক করলেন: জীবনে তিনি যেসব জিনিস ঠিক বলে মনে করেছেন, তার অনেকগুলোই যখন ভুল বলে প্রমাণিত হয়ে গেছে, তখন আজ হতে তার কোন কিছুই তিনি সত্য বলে স্বীকার করবেন না, যতক্ষণ না বুদ্ধির কষ্টিপাথরে তা নিঃসন্দেহে সত্য বলে প্রমাণিত হয়। যুক্তির প্রতি এই পক্ষপাত, এই অকুণ্ঠ বিচারশীল মনোবৃত্তি ডেকার্টের বুদ্ধিবাদের আসল কথা।

এই বিচারশীল মনোবৃত্তির দরুনই ডেকার্ট ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞানের প্রামাণ্য তাঁর দার্শনিক চিন্তার শুরুতে বেমালুম অস্বীকার করে ফেলেন। ডেকার্ট বলেন: আমাদের ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যে-বিরাট বিশ্বজগৎ প্রত্যক্ষ করছি তাকে আমরা সত্য বলে মেনে নিতে পারি না, কারণ তাকে সন্দেহ করা চলে। ঘুমের ভিতর স্বপ্নের মাধ্যমে জাগ্রত জীবনে প্রত্যক্ষের চেয়েও আরো সুস্পষ্টভাবে

আমরা এমন অনেক জিনিস, যেমন গাছ, পাথর, বাড়ীঘর, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, গ্রহ-তারা দেখি, কিন্তু ঘুম ভাঙ্গা মাত্রই সে-সব জিনিসকে আমরা দেখতে পাই না। একথা কোনও যুক্তিবাদী হলফ করে বলতে পারেন না যে, রাত্রে ঘুমিয়ে আমরা যেমন স্বপ্ন দেখি, দিনের বেলা জেগে থেকেও আমরা সে-রকম স্বপ্ন দেখছি না। নিরপেক্ষ যুক্তি-বিচারের মাপকাঠিতে স্বপ্নের সাথে জাগ্রত জীবনের কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রভেদ-রেখা খুঁজে পাওয়া কঠিন। তাই ডেকার্ট বলেন: ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমাদের অভ্রান্ত ও বিশ্বাসযোগ্য জ্ঞান হয়, একথা বলা চলে না। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞান যেখানে বুদ্ধির সমর্থন লাভ করতে পারে সেখানেই গ্রাহ্য, অন্যথায় তা অগ্রাহ্য। তাই জ্ঞানের আসল উৎস ইন্দ্রিয় নয়, বুদ্ধি, প্রত্যক্ষ, সংবেদন নয়, বুদ্ধির সাহায্যে তার সমর্থন।

এ-বুদ্ধিবাদের অনুপ্রেরণায় ডেকার্ট বললেন: সব কিছুকে আমরা সন্দেহ করতে পারি, একমাত্র সন্দেহকেই সন্দেহ করতে পারি না। প্রথম সন্দেহকে সন্দেহ করলে তা থেকে দ্বিতীয় সন্দেহের উৎপত্তি, আর দ্বিতীয় সন্দেহকে সন্দেহ করার ফলে তৃতীয় সন্দেহের উৎপত্তি। এভাবে সন্দেহের ধারা বেড়েই চলে, তার শেষ খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই ডেকার্ট বলেছেন: আর সব কিছুকেই সন্দেহ করা সম্ভব, কিন্তু সন্দেহকেই সন্দেহ করা সম্ভব নয়। আর সন্দেহ মনেরই একটি অবস্থা, অর্থাৎ এক ধরনের চিন্তা বা ভাবনা। তাই শেষ পর্যন্ত এই দাঁড়ালো: একমাত্র চিন্তাকেই আমরা সন্দেহ করিতে পারি না; চিন্তাই বিশ্বজগতে একমাত্র অসন্দিগ্ধ পদার্থ, যার সত্তা কোন ক্রমেই অস্বীকার করা চলে না। আর চিন্তা যদি অসন্দিগ্ধ হয়, তাহলে চিন্তার কর্তাও অসন্দিগ্ধ হয়ে গেল। ছেদনকর্তা ছাড়া যেমন বৃক্ষ-ছেদন হয় না, লেখক ছাড়া যেমন লেখনী পরিচালনা হয় না, ভোক্তা ছাড়া যেমন ভোজন-ক্রিয়া হয় না, ঠিক তেমনি চিন্তার কর্তা ছাড়া চিন্তা হয় না, হতে পারে না। অতএব চিন্তা আছে ব'লেই চিন্তার কর্তা আমিও আছি। চিন্তার কর্তা হিসাবে আমার সত্তা তাই পূর্ণমাত্রায় বিশ্বাস্য, অভ্রান্ত ও সংশয়লেশশূন্য।

আমি বা চিন্তার কর্তার স্বীকৃতি ডেকার্টে'র মতে বুদ্ধিবাদের প্রথম সিদ্ধান্ত। ডেকার্ট বলেন: 'আমি'র অসন্দিগ্ধ সত্তার প্রমাণ তার সুস্পষ্টতা, অবাধ প্রতীতি। এ-থেকে বুদ্ধিবাদকে আর এক ধাপ এগিয়ে দে'য়া সম্ভব, তা হলো এই: যা কিছুর প্রতীতি 'আমি'র প্রতীতির মতো সুস্পষ্ট ও বাধারহিত, তা-ই অভ্রান্ত সত্য।

এই নব-আবিষ্কৃত সত্যের আলোকে ডেকার্ট মানুষের মন বিশ্লেষণ করে দেখতে পেলেন, তাতে তিনটি বিভিন্ন ধরনের ধারণা রয়েছে। তাদের একজাতীয়

ধারণা : আমাদের মনে বাইরের বস্তুরই প্রতিফলন। বস্তুর সত্তা আমরা সন্দেহ করতে পারি, কিন্তু বস্তুর প্রতিফলনের, তার মানস-চিত্রের সত্তা আমরা সন্দেহ করতে পারি না। স্বপ্নের বেলায়ও স্বপ্ন দেখাকে অস্বীকার করা যায় না, স্বপ্নে-দেখা জিনিসগুলোকেই অস্বীকার করা চলে। আরেক জাতীয় চিন্তা বা ভাবনা আমাদের মনে আছে · সেগুলো আমাদের মনেরই নিছক কল্পনা, মানসসৃষ্টি ছাড়া তাদের আর কিছু বলা যায় না। যেমন ডানাওয়ালা সাপের, পরীর ও ঘোড়ার ডিমের কল্পনা, এসব ধারণার অনুরূপ বস্তু বাইরে নাই। বাইরের বস্তুর যেসব প্রতিফলন আমাদের মনে আছে, এগুলো তাদেরই জগাখিচুড়ি। কিন্তু এছাড়াও তৃতীয় প্রকারের কতকগুলো ধারণা আমাদের মনে আছে। তারা বাইরের বস্তুরও প্রতিফলন নয়, আর আমাদের মনের সৃষ্টিও নয়। জন্মাবধি এইসব ধারণা আমাদের মনে রয়েছে, তাই এগুলোকে সহজাত ধারণা বলা চলে। এরা বস্তুর প্রতিফলনের মতো বহিরাগতও নয়, মানসসৃষ্টিও নয়। অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে মানব-মনে এদের অনুপ্রবেশ।

এই সহজাত ধারণার ভিতর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধারণা অসীম, অনন্তের ধারণা। সীমিত বস্তুর ধারণা আমাদের সকলেরই আছে। টেবিল-চেয়ার, গাছ-পাথর, জন্তু-জানোয়ার, এদের সকলকেই আমরা সীমিত বস্তু বলে জানি। আমরা সচরাচর ভেবে দেখি না, অসীমের ধারণা নিষেধ করেই সীমিত বস্তুর ধারণার সৃষ্টি। সীমার চারধারেই অসীম, আর এই অসীমের ভিতরই দড়ি দিয়ে বেড়া কাটার মতো সীমার সৃষ্টি ও উৎপত্তি। তাই অসীমের ধারণা হলো মৌলিক, আর সীমার ধারণা তারই ছায়া। অসীমের ধারণাই অস্তিবোধক, আর সীমার ধারণা নাস্তিবোধক।

অনন্ত অসীমের এই সহজাত ধারণা থেকেই ডেকার্ট' নানা যুক্তির সাহায্যে প্রমাণ করলেন অনন্ত অসীমের সত্তা। তাঁর প্রথম যুক্তি হলো : টেবিল-চেয়ার গাছ-পাথরের মতো অত্যন্ত সীমাবদ্ধ জিনিসের স্বভাব এই যে, "আমাদের মনের ভিতর তাদের ধারণা রয়েছে আর আমাদের মনের বাইরে বস্তুর আকারেও তারা রয়েছে। অনন্ত অসীম যদি শুধু মনেরই ধারণা হয়, বাইরে যদি তার অস্তিত্ব না থাকে, তাহলে সীমাবদ্ধ বস্তুর চেয়েও অসীম ছোট হয়ে যাবে। সীমাবদ্ধ বস্তুরও অস্তিত্ব ও ধারণা দুই-ই আছে আর অসীমের যদি শুধু ধারণাই থাকে, অস্তিত্ব না থাকে, তাহলে অসীম সীমার চেয়েও ছোট হয়ে যাবে। কিন্তু সীমার চেয়ে অসীম কখনো ছোট হতে পারে না।

আমরা দু'টি অসীমের কল্পনা করতে পারি। একটি অসীম শুধু আমাদের মনেই আছে, বাইরে তার কোন অস্তিত্ব নাই। আরেকটি অসীম ধারণার আকারে

আমাদের মনে আছে; বস্তুর আকারে আমাদের মনের বাইরেও আছে। এখন এ সত্য অতি স্পষ্ট যে, আমাদের পরিকল্পিত দ্বিতীয় অসীম প্রথম অসীমের চেয়ে বড়ো। কিন্তু অসীমের সংজ্ঞা অনুসারেই তার চেয়ে কিছু বড়ো হতে পারে না, তাই আমাদের প্রথম অসীম সত্যিকার অসীম নয়—দ্বিতীয় অসীমই সত্যিকার অসীম। এভাবেই ডেকার্ট প্রমাণ করলেন যে, আমাদের মনে অনন্ত অসীম ঈশ্বরের যে ধারণা রয়েছে, তা থেকেই প্রমাণ হয় যে, অনন্ত অসীম ঈশ্বর সত্যিই আছেন। যেহেতু এই সহজাত ধারণাগুলো আমাদের মনের ভিতর স্রষ্টিকর্তা ঈশ্বর দিয়ে রেখেছেন, তাই বলা চলে, স্বয়ং ঈশ্বরই তাঁর অনন্ত অসীম সত্তার যে ছাপ আমাদের মনের ভিতর রেখেছেন তার সাহায্যেই তাঁর সত্তা সম্বন্ধে আমরা অসন্দিগ্ধ প্রতীতি লাভ করতে পারি।

ডেকার্ট আরো যে-সব প্রমাণের সাহায্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন, তার আলোচনা এখানে বুদ্ধিবাদের বিশ্লেষণে অপ্রাসঙ্গিক।

ডেকার্টের বুদ্ধিবাদের প্রথম ধাপ হলো 'আমি'র অসন্দিগ্ধ সত্তার স্বীকৃতি, দ্বিতীয় ধাপ হলো অসীম অনন্তের ধারণার স্বীকৃতি, আর তৃতীয় ধাপ হলো অসীম অনন্তের সত্তার স্বীকৃতি।

ঈশ্বরের সত্তা প্রমাণ করে তার মাধ্যমে বুদ্ধিবাদী হয়েও ডেকার্ট ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতার অবস্থা-সাপেক্ষ প্রামাণ্য স্বীকার ক'রে নেন। তিনি বললেন: ঈশ্বরই আমাদের ইন্দ্রিয় দ্বারা বাইরের দুনিয়াকে জানবার ক্ষমতা দিয়েছেন। যদি সেই শক্তির সদ্ব্যবহার ক'রেও আমরা দুনিয়াকে ভুল জানি, তাহলে অনন্ত অসীমের উপর প্রবঞ্চকতা-দোষ আরোপ করতে আমরা বাধ্য হই। অনন্ত অসীম ঈশ্বর কখনো প্রবঞ্চক হতে পারেন না। সর্বশক্তিমান হওয়ায় প্রবঞ্চনার শক্তি তাঁর সত্যিই আছে; কিন্তু যেহেতু তিনি অসীম, সেজন্য কাউকে তিনি কখনো প্রবঞ্চনা করেন না, করতে পারেন না।

ঈশ্বরের প্রবঞ্চনা-শক্তির যে জোরালো ভাষ্য ডেকার্ট দিয়েছেন, তা অনেকের কাছে গোঁজামিল বলে মনে হতে পারে। সর্বশক্তিমত্তা সম্বন্ধে যে অভিধানগত ধারণা প্রচলিত, তারই চাপে ডেকার্ট প্রবঞ্চনাশক্তিকেও সর্বশক্তির আওতায় ফেলে দিয়েছেন। সীমা থেকেই শক্তির স্বল্পতা। যেহেতু ঈশ্বর সীমাহীন, সেজন্য তাঁর শক্তিও অনন্ত। প্রবঞ্চনাশক্তি হয়তো এই শক্তির অল্পতারই ফল। কাজেই পরিপূর্ণ স্বভাব ঈশ্বরে তা আরোপ করা যায় কি না, তা ভেবে দেখার বিষয়।

যাই হোক, ডেকার্ট এভাবেই দেখালেন, আমাদের ইন্দ্রিয়জ অনুভূতি যে মাঝে মাঝে ভুল হয়, যেমন দড়িকে আমরা মাঝে মাঝে সাপ বলে দেখি, সেটা

আমাদেরই অস্থিরতার, ঈশ্বর-দত্ত শক্তিরই অপব্যবহারের ফল। আমরা সেই শক্তির যখন সদ্ব্যবহার ক'রে ধীরভাবে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বস্তু প্রত্যক্ষ করি, তখন সেই প্রত্যক্ষ বিশ্বাসযোগ্য ও নির্ভুল হয়। মোট কথা, বুদ্ধি যেখানে ইন্দ্রিয়ানুভূতিকে সমর্থন করে, সেখানে ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতা গ্রহণযোগ্য; যেখানে বুদ্ধি তাকে সমর্থন করে না, সেখানে ইন্দ্রিয়জ অনুভূতি অপ্রামাণ্য ও অগ্রাহ্য। তাই ডেকার্টের বুদ্ধিবাদ ইন্দ্রিয়জ অনুভূতির পুরোপুরি বিরোধী নয়। তাতে বুদ্ধিবাদের স্থান মুখ্য, ইন্দ্রিয়জ অনুভূতির স্থান গৌণ।

ডেকার্ট তাঁর এই বুদ্ধিবাদকে গাণিতিক পদ্ধতির সাহায্যে দার্শনিক সিদ্ধান্ত নির্ণয়ের চেষ্টা ব'লে অভিহিত করেছেন। তিনি ছিলেন একজন বড়ো গণিতজ্ঞ। গণিতের অবরোহ-পদ্ধতির, অর্থাৎ কতগুলি নিশ্চিত সত্য মেনে নিয়ে তা থেকে ধীরে ধীরে ছোট ছোট অভ্রান্ত সত্যে উপনীত হবার চেষ্টার প্রয়োগ ডেকার্ট তাঁর দর্শনে করেছেন। গাণিতিক পদ্ধতিতে লব্ধ দার্শনিক সিদ্ধান্ত গণিতের সিদ্ধান্তের মতোই সহজবোধ্য ও সুনিশ্চিত হবে, এটাই ছিলো ডেকার্টের বিশ্বাস।

স্পিনোজার বুদ্ধিবাদ

ডেকার্টের এ বুদ্ধিবাদকে আরেক ধাপ এগিয়ে স্পিনোজা (১৬৪২-১৬৭৭) তার পরিণতি খুঁজে বের করেছেন এক বিশ্বব্যাপী শাশ্বত সত্তার প্রত্যক্ষ অনুভূতিতে। আমাদের ইন্দ্রিয়জ অনুভূতির মূল্য আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে স্পিনোজা স্বীকার করেছেন সন্দেহ নেই, কিন্তু তত্ত্ব-নির্ণয়ে ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতা ও তার উপর প্রতিষ্ঠিত অনুমানের প্রামাণ্য তিনি পুরোপুরি অস্বীকার করেছেন। স্পিনোজার মতে যা কালিক, ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমানের সঙ্গে যার সম্বন্ধ, তা কখনো সত্য হতে পারে না; যা ত্রৈকালিক, যা শাশ্বত, তাই সত্য, তার সত্তা অনস্বীকার্য। ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে আমাদের চলমান কর্মচঞ্চল প্রাত্যহিক জীবনের যে অপরিহার্য যোগ, স্পিনোজার মতে তা অসত্য, অপ্রমাণ, খণ্ডদৃষ্টি থেকেই এর উৎপত্তি। এই কারণেই ইন্দ্রিয়জ অনুভূতি ভ্রান্ত, অবিশ্বাস্য। আমাদের ইন্দ্রিয় অনন্ত শাশ্বত সত্তাকে খণ্ডিত ক'রে তাকে চলমান কালিক রূপ দেয়। যে অখণ্ড দৃষ্টি দ্বারা শাশ্বত সত্যকে জানা যায়, ইন্দ্রিয় তা থেকে চিরবঞ্চিত; কাজেই ইন্দ্রিয়ের জগৎ খণ্ডিত জগৎ, কালিক জগৎ।

এই জগতের যে কালাতীত শাশ্বত অখণ্ড রূপ, আমাদের বুদ্ধি তাকে পরোক্ষভাবে জানতে পারে। একটি উদাহরণ দিয়ে এ বিষয়ের বিশ্লেষণ করছি। গফুরের কথাই ধরা যাক। 'গফুর' বলতে আমরা প্রথমতঃ তার শরীরই বুঝি। তার এই শরীর কতকগুলো পরিবর্তন-ধারার সমষ্টি। একটি দৈহিক পরিবর্তন

থেকে আরেকটি দৈহিক পরিবর্তনের উৎপত্তি। এই পরিবর্তন-প্রবাহের নামই গফুরের শরীর। এটাই কিন্তু গফুরের সহজ উপলব্ধি-গম্য সত্তা নয়। গফুর বলতে এই দৈহিক পরিবর্তন-প্রবাহের সঙ্গে তার অপরিহার্য প্রতিফলন চিন্তা-প্রবাহকে আমরা বুঝি। এরই নাম গফুরের মন। প্রথমটি হলো তার বহিঃসত্তা আর দ্বিতীয়টি হলো তার আত্মিক সত্তা। এই দুই সত্তার যোগফল হলো গফুর।

যদিও গফুরের মন তার দেহেরই প্রতিফলন, তথাপি এ দু'য়ের ভিতর কোন সাক্ষাৎ যোগ বা একের উপর অন্যের সাক্ষাৎ প্রভাব দেখতে পাওয়া যায় না। এর অবস্থা অনেকটা দু'টি সমান্তরাল রেখার মতো। অবাধ গতিশীল দুটি সমান্তরাল রেখার মতো একে অন্যের উপর প্রভাব বিস্তার না ক'রেই এরা ছুটে চলেছে নিজের নিজের পথে।

কিন্তু বুদ্ধির সাহায্যে গফুরের দেহ ও মন বিশ্লেষণের এটাই শেষ কথা নয়। সারা বিশ্বেই গফুরের দেহের সঙ্গে জড়িত জড় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর এক প্রবাহ বিদ্যমান। তারই এক ক্ষুদ্রতম অংশের নাম গফুরের দেহ। ঠিক তেমনি গফুরের মনের সঙ্গেও সারা বিশ্বের সমস্ত চিন্তাশীল প্রাণীর চিন্তা-প্রবাহের যোগ। সেই সীমাহীন চিন্তা-প্রবাহের এক ক্ষুদ্রতম অংশের নামই গফুরের মন। সুতরাং বুদ্ধির বিশ্লেষণে ধরা পড়ে, আমরা যাকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ বলি, তার স্বভাব খণ্ডিত নয়। তাতে রয়েছে দু'টি সীমাহীন সমান্তরাল রেখার মতো বর্তমান জড় পরিবর্তন-প্রবাহ আর অজড় ভাবনা-প্রবাহ। এটাই হলো আমাদের চিরপরিচিত অথচ দুর্বোধ্য অভিজ্ঞতার জগৎ।

এই দুই প্রবাহ পাশাপাশি সমান্তরাল রেখার মতো কেন ছুটে চলেছে, এ প্রশ্নের উত্তর বুদ্ধির মতে: সীমাহীন জড় পরিবর্তন-ধারা ও অজড় ভাবনা-প্রবাহ পাশাপাশি চলেছে—যেহেতু এক অনন্ত সত্তা তাদের উৎস ও আকর, সেই অনন্ত সত্তারই তারা বহিঃপ্রকাশ। সেই অনন্ত সত্তায় কালের প্রবেশ নিষেধ। কারণ কাল খণ্ড দৃষ্টিরই নামান্তর। আমরা যাকে কাল বলি, তাকে আমরা সেকেণ্ড, মিনিট, ঘণ্টা, মাস, বছর ইত্যাদি নানাভাবে টুক্‌রো করে দেখি। তাদের উৎস সেই অনন্ত সত্তার সঙ্গে যোগ করে যদি জগৎকে দেখি, তখন আর খণ্ড ও কালিক দৃষ্টি থাকে না। তখন আমরা বুঝতে পারি, ইউক্লিডের জ্যামিতির ত্রিভুজের স্বভাব থেকেই যেমন তার ত্রিকোণের যোগফল দুই সমকোণ, ত্রিভুজ ও তার ত্রিকোণের যোগফল দুই সমকোণের মাঝখানে যেমন কোনো কালিক ব্যবধান নাই, ঠিক সে রকমই অনন্ত অসীম সত্তা ও বিশ্বজগৎ সহভাবী, তাদের মাঝখানে সময়ের কোনও ব্যবধান নাই; সুতরাং কালের অনুভূতি অলীক,

অপ্রমাণ। আর আমাদের ইন্দ্রিয়জগৎ অনুভূতিও অপ্রমাণ, কারণ কাল ও ইন্দ্রিয়জ অনুভূতি অবিচ্ছেদ্য।

ডেকার্ট যে গাণিতিক পদ্ধতি দর্শনে প্রয়োগ করার চেষ্টা করেছেন, স্পিনোজা তাকে রূপান্তরিত করেছেন জ্যামিতিক পদ্ধতিতে। দুয়েরই মূল কথা এক, দু'জনেই অবরোহ-পদ্ধতিতে দার্শনিক সিদ্ধান্ত প্রমাণে সচেষ্ট। ডেকার্ট ও স্পিনোজাতে শুধু এই প্রভেদ যে, স্পিনোজা দর্শনে অবরোহ পদ্ধতির প্রয়োগ করতে গিয়ে ইউক্লিডের জ্যামিতিকে পুরোপুরি অনুকরণ করে তার সমস্ত দার্শনিক চিন্তাধারাকে স্বতঃসিদ্ধ, উপপাদ্য, সিদ্ধান্ত, উপসিদ্ধান্ত ইত্যাদির রূপ পুরোপুরি দিয়ে দিয়েছেন।

বুদ্ধির সাহায্যে বিশ্বের অখণ্ডত্বের এই যে প্রতীতি, যাতে তার চলমান কালিক-শক্তি বিলুপ্ত, স্পিনোজার মতে তা পরমতত্ত্বের পরোক্ষ অনুভূতি। এই পরোক্ষ অনুভূতিতে আমরা বিশ্বসত্তার মাধ্যমে যে শাশ্বত সত্তায় বিশ্ব প্রতিষ্ঠিত, তাকে জানি। কিন্তু এটাই এই অনুভূতির শেষরূপ নয়, এ অনুভূতির শেষরূপ তত্ত্ব-সাক্ষাৎকার। যেহেতু এই অনুভূতি বৈজ্ঞানিক যুক্তিসিদ্ধ, তাই স্পিনোজা এর নাম দিয়েছেন বৈজ্ঞানিক স্বজ্ঞা বা বোধি। এতে আমরা সেই শাশ্বত চরম সত্তা, যাতে বিশ্ব প্রতিষ্ঠিত, তাকে সাক্ষাৎভাবে জানি। এই অনুভূতিতে আমরা সেই সত্তার মাধ্যমেই বিশ্ব-জগৎকে জানি, বিশ্ব-জগতের মাধ্যমে তাকে জানি না।

জন্ লকের অভিজ্ঞতাবাদ

ইংরেজ দার্শনিক জন্ লক (১৬৩২-১৭০৪) অভিজ্ঞতাবাদের গোড়াপত্তন করেন। জ্ঞানের উৎপত্তি সম্বন্ধে জন্ লকের মত ডেকার্টের মতের ঠিক বিপরীত। ডেকার্টের বুদ্ধিবাদের উগ্র বিরোধিতা ক'রে লক ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতাবাদের গোড়াপত্তন করেন। তিনি বলেন: মানুষের মন তার জন্মের মুহূর্তে সম্পূর্ণরূপে অভিজ্ঞতার প্রভাবমুক্ত। তার মনে তখন কোনও চিন্তাভাবনা নাই। মানুষের মনের এই আদিমতম অবস্থাকে লক একটা অলিখিত পাথরের টেব্‌লেটের সঙ্গে তুলনা করেছেন। পাথরের টেব্‌লেটে খোদাই ক'রে কিছু না লেখা পর্যন্ত যেমন তাতে কোন দাগ দেখতে পাওয়া যায় না, তেমনি তার জীবনের আদিমতম মুহূর্তে মানুষের মনে কোন অভিজ্ঞতারও ছাপ নেই। বাইরের জগতের উত্তেজনা এসে যখন তার মনকে সক্রিয় ক'রে তোলে, তখন থেকেই তার জ্ঞানের শুরু। তার আগে তার মন সম্পূর্ণরূপে জ্ঞানহীন।

লক তাই মনে করেন, ডেকার্টের পরিকল্পিত সহজাত ধারণা বলে কোন ভাবনা মানুষের মনে নাই। এ রকম অভিজ্ঞতার সঙ্গে সংম্বন্ধ-বর্জিত ধারণা যদি মানুষের মনে কিছু থাকতো, তাহলে সব মানুষের মনেই তার উপলব্ধি সমানভাবে হতো। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা চলে, যদি অসীম, অনন্তের ধারণা মানুষের সহজাত হতো, আর তার অভিজ্ঞতার সঙ্গে যদি তার কোন যোগ না থাকতো, তাহলে সব মানুষই ঈশ্বর-বিশ্বাসী হতো, ঈশ্বরের সত্তায় সন্দিহান মানুষ কেউ থাকতো না। কিন্তু এ-কথা সকলেরই জানা যে, সৃষ্টির আদি যুগ থেকে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত জগতে অনেক নিরীশ্বরবাদী রয়েছেন, আর ভবিষ্যতেও থাকবেন।

আর এ-জাতীয় সহজাত ধারণা ডেকার্টের মতো পণ্ডিতদের মনেই খুঁজে পাওয়া যায়, সাধারণ মানুষের মনে খুঁজে পাওয়া যায় না। অন্ততঃ অল্প-বয়স্ক শিশু, অপরিপক্কবুদ্ধি ও নির্বোধদের মনে এ-জাতীয় সহজাত ভাবনা বলে কিছু নেই। কেউ কেউ মনে করতে পারেন, সহজাত ভাবনা সব মানুষের মনেই আছে, কিন্তু সকলে সকল মনের ভিতর তার সন্ধান খুঁজে পায় না। লক মনে করেন, এ-মত অতি উদ্ভট ও অবাস্তব। তাঁর মতে, মনের ভিতর কোন কিছু থাকা ও তাকে জানা একই কথার এপিঠ আর ওপিঠ। অজ্ঞাত নির্জ্ঞান মন বলে যে কিছু আছে, আজকের দিনের ফ্রয়েডীয়দের মতে লক তা মানতেন না।

এভাবে সহজাত ধারণা খণ্ডন করে লক তাঁর অভিজ্ঞতাবাদের সাহায্যে জ্ঞানের উৎপত্তি ও বিবর্তন ব্যাখ্যা করতে প্রবৃত্ত হন। লক বলেন: আমাদের জ্ঞানের শুরু কতকগুলো অবিমিশ্র সহজ, সরল ধারণা নিয়ে। এই সব ধারণাকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। তাদের কতকগুলোর উৎপত্তি বাইরের জগৎ থেকে, আর কতকগুলোর উৎপত্তি আমাদের মনের ভিতর থেকে। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ইত্যাদির যে ধারণা, তার উৎপত্তি বাইরের জগৎ থেকে। তাই এদের নাম বাহ্য-প্রত্যক্ষজ অবিমিশ্র ধারণা। আর এই রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শের অনুভূতি থেকে আমাদের মনে সুখ-দুঃখ ইত্যাদির যে অবিমিশ্র ধারণা জন্মে, তার নাম মানস-প্রত্যক্ষজ অবিমিশ্র ধারণা। এখানে লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, আমাদের মানস-প্রত্যক্ষ বাহ্য-প্রত্যক্ষের উপর নির্ভরশীল। কাজেই শেষ পর্যন্ত আমাদের সমস্ত জ্ঞানের উৎস বাইরের জগৎ।

লকের এই দু'রকমের প্রত্যক্ষজ অবিমিশ্র ধারণার সঙ্গে ন্যায়-দর্শনের বাহ্য-প্রত্যক্ষ ও মানস-প্রত্যক্ষের সাদৃশ্য প্রচুর। নৈয়ায়িকরাও বাহ্য বস্তুর সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সংস্পর্শ থেকে রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শের, আর আমাদের মনের সাহায্যে সুখ-দুঃখের প্রত্যক্ষ অনুভূতি হয়, একথা স্বীকার করেছেন।

লকের মতে মানুষের মন অত্যন্ত নিষ্ক্রিয়ভাবে এই দু'রকমের অবিমিশ্র ধারণার অধিকারী হয়। এটা তার জ্ঞানের প্রথম স্তর। জ্ঞানের দ্বিতীয় স্তরে মানুষের মন কিন্তু সক্রিয়, নানা রকমের, নানা বিষয়ের অবিমিশ্র ধারণাকে একত্র করে মানুষের মন জ্ঞানের দ্বিতীয় স্তরে, নানা ধরনের মিশ্র ধারণা সৃজন করে। আমরা দিনরাত যে-বস্তুর কথা বলি, তা আমাদের মনের সৃষ্ট মিশ্র ধারণারই প্রতিরূপ। একটি টেবিলের উদাহরণের সাহায্যে একথা বোঝার চেষ্টা করা যাক। টেবিলের রং, তার চেহারা, তার ওজন ইত্যাদি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমরা জানি। এগুলো সম্বন্ধে আমাদের অবিমিশ্র ধারণা আছে। কিন্তু টেবিলকে আমরা এভাবে জানতে পারি না। এ-সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য গুণ যাতে আছে তাকেই আমরা টেবিল বলি, তাই আমাদের টেবিলের ধারণা একটি মিশ্র ধারণা। তাকে মোটামুটি গুণগুলোর ধারণার যোগফলও বলা চলে।

নানা রকমের অবিমিশ্র ধারণার সংযোগে মিশ্র ধারণার সৃষ্টি, আর নানারকমের মিশ্র ধারণার যোগে আমাদের জ্ঞানের বিরাট ইমারত সৃষ্টি। রাজমিস্ত্রী যে রকম চুন-সুরকির যোগে ইটের উপর ইট চাপিয়ে দালান তৈরী করে, আমরাও আমাদের ইচ্ছা-শক্তির প্রয়োগে, অবস্থার তাগিদে অবিমিশ্র ধারণার যোগে মিশ্র ধারণার, আর মিশ্র ধারণার যোগে জ্ঞানের ইমারত গড়ে তুলি।

আমাদের জ্ঞানভাণ্ডারে এমন কিছু নেই, বাইরের জগৎ থেকে যা আমাদের মনের কাছে উত্তেজনার আকারে এসে হাজির হয়নি। মানুষের বিস্তীর্ণ জ্ঞান-ভাণ্ডারের উৎপত্তি ও বিবর্তন ভালোভাবে বিশ্লেষণ না ক'রে আমরা মনে করি, এই জ্ঞান-ভাণ্ডারের কিছুটা অংশ আমাদের মনের ভিতর জন্ম থেকেই রয়েছে; কিন্তু এ-ধারণা খুবই ভুল; যেমন ইংরেজী সাহিত্যের নানা ধরনের জটিল কথাগুলো আসলে তার বর্ণমালার ছাব্বিশটি অক্ষরের নানা প্রকারের বিন্যাস ছাড়া কিছুই নয়, ঠিক তেমনি আমাদের মনের অসংখ্য অগণিত ভাবরাজিও বাইরের জগৎ থেকে পাওয়া আমাদের অবিমিশ্র ধারণাগুলোর হরেক রকমের যোগফল ছাড়া আর কিছুই নয়। বুদ্ধি থেকেই সত্যিকার জ্ঞানের উৎপত্তি, বুদ্ধিবাদের এই সর্বজনবিদিত মতকে সাক্ষাৎভাবে চ্যালেঞ্জ ক'রে লক বলেছেন: মানুষের বুদ্ধিতে এমন কিছু নেই, থাকতে পারে না, যার সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে তার সাক্ষাৎ পরিচয় আগে হয়নি। অতএব ইন্দ্রিয়ই জ্ঞানের একমাত্র উৎস। বুদ্ধির কাজ ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের বিশ্লেষণ ও সংযোজন। আধুনিক কালের শিক্ষিত পরিবারের আলোকপ্রাপ্তা গৃহিণীরা যেমন অনেক সময় নিজে উপার্জন না করলেও স্বামীর উপার্জিত অর্থের সদ্ব্যবহার যাতে হয় সেজন্য তার প্রতি কপর্দকের

উপর কড়া নজর রাখেন, বুদ্ধিও অনেকটা সে-নিয়মেই ইন্দ্রিয়ের আহৃত জ্ঞানের সংরক্ষণ করে থাকে।

লাইবনিজ ও অন্তরাত্মা

জার্মান দার্শনিক লাইবনিজের বুদ্ধিবাদে জন্ লকের অভিজ্ঞতাবাদেরই প্রতিবাদ, বর্জন ও গ্রহণ, এই ত্রিবিধ আপাতঃবিরোধী চেষ্টার একটা সামঞ্জস্য দেখা যায়। লাইবনিজ (১৬৪৬-১৭১৬) মনে করেন, মানুষ কোন জ্ঞান বাইরের জগৎ থেকে পেতে পারে না। কারণ তার চেতন অন্তরাত্মা বাইরের বস্তুর প্রভাবে প্রভাবিত হয় না, হতে পারে না। চেতন সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন, তাই তা বাহ্য উত্তেজনার প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। সুতরাং বাইরের জগৎ থেকে কোন উত্তেজক এসে আমাদের ইন্দ্রিয়ের দ্বারে আঘাত করে, আর তা থেকে আমাদের জ্ঞান জন্মে—এ ধারণা জ্ঞানের অতি স্থূল ব্যাখ্যা ছাড়া আর কিছুই নয়। আসলে সব জ্ঞান আমাদের অন্তরাত্মার মধ্যে সুপ্ত রয়েছে; তথাকথিত ইন্দ্রিয়ানুভূতি তার উপলক্ষ ছাড়া আর কিছুই নয়।

সমস্ত জ্ঞানের উৎস ও আকর মানুষের অন্তরাত্মা, লাইবনিজের এই মতের সমর্থক এক ধর্মপ্রচারকের পুস্তকে পড়েছিলামঃ নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ-নিয়ম আবিষ্কারের কাহিনী ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেছেনঃ আপেল ফল পৃথিবীতে পড়েছে দেখে নিউটন যে মাধ্যাকর্ষণ-নিয়ম আবিষ্কার করেছিলেন তা আপেল গাছে ঝুলে' ছিল না, নিউটনের মনের ভিতরই ছিল। আপেল ফলের ভূ-পতন নিউটনের এই অন্তর্নিহিত সত্যের আবিষ্কারের উপলক্ষ ও উদ্বোধক ছাড়া আর কিছু নয়।

লাইবনিজের এই মত সক্রেটিস-প্লেটোর মতেরই প্রতিধ্বনি। এক অশিক্ষিত গ্রাম্য লোক তার পুরোপুরি অজানা গণিতের এক সত্য সক্রেটিসের তর্কবাণে জর্জরিত হয়ে বুঝতে পেরেছিল, প্লেটোর এক ডায়লগে এ-কাহিনী বর্ণিত। এ-কাহিনীর মূল কথা হলোঃ অশিক্ষিত লোকটির মনে আগে থেকেই গণিতের জ্ঞান প্রসুপ্তভাবে ছিল, অভিজ্ঞতার আলোকে শুধু তার প্রকাশ ও অভিব্যক্তি।

এই সত্য বুঝতে গিয়ে সক্রেটিস বলেছেনঃ দার্শনিকের জ্ঞানোৎপত্তির চেষ্টা ধাত্রী-বিদ্যারই সমজাতীয়। সুনিপুণ ধাত্রী যেমন মাতৃগর্ভ থেকে সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার সহায়তা করে থাকে, দার্শনিকের কাজও ঠিক তেমনি মানুষের অন্তরাত্মায় যে জ্ঞানভাণ্ডার লুকায়িত তাকে সন্তর্পণে, দক্ষতা ও তৎপরতার সঙ্গে প্রকাশ করা। সক্রেটিস রহস্য ক'রে তাই বলেছেন যে, তিনি ও তাঁর মা

সমব্যবসায়ী। সক্রেটিসের মা ছিলেন ধাত্রী। তিনি বলতেন: তাঁর মার কাজ ছিল মাতৃগর্ভে লুক্কায়িত সন্তানের পৃথিবীতে অবতরণের ব্যবস্থা করা, আর তাঁর কাজ হলো মানুষের অন্তরাত্মার ভিতর লুক্কায়িত জ্ঞানের অভিব্যক্তির সহায়তা করা। তাই জ্ঞানের ক্ষেত্রে ধাত্রী-বিদ্যার প্রয়োগই তাঁর পেশা।

মানুষের মনের ভিতর সব জ্ঞানই যদি আগে থেকে লুক্কায়িত থাকে, বাইরের কারো সঙ্গে জ্ঞানের রাজত্বে আমাদের যোগসূত্র যদি না থাকে, তবে আমরা চোখের সামনে যে জগৎ দেখতে পারছি, এই একই জগতে আমাদের চলাফেরা, ভাববিনিময়-সমঝোতা কি ক'রে সম্ভব? এই সংশয়ের সমাধান করতে গিয়ে লাইবনিজ বলেছেন: যদিও আমাদের সকলের আত্মাই স্বাধীন ও স্বতন্ত্র, তবু আমাদের সকলের উৎস এক বিশ্বাত্মা। তিনিই আমাদের স্রষ্টা ও জনক। বিশ্বসৃষ্টির আদিমতম মুহূর্তে তিনি আমাদের সকলের মনকে তাঁর অদম্য শক্তি-প্রভাবে এমন ক'রে গড়ে তুলেছেন যে, আমরা সকলেই পারস্পরিক প্রভাব-রহিত হয়েও সকলের অজ্ঞাতসারে অথচ অতি সহজ ও স্বাভাবিকভাবে এক বিরাট বিশ্বের সত্তায় শরীক হয়ে তার সামঞ্জস্য রক্ষা ক'রে চলেছি। এটা হলো অনন্ত শক্তিমান স্রষ্টার পূর্বনির্দিষ্ট সামঞ্জস্য-বিধান। এক কথায়, তাঁর অচিন্তনীয় ম্যাজিক, মোজেজা বা অলৌকিক ঘটনা। এ অসম্ভব কি ক'রে সম্ভব হলো, তা আমরা জানি না; তবে আমাদের সীমাবদ্ধ বুদ্ধিতে এ-অসম্ভবের এর চেয়ে ভালো ব্যাখ্যা আর হতে পারে না।

যাই হোক, যদিও সমস্ত জ্ঞানের আকর ও উৎস আমাদের স্বাধীন স্বতন্ত্র বাহ্য প্রভাবমুক্ত অন্তরাত্মা, তা'হলেও আমাদের এই অন্তর্নিহিত জ্ঞানের অভিব্যক্তি ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বাহ্য বস্তুর সংযোগের মাধ্যমেই হয়। ইন্দ্রিয়জ উত্তেজনা জ্ঞানের কারণ না হলেও তার উপলক্ষ, একথা স্বীকার ক'রে লাইবনিজ লকের অভিজ্ঞতা-বাদের দিকে একটুখানি পক্ষপাত দেখিয়েছেন, সন্দেহ নেই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি একথা দৃঢ় কণ্ঠে বলেছেন যে, বাইরের জগৎ থেকে আমাদের যে জ্ঞানের উৎপত্তি ও সূচনা তার আসল উৎস, তার মূল আকর আমাদের অন্তরাত্মা।

লক্ মানুষের মনের আদিম স্বচ্ছ অবস্থাকে অক্ষরবিহীন নির্লেপ প্রস্তর-ফলকের সঙ্গে তুলনা করেছেন। এটা হলো উগ্র অভিজ্ঞতাবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে উদাহরণ সংগ্রহ। লাইবনিজ তাঁর বুদ্ধিবাদের সপক্ষে উদাহরণ আহরণ করতে গিয়ে আমাদের সামনে ধরেছেন মর্মর-প্রস্তর নির্মিত মূর্তির কথা। মর্মর-প্রস্তরের ভিতর সেই মূর্তি লুক্কায়িত ছিল, সুনিপুণ ভাস্কর যন্ত্রের সাহায্যে প্রস্তরখণ্ডের ভিতর থেকে যা বের করেছেন। এখানেই তাঁর কর্মকৌশল, এখানেই

তাঁর নৈপুণ্য। মর্মর-পাথরের ভিতরে যেমন ভাস্করের খোদাই-করা মূর্তি আগেই ছিল, অভিজ্ঞতা-লব্ধ জ্ঞানও আমাদের মনের ভিতর তেমনি আগে থেকেই ছিল। অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শুধু তার প্রকাশ ও অভিব্যক্তি, এইটুকুই পার্থক্য।

লকের অভিজ্ঞতাবাদের মূল সূত্র: আমাদের বুদ্ধির ভিতর এমন কিছু খুঁজে পাওয়া যায় না যা ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে বাইরের জগৎ থেকে আমাদের কাছে আসেনি। লাইবনিজ তাঁর বুদ্ধিবাদের মুগুরের সাহায্যে এ-মূল সূত্রকে চুরমার ক'রে দিয়ে বলেছেন: লক্ যা বলেছেন তা খুবই খাঁটি কথা, একটু পরিবর্তিত আকারে তা মানতে আমার মোটেই অসম্মতি বা অমত নেই। আমি বলি, আমাদের বুদ্ধিতে বুদ্ধি ছাড়া আর কিছুই নেই যার সঙ্গে আমাদের যোগ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে হয়নি।

ক্যাণ্টের সমীক্ষণবাদ

আধুনিক য়ুরোপীয় দর্শনে জ্ঞানোৎপত্তিবাদের চরম পরিণতি হয়েছে ইমানুয়েল ক্যাণ্টে (১৭২৪—১৮০৪)। লাইবনিজের ভিতর বুদ্ধিবাদ ও অভিজ্ঞতাবাদের সমঝোতার যে প্রাথমিক চেষ্টা, ক্যাণ্টেই তার চরম পরিণতি। অভিজ্ঞতাবাদীদের সঙ্গে একমত হয়ে ক্যাণ্ট বলেছেন: একথা অনস্বীকার্য যে, বাইরের অভিজ্ঞতা ছাড়া আমাদের কোনো জ্ঞান হতে পারে না। তাঁর এ-মত অভিজ্ঞতাবাদেরই সমর্থন। কিন্তু অভিজ্ঞতাবাদের বিরোধিতা ক'রে ক্যাণ্ট আবার বলেছেন: অভিজ্ঞতাতে আমাদের জ্ঞানের শুরু, শেষ নয়। তাঁর এ-মত বুদ্ধিবাদেরই সমর্থন। বুদ্ধিবাদ ও অভিজ্ঞতাবাদের যে সমঝোতা ক্যাণ্ট করেছেন, তারই পারিভাষিক নাম সমীক্ষণবাদ।

ক্যাণ্টের মতে, বাইরের জগৎ থেকে কোনো জ্ঞানের উত্তেজক বা উদ্বোধক আমাদের কাছে না এলে আমাদের জ্ঞান হতে পারে না। কারণ জ্ঞান শুধু মনের ব্যাপারই নয়, আমাদের মনের বাইরে যে জগৎ, জ্ঞানের লক্ষ্য তার সঙ্গে যোগ স্থাপন। কিন্তু বাইরের জগতের সেই উত্তেজনাকে আমরা আমাদের ইন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণ করলেই তা থেকে জ্ঞান হয় না। বাইরের জগৎ থেকে যে উত্তেজনা আমাদের কাছে আসে, আমাদের ইন্দ্রিয়ের দু'টো কাঠামো আমাদের মন তাদের উপর চাপিয়ে দেয়, তাদের নাম দেশ ও কাল। আমাদের সমস্ত বাহ্য প্রত্যক্ষ দেশ ও কালের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। আমাদের মানস প্রত্যক্ষের বেলায়ও এ নিয়ম প্রযোজ্য। তবে মানস-প্রত্যক্ষের কাঠামো হলো কাল, দেশ নয়। আমাদের প্রত্যক্ষ অনুভূতির সঙ্গে এই যে দেশ-কালের যোগ, তার সম্বিৎ

বাহির থেকে আমাদের কাছে আসতে পারে না। আমাদের ইন্দ্রিয় যা প্রত্যক্ষ করে, তা পরিবর্তনশীল। যেমন আমরা এক সময় টেবিল দেখি, আরেক সময় দেখি চেয়ার ও আরেক সময় গাছ-পাথর। কিন্তু এই সব পরিবর্তনশীল প্রত্যক্ষের সঙ্গে এক সার্বভৌম প্রত্যক্ষ জড়িত, সে-প্রত্যক্ষ হলো দেশ-কালের অনুভূতি। এই সার্বভৌম জ্ঞান অপরিবর্তনশীল বলে এর উৎস আমাদের মন, বাইরের জগৎ নয়। সুতরাং ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয়ের অনুভূতি, যা জ্ঞানের প্রথম স্তর, সেখানেই তার সঙ্গে দেশ ও কালের যোগ, যাদের অনুভূতি ইন্দ্রিয়জ নয়, যার কেন্দ্র আমাদের মন। কাজেই অভিজ্ঞতাবাদীরা যে বলেন: অভিজ্ঞতা থেকেই জ্ঞানের আরম্ভ আর অভিজ্ঞতার সংযোগেই জ্ঞানের শেষ, এ-মতের ত্রুটি জ্ঞানের আদি-পর্যায়ে বাহ্য উত্তেজনার গ্রহণেই দেখা যায়।

এ বাহ্য উত্তেজনার গ্রহণ বা সংবেদনই জ্ঞানের পক্ষে পর্যাপ্ত নয়। আমাদের জ্ঞানের বিশ্লেষণে একে তার আদিম স্তর বলে কল্পনার সাহায্যে আমরা জানতে পারি। আমাদের বাস্তবের যে জ্ঞান, এ-জাতীয় অনুভূতি তার সীমারেখা হতে পারে না।

একটি উদাহরণ দিয়ে এ কঠিন বিষয় বোঝাবার চেষ্টা করা যাক। আমাদের পড়ার ঘরের টেবিল নিয়েই আলোচনা শুরু করি। টেবিলের জ্ঞানের শুরু নিশ্চয়ই বাইরের জগৎ থেকে আমাদের ইন্দ্রিয়ের কাছে প্রেরিত একটি উত্তেজনা। এই উত্তেজনাকে আমাদের ইন্দ্রিয় গ্রহণ করে দেশ ও কাল নামক তার দু'টি কাঠামোর সাহায্যে। কিন্তু একটি বাহ্য উত্তেজনা, যার সঙ্গে যোগ দেশের ও কালের, তা কখনো টেবিলের প্রত্যক্ষের সামিল হ'তে পারে না। আমাদের পড়ার ঘরে বেলা এগারোটার সময় আমাদের ইন্দ্রিয়ের দ্বারে বাইরের জগৎ থেকে বিনা তারে প্রেরিত তারবার্তার মতো যে সংবেদন, তা একটা অস্পষ্ট অনুভূতি। একে সাপও বলা যায় না, ব্যাঙও বলা যায় না, আর প্রয়োজন হলে একে সাপ ব্যাঙ দুই-ই হয়তো বলা যায়। যদিও যুক্তির বিশ্লেষণে একেই জ্ঞানের আদিম স্তর বলে মেনে নিতে হয়, তথাপি এই অন্ধ সংবেদন সত্যিকার জ্ঞান হতে পারে না, যার আলোকে সারা জগৎ আমাদের কাছে উদ্ভাসিত ও প্রকাশিত।

সুতরাং এই অন্ধ অস্পষ্ট সংবেদনের প্রত্যক্ষ জ্ঞানে রূপান্তর বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন। বাহ্য সংবেদনকে যদি আমরা আমাদের বুদ্ধির মাপকাঠির সাহায্যে মেপে-জুকে একটা বুদ্ধিগ্রাহ্য রূপ না দিই, তাহলে কখনো বাহ্য বস্তুর প্রত্যক্ষ আমাদের হতে পারে না। যে কখনো টেবিল দেখেনি, সে টেবিলকে টেবিল বলেই জানতে পারে না—একটি গাছের টুকরো বা কাঠ বলেই মনে করে।

আর যে কাঠ কাকে বলে জানে না, সে টেবিলকে ইট-পাটকেল ও পাথরের মতো একটা জড় বস্তু—যা গায়ে লাগলে ধাক্কা লেগেছে বলে মনে হয়—তাই মনে করে। তাই টেবিলকে জানতে গেলে টেবিলের ধারণা আগে থেকে থাকা চাই, আর গাছ-গাছড়া, ইট-পাটকেল, পাথর থেকে টেবিল যে আলাদা—তারও জ্ঞান থাকা দরকার। এখানেই জ্ঞানে বুদ্ধির দান।

ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয়ের অনুভূতির জন্য যেমন আমাদের মনের ভিতর দেশ-কাল এ দুইটি কাঠামো আছে, তেমনি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাহ্য সংবেদনকে সত্যিকার জ্ঞানে রূপায়িত করার জন্যে আমাদের বুদ্ধিরও কতকগুলো কাঠামো আছে। আমাদের ইন্দ্রিয়ের কাঠামো দেশ ও কালের প্রয়োগ হয় বাহ্য উত্তেজকের গ্রহণে, আর বুদ্ধির কাঠামোগুলির প্রয়োগ হয় বাহ্য উত্তেজকের জ্ঞানে রূপায়ণে। ইন্দ্রিয়ের বস্তু গ্রহণ একটি নিষ্ক্রিয় প্রক্রিয়া, আর বুদ্ধি দ্বারা তার রূপায়ণ একটি সক্রিয় প্রক্রিয়া। এ দু'য়ের যোগে আমাদের সত্যিকার জ্ঞান হয়। প্রথমটি অভিজ্ঞতাবাদকে সমর্থন করে, আর দ্বিতীয়টি বুদ্ধিবাদকে সমর্থন করে। সুতরাং ক্যান্টের সমীক্ষণবাদের মতে, বুদ্ধিবাদ ও অভিজ্ঞতাবাদের মিলনে, সামঞ্জস্য ও সমঝোতায়ই জ্ঞানোৎপত্তির সঠিক পরিচয় পাওয়া যায়।

যে বুদ্ধির কাঠামোর কথা বলা হলো তার একটু বিশ্লেষণ প্রয়োজন। আমরা যাকে টেবিল বলি তা একটি বস্তু। টেবিলের নানা ধরনের গুণ আমরা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে অনুভব করি। কিন্তু টেবিল বস্তুটিকে জানার মতো কোন ইন্দ্রিয় ত আমাদের নেই। এই সত্যের গোঁজামিল দিতে গিয়ে লক্ বলেছেন: ইন্দ্রিয়ের দেয়া কতকগুলো অবিমিশ্র ধারণার যোগফল অর্থাৎ মিশ্র ধারণাই বস্তুর জ্ঞান। বস্তু বলতে আমাদের যে ধারণা, এ যোগফলের ভিতর তাকে খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই গাছ-পাথর, টেবিল-চেয়ার, ঘর-বাড়ী ইত্যাদি বস্তুর যে বস্তুত্ব বা একত্ব, তা আমাদের বুদ্ধিরই দেওয়া এবং তা আমাদের বুদ্ধিরই একটি কাঠামো।

সোজা কথায়, ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির কাঠামো যেন আমাদের মনে রঙীন কাঁচ। আর সেই কাঁচের ভিতর দিয়ে আমরা বাইরের জগৎকে যখন দেখি, তখন বাইরের জগতের আসল রূপ রঙীন হয়েই আমাদের কাছে আসে। তাই মানব-বুদ্ধি বস্তুর নকল রূপই জানে, তার আসল রূপ তার কাছে অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়।

আমাদের মনোভাবের পরিবর্তনের সঙ্গে আমাদের বাহ্য জগতের অনুভূতির রূপও বদলে যায়,—এ-সত্য ভাবুক লোকদের অজানা নেই। শৈশবে জগৎকে আমরা এক রকম দেখি, বাল্যে আর এক রকম, তারুণ্যের রক্তিম আভায় আরেক

রকম, আর বার্ধক্যের মূঢ় ম্লান দৃষ্টিতে আরেক রকম। এক ভাবুক দার্শনিক দুঃখ করে বলেছেন :

বালস্তাবৎ ক্রীড়াসক্তঃ
তরুণস্তাবৎ তরুণী-রক্ত।
বৃদ্ধস্তাবচ্চিন্তামগ্নঃ
পরমে ব্রহ্মণি কোঽপি ন লগ্নঃ।

[বাল্যকালে ক্রীড়াতেই আমাদের আসক্তি, যৌবনে তরুণ তরুণীর ভাব-বিনিময়ে আমরা বুদ্ধিহারা, আর বার্ধক্যে নৈরাশ্যজনক দুশ্চিন্তায় আমরা মগ্ন।]

আমাদের এই সহজাত প্রবৃত্তির দাপটে পর-ব্রহ্ম বা পরম সত্যের খোঁজ নিবার অবসর আমাদের নাই। ব্যক্তিমানসের দৃষ্টিকোণ থেকে বাহ্য জগতের জ্ঞানের এই যে বিশ্লেষণ, তাকে তাঁর সমীক্ষণের সাহায্যে ক্যাণ্ট একটি পুরোদস্তুর জ্ঞানোৎপত্তিবাদে রূপান্তরিত ক'রে মানবের সহজ বুদ্ধি ও চরম তত্ত্বের মাঝখানে অজ্ঞতার এক অচলায়তন সৃষ্টি করেছেন, যা ভেদ করতে আমাদের বুদ্ধি অপারগ।

পঞ্চম অধ্যায়

প্রামাণ্য পরিচয়

প্রমা ও প্রমাণ

তর্কশাস্ত্রে যথার্থ জ্ঞানের নাম 'প্রমা'। প্রমা কথার আক্ষরিক অর্থ ভালো করে মেপে-জুকে দেখা। ভ্রম জ্ঞান তার বিষয়বস্তুকে ভালো ক'রে মেপে-জুকে দেখতে পারে না, কাজেই ভ্রম জ্ঞান বা ভ্রান্তি প্রমাণের ঠিক বিপরীত। যার সাহায্যে প্রমার উৎপত্তি, অর্থাৎ যার সাহায্য ব্যতিরেকে যথার্থ জ্ঞান হতে পারে না· তাই হলো প্রমাণ। প্রমাণ থেকে যা পাওয়া যায় তারই নাম 'প্রামাণ্য'।

আজও চলতি ভাষায় 'প্রমাণ' শব্দের এই পারিভাষিক ব্যবহার কখনো দেখা যায়। আজো কোর্টে জজ সাহেবের কাছে যখন কেউ অভিযোগ করে, অমুক দুষ্টলোক আমার এক নিকট-আত্মীয়কে হত্যা করেছে, তখন এই অভিযোগ সত্য কি-না তা জানার জন্য জজ সাহেব প্রমাণ চান। তখন যদি আর তিন ব্যক্তি এসে বলে : তা'রা স্বচক্ষে দেখেছে যে, অমুক লোক এই ব্যক্তির আত্মীয়কে হত্যা করেছে, আর যদি ঘটনাটি ভালো করে বিশ্লেষণ ক'রে জজ সাহেব বোঝেন যে, এরা যে ঘটনাটি দেখেছে তাতে কোন সন্দেহ নাই, তাহলে তিনি মনে করেন এ-হত্যার ব্যাপারে তাদের দেখাই প্রমাণ। তাদের দেখা থেকেই জজ সাহেবের এই বিষয়ে 'প্রমা' বা যথার্থ জ্ঞানের উৎপত্তি। তাই তাদের উক্তি এখানে পারিভাষিক অর্থেও 'প্রমাণ'।

প্রমাণের দ্বারা যখন যথার্থ জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তখন যথার্থ জ্ঞানের স্বভাব হলো 'প্রামাণ্য' বা জ্ঞানের সত্যতা। এই 'প্রামাণ্য' নিয়ে দার্শনিকদের ভিতর সাধারণতঃ তিনটি মত প্রচলিত দেখা যায়: (১) বস্তুসারূপ্যবাদ, (২) ভাব-সমন্বয়বাদ ও (৩) প্রয়োজনবাদ।

বস্তুসারূপ্যবাদ

বস্তুসারূপ্যবাদীদের মতে, আমরা যে বস্তুকে জানি আমাদের জ্ঞান যখন তার অনুরূপ হয়, তখনই আমাদের জ্ঞান অভ্রান্ত বা সত্য। আর আমাদের জ্ঞানের যখন তার বিষয় বা বস্তুর সঙ্গে সারূপ্য বা সাদৃশ্য থাকে না, তখন আমাদের জ্ঞান ভ্রান্ত। আমরা যখন দড়িকে দড়ি বলে জানি, তখন আমাদের মনের

ভিতর দড়ির সম্বন্ধে যে জ্ঞান, তার সঙ্গে বাইরের জগতের দড়ির সারূপ্য বা সাদৃশ্য আছে। অতএব এ জ্ঞান সত্য। সেই দড়িকে যখন আমরা ভুল ক'রে সাপ ব'লে জানি, সে-জ্ঞান সত্য নয়, ভ্রান্ত; কারণ আমাদের মনের ভিতর রয়েছে দড়ির জ্ঞান আর বাইরে রয়েছে সাপ। তাই আমাদের জ্ঞান তখনই সত্য বা যথার্থ হয়, যখন জ্ঞান ও তার বিষয়বস্তুর মধ্যে গরমিল থাকে না। আমাদের জ্ঞান তখনই ভুল হয়, যখন জ্ঞাত বিষয়ের সঙ্গে তার পুরোপুরি গরমিল। অতএব জ্ঞানের যাথার্থ্য বা সত্যতার স্বভাব হলো বিষয় সারূপ্য বা বিষয়-সাদৃশ্য। ইংরেজীতে এ মতেরই চলতি নাম করেস্‌পনডেন্স্‌ থিওরী।

এই থিওরীর সমর্থকদের মতে, মানুষের মন যেন ফটোগ্রাফের ক্যামেরার মতো একটা জিনিস। বাইরের জিনিসের ফটো যেমন ক্যামেরার উপর তার ছায়া পড়লে হুবহু উঠে যায়, তেমনি যখন ঠিক ঠিক জ্ঞান হয় তখন আমাদের মনের ক্যামেরায় বাইরের জিনিসের ছবিও ওঠে। এইজন্য অনেকেই এই থিওরীর নাম দিয়েছেন কপি থিওরী বা প্রতিফলনবাদ। এ-মতে জ্ঞান আমাদের চিত্তপটে বিষয়ের প্রতিফলন। বিষয়টি হলো আসল বস্তু, আর জ্ঞান হলো তার কপি বা প্রতিফলন। আসলে আর কপিতে যেখানে মিল, সেখানেই জ্ঞান ঠিক, আসলে আর কপিতে যেখানে গরমিল, সেখানেই জ্ঞান বেঠিক।

সত্যের স্বভাব সম্বন্ধে এ-মতটির খুব গভীর বিশ্লেষণের প্রয়োজন নাই, কারণ আমাদের সহজবুদ্ধি এ-মতকে সমর্থন করে। সত্য সম্বন্ধে এটাই আমাদের সহজাত সংস্কার ও বিশ্বাস। এই সহজাত বিশ্বাস ও সংস্কারের প্রেরণায়ই মরুভূমির পিপাসার্ত পর্যটক তার বালুকারাজিতে যখন পানিভ্রমে প্রবঞ্চিত হয়, তখনই সে জানে তার এ-জ্ঞান মিথ্যা। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের অজস্র ভ্রান্ত জ্ঞানের বেলা এ-কথাই বলা চলে। পাণ্ডুরোগগ্রস্ত ব্যক্তি যে শ্বেত শঙ্খকে পীত বলে মনে করে, তিমিরদোষগ্রস্ত ব্যক্তি যে আকাশের এক চন্দ্রকে দ্বিচন্দ্র বলে দেখে, তাকে যে আমরা ভুল জ্ঞান বলি, তারও একই কারণ অর্থাৎ জ্ঞান ও তার বিষয়বস্তুর গরমিল।

তবে অনেক দার্শনিক মনে করেন যে, বিচার-বিশ্লেষণে সত্য সম্বন্ধে আমাদের এ-সহজাত জ্ঞানের বহু দোষ ত্রুটি আছে। তাঁরা মনে করেন, জ্ঞান ও বিষয়ের সাদৃশ্য যদি সত্যের স্বভাব হয়, তাহলে মানুষের পক্ষে সত্য নির্ধারণ অসম্ভব। কোন বস্তু ও তার ফটোগ্রাফে মিল আছে কি-না, তা আমরা বস্তু ও ফটোগ্রাফকে সামনে রেখে মিলিয়ে দেখতে পারি; কিন্তু জ্ঞান যদি আমাদের মনে বিষয়ের ফটোগ্রাফই হয়, আর সে ফটোগ্রাফ ও বিষয়ের মিলই যদি সত্যের স্বভাব হয়,

তাহলে সত্য নির্ণয় অসম্ভব। আমরা কখনো এই মনের ফটোগ্রাফ ও বিষয়কে বাইরের বস্তু ও তার ফটোগ্রাফের মতো পরীক্ষা করে দেখতে পারি না। আমরা আমাদের মনের ফটোগ্রাফ থেকে নিজেদের আলাদা করে করে বিষয়ের সঙ্গে তাকে মিলাতে পারি না। জীবন্ত দেহের ভিতর থেকে আমাদের পক্ষে যেমন বেরিয়ে আসা অসম্ভব, ঠিক তেমনি আমাদের মনের ভাবনা-চিন্তা থেকে আলাদা হয়ে তাদের বিষয়ের সাথে মিলিয়ে দেখাও আমাদের পক্ষে অসম্ভব। কেউ কেউ মনে করতে পারেন, আমাদের টেবিলের জ্ঞানকে তার পরবর্তী জ্ঞানের সাহায্যে আমরা টেবিলের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে পারি। সোজা কথায়, টেবিলের জ্ঞানের পর টেবিলের জ্ঞান ও তার বিষয়ে মিল আছে—এই জ্ঞান যদি আমাদের হয়, তবে আমরা মনে করি আমাদের টেবিলের জ্ঞান সত্য। এভাবে দ্বিতীয় জ্ঞানের সাহায্যে আমরা প্রথম জ্ঞানের বিষয়-সারূপ্য নির্ণয় করতে পারি। কিন্তু এ পরিকল্পনাও খুবই অযৌক্তিক, কারণ এ-কল্পনারও বাস্তবে রূপায়ণ অসম্ভব। এ কল্পনা সত্য হলে প্রথম জ্ঞানের প্রামাণ্য নির্ণয় করার জন্য দ্বিতীয় জ্ঞান, দ্বিতীয় জ্ঞানের প্রামাণ্য নির্ণয়ের জন্য তৃতীয় জ্ঞান, আর তৃতীয় জ্ঞানের প্রামাণ্য নির্ণয়ের জন্য চতুর্থ জ্ঞান—এইভাবে এক অনন্ত জ্ঞান-ধারার পরিকল্পনা সত্য-নির্ণয়ের জন্য প্রয়োজন হয়। আমাদের পাড়া-পড়শী রাম, শ্যাম, যদুকে যদি এই নিয়মে জ্ঞানের প্রামাণ্য নির্ণয় করতে হয়, তাহলে একটি জ্ঞানের প্রামাণ্য নির্ণয় করার জন্যেই তাদের নাওয়া-খাওয়া সব বন্ধ করে অনন্তকাল পর্যন্ত এই একই কাজে ব্যস্ত থাকতে হবে; কিন্তু তাতেও তারা এ-সমস্যার সমাধান করতে পারবে কি-না, তা ভবিতব্যই বলতে পারেন।

সত্য সম্বন্ধে এমন উদ্ভট ও কর্মনাশা অনুভূতি দৈনন্দিন জীবনে আমাদের কখনো হয় না। আমরা সাধারণতঃ তড়িৎ-গতিতে কোন্ জ্ঞান সত্য আর কোন্ জ্ঞান মিথ্যা তা জেনে কার্যে প্রবৃত্ত হই। তাই বিষয়-সারূপ্যবাদের সমালোচকরা বলেন: এ মত ভ্রান্ত, যুক্তিহীন, সত্য নির্ণয়ে অক্ষম ও অপারগ।

স্বতঃপ্রামাণ্যবাদ

বস্তু-সারূপ্যবাদের এ-জাতীয় সমালোচনা খুব নিরপেক্ষ কি-না, তা ভেবে দেখা প্রয়োজন। বিষয়-সারূপ্যবাদের সমর্থকেরা জ্ঞানকে বিষয়ের ফটোগ্রাফ বা তার কপি ইত্যাদি বলে যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছেন, তার সুযোগ নিয়েই তার বিরুদ্ধে সমালোচনা বিস্তর হয়েছে। তাই বলে উপমাকে কখনো আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করা চলে না। কোনো সুন্দর মানুষের মুখকে যখন চন্দ্রবদন আর তার আয়ত চক্ষুকে যখন পদ্মপলাশলোচন বলে বর্ণনা করা হয়, তখন যদি কেউ

বলে চাঁদের কলঙ্ক যখন সে-মুখে নাই তখন তা চন্দ্রবদন হলো কি করে, আর সে-চোখের দৈর্ঘ্য যখন পদ্মের পলাশের পাপড়ির মতো নয় তখন তাকে পদ্ম-পলাশলোচন কি করে বলা যায়? তখন এটা যে উপমার অপব্যাখ্যা তা বুঝতে চিন্তাশীল লোকদের অসুবিধা হয় না। ঠিক এ রকমেই জ্ঞানকে যখন ফটোগ্রাফ বলা হয়, তখন তার অর্থ এমন নয় যে, মানুষের মন একেবারে নিছক একটি ক্যামেরা, আর সেখানে একটি ক্যামেরাম্যান রয়েছে, যে আমাদের জ্ঞানের বিষয়ের ফটোগ্রাফ অনবরত তুলে যাচ্ছে।

পুরানো দিনের একদল ভারতীয় দার্শনিক বিষয়-সারূপ্যবাদকে তাই এই স্থূল অর্থে গ্রহণ না ক'রে জ্ঞানের স্বভাবই তার প্রামাণ্য বা যাথার্থ্য, এ-কথা বলেছেন।

সত্যের স্বভাব সম্বন্ধে এ-মতেরই নাম স্বতঃপ্রমাণ্যবাদ। বৈদান্তিক ও মীমাংসকরা এ-মত নানা যুক্তির সাহায্যে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। তাঁরা বলেন, জ্ঞানের স্বভাবই হলো বিষয়-প্রকাশ। আর জ্ঞানের দ্বারা তার বিষয় যে প্রকাশিত হয় একথা আমরা কোনো দ্বিতীয় জ্ঞানের সাহায্যে জানি না। আমরা যখন টেবিলকে জানি বলি, তখন তার অর্থ: টেবিলকে জানার আগে টেবিল আমাদের কাছে অপ্রকাশিত ছিল, আমরা যখন টেবিলকে জানলাম, তখন টেবিল আমাদের কাছে জ্ঞাত বা প্রকাশিত হলো। যেমন অন্ধকার গৃহকে আলোকিত করার জন্য প্রদীপ নিয়ে আসলেই, অথবা আজকের দিনের বৈদ্যুতিক আলোর সুইচ টিপলেই গৃহ আলোকিত হয়, আর সেই আলো-কে জানবার জন্যে আরেকটি প্রদীপ আনবার অথবা আরেকটি সুইচ টিপবার প্রয়োজন হয় না, তেমনি জ্ঞান তার বিষয়কে প্রকাশ করে, জ্ঞানকে জানার জন্য আর দ্বিতীয় জ্ঞানের প্রয়োজন হয় না। তাই জ্ঞান বিষয়-প্রকাশ করেছে কি না, অর্থাৎ বিষয়ের ফটোগ্রাফ মনে ঠিক ঠিক তুলেছে কি-না, এটা জানার জন্য আর দ্বিতীয় জ্ঞানের প্রয়োজন হয় না। অতএব জ্ঞানের স্বভাবই হলো বিষয়-প্রকাশ বা বিষয়-সারূপ্য।

এখানে প্রশ্ন হতে পারে: বিষয়-সারূপ্যই যদি জ্ঞানের নিজস্ব স্বভাব হয়, তবে আমাদের কোন কোন জ্ঞান সত্য আর কোন কোন জ্ঞান মিথ্যা, এ হয় কি করে? তা'হলে আমরা দড়িকে কখনো কখনো দড়ি বলে' আবার কখনো কখনো সাপ বলে' জানি কি করে?—এই সংশয়ের সমাধান হলো এই যে: আমরা দড়িকে যখন দড়ি বলে জানি, তখন সে জ্ঞান দড়িকে প্রকাশ করে, ঠিক তেমনি দড়িকে যখন আমরা সাপ বলে জানি, তখন সে-জ্ঞান সাপকেও প্রকাশ করে। কাজেই বিষয়-সারূপ্য বা বিষয়-সাদৃশ্য দু'জায়গায়ই পুরোপুরি সমান। তথাপি আমরা দড়িকে সাপ বলে জানাকে যে ভুল মনে করি, তার

কারণ দড়িকে সাপ বলে জানার একটু পরেই তাকে দড়ি বলে জানা। এখানেই দড়িকে দড়ি বলে জানা ও দড়িকে সাপ বলে জানার মধ্যে তফাৎ। দড়িকে যে আমরা দড়ি বলে জানি, কোন পরবর্তী জ্ঞান তাকে সরিয়ে দেয় না; কিন্তু দড়িকে যখন আমরা সাপ বলে জানি তখন তার পরবর্তী জ্ঞান শুধু দড়িকেই জানায় না, আগের সাপের জ্ঞানকেও সরিয়ে দেয়। এ থেকেই বোঝা যায়, জ্ঞানের প্রামাণ্য বা সত্যতা তার নিজস্ব ধর্ম, আর তার অপ্রামাণ্য বা মিথ্যাত্ব নিজস্ব ধর্ম নয়, পরবর্তী জ্ঞানের দ্বারা তার উপর আরোপিত। কাজেই জ্ঞানের প্রামাণ্য স্বতঃ, অপ্রামাণ্য পরতঃ। এভাবে বেদান্ত ও মীমাংসা-দর্শনে বস্তু-সারূপ্য-বাদের এক নতুন ব্যাখ্যা ও সমর্থন পাওয়া যায়।

ভাবসমন্বয়বাদ

যাই হোক, বস্তু-সারূপ্যবাদের তথাকথিত সমালোচনা থেকেই ভাবসমন্বয়-বাদের উৎপত্তি। এ-মতের সমর্থকরা বলেন: আমাদের জ্ঞানের সত্যতা বিষয়ের সঙ্গে তার সাদৃশ্য বিশ্লেষণ করে আমরা নির্ণয় করতে পারি না, তা করা কখনো সম্ভবও নয়। আমরা আমাদের জ্ঞান সত্য না মিথ্যা, তা ঠিক করি আমাদের বর্তমান জ্ঞানের আমাদের অতীত জ্ঞানের সঙ্গে সম্বন্ধ বিচারের দ্বারা। আমাদের মন অফুরন্ত জ্ঞানের ভাণ্ডার। তাতে বিচিত্র রকম অভিজ্ঞতার দাগ লুকানো। আমাদের যখনই কোনো নতুন অভিজ্ঞতা হয় তখন আমরা তাকে আমাদের পুরনো অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে দেখি। আমরা যে ফুলকে ফুল বলে, 'ফলকে ফল বলে' এবং পাথরকে পাথর বলে জানি, তার সঙ্গে আমাদের পূর্ব-অনুভূতির যোগ প্রচুর। এ-কথা আমরা ক্যান্টের মত আলোচনার সময়েই বলেছি। আমি এতকাল যে-বস্তুকে ফুল বলে এসেছি, হঠাৎ যদি তাকে ফল বলে জানি, এতকাল যাকে ফল বলে জেনে এসেছি তাকে যদি হঠাৎ ফুল বলে জানি, এতকাল যাকে গাছ বলে জেনেছি, তাকে যদি হঠাৎ পাথর বলে জানি, আর এতকাল যাকে পাথর বলে জেনেছি তাকে যদি হঠাৎ রসগোল্লা বলে জানি, তাহলে আমার মন মিথ্যা জ্ঞানের একটা বড় ডিপো হয়ে উঠবে। আর এ-সব মিথ্যা জ্ঞানকে যদি আমি সত্য বলে মনে করি, তাহলে আমাকে অতিসত্বর পাগলা-গারদে রাখার প্রয়োজন হবে। সুতরাং পূর্বানুভূতির সঙ্গে বর্তমান অনুভূতির, বর্তমান অনুভূতির সঙ্গে ভাবী অনুভূতির সামঞ্জস্য প্রকৃতিস্থতার অপরিহার্য লক্ষণ। এ-নিয়মের ব্যতিক্রম মস্তিষ্ক-বিকৃতি।

বিকৃত-মস্তিষ্ক লোক তার মনের কল্পনাকে বাস্তব করে দেখে। আর তার পূর্ব অনুভূতির সঙ্গে তার বর্তমান অনুভূতির মোটেই সামঞ্জস্য নাই। প্রকৃতিস্থ

ও সুস্থির-বুদ্ধি লোকের জ্ঞানই যথার্থ জ্ঞান। তার সঞ্চিত জ্ঞানে ফাটল নেই। তার পূর্বজ্ঞান পরবর্তী জ্ঞানের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই বেড়ে ওঠে। সুতরাং কোন্ জ্ঞান ভ্রান্ত আর কোন্ জ্ঞান অভ্রান্ত, তা আমরা বস্তুর সঙ্গে জ্ঞানকে মিলিয়ে ঠিক করি না, আমাদের আগের জ্ঞানকে পরের জ্ঞানের সঙ্গে মিলিয়েই ঠিক করি।

এ-সামঞ্জস্যের অভাবই ভ্রান্ত জ্ঞানের লক্ষণ। দড়িকে আমরা সব সময় দড়ি বলেই জেনে এসেছি, আর সাপকেও আমরা সব সময় সাপ বলে জেনে এসেছি। এটাই হলো আমাদের পূর্বানুভূতির রায়। আর যদি হঠাৎ আমরা দড়িকে সাপ বলে দেখি, আর সে-সাপ সত্যিকার সাপের মতো স্থায়ী না হয়ে আকাশে বিদ্যুৎ চমকানোর মতো হঠাৎ দেখা দিয়ে আবার দড়িতে বিলীন হয়ে যায়, তাহলে আমরা বুঝি: এ-সাপের জ্ঞানের সঙ্গে আমাদের আগেকার সাপের জ্ঞানের মিল নাই—আমাদের আগেকার দড়ির জ্ঞানেরও এর সঙ্গে মিল নাই। অতএব পূর্বানুভূতির সঙ্গে সমন্বয়বোধের অভাবই মিথ্যাজ্ঞানের স্বভাব, স্বরূপ ও অপরিহার্য লক্ষণ।

সামাজিক সমন্বয়বাদ

এমন দার্শনিকও আছেন, যাঁরা এই জ্ঞান-সমন্বয়বাদকে ব্যক্তির সীমাবদ্ধ অনুভূতির আওতার বাইরে নিয়ে এসে তাকে তার ব্যবহারিক ও সামাজিক জীবনে প্রয়োগ করেছেন। তাঁরা বলেন: আমাদের কোন্ জ্ঞান ঠিক আর কোন্ জ্ঞান ভুল, তা আমরা ঠিক করি আর দশজনের সঙ্গে আমাদের জ্ঞানের মিল বা গরমিলের সাহায্যে। দশজনে যাকে দড়ি বলে, আমি যদি তাকে দড়ি বলি, তবে বুঝতে হবে আমার জ্ঞান ঠিক। আর আমি যাকে সাপ বলি, দশজন যদি তাকে দড়ি বলে, তাহলে বুঝতে হবে আমার জ্ঞান ভুল।

সত্য নির্ধারণের ব্যাপারকে আলেকজাণ্ডার অনেকটা রাজনৈতিক নির্বাচনে ভোট গ্রহণের শামিল ক'রে তুলেছেন। সেখানে যেমন মেজরিটি যাকে ভোট দেয় তিনি নির্বাচিত হন, সত্য নির্বাচনেও সে-রকম মেজরিটির মতই গ্রহণযোগ্য। তবে এ মত যে খানিকটা অতিরঞ্জিত, তা অস্বীকার করা চলে না। কারণ সত্য নির্ণয়ে ভোট গ্রহণ রাজনৈতিক নির্বাচনে ভোট গ্রহণের মতো একটি সুপরিকল্পিত ব্যাপার নয়। ভোট না নিয়েও সহজবুদ্ধির সাহায্যে আমরা আমাদের জ্ঞানের সামাজিক জীবনে সার্থকতা অক্লেশে নির্ণয় করতে পারি। আসল, কথা, আলেকজাণ্ডার জ্ঞানের বস্তু-সারূপ্যকেই তার সত্যতা বলে মেনে নিয়েছেন। তবে বস্তু-সারূপ্যবাদের তথাকথিত দোষ-ত্রুটি—যার কথা আমরা আগেই বলেছি—মনে ক'রে সামাজিক সামঞ্জস্যকেই তিনি সত্যের স্বভাব বলে প্রমাণ করতে চেয়েছেন।

প্রয়োজনবাদ

প্রয়োজনবাদীদের মতে, যে জ্ঞান আমাদের প্রয়োজন সম্পাদন করতে পারে, কর্মজীবনে যা সার্থক, তাই সত্য। এ-মতে প্রয়োজননিষ্পত্তি সত্যের স্বরূপ।

একটা রূপোর টুকরো রাস্তায় সূর্যের আলোকে চকচক করছে দেখে এক ব্যক্তি তা হাতে তুলে নিল। সে বেচারা ছিল খুব গরীব। তার হাতে বাজার করার পয়সা কিছুই ছিল না। তাই এ-রূপোর টুকরো বিক্রি ক'রে খাবার জিনিস কেনার জন্যে সে বাজারে চলে গেল। বাজারে গিয়ে এক দোকানীর হাতে সেই রূপোর টুকরোটি যে-ই দিল, অমনি দোকানী হেসে আটখানা। সে বললো: "এটা তো রূপোর টুকরো নয়, এটা ঝিনুক। সূর্যের আলোকে এটা চকচক করছিল বলে আপনি এটাকে রূপো বলে ভুল করেছেন।" তখন সে বুঝলো, তার এই রূপোর জ্ঞান ভুল। এ-জ্ঞান ভুল হওয়ার কারণ, কর্ম-জীবনে তার ব্যর্থতা। এ-রূপোর টুকরো যদি সত্যিকার রূপো হতো, তাহলে নিশ্চয়ই একে বাজারে বিক্রি ক'রে খাবার জিনিস কেনা যেতো।

দর্শনের পারিভাষিক ভাষায় জ্ঞানের এই শক্তির নাম সমর্থ-প্রবৃত্তি। প্রয়োজনবাদীদের মতে, সত্যের স্বভাব হলো সমর্থ বা সফল প্রবৃত্তি জন্মাবার শক্তি, অর্থাৎ সমর্থ-প্রবৃত্তিজনকত্ব। এ কথাকে একটু বদলে নাম দেওয়া হয়েছে: প্রবৃত্তি-সামর্থ্য বা সার্থক প্রবৃত্তি জন্মাবার ক্ষমতা।

প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারতে বৌদ্ধেরা এ-প্রয়োজনবাদ সমর্থন করেছেন। বৌদ্ধেরা বলেন, বস্তুর সত্তা তার প্রয়োজন মেটাবার শক্তিতেই সীমাবদ্ধ। তাঁরা এর নাম দিয়েছেন অর্থক্রিয়াকারিত্ব, অর্থাৎ অর্থ বা জ্ঞানের বিষয়ের, তার উপযোগী ক্রিয়া উৎপন্ন করার ক্ষমতা।

মীমাংসকরাও সমস্ত জ্ঞানের সঙ্গে প্রয়োজন সিদ্ধির সম্বন্ধ খুঁজে বের ক'রে থাকেন। এ দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁদের স্বতঃপ্রামাণ্যবাদকে কেউ কেউ প্রয়োজনবাদে রূপান্তরিত করতে চেয়েছেন।

ন্যায়দর্শনের বিষয়-সারূপ্যবাদের সঙ্গে প্রয়োজনবাদের যোগ দেখতে পাওয়া যায়। জ্ঞানের সঙ্গে বিষয়ের সারূপ্য বা সাদৃশ্যই সত্য, একথা মেনে নিয়েও নৈয়ায়িকরা বলেছেন: জ্ঞান যে বিষয়ের সদৃশ তা আমরা প্রয়োজন সিদ্ধির মাধ্যমে জানতে পারি। উদাহরণ দিয়ে তাঁরা বলেছেন: অরণ্যে ভ্রমণকারী এক পিপাসার্ত লোক তার সামনে এক সরোবর দেখতে পেলে। খুব তাড়াতাড়ি সেই সরোবরে গিয়ে সে স্নান করলো, তার পানি পান করে তার পিপাসার নিবৃত্তি হলো। এ-প্রয়োজনসিদ্ধি থেকেই সে জানলো যে, তার সরোবরের

জ্ঞান সত্য। নৈয়ায়িকগণ প্রয়োজনসিদ্ধিকে সত্যের স্বরূপ ব'লে স্বীকার করেন নি, তাঁরা তাকে সত্য নির্ণয়ের উপায় ব'লে মেনে নিয়েছেন। এটা অনেকটা কোন জীবন্ত পশুকে—যার শরীরের লেজ ছাড়া আর কোন কিছুই আমরা দেখতে পাচ্ছি না—তার লেজের সাহায্যে তাকে জানার চেষ্টা করার মতো। তা কি সাপের লেজ, না ছাগলের লেজ, না আর অন্য কিছু—এইসব গবেষণা করে জানোয়ারটিকে যেমন আমরা জানবার চেষ্টা করতে পারি, ঠিক তেমনি আমাদের কর্মজীবনে ব্যবহার-ক্ষেত্রে যে জ্ঞান থেকে আমরা যে ফল আশা করি, তা যদি আমরা পাই, তবেই আমরা মনে করি: সে জ্ঞান যথার্থ। কোন বস্তুকে পানি মনে ক'রে যদি তাকে আমরা ছুঁয়ে দেখি, তাতে আমাদের গা কেটে যায়, তবে আমরা জানি তা পানি নয়, কাঁচ। সত্য নির্ণয়ের উপায় হিসাবে ন্যায়দর্শন তাই প্রয়োজনবাদ স্বীকার করে, সত্যের স্বভাব বা স্বরূপ হিসাবে নয়। সত্যের স্বভাব প্রয়োজনসিদ্ধি নয়, বস্তু-সারূপ্য।

জেমস্ ও শিলারের সমর্থন

সাম্প্রতিক দর্শনে প্রয়োজনবাদের কিছু কিছু সমর্থকের খোঁজ পাওয়া যায়। তাঁদের সকলের অগ্রগণ্য আমেরিকার মনীষী দার্শনিক ও মনোবিজ্ঞানী উইলিয়াম জেম্‌স্ (১৮৪২-১৯১০)। তিনি প্রয়োজনবাদের প্রয়োগ করেছেন এই সংশয়বাদের যুগে নীতি ও ধর্মবোধের ক্ষেত্রে। তিনি বলতে চান: বিজ্ঞানের থিওরীগুলোকে আমরা সত্য ব'লে মেনে নেই, কারণ যে-সমস্ত ঘটনার ব্যাখ্যার জন্যে তাদের সৃষ্টি সে-সমস্ত ঘটনার ব্যাখ্যা তা'রা করতে পারে। আপেল ফল কেন সূর্যমণ্ডলের দিকে লাফিয়ে লাফিয়ে না গিয়ে মাটির পৃথিবীতে পড়ে যায়, তার কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মহাবিজ্ঞানী নিউটন মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম আবিষ্কার করেছিলেন। জেমস্ বলেন: কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগের মাধ্যমেই বিজ্ঞান সত্য নির্ণয় করে। কাজেই জ্ঞান বস্তুর একটা ফটোগ্রাফ, আর সে-ফটোগ্রাফের সঙ্গে বস্তুর মিল থাকলেই তা সত্য, তা না হলে নয়, এ ধারণা খুবই ভুল। বরং ভাবসমন্বয়বাদীদের মতো জেম্‌স্ বলেছেন: আমরা সেই জ্ঞানকেই সত্য বলে মেনে নেই, আমাদের আগেকার জ্ঞানের সঙ্গে যার গরমিল নেই। হঠাৎ যদি একটা আজগুবী অদ্ভুত ধারণা আমাদের হয়, যা আমাদের পূর্বসঞ্চিত জ্ঞান-ভাণ্ডারকে ওলট-পালট করে দেয়, তাকে আমরা সত্য বলে মানি না। তবে ভাব-সমন্বয়ের মূল কারণ প্রয়োজন সিদ্ধি। আমাদের পূর্বজ্ঞান ও বর্তমান জ্ঞানের ভিতর সামঞ্জস্য থাকলেই আমাদের কর্মজীবন সহজ, সরল, স্বচ্ছন্দভাবে চলে, না হলে আসে নৈরাশ্য ও অসাফল্য।

জেমস্ অনেকটা ন্যায়দর্শনের মতোই বলেছেন: আমরা যাকে জ্ঞানের বিষয়ের সঙ্গে সারূপ্য ব'লে থাকি, আসলে তা জ্ঞানের প্রয়োজন সিদ্ধির ক্ষমতা ছাড়া আর কিছু নয়। একথা এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে, জেমস্ প্রয়োজন-সিদ্ধিকে সত্যলাভের উপায় বলেই শুধু মনে করেন না, তার স্বভাব ও স্বরূপ বলেও মনে করেন।

যাই হোক, বিজ্ঞানের থিওরীগুলোর প্রমাণ-পদ্ধতি ও ভাব-সমন্বয়বাদ ও বিষয়-সারূপ্যবাদের পরীক্ষা-সমীক্ষার ফলে জেম্স্ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, আমাদের জ্ঞান তখনই সত্য হয়, যখন তা প্রয়োজনসিদ্ধি করে। বিজ্ঞানের থিওরীগুলো যেমন কর্মক্ষেত্রে কার্যকরী বলেই সত্য, ঠিক তেমনি আমাদের নীতিবোধ ও ধর্মীয়বোধ যতক্ষণ প্রয়োজনের তাগিদ মেটাতে পারে, ততক্ষণই সত্য। কেন আমরা দুর্নীতিপরায়ণ না হয়ে নীতিপরায়ণ হবো, কেন আমরা কুপথে না চলে সুপথে চলবো, কেন আমরা মুশরেক না হয়ে মুমিন হবো, এ-প্রশ্নের সদুত্তর আমাদের প্রাত্যহিক জীবনেই খুঁজে পাওয়া যাবে। সুপথে আর কুপথে চলা যদি কর্মজীবনে একই ফল প্রসব করে, নাস্তিক ও আস্তিক হওয়াতে জীবনযাত্রা-প্রণালীতে যদি কোন তফাৎ না থাকে' তবে জানতে হবে: এ-দু'পথের কোন পথই গ্রহণযোগ্য নয়। সত্যিকার নীতিবোধ ও অকপট ধর্মবিশ্বাস আমাদের কর্মজীবনে শুভপ্রেরণা জাগিয়ে জীবনযাত্রা-প্রণালীকে সার্থক ও সফল করে; তাই যে কারণে বিজ্ঞানের থিওরী স্বীকার্য, ঠিক সেই কারণেই ধর্মবোধ এবং নীতিবোধও স্বীকার্য।

তবে বিজ্ঞানের থিওরী যেমন জ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বদলে যেতে পারে, ঠিক তেমনি আমরা আজ যাকে সত্য মনে করছি কাল তা সত্য না-ও হতে পারে। আজ যে পরিবেশে আমাদের প্রয়োজনসিদ্ধি, কাল নতুন পরিবেশে আমাদের আগেকার জ্ঞান সেই প্রয়োজনসিদ্ধিতে অপারগ; কাজেই শাশ্বত সত্য ব'লে কিছুই নেই। পরিবেশের পরিবর্তনের, জ্ঞানের বৃদ্ধি ও প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের প্রয়োজনসিদ্ধির চেহারা যেমন বদলে যায়, তেমনি সত্যেরও চেহারা বদলে যায়।

তাই বলে সত্য ব্যক্তিকেন্দ্রিক নয়, কারণ আমরা যে প্রয়োজনসিদ্ধির কথা বলেছি, সে প্রয়োজনসিদ্ধি সমষ্টি-কেন্দ্রিক। কাজেই কোন জ্ঞান আমার প্রয়োজন মেটালেই তা যে সত্য—তা নয়; সত্য আমাদের সামাজিক জীবনে সকলের প্রয়োজন সিদ্ধ করে। তাই প্রয়োজনবাদীদের মতে, সত্য সমাজ-কেন্দ্রিক, অর্থাৎ সত্য ব্যক্তির খেয়াল-প্রসূত নয়, মানুষের সার্বিক প্রয়োজন-প্রসূত।

সত্যের এই প্রয়োজনসিদ্ধির ক্ষমতার নাম জেমস্ দিয়েছেন: ক্যাশ ভ্যালু অব্ ট্রুথ। কোন সুপরিচালিত রাষ্ট্রের কারেন্সি নোটের উপর লেখা আছে তার মূল্য একশত টাকা। যে কোন ব্যক্তি সেই একশো টাকা মার্কাযুক্ত কাগজের বিনিময়ে সে দেশের যে কোনও বাজার থেকে চাইবামাত্র একশো টাকা পেতে পারে, নোটটি যদি খাঁটি হয়। কিন্তু নোটটি যদি জাল হয়, তাহলে তার বিনিময়ে কাগজে লেখা টাকা পাওয়া যায় না। যথার্থ জ্ঞান বাজারের খাঁটি নোটের মতো। প্রয়োজন সিদ্ধি তার মূল্য, আর জ্ঞান হওয়ামাত্রই সেই প্রয়োজন সিদ্ধি। আর ভ্রম জ্ঞান বাজারের জাল নোটের মতো; তাই তার দ্বারা প্রয়োজনসিদ্ধি হয় না। প্রয়োজনসিদ্ধির বাজারে তার মূল্য শূন্য।

জেমসের সমসাময়িক ইংল্যাণ্ডের দার্শনিক শিলার (১৮৬৪—১৯৩৭) মানবতা-বাদ নাম দিয়ে প্রয়োজনবাদ সমর্থন করেছেন। তিনি বলেন: ধর্মই হোক, দর্শনই হোক, বিজ্ঞানই হোক, সাহিত্যই হোক, শিল্পকলাই হোক—মানুষের এমন কোন অনুভূতি থাকতে পারে না যা মানবীয় নয়, অতিমানবীয়। অতিমানবীয় কথাটি একটি রূপক ছাড়া আর কিছুই নয়। মানুষের বৈশিষ্ট্য যেখানে প্রকট, তাকেই আমরা অতিমানব বলি। এই মানবতাবাদের উৎস শিলার পেয়েছেন প্রোটাগোরাসের ভিতর। প্রোটাগোরাস বলেছেন: মানুষ নিজেই সত্যের মাপকাঠি।

মোদ্দা কথা, মানুষের সমস্ত চিন্তা-ভাবনার উৎপত্তি প্রয়োজনবাদ থেকে। তাই আমরা যাকে সত্য বলি, তা প্রয়োজনবোধেরই নামান্তর।

প্রয়োজনবাদের সমালোচনা

দর্শনের ইতিহাসের আদিযুগ থেকেই প্রয়োজনবাদের অনেক সমালোচনা দেখতে পাওয়া যায়। ভারতীয় সমালোচকেরা বলেছেন: স্বপ্নে আমরা যে পানি দেখি, তা খেয়েও স্বপ্নজীবনে আমাদের পিপাসার নিবৃত্তি হয়, তাই বলে কি একথা বলা চলে যে, স্বপ্নে পানির অনুভূতি সত্যি? প্র্যাগমেটিজমের এ জাতীয় সমালোচনা আজ পর্যন্ত চলছে। সত্য যে আমাদের প্রয়োজন সিদ্ধি করে, এ কথার একটা গভীর অর্থ আছে; সে গভীর অর্থ ভুলে গিয়েই প্রয়োজনবাদের নানারকম বিরুদ্ধ-সমালোচনা হয়েছে ও হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও হয়তো হবে। রাসেল এই স্থূল দৃষ্টিকোণ থেকে শিলারের প্রয়োজনবাদের সমালোচনা করে বলেছেন: "প্রয়োজনবাদীদের মতে সত্য খুঁজে পাওয়া যায় সমরবাহিনীর ভিতর, কারণ যুদ্ধক্ষেত্রে তাদের সার্থকতা অনস্বীকার্য।"

যাই হোক, সত্যের স্বভাব সম্বন্ধে শেষ পর্যন্ত এইটুকু বলা চলে যে, প্রদীপের প্রকাশধর্ম যেমন স্বাভাবিক ও স্বতঃসিদ্ধ, জ্ঞানমাত্রেই তেমনি সত্য। জ্ঞান ও সত্যের স্বভাব বিশ্লেষণ ক'রে তার চেয়ে আর কোন মৌলিক জিনিস পাওয়া যায় না, যার সাহায্যে আমরা জ্ঞান ও সত্যকে বোঝাবার চেষ্টা করতে পারি। তা বলে আমরা কতকগুলো জ্ঞানকে ঠিক বলি, আর কতকগুলো বেঠিক বলি, তার কারণ, প্রয়োজনসিদ্ধির শক্তি ও তার অভাব। এভাবেই কর্মজীবনের সত্য ও মিথ্যার মধ্যে একটা সীমারেখা টানা যেতে পারে, যদিও আসলে জ্ঞানমাত্রেই বস্তুকে প্রকাশ করে বলে স্বভাবতঃই সত্য, মিথ্যা নয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

জ্ঞানের কাঠামো

সর্বজনীন ধারণা

যে সমস্ত সর্বজনীন ও সার্বভৌম ধারণা আমাদের জ্ঞানের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধে জড়িত, তাদের স্বভাব ও স্বরূপ একটু বিশ্লেষণ ক'রে দেখতে চাই।

ক্যাণ্টের সমীক্ষাবাদের আলোচনায় আমরা দেখতে চেষ্টা করেছি যে, তাঁর মতে, আমাদের জ্ঞানের বিষয় অনবরত বদলালেও দেশ ও কালের জ্ঞান মোটেই বদলায় না। তাই দেশ ও কালকে জ্ঞানের দু'টি সার্বভৌম ও সার্বজনীন রূপ ব'লে আমরা ধরে নিতে পারি। কিন্তু আমাদের জ্ঞানের, অভিজ্ঞতার জগৎ শুধু দেশ-কালের কাঠামোতেই আবদ্ধ নয়, তা কার্যকারণ-সম্বন্ধের সাথেও অবিচ্ছেদ্য-ভাবে জড়িত। আমরা যে বিশ্বজগতে বাস করি তাকে বৌদ্ধ দর্শনের আলোকে এক অবিচ্ছিন্ন পরিবর্তন-প্রবাহ বলে বর্ণনা করা যেতে পারে। তাই এর 'জগৎ' নাম আক্ষরিক অর্থেও সার্থক। সংস্কৃতে 'জগৎ' কথার অর্থ যা বদলায়। যে ঘটনা-প্রবাহ নিয়ে আমাদের জগতের সৃষ্টি, সে ঘটনাগুলো একে অন্যের সঙ্গে কার্যকারণ-সম্বন্ধে জড়িত। যে আগের ঘটনা না থাকলে পরের ঘটনা হতে পারে না, তাকে আমরা পরের ঘটনার কারণ বলি, আর পরের ঘটনাটিকে বলি কার্য। এ বিশ্বজগৎ যেন দেশ-কালের কাঠামোতে আঁটা ও কার্যকারণের শিকলে বাঁধা বিচিত্র ঘটনা-প্রবাহের এক বিরাট সমাবেশ, যার আদি ও অন্ত কোনটাকেই সহজ বুদ্ধিতে খুঁজে পাওয়া যায় না। কাজেই বিষয়ের জ্ঞান বলতে শুধু বিষয়ের জ্ঞানই বোঝায় না, তার সঙ্গে অচ্ছেদ্য সম্পর্কে জড়িত দেশ-কাল ও কার্যকারণ বা নিমিত্তের জ্ঞানও বোঝায়।

আমাদের জ্ঞান বিশ্লেষণে আরও দু'টি সর্বজনীন ও সার্বভৌম ধারণার পরিচয় পাওয়া যায়। তা হ'লো: দ্রব্য ও তার গুণের জ্ঞান। আমাদের টেবিলের জ্ঞানই ধরা যাক। টেবিল বলতে আমরা একটি দ্রব্য বুঝি। দ্রব্য কথার অর্থ জ্ঞানের আধার। টেবিলের সাদা কালো ইত্যাদি রং, তার বিশেষ একটি আকার, দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ ইত্যাদি, তার ওজন, এগুলো টেবিলের গুণ। কিন্তু এগুলো ত আকাশে ঝুলে থাকতে পারে না, তাই এদের আমরা বুঝি একটি দ্রব্যের ধারণার সাহায্যে। সহজ কথায়, আমাদের জ্ঞানের বিষয়ের দু'টি ভিন্ন দিক: একটি তার একত্ব, অপরটি তার বহুত্ব।

টেবিল দ্রব্য হিসাবে এক এবং গুণ হিসাবে বহু। তাই যেখানেই বিষয়ের জ্ঞান, সেখানে দ্রব্যেরও জ্ঞান আর তার গুণেরও জ্ঞান। দেশ-কাল নিমিত্তের জ্ঞানের মতো দ্রব্য ও গুণের জ্ঞানও অতি ব্যাপক, আর জ্ঞানের বিষয়-ভেদে এদের পরিবর্তন হয় না। তাই দেশ-কাল নিমিত্তের মতো এদের ধারণাও সর্বজনীন ও সার্বভৌম।

যে সব দার্শনিক বিশ্বের মূল উপাদান বহু বলে স্বীকার করেন, তাঁরা অনেক সময় আমাদের অনুভূতির বিষয়কে নানা ব্যাপক শ্রেণীতে বিভক্ত করে থাকেন। এই শ্রেণীগুলোর ভিতর তাঁরা কেউ কেউ দ্রব্য ও গুণ, দেশ ও কালকে স্থান দিয়েছেন। তাঁরা তাদের শুধু অনুভবগম্য মানস-সত্তাই স্বীকার করেন নি, তাদের মন-বহির্ভূত বাহ্যসত্তাও স্বীকার করেছেন। তাঁরা তাদের নাম দিয়েছেন পদার্থ। কণাদের বৈষয়িক দর্শনে এই চেষ্টা সুপরিস্ফুট। আরিস্টটল তাঁর তত্ত্ববিদ্যায় এই সমস্ত শ্রেণীকে 'ক্যাটেগরি' নাম দিয়েছেন। এই ক্যাটেগরিগুলোর কতকগুলোর সত্তা আমাদের মনে, কতকগুলোর সত্তা আমাদের মনের বাইরে।

বহির্বিশ্বের সাধারণ ধর্মের আলোচনা তত্ত্ববিদ্যার অন্তর্গত। আমরা এখানে ধী-বিদ্যার অঙ্গ হিসাবে জ্ঞানের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে জড়িত কতকগুলো ব্যাপক ধারণার আলোচনা করছি মাত্র; যেমন—দেশ ও কাল, বস্তু ও গুণ, কার্য ও কারণ। মানুষের ইতিহাসে দার্শনিক চিন্তার শুরু থেকেই এসব ব্যাপক ধারণার আলোচনা চলেছে। সে আলোচনার মর্মকথা আমরা এখানে সংক্ষেপে বলতে চাই।

দেশ ও কালের স্বভাব

প্রথমে আমরা দেশ ও কালের স্বরূপ বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হব।

দর্শনের পরিভাষায় যাকে 'দেশ' বলা হয়, চলতি কথায় তার নাম 'স্থান'। উপর-নীচ, ডান-বাঁ, উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিম, দূরে-কাছে ইত্যাদি যে সব কথা আমরা চিরদিন ব্যবহার করি সেগুলো দেশেরই নানা দৃষ্টিকোণ থেকে নানা রকমের বর্ণনা। আর একটু বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, আমরা সহজ বুদ্ধিতে দেশ বলতে একটি ত্রিস্বভাবাত্মক বস্তুকে বুঝি। সে তিনটি স্বভাব হলোঃ দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও দূরত্ব। প্রত্যক্ষ জ্ঞানে আমরা দেশকে যেভাবে জানি, তা হলো সীমিত বা খণ্ডিত দেশ। তার ভিত্তি আমাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞান, এ থেকেই আমরা আমাদের বুদ্ধির সাহায্যে অসীম, অনন্ত, সর্বব্যাপী দেশের ধারণা করি। এ ধারণা প্রত্যক্ষলব্ধ নয়, বুদ্ধিগম্য—বুদ্ধিরই সৃষ্টি।

'কাল' বলতে আমরা সহজ বুদ্ধিতে এক গতিশীল বস্তুকে বুঝি। কালের একটি ধর্ম—ধারাবাহিকতা। কালের স্বভাব অনেকটা কবি-বর্ণিত নদীর স্বভাবের মতো। নদীর প্রবাহ বর্ণনা করতে গিয়ে কবি রূপকের সাহায্যে নদীর মুখ দিয়ে বলিয়েছেন: ''মানুষ যায় আসে কিন্তু আমার গতি অব্যাহত, আমি চলার পথে চিরকাল এগিয়ে চলেছি।"—'কাল আপনার বন্ধুর বাড়ীতে আমার নেমন্তন্ন ছিল', 'আজ আপনার ওখানে যাব', 'আগামীকাল প্রাদেশিক আইনসভার অধিবেশন' ইত্যাদি অতীত, বর্তমান ও অনাগত ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমাদের যে সব উক্তি, সেগুলো কালকে নিয়ে। দেশের বেলা যেমন, কালের বেলায়ও তেমনি আমাদের প্রত্যক্ষ অনুভূতি খণ্ডকালকেই নিয়ে। অখণ্ড বা অনন্ত কাল যাকে কখনো কখনো মহাকাল বলে বর্ণনা করা হয়, তার ধারণা প্রত্যক্ষলব্ধ নয়, তা বুদ্ধিলব্ধ ও বুদ্ধিরই সৃষ্টি।

দেশ-কালের সত্তা নিয়ে যুগে যুগে দার্শনিকদের মধ্যে কত মতবিরোধ। খুব চুলচেরা বিশ্লেষণের ভিতর না গিয়ে, এ বিষয়ে তিনটি প্রধান মত দেখা যায়। একদল দার্শনিকের মতে, দেশ ও কাল টেবিল-চেয়ার, গাছ-পাথর ইত্যাদির মতোই বাস্তব-পদার্থ, বহির্বিশ্বে যার সত্তা আছে। আর একদল দার্শনিক ঠিক তার উল্টো মত পোষণ করেন। তাঁরা বলেন, দেশ ও কাল বলে মনের বাইরে কোন সত্তা নেই। তাঁদের মতে, দেশ-কালের সত্তা বিষয়-কেন্দ্রিক নয়, আত্মকেন্দ্রিক। তৃতীয় এক দল দার্শনিকও আছেন—যাঁরা এই বিরোধের সমন্বয় সাধন করে বলতে চান, দেশ-কালের সত্তা আমাদের মনের ভিতরও আছে, মনের বাইরের জগতেও আছে। দেশ কাল তাই বিষয়কেন্দ্রিকও বটে, আত্ম-কেন্দ্রিকও বটে।

দেশ ও কালের বাহ্যসত্তাবাদ

দেশ-কালের বাহ্যসত্তাবাদ-অনুসারে দেশ ও কাল দু'টি অখণ্ড সত্তা—যার ভিতর জগতের সমস্ত বস্তু নিহিত। আমরা যেমন একটি হোল্ডঅলের ভিতর নানা রকমের জিনিসপত্র ঢুকিয়ে রেখে দেই, ঠিক তেমনি দেশ ও কাল যেন দু'টি সীমাহীন হোল্ডঅল্—যার ভেতর প্রকৃতি সমস্ত বস্তু যেন ঢুকিয়ে রেখেছেন। দেশের স্বভাব সীমাহীন দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও দূরত্ব। আর কাল একটি অনন্ত প্রবাহ। এদের শেষ খুঁজে পাওয়া যায় না। দেশের বাহ্যসত্তা সম্বন্ধে দু'টি মত পাওয়া যায়। গ্রীক দার্শনিক ডিমোক্রিটাস জগতের বস্তুসমূহকে ভাগ করে কতকগুলো অবিভাজ্য অতিক্ষুদ্র অবয়বের সন্ধান পেয়েছেন। এগুলোর পারিভাষিক নাম পরমাণু। এ পরমাণুগুলোর ভিতর কোনও শূন্য স্থান বা অবকাশ নেই। আর

এই পরমাণুগুলো মহাশূন্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এ দুটিই দেশের দুটি ভিন্নরূপ। প্রথমটি অবকাশ-রহিত দেশ, আর দ্বিতীয়টি অবকাশযুক্ত দেশ। ইংরেজীতে প্রথমটিকে বলে 'প্লেনাম' ও দ্বিতীয়টিকে বলে 'ভ্যাকুয়াম।' সক্রেটিস শতকে দেকার্ত দেশ বলতে অবকাশশূন্য স্থানই বুঝেছেন। তাঁর মতে, নিরবকাশ স্থান বা ভ্যাকুয়াম বলে কিছুই নেই।

ভারতীয় দর্শনে বৈশেষিকেরা বিশেষ করে দেশ ও কালে বাহ্য সত্তা স্বীকার করেছেন। তাঁদের মতে, দেশ কাল দু'টি দ্রব্য। কালকে তাঁরা সমস্ত অনিত্য পদার্থের কারণ বলে বর্ণনা করেছেন। তাঁরা বলেছেন: কাল আসলে এক, অনন্ত এবং সর্বব্যাপী—শুধু বাহ্য পরিবেশের যোগে তাকে আমরা মুহূর্ত, দিন মাস, বছর ইত্যাদি রূপে ব্যবহার করে থাকি।

দেশকে তাঁরা দিক্ বলে সংজ্ঞা দিয়েছেন। এই দেশে নিত্য ও সর্বব্যাপী। এই দিকের সাহায্যে কোন্‌টা দূরে বা অন্তিকে অর্থাৎ কাছে, তা আমরা বুঝি। দিক এক, অনন্ত ও সর্বব্যাপী হলেও অবস্থা-ভেদে পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ ইত্যাদি রূপে তার ব্যবহার।

বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগের আরম্ভে গ্যালিলিও ও নিউটন দেশকে একটি অনন্ত ব্যাপক বাহ্যবস্তু বলে দেখেছেন। নিউটন এই সর্বাধার দেশের বৈজ্ঞানিক ধারণার সঙ্গে তাঁর স্বাভাবিক ঈশ্বর-বিশ্বাসের একটা রফা করে বলেছেন: সৃষ্টির আদিতে সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর গ্রহ-তারা-নক্ষত্রগুলোকে স্বইচ্ছায় মহাশূন্যে নিক্ষেপ করেছেন, আর তাদের তিনি তখন যে গতিবেগ দিয়েছেন তার চাপেই তারা আজও চলেছে।

দেশ ও কালের মানস-সত্তাবাদ

দেশ কালের মানস সত্তাবাদ জন লক্ ও ইম্যানুয়েল ক্যাণ্ট দু'টি ভিন্ন ভাবে দেখিয়েছেন। ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতাবাদী জন লক্ খণ্ড কাল ও খণ্ড দেশের বাহ্য সত্তা স্বীকার করেছেন। আমাদের ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যে টুকরো টুকরো দেশ, অর্থাৎ পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ ইত্যাদি, তারই সংযোগে আমরা অখণ্ডকালের একটি ব্যাপক ধারণা করে থাকি। কাজেই খণ্ডকাল বাস্তব, অখণ্ডকাল আমাদের মনের সৃষ্ট ধারণ ছাড়া আর কিছুই নয়। এই বিশ্লেষণ-পদ্ধতিকে খানিকটা রূপান্তরিত করে লক্ কালের উপরও প্রয়োগ করেছেন। সেকেণ্ড, মিনিট, ঘণ্টা, দিন, সপ্তাহ, মাস, বছর ইত্যাদি সময়ের খণ্ডজ্ঞান ইন্দ্রিয় আমাদের দেয়। তাই তাদের বাহ্যসত্তা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু অখণ্ড, অনন্তকালের কোন কোন প্রত্যক্ষ অনুভূতি আমাদের নাই। খণ্ড খণ্ড কালের প্রত্যক্ষ জ্ঞান থেকেই

বুদ্ধির সাহায্যে অখণ্ড কালের ধারণার সৃষ্টি। অখণ্ড কালের তাই মানস-সত্তা আছে, বাহ্য-সত্তা নাই।

দেশ-কালের স্বরূপ বিশ্লেষণে লক্ যে আপোষমূলক মনোভাব পোষণ করেছেন, ক্যাণ্ট তা সমর্থন করেন না। ক্যাণ্টের মতে, খণ্ড কাল আর অখণ্ড কালের তফাৎ নেহাত কাল্পনিক। দেশ ও কাল আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতির দু'টি কাঠামো। তাদের সত্তা মানস সন্দেহ নাই; কিন্তু তাদের প্রয়োগ হয় ইন্দ্রিয়ানুভূতিতে, বহির্বিশ্ব থেকে যে উত্তেজক এসে আমাদের ইন্দ্রিয়ের দ্বারে আঘাত করে, তার উপর। বাইরের বিশ্বে যার সত্তা আছে, যেমন টেবিল চেয়ার, গাছ-পাথর, মানুষ-গরু ইত্যাদি, তারা আমাদের জ্ঞানের বিষয় কখনো হয়, কখনো হয় না। জ্ঞানের বিষয়-বৈচিত্র্যে স্থিতিশীলতা বলে কিছু নাই। এক বস্তুর জ্ঞান এলো, খানিকক্ষণ রইলো, তারপর তাকে ধাক্কা দিয়ে যেন আরেক জ্ঞান আমাদের মনোরাজ্য করতলগত করে নিল। কিন্তু এ জ্ঞানেরও স্থায়িত্ব নাই। এইভাবে বিষয়ের জ্ঞান ক্ষণিক, চঞ্চল, তাই বিষয়ের সঙ্গে আমাদের যোগও ক্ষণিক, শাশ্বত নয়, চঞ্চল। এই অর্থেই বাউলদের "কত ঢেউ ওঠছে রে দিল্-দরিয়ায়" —এই চিত্ত-বিশ্লেষণের সার্থকতা।

ক্যাণ্টের মতে, বিষয়ের জ্ঞানে যে নিয়ম খাটে, দেশ-কালের জ্ঞানে তা মোটেই খাটে না। দেশ-কালের জ্ঞান গাছ-পাথরের জ্ঞানের মতো যায়-আসে একথা বলা চলে না। আমরা যে অসংখ্য বাইরের বস্তুকে জানছি, তাদের সকলের জ্ঞানের সঙ্গে দেশ-কালের নিকট-যোগ। দেশ-কালের জ্ঞান ছাড়া আমাদের কোন বাহ্যবস্তুর জ্ঞানই হয় না। ঠিক সে-রকমেই যখন আমাদের কোন মানস প্রত্যক্ষ হয়, যেমন সুখ-দুঃখের অনুভূতি, তখন সেখানে দেশের জ্ঞান না থাকলেও কালের জ্ঞান আছেই আছে। দেশ-কালের জ্ঞান সার্বভৌম বলে দেশ কালের বাহ্য-সত্তা থাকতে পারে না, মানস-সত্তাই থাকতে পারে। এই মানস সত্তার ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বাহ্যজগতে প্রয়োগ হয় বলে দেশ-কালের বহিঃসত্তা আছে বলে আমাদের মনে হয়।

এ থেকে ক্যাণ্ট এ কথাও প্রমাণ করেছেন যে, যেহেতু দেশ ও কাল আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতির কাঠামো ছাড়া আর কিছুই নয়, তাই ইন্দ্রিয়াতীত জগতে দেশ-কালের সত্তা নাই। বাহ্যজগৎ থেকে যে উত্তেজক আমাদের ইন্দ্রিয়-দ্বারে এসে ইন্দ্রিয়জ অনুভূতি উৎপন্ন করে, তার পেছনে রয়েছে চরমতত্ত্ব। সে চরমতত্ত্বে দেশ-কাল নাই, থাকতে পারে না, কারণ সে তত্ত্ব ইন্দ্রিয়ানুভূতির অতীত ও অগম্য।

ভারতীয় দর্শনে বৈদান্তিকরা দেশ-কালের সত্তা নির্ণয়ে ক্যাণ্টের মতেরই অনেকটা সমর্থন করেছেন। তাঁরা মনে করেন, চরমতত্ত্ব দেশ ও কালের অতীত।

দেশ-কালের সত্তা এ পরিদৃশ্যমান জগতে। বৈদান্তিকদের মতে এ পরিদৃশ্যমান জগৎ চরমতত্ত্বে নাই। অতএব এ পরিদৃশ্যমান জগতের সঙ্গে অচ্ছেদ্যসম্বন্ধে জড়িত দেশ-কালও চরমতত্ত্বে নাই।

হেগেলের সমন্বয়

দার্শনিক হেগেল দেশ-কালের স্বরূপ নির্ণয়ে তাঁর দ্বান্দ্বিক সমন্বয়বাদের মূলনীতি অনুসারে উভচর মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর মতে, আমাদের সসীম আত্মসত্তা এক অনন্ত বিশ্বাত্মার প্রকাশ। আমাদের সত্তা সেই বিশ্বচেতনার অংশ মাত্র। কাজেই দেশ-কাল এক দিক দিয়ে যেমন আমাদের মনেরই কাঠামো, অন্যদিকে তেমনি তা'রা যে বিরাট বিশ্বমনে সমস্ত বিশ্বজগৎ প্রতিষ্ঠিত, তারও কাঠামো। তাই আমাদের সসীম বুদ্ধির কাঠামো হিসাবে দেশ-কালের মানস-সত্তাই স্বীকার করা যায়, বাহ্যসত্তা স্বীকার করা যায় না। কিন্তু বিশ্বমনের কাঠামো হিসাবে দেশ ও কালের বাহ্যসত্তাও স্বীকার করা যায়। অতএব দু'টি ভিন্ন ও পরস্পরের পরিপূরক দৃষ্টিকোণ থেকে বলা চলে—দেশ ও কাল উভয়ধর্মী, তাদের মানস-সত্তা যেমন সত্য, তাদের বাহ্যসত্তাও তেমনি সত্য।

আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ

সাম্প্রতিক বিজ্ঞানে মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইন দেশ ও কালের ভিন্নতা অস্বীকার করেন। তিনি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রমাণ করেছেন: আমরা যাকে কাল বলি তা দেশেরই চতুর্থ ধর্ম। দেশ বলতে আমরা যে তিনটি স্বভাব অর্থাৎ দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও দূরত্ব বুঝি, আইনস্টাইন তার সঙ্গে কালের গতিশীলতা যোগ করে দেখিয়েছেন স্থির দেশ বলে কিছু নাই, দেশ ও কাল এক অবিভাজ্য সত্তা। সহজ কথায় আমরা যাকে উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম বলি, ঘড়ির কাঁটার সেকেণ্ড, মিনিট ও ঘণ্টা ছাড়া তাকে খুব বুঝা যায় না। গতিশীল দেশই দেশ-কাল।

গ্যালিলিও ও নিউটনের কাছ থেকে আমরা জেনেছি, দেশ ও কাল শুধু দু'টি পৃথক স্থির বস্তুই নয়, তাদের সত্তা নিরপেক্ষও। আইনস্টাইন দেখিয়েছেন: দেশ-কালের স্বভাব অবস্থা সাপেক্ষ। এক দৃষ্টিকোণ থেকে যা এক বছর ও এক মাইল, অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে তাকে একশো বছর ও একশো মাইলও বলা যেতে পারে। গণিতের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের সাহায্যে আইনস্টাইন দেখিয়েছেন যে, পৃথিবীতে দেশ-কালের যে পরিমাপ, গ্রহ-তারার দৃষ্টিকোণ থেকে তার ভিন্ন পরিমাপ সম্ভব। আইনস্টাইনের মতে তাই দেশ ও কাল বলে আলাদা কিছু নাই, দেশ-কালই আছে।

আর দেশ-কালের নিরপেক্ষ সত্তাও নাই, তাদের সত্তা আপেক্ষিক। এরই নাম 'দেশ-কালের আপেক্ষিকতাবাদ'।

আইনস্টাইনের এই আপেক্ষিকতাবাদ আমাদের দেশ-কালের চলতি ধারণাকে এমনি উল্টে দিয়েছে যে, তার সঙ্গে আমাদের সহজবুদ্ধিজাত দেশ-কালের ধারণার বৈষম্য দেখাতে গিয়ে হাস্যোদ্দীপক কবিতা রচনা ক'রে একজন বলেছেন : "ব্রাইট নাম্নী এক মহিলা আইনস্টাইনের পদ্ধতিতে আজ সূর্যমণ্ডলের দিকে যাত্রা শুরু ক'রে দেখতে পেলেন, গতকালই তিনি সূর্যমণ্ডলে পৌঁছে গেছেন।"

বর্তমান শতকের ব্রিটিশ দার্শনিক আলেকজাণ্ডারও আইনস্টাইনের মতোই দেশ-কালের শুধু একত্ব স্বীকার করেন নি, তাকেই তিনি বিশ্বের আদি উপাদান বলে মনে করে তার মাধ্যমে বিশ্ববিবর্তনের ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টাও করেছেন। কেউ কেউ আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদের ভিতর বেদান্তের মায়াবাদের ইঙ্গিত খুঁজে পেতে চেষ্টা করেন। বেদান্তের মায়াবাদের মতে, যদিও আমরা জগতকে দেখছি, তথাপি জগতের সত্যিকার অস্তিত্ব নেই। তাঁদের মতে, দেশ-কালের আপেক্ষিকতা মানে দেশ কালের সত্তা মানুষের বুদ্ধি-উদ্ভূত। তাই বুদ্ধির অতীত জগৎ দেশ-কালেরও অতীত।

আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদের এ জাতীয় ব্যাখ্যা কতখানি যুক্তিসঙ্গত জানি না। বেদান্তের মতবাদের সঙ্গে ক্যাণ্টের মতের সাদৃশ্য অপ্রচুর নয়, আইনস্টাইনের মতের সঙ্গে মায়াবাদের সাদৃশ্য যে বেশ খানিকটা কল্পনা-প্রসূত, তাতে হয়তো সন্দেহ নাই, তবে মায়াবাদীরা আইনস্টাইনের মতকে তাদের অনুকূলে ব্যাখ্যা করলে তাতে আপত্তি করারও খুব যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই। আজকের দিনের দর্শন বিজ্ঞানভিত্তিক, কাজেই মায়াবাদের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি বের করার চেষ্টা আধুনিক মনোবৃত্তিরই পরিচয়।

দ্রব্য ও গুণ

আগেই বলেছি, বৈশেষিকরা দ্রব্যকে গুণের আধার বলে বর্ণনা করেছেন। একটা টেবিলের কথা ধরা যাক। টেবিলের কতকগুলো গুণ আছে : তার রং, চেহারা, ওজন ইত্যাদি। টেবিল বলে যদি একটা কিছু না থাকে, তাহলে গুণগুলো কোন্ আশ্রয়ে থাকতে পারে? টেবিলের গুণগুলো : তার রং, চেহারা, ওজন ইত্যাদি একে অন্য থেকে আলাদা হয়েও এক সঙ্গে গাঁথা রয়েছে, তার কারণ তাদের একক আশ্রয়। সেই আশ্রয়ের নামই দ্রব্য। ক্যাণ্টের মত বিশ্লেষণে আমরা দেখিয়েছিলাম যে, আমাদের জ্ঞানের বিষয়গুলোর দুটি ভিন্ন দিক আছে। একটি তার ঐক্য, আর আরেকটি তার বহুত্ব। এরা পরস্পরের

পরিপূরক, অর্থাৎ দ্রব্য ছাড়া গুণ থাকে না, আর গুণ ছাড়া দ্রব্যও থাকে না। বৈশেষিক দর্শনে দ্রব্য ও গুণের যে বর্ণনা তার সহজ সরল অর্থ এইটুকুই।

তবে মুশকিল এইখানে যে, দ্রব্য ছাড়া গুণকে বোঝা যায় না, আর গুণ ছাড়া দ্রব্যকেও বোঝা যায় না। দ্রব্য ও গুণের এই স্বরূপ বিশ্লেষণ হেঁয়ালির মতোই শোনায়। কেউ কেউ এতে একটি বড় যুক্তিদোষ বা হেত্বাভাসও খুঁজে বের করেছেন, তার নাম অন্যোন্যাশ্রয়-দোষ। গুণ ছাড়া যদি দ্রব্যকে আর দ্রব্য ছাড়া যদি গুণকে বোঝা না যায়, তাহলে এ দু'য়ের কারো সম্বন্ধেই আমাদের ভাল জ্ঞান নেই, একথাই মেনে নিতে হয়। এ জাতীয় বুদ্ধিসঙ্কটের উদাহরণ আমাদের জীবনে প্রচুর। যেমন আমরা আব্বা ছাড়া আম্মাকে বুঝতে পারি না, আর আম্মাকেও আব্বা ছাড়া বুঝতে পারি না; স্ত্রী ছাড়া স্বামীকে বুঝতে পারি না, আর স্বামী ছাড়া স্ত্রীকেও বুঝতে পারি না। ইংরেজী লজিকে এ জাতীয় পদের নাম আপেক্ষিক পদ। বৈশেষিকদের মতে, দ্রব্য ও গুণ অনেকটা এই আপেক্ষিক পদেরই পর্যায়ে।

সহজ বুদ্ধিতে দ্রব্য গুণগুলোর একটা আধার বা আশ্রয়, এ কল্পনা না করে আমরা পারি না। তাই যে নিয়মে আমরা জানি: অনেকগুলো লোক এক পরিবারভুক্ত হলে বাড়ী বলে তাদের সকলের আশ্রয়স্থল কিছু থাকা দরকার, ঠিক সেই নিয়মেই আমরা মনে করি বস্তু বলে গুণগুলোরও একটা আশ্রয়স্থলের প্রয়োজন। অথবা আমরা যেমন মনে করি, একটি গরুকে গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখতে হলে দড়ি বলে তাদের একটা সংযোগ-সূত্র থাকা দরকার, ঠিক তেমনি আমরা মনে করি বস্তুর গুণগুলোকে একত্রে বেঁধে রাখার জন্যে দ্রব্য বলে তাদের একটি ঐক্যসূত্র থাকা দরকার।

সাম্প্রতিক যুগের ব্রিটিশ দার্শনিক ব্র্যাড্‌লি দ্রব্য ও গুণের বিশ্লেষণে এই অন্যোন্যাশ্রয় বা পরম্পরাশ্রয় দোষ দেখে দ্রব্য ও গুণের ধারণার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত আমাদের প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতার জগৎকে স্ববিরোধী বলে বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে, এই স্ববিরোধী অনুভূতি তাত্ত্বিক নয়, প্রাতিভাসিক, অর্থাৎ আমাদের সসীম বুদ্ধির সৃষ্টি।

দ্রব্যের ধারণার সঙ্গে স্থির সত্তার বোধও জড়িত। টেবিলের রং ও চেহারা বদলে গেলে বা ওজন কমে গেলে টেবিল টেবিলই থাকে। কাজেই দ্রব্য বলতে বস্তুর যে সত্তা বদলায় না অর্থাৎ যা তার আসল সত্তা, আর গুণ বলতে তার যে সত্তা বদলায়, অর্থাৎ তার আকস্মিক সত্তাই বোঝায়। ইংরেজীতে তাই দ্রব্য কথার নাম সাব্‌স্ট্যান্‌স। সাব্‌স্ট্যান্‌স মানে কোন কিছুর সারাংশ।

মধ্যযুগীয় চার্চীয় দর্শনে এই অর্থে দ্রব্য ও গুণের, সাব্‌স্ট্যান্‌স ও অ্যাট্রিবিউটের খুবই আলোচনা।

ভারতীয় দর্শনে বৌদ্ধেরা গুণ স্বীকার করেন, দ্রব্য স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে কোন স্থায়ী সত্তা নাই: তাঁদের মতে যা কিছু আছে তা ক্ষণিক, মুহূর্তকাল স্থায়ী। সুতরাং দ্রব্য বলতে যদি স্থায়ী পদার্থ কিছু বুঝায়, তাহলে বৌদ্ধেরা এ জাতীয় কোন সত্তা স্বীকার করতে পারেন না। কাজেই বৌদ্ধদের এধারণা ইসম্ভবতঃ বৌদ্ধদর্শনে দ্রব্যের বিরুদ্ধে জেহাদের কারণ।

বেদান্ত দর্শন দ্রব্য ও গুণের পার্থক্য স্বীকার করে না। বৈদান্তিকদের মতে দ্রব্য ও গুণ আসলে অভেদ। দ্রব্য ও গুণ একই সত্তার এপিঠ আর ওপিঠ। জ্ঞানের একই বিষয়কে একত্ব ও স্থায়িত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে দ্রব্য বলে আমরা মনে করি আর বহুত্ব ও নশ্বরত্বের দিক থেকে তাকেই আমরা গুণ বলে মনে করি। শঙ্করাচার্য বলেন: যেমন একই যজ্ঞদত্ত তার পিতার পুত্র, পুত্রের পিতা, পত্নীর স্বামী, বন্ধুর বন্ধু, ঠিক সেরকমই একই বিষয়ের দ্রব্য ও গুণ ইত্যাদি নানাভাবে বিশ্লেষণ। তাদের মূল সত্তা এক।

আধুনিক য়ুরোপীয় দর্শনে দ্রব্য ও গুণ

মধ্যযুগীয় চার্চের দর্শনে দ্রব্য-গুণের আলোচনার কথা আগেই বলেছি। তার সাক্ষাৎ প্রভাবেই হোক, আর পরোক্ষ প্রভাবেই হোক, আধুনিক য়ুরোপীয় দার্শনিক চিন্তায় দ্রব্য-গুণের স্বরূপ-বিশ্লেষণ এক উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে রয়েছে।

বৈশেষিকরা দ্রব্য-গুণের আলোচনা করেছেন সহজবুদ্ধির সাহায্যে। সহজ দৃষ্টি নিয়ে তাঁরা দ্রব্য বলতে দুনিয়ার গুণশীল যাবতীয় বস্তুকে ধরে নিয়েছেন। এইসব দ্রব্যকে তাঁরা নয় শ্রেণীতে ভাগ করেছেন: (১) পৃথিবী, (২) পানি, (৩) তেজ, (৪) আকাশ, (৫) বাতাস, (৬) দেশ, (৭) কাল, (৮) আত্মা ও (৯) মন। বৈশেষিক দর্শনে দ্রব্য ও গুণ উভয়েরই সত্তা সমতুল্য। কিন্তু চার্চীয় দর্শনে দ্রব্য বা সাব্‌স্ট্যান্‌সই আসল সত্তা, গুণের সত্তা তার তুলনায় গৌণ ও দ্রব্যের সত্তার উপরই নির্ভরশীল।

দ্রব্য ও গুণের সত্তা সম্বন্ধে এই চার্চীয় মত মোটামুটি গ্রহণ করেই দেকার্ত দ্রব্যের স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর মতে, স্বাধীন সত্তাই দ্রব্যের স্বভাব। এই সংজ্ঞা অনুসারে একমাত্র সৃষ্টিকর্তা অনন্ত শক্তিমান ঈশ্বরকেই দ্রব্য বলা চলে। কারণ তাঁর সত্তা আর কারো উপর নির্ভরশীল নয়, অন্য সকলের সত্তাই তাঁর উপর

নির্ভরশীল। তথাপি তিনি গৌণ অর্থে আরও দু'টি দ্রব্য স্বীকার করেছেন ঃ জড়-পদার্থ ও মানব-আত্মা। জড়-পদার্থের বিশেষ গুণ ব্যাপ্তি, আর মানব-আত্মার বিশেষ গুণ ভাবনা। জড়-পদার্থ ও মানব-আত্মা ঈশ্বরের অধীন। এ দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের স্বাধীন সত্তা নাই, কিন্তু তারা পরস্পরের উপর নির্ভরশীল নয়। জড়বস্তুর সত্তা আত্মসত্তার উপর নির্ভরশীল নয়, আর আত্মসত্তাও জড়বস্তুর সত্তার উপর নির্ভরশীল নয়। তাই দেকার্ত বলেছেন ঃ ঈশ্বরের দ্রব্যত্ব অবস্থা-নিরপেক্ষ, আর জড়বস্তুর ও মানব-আত্মার দ্রব্যত্ব অবস্থা-সাপেক্ষ। দ্রব্যত্ব বা স্বাধীন সত্তার মুখ্য অর্থে প্রয়োগ ঈশ্বরে, গৌণ অর্থে মানব-আত্মা ও জড় বস্তুতে।

দেকার্তের পরবর্তী দার্শনিক স্পিনোজাও দ্রব্যের চার্চীয় ধারণার প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারেননি। তাঁর মতেও দ্রব্যের লক্ষণ স্বাধীন সত্তা। তবে স্বাধীন সত্তা সম্বন্ধে দেকার্তের আপোষমূলক মনোবৃত্তির তিনি সমর্থন করেন না। স্বাধীন সত্তা যখন একমাত্র ঈশ্বরেরই আছে, তখন ঈশ্বর ছাড়া আর কোন দ্রব্য থাকতে পারে না। জড়বস্তু ও মানব-আত্মার দ্রব্যত্ব তাই স্পিনোজায় অস্বীকৃত। জড়বস্তুর গুণ ব্যাপকত্ব, আর মানব-আত্মার গুণ ভাবনা—আসলে ঈশ্বরেরই গুণ। দেকার্ত একটি মুখ্য দ্রব্যের ও আর দু'টি গৌণ দ্রব্যের সত্তা স্বীকার করেছেন। স্পিনোজা গৌণ দ্রব্য স্বীকার করেন না, একটি মুখ্য দ্রব্যই স্বীকার করেন। তাই দেকার্তের দ্রব্যের ত্রিত্ববাদের পরিণতি স্পিনোজার একত্ববাদে।

লাইবনিজের বহুদ্রব্যত্ববাদ

দ্রব্যের এই একত্ববাদের উগ্র বিরোধিতা করেছেন লাইবনিজ। তাঁর মতে, দ্রব্য একও নয়, তিনও নয়, অসংখ্য ও অগণিত। লাইবনিজ দেকার্তের দেয়া স্পিনোজার গৃহীত দ্রব্যের সংজ্ঞাকে ঈষৎ রূপান্তরিত করে ফেলেন। তাঁর মতে, দ্রব্যের স্বভাব স্বাধীন সত্তা নয়, স্বাধীন ক্রিয়া। লাইবনিজের মতে, এক একটি মানব-আত্মা এই স্বাধীন ক্রিয়ার এক একটি কেন্দ্র। আর আমরা যাকে জড়বস্তু বলি তাও আসলে এ জাতীয় স্বাধীন ক্রিয়ার কতকগুলো কেন্দ্রের সমষ্টি। জড়বস্তু ও মানব-আত্মার ভিতর কোন প্রকারগত পার্থক্য আছে একথা লাইবনিজ স্বীকার করেন না।

ডেমোক্রিটাস্ জড়-বস্তুকে ভাগ করে তার অবিভাজ্য ন্যূনতম অংশ আবিষ্কার করেছিলেন, সেই অংশের নাম পরমাণু। ডেমোক্রিটাসের মতে, এই পরমাণু অবিভাজ্য হলেও তার ব্যাপ্তি আছে। লাইবনিজ বলেন ঃ যার ব্যাপ্তি আছে তার বিভাগও সম্ভব, যদিও বা বাস্তবে তা সম্ভব না হয়, অন্ততঃ চিন্তায় সম্ভব। কাজেই পরমাণু যদি অবিভাজ্য হয়, তাহলে তার ব্যাপ্তি থাকতে পারে না।

অতএব আমরা যাকে জড়-বস্তু বলি, তার আদি উপাদানও মানব-আত্মার মতো অবিভাজ্য ও ব্যাপ্তিহীন। এইভাবে লাইবনিজ অসংখ্য চেতন পরমাণুতে বিশ্বের আদি-উপাদান খুঁজে পান। এই পরমাণুগুলোর স্বভাব ক্রিয়া বা পরিবর্তন। আর মানব-আত্মার বিশেষ ধর্ম যে চিন্তা, তাও ত পরিবর্তনেরই এক উন্নত রূপ। আজকের দিনের বিজ্ঞানে জড়-বস্তুর শক্তি-কেন্দ্রে যে রূপান্তর, লাইবনিজে তার আভাস পাওয়া যায়।

এই অসংখ্য চেতন পরমাণু কাজ করে চলেছে, তাদের যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ তাদের যিনি স্রষ্টা, সেই ঈশ্বরের ইচ্ছা-সঙ্কেতে, তাঁর ইচ্ছাতেই তারা সকলে স্বতন্ত্র স্বাধীন পথে চলেও একই সামঞ্জস্যপূর্ণ বিশ্বের অধিবাসী। অনন্ত বৈচিত্র্যের ভিতর এই সামঞ্জস্য সর্বশক্তিমান স্রষ্টার আদিম ইচ্ছারই অপরিহার্য ফল।

এইভাবেই আধুনিক য়ুরোপীয় দর্শনে বুদ্ধিবাদে দ্রব্যের ধারণার পরিণতি।

লকের মুখ্য ও গৌণ-গুণ

এবার অভিজ্ঞতাবাদে দ্রব্যের ধারণার পরিণতি বিশ্লেষণ করে দেখা যাক। আগেই বলেছি, অভিজ্ঞতাবাদী জন লক্ বলেছেন, আমরা জড়বস্তুর গুণের কথা সাক্ষাৎভাবে ইন্দ্রিয়ের মারফত জানি। কিন্তু এ সমস্ত গুণ কিভাবে একত্র থাকতে পারে তার ব্যাখ্যা খুঁজতে গিয়েই আমরা সাক্ষাৎভাবে তাকে জানতে না পারলেও একটি জড়-বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করি। জড়-বস্তুর গুণের জ্ঞান ইন্দ্রিয়ের দেয়া অমিশ্র ধারণা। আর এই অমিশ্র ধারণার যোগফলই জড়-বস্তুর মিশ্র ধারণা। কাজেই জড়-বস্তুকে যদিও আমরা জানি না, তথাপি তার সত্তা বুদ্ধির তাগিদে আমরা স্বীকার করতে বাধ্য হই।

জড়-বস্তুর গুণের আলোচনা করতে গিয়ে লক্ কতকগুলো বেশ মজার কথা বলেছেন। লকের মতে জড়-বস্তুর গুণ দু'রকমের, এক—মানস-কেন্দ্রিক, আর দুই—বিষয়-কেন্দ্রিক। জড়-বস্তুর যে সমস্ত গুণ আমরা এক ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে জানি, যেমন—রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ, সেইগুলো আসলে জড়-বস্তুতে নাই। রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ নানা লোকের কাছে নানাভাবে অনুভূত হয়, এমন কি একই লোকেরও অবস্থাভেদে তাদের অনুভূতি ভিন্ন। বস্তুর রং নিয়ে আমাদের ভিতর কত মতভেদ। সুগন্ধ-দুর্গন্ধ নিয়ে, ঠাণ্ডা-গরম নিয়ে, জোরালো ও নিচু শব্দ নিয়েও মতভেদের অন্ত নাই। এসব গুণ যদি বস্তুতেই থাকত, তাহলে আমরা সকলেই সব সময় তাদের একভাবে জানতাম। সুতরাং বুঝতে হবে, বস্তুতে তারা আসলে নাই; আমাদের মনেই তাদের সত্তা। তাই লক্ এদের নাম দিয়েছেন জড়-বস্তুর গৌণ-গুণ। একাধিক ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বস্তুর

যেসব গুণ আমরা জানি, যেমন—তার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, ওজন ইত্যাদি, সেগুলি কিন্তু অবস্থাভেদে এক ব্যক্তির কাছে অথবা অন্য লোকেরও কাছে বদলায় না, এক-রকমই থাকে। অতএব এই বিষয়-কেন্দ্রিক জড়-বস্তুর গুণগুলোই হলো আসল গুণ। লক্ এদের নাম দিয়েছেন—মুখ্য-গুণ।

অভিজ্ঞতাবাদী লক্ কিন্তু বস্তুর গৌণ গুণগুলোকেও একেবারে মনের সৃষ্টি বলেননি। তিনি বলেনঃ জড়-বস্তুতে কোন বিশেষ গুপ্ত শক্তি আছে, যার চাপে আমরা ভেল্কিবাজির মতো নানা অবস্থায় তাকে নানারকম করে দেখি। বাহ্য ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমাদের যেসব অমিশ্র ধারণা হয়, তারই অধিষ্ঠানরূপে জড়-বস্তুর সম্বন্ধে আমাদের মিশ্র ধারণা। ঠিক এই নিয়মেই অন্তরেন্দ্রিয়ের মারফত আমাদের যে সব ধারণা হয় তাদেরই অধিষ্ঠানরূপে আমরা আত্মারও কল্পনা করি। তাই আত্মার ধারণাও একটি মিশ্র ধারণা।

লক্ আরও বলেন, অনন্তের ধারণা বলে কোন মৌলিক ধারণা জন্মাবধি আমাদের মনের ভিতর রয়েছে—দেকার্তের এই মত মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। তবে আমাদের মনোজগতে ও বহির্জগতে সীমার যে অমিশ্র ধারণা, তারই যোগফল অনন্তের মিশ্র ধারণা, আর সেই ধারণার ভিত্তি হিসাবেই আমরা অনন্ত শক্তিমান ঈশ্বরের সত্তা পরোক্ষভাবে স্বীকার করি।

মোটকথা, লকের মতে দ্রব্য তিনটিঃ জড়-বস্তু, মানব-আত্মা ও ঈশ্বর। সোজা কথায় লকের মত এ বিষয়ে বুদ্ধিবাদী দেকার্তের মতেরই প্রতিধ্বনি।

বার্কলের অজড়বাদ

বিশপ্ বার্কলে (১৬৮৫-১৭৫৩) লকের মতের অনুসরণ করেই দেখাবার চেষ্টা করেন যে, জড়-বস্তুর মুখ্য-গুণ ও গৌণ-গুণে আসলে কোন তফাৎ নাই। রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শ যেমন অবস্থাভেদে নানাভাবে অনুভূত হয়, দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-দূরত্ব ইত্যাদি তথাকথিত মুখ্য-গুণও সেভাবে অনুভূত হয়ে থাকে। একজন স্বাস্থ্যহীন বৃদ্ধ লোকের কাছে যা বহুদূর, একজন স্বাস্থ্যবান তরুণের কাছে তা অতি নিকট। কাজেই লক জড়-বস্তুর মুখ্য-গুণ ও গৌণ-গুণের ভিতর যে সীমারেখা টেনেছেন, তা অবাস্তব ও অযৌক্তিক। আর মাথা না থাকলে যেমন মাথাব্যথা থাকতে পারে না, তেমনি জড়-বস্তুর মুখ্য-গুণ ও গৌণ-গুণ এ দু'ই যদি মানস-কেন্দ্রিক হয়, তাহলে জড়বস্তুতে তাদের অধিষ্ঠান কল্পনা করারও প্রয়োজন থাকে না। তাহলে বলতে হয়, মানব আত্মাই তাদের অধিষ্ঠান। অতএব লকের তিনটি দ্রব্যের একটির মুণ্ডপাত ক'রে বার্কলে অবশিষ্ট রাখলেন দু'টিঃ মানবাত্মা ও ঈশ্বর।

হিউমের সর্বদ্রব্য সত্তালোপ

অভিজ্ঞতাবাদের পথে আরেক ধাপ এগিয়ে ডেভিড হিউম দেখালেন: ইন্দ্রিয়ই যখন আমাদের জ্ঞানের একমাত্র হাতিয়ার, আর ইন্দ্রিয়ের সাহায্যেই যখন রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শ, সুখ-দুঃখ ইত্যাদি গুণের অনুভূতি হয় তাহলে তাদের অধিষ্ঠান কল্পনা করা নেহাত অযৌক্তিক। অতএব, জড়বস্তু বলতে আমরা বুঝি কতকগুলো গুণ, আর আত্মা বলতেও আমরা বুঝি আরো কতকগুলো গুণ, যেমন সুখ-দুঃখ, ইচ্ছা-দ্বেষ-আবেগ-উচ্ছ্বাস ইত্যাদি। জড়বস্তু হ'ল কতকগুলো গুণের সমষ্টি, আর আমাদের মন হ'ল কতকগুলো ক্ষণিকভাবের সমষ্টি। আর অনন্ত ঈশ্বর বলে জগতের এক অধিষ্ঠান কল্পনা করার সপক্ষেও কোন যুক্তি নাই। কাজেই দ্রব্য বলে কোন কিছু নাই, গুণই আছে, এ বিষয়ে হিউমের মত বৌদ্ধ মতেরই প্রতিধ্বনি।

ক্যাণ্টে মানস-সত্তা

ইমানুয়েল ক্যাণ্টের সমীক্ষণবাদ আলোচনায় আমরা দেখিয়েছি যে, তিনি দ্রব্য ও মন উভয়কেই মানবীয় জ্ঞানের দু'টি অপরিহার্য কাঠামো বলে মেনে নিয়েছেন। এরা দুই-ই মানস কেন্দ্রিক। আমাদের বাহ্যজগতের জ্ঞানে এদের প্রয়োগ, জ্ঞানের অতীত তত্ত্বে নয়।

হেগেলের উভচর মত

হেগেলের মতে, আত্মকেন্দ্রিক ও বিষয়কেন্দ্রিক সত্তায় আসলে বিশেষ কোনও তফাত নাই। জ্ঞান ও বিষয়-সত্তার অভেদই হলো তার মূল কথা। তাঁর দর্শনের এই মূল নীতি অনুসারে তিনি দ্রব্য ও গুণের মানস-সত্তা ও বাহ্য-সত্তা উভয়ই একসঙ্গে স্বীকার করেছেন।

রাসেলের বস্তুনিষেধ

বার্ট্রে'ও রাসেল আজকের দিনের পদার্থবিস্তার আলোকে দ্রব্যের স্বরূপ বিশ্লেষণ ক'রে হিউমের মতেরই প্রতিধ্বনি করেছেন। তিনি বলেন, স্থিতিশীল দেশকে আমরা গতিশীল কাল থেকে যতদিন আলাদা করে দেখেছিলাম, ততদিন আমরা দ্রব্য বলে স্থিরস্বভাব একটি তত্ত্বও স্বীকার করেছি; কিন্তু আজকের দিনে আইনস্টাইনের দেশ-কালের একক সত্তা আবিষ্কার করার পর এমন স্থির-বস্তু কিছু স্বীকার করা যায় না। নিউটনের মতে দেশ ত্রিস্বভাব, অর্থাৎ দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও দূরত্বযুক্ত।

আইনস্টাইনের মতে কালই দেশের চতুর্থ স্বভাব, অর্থাৎ গতিশীলতাই দেশের ধর্ম। এই চতুঃস্বভাব-যুক্ত জগতে কোন স্থির বস্তু নাই, যা কিছু আছে সবই ক্ষণিক। সুতরাং দেকার্ত থেকে আরম্ভ করে বার্কলে পর্যন্ত আধুনিক য়ুরোপীয় দর্শনে স্থির দ্রব্যসত্তায় যে বিশ্বাস তা আইনস্টাইন-পূর্ব নিউটন-প্রভাবিত বিজ্ঞানেরই দর্শনে দান। হিউম এই অবৈজ্ঞানিক ধারণার মূলে কুঠারাঘাত করেছেন। রাসেল তাই মনে করেন, সাম্প্রতিক বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি নিয়ে চিরাচরিত স্থির দ্রব্যের ধারণাকে দর্শনে সাড়ম্বরে সমাধি দান করাই উচিত।

কার্যকারণ-সম্বন্ধ

কার্যকারণ-সম্বন্ধের স্থান অনেক দর্শনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কোন কোন দার্শনিক কার্যকারণ-সম্বন্ধ নির্ণয়কে দর্শনের প্রধান সমস্যা বলে গ্রহণ করেছেন। ঈশ্বর-বাদী আস্তিক দর্শনে ঈশ্বরই জগতের চরম তত্ত্ব, আর সেই ঈশ্বরের সত্তা বহু দার্শনিক কার্যকারণ-সম্বন্ধ বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রমাণিত করেছেন।

আমাদের অভিজ্ঞতার জগৎ, যাতে আমরা বাস করি, যাতে আমরা চলে-ফিরে বেড়াই, আর যা নিয়ে আমাদের জৈবিক সত্তা, তা একটি অবিচ্ছিন্ন ঘটনা-প্রবাহ ছাড় কিছুই নয়, শুধু বাইরের জগৎ নয়, আমাদের মনোজগৎও ভাবনা-চিন্তা, সুখ-দুঃখ, আবেগ-উচ্ছ্বাস, ইচ্ছা-দ্বেষের এক প্রবাহ। জন্ম থেকে মরণ পর্যন্ত এ প্রবাহে ভাঙন দেখা যায় না। উইলিয়াম জেম্‌স্ আমাদের ভাবধারার এই অবিচ্ছিন্নতা দেখাতে গিয়ে বলেছেন: রাত্রে ঘুমুবার আগে আমরা যে চিন্তা করে শুই, তা থেকেই ঘুম ভাঙ্‌বার পর পরের দিন সকালে আমাদের চিন্তা শুরু। বোধ হয় সেই জন্যেই ধার্মিক লোকেরা রাত্রিবেলা ঘুমুবার আগে আল্লাহ্‌তা'লার জিকির ক'রে থাকেন, তাহলে পরের দিন সকাল বেলা বাজার-খরচের টাকা-কড়ি, ডাল-চাল-মাছ-গোশ্‌তের কথা মনে হবার আগে আল্লাহ্‌তা'লার কথাই তাদের মনে পড়বে। যাই হোক, এই যে বিচিত্র পরিবর্তন-ধারা যার নাম জগৎ, এতো আকস্মিক নয়ই, বরং একটি ধরাবাঁধা নিয়মে বাঁধা। এ নিয়মেরই নাম কার্যকারণ নিয়ম, কতকগুলো অগ্রভাবী ঘটনার সঙ্গে কতকগুলো পরভাবী ঘটনার অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। তৃষ্ণা হলো পানি খেলাম, তৃষ্ণা চলে গেলো; ম্যালেরিয়া জ্বরে অনবরত কাঁপছি, ডাক্তার এসে চিনি-ঢাকা তিক্ত কুইনাইন খাইয়ে দিলেন, জ্বর সেরে গেলো। হঠাৎ এক বর্বর দস্যু আচমকিতে তরবারির আঘাতে কারো গলা কেটে দিল, আর অমনি তার মৃত্যু ঘটলো। এইভাবে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কত আগের ঘটনার সঙ্গে কত পরের ঘটনার অবিচ্ছেদ্য যোগ, একেই বলে কার্যকারণ-সম্বন্ধ।

ন্যায়-দর্শনে কার্যকারণ

এই কার্যকারণ-সম্বন্ধের বিশ্লেষণ করে প্রাচীন কালের নৈয়ায়িকেরা বলেছেন : 'কার্য নিয়ত-পূর্ববর্তী কারণম্', অর্থাৎ যা সব সময় কোন ঘটনার আগে থাকে তাই তার কারণ। তাঁদের সেকালের সীমিত বাহ্য অভিজ্ঞতা থেকে ঘটের ও পটের দৃষ্টান্ত দিয়ে তাঁরা বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেছেন। তাঁরা বলেন : মাটি ছাড়া যখন মাটির ঘট তৈরী হয় না, ঘট তৈরীর আগে মাটি যখন সব সময় থাকে, তখন মাটি হলো ঘটের কারণ। শুধু তাই নয়, মাটি থাকলেই হয় না; মাটিকে ঘটের চেহারা দেবার জন্য একটি কর্তারও প্রয়োজন। সে কর্তা হলো কুমোর। কুমোর ঘট তৈরী ক'রে তার চাকাতে মাটি ফেলে, সেই চাকা সে চালায় একটি হাতল দিয়ে। এগুলো ছাড়া মাটির ঘট তৈরী হয় না। এরা সব সময়ই ঘট তৈরীর আগে থাকে। কাজেই এরা সকলেই ঘট তৈরীর কারণ। পট বা কাপড়ের দৃষ্টান্ত বিশ্লেষণ করেও বলা যায়, তার কারণ তুলো, তাঁতী ও তাঁতীর তাঁত।

কিন্তু ঘট ও পট তৈরীর আগে যে সমস্ত জিনিস সব সময় থাকে, তা'রা যে তার কারণ হবেই, এমন কথা হলফ করে বলা যায় না। ঘট ও পট তৈরীর আগে এমন সব ঘটনা সব সময়ই ঘট্‌ছে যার সঙ্গে তার কোন যোগ নেই। সে সব ঘটনা কার্যের আগে সব সময় থাকা সত্ত্বেও তার কারণ হতে পারে না। যেমন, দিনের আলোতেই যদি সব সময় ঘট তৈরী করা হয় আর কাপড়ও বোনা হয়, তা থেকে এমন কথা বলা যায় না যে, দিনের আলো ঘট তৈরী ও কাপড় বোনার কারণ। এই আপত্তি বা অসঙ্গতি দূর করার জন্যে নৈয়ায়িকেরা বলেছেন : কার্যের সব সময় আগে থাকাই কারণের পক্ষে যথেষ্ট নয়, তার আগে থাকাটা কার্য উৎপত্তির জন্য একান্তভাবে অপরিহার্য হওয়া উচিত। দিনের আলো ঘট তৈরী ও কাপড় বোনার আগে সব সময় থাকতে পারে, কিন্তু তার থাকাটা অপরিহার্য নয়; কারণ রাতের অন্ধকারে রেঁড়ির তেলের প্রদীপ জ্বেলেও ঘট তৈরী ও কাপড় বোনা যেতে পারে। এমনকি, ভালো কারিগর দু'চোখ বন্ধ করেও ঘট তৈরী করতে ও কাপড় বুনতে পারে। এইজন্যে নৈয়ায়িকেরা বলেছেন :

"অনন্য সিদ্ধত্বে সতি কার্য্যনিয়ত—
পূর্ব্ববির্ত্ত্বম—কারণত্বম—"

"যা অপরিহার্যভাবে সব সময় কার্যের আগে থাকে তারই নাম কারণ।

জন স্টুয়ার্ট মিলের মত

ন্যায় দর্শনের এই মতের সঙ্গে য়ুরোপীয় ইনডাক্‌টিভ লজিকে জন্ স্টুয়ার্ট মিলের দেওয়া কারণের স্বভাব বিশ্লেষণের বেশ মিল দেখা যায়। মিল্ কারণের

স্বভাব স্তরে স্তরে বিশ্লেষণ করে বলেছেন: কারণ কার্যের আগে থাকে, কিন্তু কার্যের আগে থাকলেই তাকে কারণ বলা যায় না।

ঘটনার যেটি আগে থাকে, তাকে যদি কারণ বলা যায়, তাহলে জীবনে আর ভুলের সীমা থাকে না। যা ঘটনার আগে থাকে, তাকে কারণ বলে ভুল ক'রে এক বাদ্‌শাহ্ পুরানো দেয়াল ভেঙে এক ব্যক্তির আকস্মিক মৃত্যু হবার অপরাধে তার বুড়ো মার প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা করেছিলেন শোনা যায়। দেয়াল ভেঙ্গে গেছে, তার কারণ রাজমিস্ত্রী ভাল ইঁটের গাঁথুনি দেয়নি, আর বাজারে ভাল ইট কিন্‌তে যাওয়ার সময় হঠাৎ রাণীমার সঙ্গে তার দেখা, আর তাতেই বিলম্ব হয়ে বাজারে গিয়ে তার ভাল ইঁট না পাওয়া। কাজেই পুরানো দেয়াল ভেঙ্গে একজন নিরপরাধ লোক মারা যাওয়ার অপরাধে ন্যায়পরায়ণ বাদ্‌শা বিনা দ্বিধায় তার বুড়ো আম্মাজানেরই কোতলের ব্যবস্থা করেন। একেই বলে কার্যকারণ-সঙ্কট। এমন বিপদ যাতে ঘটতে না পারে সেইজন্য জন স্টুয়ার্ট মিল্ বলেছেন: শুধু ঘটনা আগে থাকলেই কোনও কিছু তার কারণ হয় না, কারণ হতে গেলে সব সময় তার সে ঘটনার আগে থাকা চাই। আবার সব সময়, আগে থাকলেও যে ঘটনাটি কারণ হতে পারে না, তা আমরা দেখিয়েছি। তাই মিল্ বলেন: ঘটনাটি অপরিহার্যভাবে, অর্থাৎ বিনা শর্তে কার্যের আগে থাকা চাই। এই অপরিহার্যতা ভাল করে বুঝিয়ে দেবার জন্যে মিল্ আরো বল যে: কারণ কার্যের অব্যবহিত পূর্ববর্তী হওয়া চাই, অর্থাৎ কারণের যেখানে সমাপ্তি, সেখানেই কার্যের শুরু হওয়া দরকার। তাদের দুয়ের মাঝখানে সময়ের ব্যবধান মোটেই থাকতে পারে না।

এক বুড়ো মাতাল ভদ্রলোক মদ খেয়ে তৎক্ষণাৎ মারা গিয়েছিলেন। তাতে তার ছেলে বিস্ময়সূচক মনোবেদনা প্রকাশ করে বলেছিল: বাবার কি আশ্চর্য মৃত্যু, যেমনি এক মদের গ্লাস শেষ, অমনি তার ইন্তিকাল। এটাই হলো কার্যকারণের মধ্যে সময়ের ব্যবধান না থাকার এক সহজবোধ্য উদাহরণ।

মিলের মত অনুসারে: কার্য ও কারণের সম্বন্ধ ঘড়ির কাঁটায় মাপকাঠি দিয়ে মেপে-জোঁকে দেখা প্রয়োজন। কারণ যদি এসে হাজির হয় ১৯৬৫ সালের ২৯শে জুলাই সোমবার ঠিক সাড়ে বারোটায়, তাহলে কার্য বেচারীকে তার ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক—ঠিক তখনই এসে হাজির হতে হবে। কার্য-কারণের ধর্মাধিকরণে যেই সমন জারি অমনি হাকিমের রায়; উকিলের সাফাই গাওয়া, সাক্ষীর কাঠগড়ায় হাজির হওয়া, নূতন তারিখের জন্য হুজুরের কাছে আবেদন পত্র দাখিল করা—এ সবই নাকচ।

আরিষ্টটলের কারণ-বিভাগ

ন্যায়দর্শনে কারণকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছেঃ যে উপাদান না হলে মাটির ঘট হয় না তা তার সমবায়ী কারণ ; অনেকে একে উপাদান কারণও বলে থাকেন। যে কর্তার সাহায্যে ঘটের সৃষ্টি, সে কুমোর নিমিত্ত কারণ। নিমিত্ত কারণ যে সমস্ত যন্ত্রপাতির সাহায্যে কার্য উৎপাদন করে, তার নাম অসমবায়ী কারণ।

ন্যায়দর্শনের এই কারণ-বিভাগ আরিষ্টটলের কারণ-বিভাগকে মনে করিয়ে দেয়। আরিষ্টটল বস্তুর চার রকম কারণ স্বীকার করেছেন। তিনি অনেকটা ন্যায়দর্শনের মতোই বস্তুর নির্মাতাকে নিমিত্ত কারণ ও বস্তু যে উপাদানে নির্মিত তাকে উপাদান কারণ বলেছেন।

ন্যায়দর্শনের অসমবায়ী কারণ আরিষ্টটল স্বীকার করেন না, তার পরিবর্তে তিনি আরো দু'টি কারণ মেনেছেন। তাদের নাম আকারী কারণ ও প্রয়োজন কারণ। আমরা যখন একটি দালান তৈরী করি, তখন রাজমিস্ত্রী হলো তার নিমিত্ত কারণ, ইঁট, চুন, সুরকি তার উপাদান কারণ। ইঞ্জিনিয়ার বাড়ী তৈরীর আগে যে প্ল্যান করে রেখেছেন, তা হলো দালানের আকারী কারণ। আর দালান তৈরী আমরা বিনা প্রয়োজনে করি না। দালানটি তৈরী হলে তাতে আমরা বাস করতে পারব, অথবা ভাড়া দিয়ে বেশ কিছুটা টাকা পাব, এ জাতীয় প্রয়োজন থেকেই দালান তৈরী হয়ে থাকে ; সুতরাং এ প্রয়োজন-বোধও দালান তৈরীর আর একটি কারণ।

অসৎকার্যবাদ ও আরম্ভবাদ

কার্য ও কারণের সম্বন্ধ নিয়ে ভারতীয় দর্শনে নানা রকমের বাদানুবাদ দেখা যায়। কারণের অতিরিক্ত কার্যের কোন সত্তা আছে কি-না, এই প্রশ্নের সমাধান নিয়েই এইসব বাদানুবাদ। নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকগণ বলেনঃ কার্যের সত্তা কারণ হতে নিশ্চয়ই স্বতন্ত্র, তা না'হলে কার্যের উৎপত্তিরই কোন অর্থ হয় না। ঘট যদি উৎপত্তির আগেই তার উপাদান কারণ মাটিতে থাকে, তাহলে মাটি থেকে ঘটের উৎপত্তিটাই একটা আজগুবী কথা হয়ে দাঁড়ায়। আবার মাটির ভিতর যদি ঘট আগে থেকেই থাকে তাহলে মাটির ভিতর থেকে ঘট তৈরীর জন্য যে সমস্ত চেষ্টা আমরা করি, ন্যায়দর্শনের পারিভাষিক ভাষায় যার নাম কারণ-ব্যাপার, তা সবই নিরর্থক হয়ে যায়। মাটির ভিতর ঘট থাকলে, ঘট তৈরীর জন্য কুমোরের এত চেষ্টা সত্যিই কি প্রহসন নয়? অতএব ঘটের সত্তা ও তার উপাদান কারণ মাটির সত্তা স্বতন্ত্র। এ-মতের দু'টো পারিভাষিক নামঃ

অসৎকার্যবাদ ও আরম্ভবাদ। কার্য কারণে আগে থেকে নেই, উৎপত্তির আগে কার্য সত্তাহীন বা অসৎ, তাই এমতের নাম অসৎকার্যবাদ। কার্য উৎপত্তির আগে উপাদান কারণে না থাকায়, উৎপত্তি থেকেই কার্যের সত্তার আরম্ভ, শুরু বা সূচনা। এই অর্থে এ মতের নাম আরম্ভবাদ।

ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের অসৎকার্যবাদ বা আরম্ভবাদ সাম্প্রতিক য়ুরোপীয় দর্শনের অভিনব-উৎপত্তিবাদ বা ইমারজেন্স থিওরীরই নামান্তর। অভিনব-উৎপত্তিবাদের সমর্থকরা কেউ কেউ কার্যমাত্রকেই কারণ থেকে স্বতন্ত্র বলে স্বীকার করেছেন। আবার তাঁদের কেউ কেউ প্রকৃতির বিবর্তনে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ কার্যকে অভিনব বলে মত প্রকাশ করেছেন, যেমন নিষ্প্রাণ জড় থেকে প্রাণবান পদার্থের সৃষ্টি, প্রাণবান পদার্থ থেকে ভাবনাশীল মনের সৃষ্টি।

সৎকার্যবাদ

সাংখ্যদর্শন ন্যায়-বৈশেষিকের সৎকার্যবাদ বা আরম্ভবাদ স্বীকার করেন না। এঁরা চলতি লাতিন প্রবাদ অনুসারে শূন্য থেকে শূন্যের, 'কিছু না' থেকে 'কিছু না'র উৎপত্তি স্বীকার করেন। তাঁরা বলেন: কার্য যদি কারণের আগে থেকে না থাকে, তাহলে কারণ থেকে কার্যের উৎপত্তি অসম্ভব। কার্য আগে থেকে কারণে আছে বলেই কারণ কার্যের নিয়ত-পূর্ববর্তী হয়। কার্য যদি কারণে না থাকে, তাহলে যে-কোন কারণ থেকে যে-কোন কার্যের উৎপত্তি হতে পারে। কিন্তু আমাদের সহজ অভিজ্ঞতার রায় ঠিক এর উল্টো। আমরা আমাদের সহজ অভিজ্ঞতায় দুধ থেকে দৈ-এর আর সর্ষের বীজ থেকে সর্ষের তৈল উৎপন্ন হতে দেখি। রাস্তার বালি থেকে আমরা দৈ তৈরী করতে পারি না, তেঁতুলের বীজ থেকেও সর্ষের তৈল তৈরী করতে পারি না। এর কারণ কি? এর কারণ দুধের ভিতর আগে থেকেই দৈ রয়েছে, সর্ষের বীজের ভিতর রয়েছে তৈল।

অসৎকার্যবাদ বা আরম্ভবাদ যদি আমরা স্বীকার করি, তাহলে কার্যকারণ নিয়মই নস্যাৎ হয়ে যায়। কার্য যদি কারণে আগে থেকে না থাকে, তাহলে কার্যের না থাকাটা সব কারণেই সমভাবে প্রযোজ্য। তাহলে দৈ যেমন দুধে নাই, তেমনি বালুতেও নাই, গাছ-পাথরেও নাই। কাজেই এ নিয়ম অনুসারে দুধ থেকে যেমন দৈ-এর উৎপত্তি সম্ভব, তেমনি বালু, গাছ ও পাথর থেকেও তার উৎপত্তি সম্ভব। এ মতে সর্ষের বীজে যেমন সর্ষের তেল নাই, ঠিক সে রকমই বালু, গাছ ও পাথরেও সর্ষের তেল আগে থেকে নাই। সুতরাং শুধু সর্ষের বীজ থেকেই নয়, বালু, গাছ, পাথর ইত্যাদি থেকেও সর্ষের তেলের উৎপত্তি হতে পারে। এভাবে যদি কার্য উৎপত্তি একটা সহজ ব্যাপার হতো, তাহলে

সংসারে মানুষের আর অভাব বলে কিছু থাকত না। আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপের মতো সব জিনিস থেকেই সব জিনিস উৎপন্ন করা যেত। কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতা এর ঠিক বিপরীত। কার্যকারণ নিয়মে এমন ভেল্কিবাজির কোন স্থান নাই। তার স্বভাব অবাধ স্বাতন্ত্র্য নয়, পূর্ণ বাধ্যবাধকতা।

কার্য-কারণ নিয়মের এই সীমাবদ্ধতা, অর্থাৎ বিশেষ কারণ হতে বিশেষ কার্যের উৎপত্তি, তাদের অভিনব-উৎপত্তিবাদের সাহায্যে নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকগণ ব্যাখ্যা করতে অক্ষম হয়ে বলছেন: কারণে কার্য আগে থেকে নাই বটে, তথাপি কারণে কোন 'অতিশয়' অর্থাৎ অতিরিক্ত কোন গুণ আছে যার জন্য সেই কারণ থেকে তার অনুরূপ কার্যের উৎপত্তি। মাটিতে ঘট উৎপত্তির যে যোগ্যতা আর সর্ষেতে তেল উৎপত্তির যে যোগ্যতা তারই নাম অতিশয়। শঙ্করাচার্য ন্যায় বৈশেষিক দর্শনের অসৎকার্যবাদ খণ্ডন প্রসঙ্গে ঠিকই বলেছেন: কারণে কার্য নাই, কিন্তু কার্য-উৎপত্তির উপযোগী একটি বিশেষ ধর্ম আছে, এ কথা বলাও যা, আর কারণে কার্য আগে থেকে আছে একথা বলাও ঠিক তাই। শুধু ভাষারই তফাত, বস্তু-সত্তায় কিছু তফাত নাই। ন্যায় বৈশেষিকদের 'অতিশয়' কারণে কার্যের সত্তারই নামান্তর।

সৎকার্যবাদীদের বিরুদ্ধে নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকগণ বলেছেন: কার্য যদি কারণে আগে থাকে তাহলে কার্য-উৎপত্তি একটা কথার কথা মাত্র, আর তাহলে কার্য-উৎপত্তির চেষ্টাও নিরর্থক। যেমন, ঢাকা শহরের অভিজাত ব্যক্তিদের বাসস্থান ইস্কাটন ও ধানমণ্ডীর সুন্দর সুন্দর দালানগুলো যদি আগে থেকে ইঁট, সুরকির ভিতরে লুকানো থাকে তবে তাদের তৈরীর জন্যে জমি সংগ্রহ, প্ল্যান তৈরী করা, হাউস বিল্ডিং ফিন্যান্স কর্পোরেশন থেকে দেনা নেয়া ও ইঞ্জিনিয়ারের তত্ত্বাবধানে রাজমিস্ত্রী ও মজুর খাটানো ত নিরর্থক। এ প্রশ্নের উত্তরে সৎকার্য-বাদের সমর্থকরা বলেন: কার্য কারণে সুপ্ত বা অব্যক্তভাবেই আছে, ব্যক্ত বা প্রকাশিতভাবে নাই। কাজেই অব্যক্তের ব্যক্তেতে, আর সুপ্তের প্রকাশিততে রূপান্তরের জন্যেই কারণ ব্যাপারের প্রয়োজন। সেজন্যেই মনে রাখতে হবে, ভাগ্যবান বড়লোকদের বড় বড় বাড়ী—যার চাকচিক্য গরীব লোকের চোখে ধাঁধা লাগিয়ে দেয়, ইঁট, চুন, সুরকির ভিতর লুকানো থাকলেও, তাকে তার বাহ্য ও ব্যক্ত রূপ দেয়ার জন্যে এতসব চেষ্টার প্রয়োজন। এখানেই ভাগ্যবানদের ভাগ্যের সীমারেখা।

এই সৎকার্যবাদের আর এক নাম পরিণামবাদ বা পরিবর্তনবাদ। এ মতে কারণের ভিতর কার্যের যে সূক্ষ্ম সত্তা, তাই কার্যের আকারে স্থূল রূপ নেয়।

তাই দুধের ভিতর দৈ থাকলেও তাকে দৈ-এর আকারে রূপান্তরিত করার, সর্ষের ভিতর তেল থাকলেও তাকে তেলে রূপান্তরিত করার জন্যে চেষ্টার প্রয়োজন।

বিবর্তবাদ

শঙ্করের অদ্বৈত-বেদান্তের মতে কার্য কারণের পরিণাম বা পরিবর্তিত অবস্থা নয়, তা তার বিবর্ত বা পরিবর্তনের আভাস মাত্র। দৈ দুধের আকারে পরিবর্তিত হয়, এর নাম পরিণাম বা সত্যিকার পরিবর্তন। আর ভ্রম জ্ঞানে দড়ি সাপের আকারে পরিবর্তিত হয়, এটা সত্যিকার পরিবর্তন নয়, পরিবর্তনের আভাস মাত্র। এরই নাম বিবর্ত। অদ্বৈত বেদান্তীরা বলেন : কার্য যখন আগে থেকেই কারণে আছে, তখন কারণের অতিরিক্ত কার্যের কোন সত্তা নাই। অতএব কার্যের উৎপত্তি, কারণের কার্যে পরিবর্তনের আভাসমাত্র, কারণের সত্যিকার রূপান্তর বা পরিণাম নয়। দড়িকে জানলে যেমন তা থেকে যে সাপের উৎপত্তি, তা দড়ির ভিতর হারিয়ে যায়, তেমনি এই বিশ্ব-জগতের আসল কারণ যে ব্রহ্ম বা সর্বব্যাপী চেতন সত্তা, তাকে জানলে এ বিশ্বজগৎও সেই ব্যাপক সত্তায় বিলীন হয়ে যায়। সুতরাং কার্য কারণের পরিণাম বা সত্যিকার রূপান্তর নয়, তা তার বিবর্ত বা পরিবর্তনের আভাস মাত্র। এ মতে যখন কারণের সত্তাই স্বীকার্য, কার্যের সত্তা অস্বীকার্য, অর্থাৎ এ মতে যখন আসলে কারণই আছে, কার্য নাই, তাই এ মতের আর এক নাম সৎকারণবাদ।

চলতি বাংলায় সৎ ও অসতের যে অর্থ, সেই অনুসারে সৎকার্যবাদ ও অসৎকার্যবাদের অর্থ যদি আমরা স্থির করি, তাহলে এ বৈজ্ঞানিক যুগে সৎকার্যবাদেরই পরাভব আর অসৎকার্যবাদেরই বিজয়-বৈজয়ন্তী। বিপদে না পড়লে বা কোন বিশেষ মতলব না থাকলে আজকের দিনের জটিল জীবনে কেউ সৎকাজ বা ভালো কাজ করতে সচরাচর অগ্রসর হয় না, এ কথা বললে হয়তো সত্যের অপলাপ হবে না। যাই হোক, বর্তমান প্রসঙ্গে সৎ মানে, যা আছে, আর অসৎ মানে, যা নাই। এই অর্থেই সৎকার্যবাদ ও অসৎকার্যবাদ এই দুই দার্শনিক পরিভাষার কার্য-কারণ বিশ্লেষণে প্রয়োগ।

ক্যাণ্টের কার্য-কারণ সম্বন্ধ

অদ্বৈত বেদান্তের জোরালো প্রচারের শুরু খ্রীস্টীয় অষ্টম শতকে, শঙ্করের সময়ে। তার হাজার বছর পরে, আঠারো শতকের শেষ-পর্বে, জার্মান দার্শনিক ক্যাণ্ট কার্য-কারণ সম্বন্ধের বিশ্লেষণে যে মত গড়ে তুলেছেন, তার সঙ্গে অদ্বৈত-বেদান্তের বিবর্তবাদের বেশ কিছুটা মিল দেখা যায়। নানা যুক্তি দিয়ে ক্যাণ্ট

দেখিয়েছেন : কার্য-কারণ-সম্বন্ধে জগতের পেছনে যে তত্ত্ব তাতে নেই. সে তত্ত্বকে আমাদের বুদ্ধির সাহায্যে আমরা রূপান্তরিত করে যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ তৈরী করেছি, কার্য-কারণ-সম্বন্ধ তারই এক অপরিহার্য উপাদান। এই কার্য-কারণ-সম্বন্ধ আমাদের বুদ্ধিরই এক কাঠামো, যার সাহায্যে বাইরের দুনিয়া থেকে আমাদের ইন্দ্রিয়ের কাছে যে সব উত্তেজক এসে হাজির হয় তাদের পূর্বাপর পারম্পর্য অনুসারে আমরা কার্য-কারণ-সম্বন্ধ নির্ণয় করি। যেহেতু কার্য-কারণ-সম্বন্ধ আমাদের বুদ্ধিরই একটি কাঠামো, সেই জন্যে আমাদের বুদ্ধি-পরিমার্জিত ইন্দ্রিয়ানুভূতির বাইরে তত্ত্ব-সত্তায় কার্য-কারণ সম্বন্ধের প্রয়োগ অযৌক্তিক ও অপ্রাসঙ্গিক। সুতরাং তত্ত্ব কার্য-কারণ-সম্বন্ধ বহির্ভূত।

বৌদ্ধদর্শনে কার্য-কারণ-প্রবাহ

বৌদ্ধ দর্শন কারণ থেকে কার্যের উৎপত্তি স্বীকার করে না। আগেই বলেছি, বৌদ্ধদের মতে জগতে স্থির বস্তু বলে কিছু নাই ; যা কিছু আছে সব ক্ষণিক, মুহূর্তকাল স্থায়ী। কাজেই যাকে আমরা কারণ বলি, আর যাকে আমরা কার্য বলি উভয়ের সত্তা ক্ষণিক। স্থিতি ছাড়া উৎপত্তি হতে পারে না, তাই কারণ থেকে কার্য উৎপন্ন হয়—এ কথা বলা ভুল, আসলে কারণ কার্যের পূর্বভাবী, আর কার্য কারণের পরভাবী। তথাপি কার্য-কারণের সম্বন্ধ অনিবার্য ও অবশ্য-ম্ভাবী। আর সারা বিশ্ব এ ক্ষণিক কার্য-কারণ-প্রবাহ ছাড়া আর কিছু নয়। এ প্রভাবের মূল কারণ অবিদ্যা। অবিদ্যাকে কার্য-কারণ-প্রবাহের আদি ধরে নিয়ে বৌদ্ধ দার্শনিকরা মানুষের জন্মমৃত্যু-প্রবাহকে তার নির্বাণ পর্যন্ত একটি অবিচ্ছিন্ন ধারার ভিতর ফেলেছেন। কার্য-কারণের এই অবিচ্ছিন্ন ক্ষণিক-প্রবাহের স্বীকৃতিকে বৌদ্ধ দর্শনে নাম দেওয়া হয়েছে পটিচ্চ সমুপ্পাদ, যার সংস্কৃত নাম প্রতীত্য-সমুৎপাদ। এর মূল কথা- কার্যকারণের অবিচ্ছিন্ন-প্রবাহে পূর্ববর্তীকে অবলম্বন করেই পরবর্তীর উৎপত্তি। কারণ থেকে কার্যের উৎপত্তি স্বীকার না করেও বৌদ্ধরা এইভাবে কার্য-কারণ নিয়মের অবশ্যম্ভাবিতা মেনে নিয়েছেন।

গাজ্জালী ও হিউমের সম্ভাব্যতাবাদ

এগার শতকের মুসলিম দার্শনিক ইমাম গাজ্জালী কার্য-কারণ নিয়মের এক নতুন মত প্রচার করেন। তিনি বলেন : কারণ কার্য উৎপন্ন করে না, কার্য কারণের শুধু পরবর্তী মাত্র। কার্য-কারণ সম্বন্ধ শুধু পূর্ববর্তী-পরবর্তীর সম্বন্ধ মাত্র। তাই পূর্ববর্তী কারণ যে পরবর্তী কার্য উৎপন্ন করে, এই চলতি ধারণা একান্ত অবাস্তব ও অযৌক্তিক। শুধু যে কারণ কার্য উৎপন্ন করে না তা নয়,

কারণের পর যে কার্য এসে হাজির হবেই, এমন কথাও হলফ করে বলা যায় না। কারণের পর কার্য আসতেও পারে, নাও আসতে পারে। সুতরাং কারণের পূর্ববর্তিতা আর কার্যের পরবর্তিতায় কোন নিশ্চয়তা নাই। কার্য-কারণের সম্বন্ধ তাই নিশ্চয়াত্মক নয়, সম্ভাবনামূলক।

আঠারো শতকের সংশয়বাদী দার্শনিক ডেভিড হিউম কার্য-কারণ-সম্বন্ধের বিশ্লেষণে মোটামুটি গাজ্জালীর মতেরই পুনরাবৃত্তি করেছেন। হিউম বলেন : কারণ ও কার্যের ভিতর কোন অপরিহার্য যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যায় না। কার্য-কারণের সম্পর্ক কালিক, আগে কারণ, তারপর কার্য। বার বার এই কালিক সম্বন্ধের পুনরাবৃত্তি দেখে আমরা বলি, কারণ থাকলেই কার্য থাকবে। কিন্তু এতে কোন নিশ্চয়তা বা বাধ্যবাধকতা নাই। বার বার পানি খাবার পর পিপাসা নিবৃত্তি অনুভব করে আমরা মনে করি এ দু'য়ের ভিতরে কোন অনিবার্য ও অবিচ্ছিন্ন যোগ আছে। কিন্তু আসলে তা নয়, আসলে বার বার পানি খেয়ে পিপাসা নিবৃত্তি অনুভবের পর আমাদের একটা বদ্ধমূল সংস্কার হয়েছে যে, পানি খেলেই পিপাসার নিবৃত্তি হবে। কিন্তু এ নিশ্চয়তার ভিত্তি আমাদের মনে, বাইরের জগতে নয়। রোজ সকালে সূর্য পূর্ব দিকে উঠছে দেখে আমরা ধরে নিতে পারি যে, সূর্য সব সময়ে পূর্ব দিকে উঠবে। কিন্তু এ কথা আমরা কি করে বলি যে, হঠাৎ একদিন সূর্যমামা পশ্চিম দিকে উঠে' আমাদের চমকে দেবেন না?

আমরা মনে করি প্রকৃতিতে নিয়মের রাজত্ব। তাই কার্য-কারণের সম্বন্ধ অপরিবর্তনশীল। কিন্তু প্রকৃতির এই নিয়মানুবর্তিতায় বিশ্বাস অভিজ্ঞতার ফলেই আমাদের মনে শিকড় গজিয়েছে। বাস্তব জগতে এ নিয়মের অনিবার্যতার সপক্ষে কোন অকাট্য যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায় না। কাজেই হিউমের মতে, কার্য-কারণ-সম্বন্ধের অনিবার্যতায় বিশ্বাস আমাদের অভিজ্ঞতা-লব্ধ একটি মানসিক প্রবৃত্তি ছাড়া আর কিছু নয়।

এমন একদিন ছিলো'যখন কার্য কারণের সম্বন্ধে অনিবার্যতা স্বীকার করেই বিজ্ঞানের বিজয়-অভিযান। আর আজকের দিনের পদার্থবিদ্যায় কার্য-কারণ-সম্বন্ধের অনিবার্যতায় অনাস্থাই বেশ কিছুটা প্রকট। আজকের দিনের কোয়ান্টাম ফিজিক্সের মতে, জড়-বস্তুর বিশ্লেষণে এমন কতকগুলো পরিবর্তন দেখতে পাওয়া যায়, যার উৎপত্তির কারণ গণিতের হারে নির্ণয় করা যায় না। কাজেই এসব পরিবর্তনের কোন নিশ্চিত কারণ খুঁজেই পাওয়া যায় না। আজকের দিনের বিজ্ঞানে কার্য-কারণ নিয়মের প্রতি অনাস্থায় উদ্বুদ্ধ হয়েই বার্ট্রেও রাসেল বলেছেন : কার্য-কারণ-সম্বন্ধের অনিবার্যতা স্বীকার না করে কারণের পূর্ববর্তিতা ও কার্যের

পরবর্তিতা আমাদের মেনে নিতে হবে। কার্য-কারণ-সম্বন্ধ তাই আজ আমরা ঠিক করি নিশ্চয়তার ভিত্তিতে নয়, আমাদের অভিজ্ঞতার হার সংখ্যা-বিজ্ঞানের মাধ্যমে নির্ণয় ক'রে। এ নিয়মে পঞ্চাশ জনের বেলায় যদি দেখা যায় কুইনাইন খেলে ম্যালেরিয়া সারে, আর পাঁচ জনের বেলায় সারে না, তাহলে বুঝতে হবে কুইনাইনই মোটামুটি ম্যালেরিয়া সারার কারণ। এইভাবে কার্য-কারণ-সম্বন্ধের নিশ্চয়তার বদলে কার্য-কারণের সম্ভাব্যতা স্বীকার করে তাদের বোঝার চেষ্টা করাই কার্য-কারণের বিজ্ঞানসম্মত সাম্প্রতিক মত।

সম্ভাব্যতাবাদের শিক্ষা

যাই হোক, কার্য-কারণের ভিতর যদি কোন অনিবার্য যোগসূত্র আমরা খুঁজে না পাই, তাহলে জগতের স্বভাব সম্বন্ধে আর কিছু জোর করে বলার জো নাই। আমরা জগতের সম্বন্ধে অতি অল্প যা জানি, তার সাহায্যেই জগতের স্বভাব সম্বন্ধে দু'চারটা সম্ভাব্য সিদ্ধান্ত সাময়িকভাবে গ্রহণ করতে পারি মাত্র। এর বেশী জোর করে আমাদের কিছু বলার নেই। পুরানো দম্ভের পরিবর্তে বিজ্ঞান তাই এক্ষেত্রে আমাদের শিক্ষা দিচ্ছে বিনয়, অজ্ঞতার আস্ফালনের পরিবর্তে সীমাবদ্ধ জ্ঞানের সতর্ক পদক্ষেপ, অন্ধবিশ্বাসের যান্ত্রিকতার পরিবর্তে বিচার-শীলতার স্বাতন্ত্র্যবোধ, তথাকথিত নিরপেক্ষ-জ্ঞানজ উগ্রতার পরিবর্তে সাপেক্ষ-জ্ঞানজনিত পারস্পরিক সমঝোতা ও মানবতাবোধ।

সপ্তম অধ্যায়

ভাববাদ ও বাস্তববাদ

জ্ঞানের সঙ্গে তার বিষয়ের সম্বন্ধ নিয়ে আলোচনা দর্শনশাস্ত্রে অতি প্রাচীন কাল থেকেই দেখা যায়। খ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে প্লেটো-দর্শনে এ আলোচনার প্রচুর ইঙ্গিত। প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারতীয় দর্শনে, রেনেসাঁস-পূর্ব মুসলিম দর্শনে, আধুনিক য়ুরোপীয় দর্শনে এ সমস্যার নানাভাবে আলোচনা ও সমাধানের নানা চেষ্টা।

জ্ঞানের ও তার বিষয়ের সম্বন্ধ আলোচনা করতে গিয়ে অনেক দার্শনিক বিষয়ের জ্ঞানাতীত সত্তা নাই, এ কথা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। তাঁদের মতে বস্তুর জ্ঞানেই তার সত্তা। এ মতেরই চল্‌তি নাম ভাববাদ। আর একদল দার্শনিক আছেন, যাঁরা মনে করেন, আমরা যে বস্তুকে জানি তার জ্ঞানাতীত নিজস্ব সত্তা নিশ্চয়ই আছে। এ মতের নাম বাস্তববাদ বা বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদ। ইংরেজীতে ভাববাদের নাম 'আইডিয়ালিজম্', আর বাস্তববাদের নাম 'রিয়্যালিজম্'। ইংরেজী 'রিয়্যাল' কথার অর্থ বাস্তব, আর 'আইডিয়্যাল' কথার অর্থ অবাস্তব। কাজেই আইডিয়ালিজমের শেষ কথা জ্ঞানের বিষয়ের বাস্তব সত্তা অস্বীকার, আর রিয়্যালিজমের মূল কথা বস্তুরই স্বতন্ত্র স্বাধীন সত্তার স্বীকৃতি।

ভারতীয় দর্শনে বাস্তববাদের বেশ কিছুটা প্রাধান্য। ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য-যোগ, মীমাংসা ইত্যাদি দর্শনে বাস্তববাদের প্রচুর স্বীকৃতি। শুধু বৌদ্ধ দর্শন ও বেদান্ত দর্শনে ভাববাদের প্রতি বেশ কিছুটা পক্ষপাত।

বৌদ্ধদর্শনে ভাববাদ

বৌদ্ধদর্শনে ভাববাদ বিজ্ঞানবাদ নামে প্রচলিত। বৌদ্ধেরা মনের ভাবনাকে বিজ্ঞান আখ্যা দিয়েছেন। এ মতের বড় প্রবক্তা খ্রীস্টীয় চতুর্থ শতকের প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ দার্শনিক অসঙ্গ ও তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা বসুবন্ধু। বসুবন্ধুর শিষ্য দিঙনাগ (৪২৫ খ্রীঃ) ও ধর্মকীর্তি (৬০০ খ্রীঃ) এই বিজ্ঞানবাদেরই বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছেন।

এই বিজ্ঞানবাদীরা বলেন: জ্ঞান ছাড়া বিষয়ের সত্তা আমরা খুঁজে পাই না। যেমন, নীলের জ্ঞান ছাড়া নীলের সত্তার সঙ্গে আমাদের পরিচয় অসম্ভব। জ্ঞানের সঙ্গে বিষয়ের এই সম্বন্ধকে বৌদ্ধ দার্শনিকরা নাম দিয়েছেন সহ উপলম্ভ। এই সহ-উপলম্ভ থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, বস্তুর জ্ঞানের অতিরিক্ত সত্তা নাই। বৌদ্ধদর্শনের ভাষায় বস্তুর সত্তা তাই বিজ্ঞানেই পর্যবসিত।

বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদীদের মতে, জ্ঞানের বিষয়ের বাহ্য সত্তায় আমাদের যে সহজাত বিশ্বাস, তা ভ্রান্তিজ্ঞান, আমরা মনে করি, ঘটকে যখন আমরা জানি, তখন ঘটের জ্ঞান আমাদের মনে থাকে, আর ঘট থাকে বাইরের জগতে। কিন্তু বিজ্ঞানবাদীরা বলেন : ঘটকে আমরা যখন কখনো তার জ্ঞান ছাড়া ধরতে ছুঁতে পারি না', তখন ঘট ঘটের জ্ঞান ছাড়া আর কিছুই নয়। এখানে প্রশ্ন হতে পারে : ঘট যদি আমাদের জ্ঞান ছাড়া আর কিছুই না হয়, তাহলে আমরা যখন ঘটকে জানি না তখন ঘট থাকে কোথায়? আর ঘট যদি শুধু আমাদের জানার সময় থাকে, আর যখন আমরা জানি না তখন থাকে না, তাহলে বলতে হবে : আমরা যখন ঘটকে জানি, তখনই আমরা ঘট সৃষ্টি করি। এ মত মানলে বলতে হয় : দুনিয়ায় অসংখ্য বস্তুকে যখন আমরা জানি, তখন আমরা তাদের হঠাৎ সৃষ্টি করে ফেলি, আর যখন আমরা তাদের জানি না, তখন তারা তড়িৎগতিতে ধ্বংস হয়ে যায়। জ্ঞানের সঙ্গে বস্তুর সম্বন্ধ এভাবে কল্পনা করা নেহাত ভেল্কিবাজি ছাড়া আর কিছুই নয়।

বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধেরা এ আপত্তির কথা নিশ্চয়ই জানতেন, তাই তাঁরা জ্ঞানকে ভেল্কিবাজিতে রূপান্তরিত করেন নি। বিষয়ের জ্ঞানাতীত সত্তা না মানলেও এ অসঙ্গতির কথা তাঁরা জানতেন, তাই তাঁরা এর একটা সদুত্তরও আবিষ্কার করার চেষ্টা করেছেন। মনের অতীত বিরাট বিশ্বজগতের পরিবর্তে বৌদ্ধ দার্শনিকরা এক বিরাট জ্ঞান-সমুদ্রের সত্তা কল্পনা করেছেন। তাঁরা মনে করেন, সেই জ্ঞান-সমুদ্র থেকেই যতো ছোটখাট জ্ঞান—যেমন গাছ, পাথর, জন্তু, জানোয়ার, ঘরবাড়ীর জ্ঞান—আমাদের মনে এসে হাজির হয়। তাই ঘটকে যখন আমরা জানি না, তখন ঘটের জ্ঞান সেই জ্ঞান সমুদ্রে মিশে যায়, আর আমরা ঘটকে যখন জানি তখন ঘটের জ্ঞান সেই বিরাট মহাসমুদ্রের এক ছোট ঢেউ-এর মতো আমাদের মনের দুয়ারে এসে আঘাত করে। বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধরা এই বিরাট জ্ঞান-সমুদ্রের নাম দিয়েছেন 'আলয় বিজ্ঞান', আর তা থেকে উদ্ভূত আমাদের ছোট ছোট জ্ঞানের নাম দিয়েছেন, 'প্রবৃত্তি বিজ্ঞান'।

আধুনিক পাশ্চাত্ত্য দর্শনে বিশপ বার্কলে আঠারো শতকের প্রথম ভাগে ভাববাদের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তার সঙ্গে বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদের বেশ কিছুটা মিল আছে—আমরা যথাস্থানে এ মতের আলোচনা করবো।

বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদ ও ক্ষণিকবাদ

বৌদ্ধদের বিজ্ঞানবাদের মূলে তাঁদের ক্ষণিকবাদের প্রচুর প্রভাব। আগেই বলেছি, বৌদ্ধ দার্শনিকরা একবাক্যে বলেছেন : স্থির শাশ্বত কোন সত্তা নাই,

যা কিছু আছে তা ক্ষণিক। তাই যে মুহূর্তে বস্তুর উৎপত্তি, সেই মুহূর্তেই তার বিনাশ। বৌদ্ধদের এই মতের সঙ্গে বাইরের জগতের বস্তুসত্তার বেশ গরমিল। বাইরের জগতের বস্তুগুলো—টেবিল, চেয়ার, গাছ, পাথর, ঘর-বাড়ী সবই—পরিবর্তনশীল হলেও তাদের একটা মোটামুটি স্থির সত্তা আছে। আমাদের মনোজগতের অবস্থা ঠিক তার উল্টো। মনের চিন্তা-প্রবাহ অত্যন্ত ক্ষণিক, তার স্থির সত্তা বলে কিছু নাই। তাই বৌদ্ধ ক্ষণিকবাদের সঙ্গে চিন্তা-প্রবাহের সত্তারই সামঞ্জস্য অধিকতর। এইজন্যই বোধ হয় বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদে বস্তুর স্বতন্ত্র সত্তা উপেক্ষিত।

বৌদ্ধদের ক্ষণিকবাদ ও বিজ্ঞানবাদ উভয়েরই আদি উৎস বুদ্ধের প্রচারিত জীবন-দর্শন। সে জীবন-দর্শনের মূলকথা : বাসনার নিবৃত্তিতেই নির্বাণ বা পরম শান্তি। এই বাসনা নিবৃত্তির জন্যে বস্তুর প্রতি আকর্ষণ ত্যাগ অপরিহার্য। তাই বৌদ্ধ দর্শনে বস্তুর ক্ষণিকত্বের ভিতরই তার প্রতি আসক্তি ত্যাগের এক সার্থক ইঙ্গিত। জগতে যখন কোন স্থির পদার্থ নেই, স্ত্রী, পুত্র, পরিবার, ধনদৌলত সবই যখন ক্ষণিক, তখন তাদের প্রতি আসক্তি রাখা নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কিছু নয়। এইভাবে উদ্বুদ্ধ হয়েই বুদ্ধের অনুগামীরা পরবর্তীকালে বুদ্ধ-প্রচারিত সংসারের অনিত্যতাকে তার ক্ষণিক সত্তায় রূপান্তরিত করেছিলেন। আর এই বৈরাগ্যমূলক মনোবৃত্তি থেকেই তাঁরা ক্ষণিকবাদকে আরেক ধাপ এগিয়ে বিজ্ঞানবাদে রূপান্তরিত করেছেন। মীমাংসা-আচার্য কুমারিল ভট্ট বিজ্ঞানবাদের সমালোচনায় ঠিকই বলেছেন : "বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদীরা বৈরাগ্য অভ্যাসের জন্যই বাহ্যবস্তুর সত্তাই অস্বীকার করেছেন। বাহ্যবস্তু বলে যদি কিছু না-ই থাকে, তাহলে তার প্রতি আসক্তি বা আকর্ষণের প্রশ্নই ওঠে না।"

বৌদ্ধ দার্শনিকদের ভিতর যাঁরা বাস্তববাদী তাঁরা অবশ্যই বাহ্যবস্তুর ক্ষণিক সত্তা স্বীকার করেছেন। বিজ্ঞানবাদীরা দেখাবার চেষ্টা করেছেন যে, বস্তু ক্ষণিক হলে তাকে জানাই যায় না। বস্তুর যে মুহূর্তে উৎপত্তি, সেই মুহূর্তেই যদি তার বিনাশ, তা হলে তাকে জানা যাবে কি করে? বস্তুকে জানতে গেলে অন্তত: মুহূর্তকাল তার স্থিতি প্রয়োজন। সুতরাং বাহ্যবস্তুর অস্তিত্ব যখন জানাই যায় না, তখন বাহ্যবস্তুর অস্তিত্ব মানাও যায় না। এইভাবেই বৌদ্ধ বাস্তববাদের বিজ্ঞানবাদে পরিণতি।

বাস্তববাদীদের দৃষ্টিকোণ থেকে বিজ্ঞানবাদের অনেক কঠোর সমালোচনা হয়েছে। শঙ্করাচার্য বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদের সমালোচনা করতে গিয়ে সহজ বাস্তববাদের দৃষ্টিকোণ থেকে বলেছেন : স্তম্ভ, ঘট, পট ইত্যাদি বিষয়ের সত্তা আমরা প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করি, তাই তাদের বাহ্য সত্তা অস্বীকার করা যায় না। তিনি রহস্য ক'রে আরো

বলেছেন, বাহ্য বিষয়ের সত্তাই যদি আমরা স্বীকার না করি, তাহলে আমরা খেয়েও বলতে পারি খাইনি, আর না খেয়েও বলতে পারি খেয়েছি। শঙ্করাচার্যের এ জাতীয় সমালোচনা বার্কলের উপর যে-সব বিদ্রূপ-বাণ সমালোচকরা নিক্ষেপ করেছেন, তা-ই মনে করিয়ে দেয়।

পাশ্চাত্ত্য দর্শনে ভাববাদ ও বাস্তববাদ

এবার পাশ্চাত্ত্য দর্শনে ভাববাদ ও বাস্তববাদের যে দ্বন্দ্ব ও পরিণতি, তার কথা সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক।

আধুনিক পাশ্চাত্ত্য দর্শনে সহজবুদ্ধির বাহ্য সত্তার বিশ্বাস থেকেই বাস্তববাদের সূচনা। সাধারণ মানুষেরা মনে করে যে, সহজবুদ্ধি নারী-পুরুষে সমভাবে বিদ্যমান। তাদের আরও ধারণা যে, আমাদের মনের বাইরে এক বিরাট বিশ্বজগৎ রয়েছে, আমরা সকলেই সেই জগতের বাসিন্দা। সেই জগতেই আমাদের জীবনের যত বেচা-কেনা, সুখ-দুঃখ, মিলন-বিরহ, বাদ-বিসম্বাদ ; আমাদের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যতসব ভাব-বিনিময়, তা আমাদের মনের বাইরের এই বিশ্বজগতেই। আমরা মনে করি, এই বাইরের জগতে আমরা যা কিছু দেখ্‌ছি, সবই আমাদের মনের বাইরে। আমরা ফুলের বাগানে যে ফুল দেখ্‌ছি, সব্‌জিবাগানে যে সব্‌জি দেখ্‌ছি, আর মাঠে যে ধান গাছ, সর্ষে গাছ ও অন্য শস্যের গাছ দেখ্‌ছি, তা'রা বাইরের জগতেই আছে—এটাই আমাদের বিশ্বাস। আমরা যদি মনে করতাম, ব্যাঙ্কের যা টাকা তা আমাদের মনের ভিতরেই আছে, তাহলে দুনিয়ার গরীব লোক কেউ থাকতো না। আমরা যদি মনে করতাম, ধান, চাল ও অন্যান্য খাবার জিনিস আমাদের মনের ভিতরেই আছে, তাহ'লে দুনিয়ায় খাদ্য-সমস্যা বলে কিছুই থাকতো না। আমাদের সহজ অভিজ্ঞতা এভাবেই আমাদের জানিয়ে দেয় যে, আমাদের মনের বাইরে বিরাট বিশ্বজগৎ, ঘর-বাড়ী, জন্তু-জানোয়ার, হরেক রকম জিনিস রয়েছে। শুধু তাই নয়। আমরা এটাও বিশ্বাস করি যে, আমরা যে বস্তুকে যেভাবে জানি, তার স্বভাবও ঠিক সে-রকমই। তাই কাঁঠালকে আমরা আম বলে ধরে নেই না, আর আমকেও কাঁঠাল বলে ধরে নেই না, বা চাউলকে পাথর বলে আর পাথরকে চাউল বলেও মনে করি না। আমাদের সহজাত বুদ্ধির রায় অনুসারে বস্তুর বাহ্য সত্তায় এই যে আমাদের বিশ্বাস, যার ভিত্তিতে আমাদের জীবনযাত্রা তারই নাম সহজ বাস্তববাদ। সাধারণ মানুষের এই সহজ বাস্তববাদে বিশ্বাসের ভিত্তিতে এই মতকে লৌকিক বাস্তববাদও বলা চলে।

কোন বিশেষ দার্শনিকের সঙ্গে এ মতের নিকট যোগ সাধারণতঃ খুঁজে পাওয়া যায় না। তবে কোনো কোনো দার্শনিক যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে এ মতের

সমর্থন করেছেন, তা অনস্বীকার্য। ন্যায়-দর্শনে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিশ্লেষণে এই সহজ বা লৌকিক বাস্তববাদেরই প্রতিধ্বনি। বাহ্যবস্তুর প্রত্যক্ষের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে নৈয়ায়িকরা বলেছেন: আমরা যখন ঘটকে প্রত্যক্ষ করি, তখন ঘটের সঙ্গে আমাদের ইন্দ্রিয়ের সংযোগ, আর আমাদের ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে আমাদের মনের সংযোগ, আর সবশেষে আমাদের মনের পেছনে যে জ্ঞাতা বা আত্মা তার সঙ্গে আমাদের মনের সংযোগ। এই হলো বাহ্যবস্তুর প্রত্যক্ষের ক্রমিক স্তর। বিশ শতকের বৃটিশ দার্শনিক আলেকজাণ্ডার বলেছেন: জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের সহ-অবস্থিতির নামই জ্ঞান। আমরা যখন গাছকে জানি, তখন আমাদের সঙ্গে গাছের যোগ অনেকটা গাছ ও তার তলার ঘাসের যোগের মতোই। সোজা কথায়, জ্ঞান ও বস্তুর মাঝখানে কোন ব্যবধান নাই, তাদের যোগ সাক্ষাৎ। এটাই সহজ বা লৌকিক বাস্তববাদের সারকথা।

সহজ বাস্তববাদ ও ভ্রমজ্ঞান

সহজ বা লৌকিক বাস্তববাদের উপর আমাদের ভ্রমজ্ঞান খুব জোরালো আঘাত হানে। ভ্রান্তি-জ্ঞান বলে কিছু না থাকলে হয়তো দার্শনিকরা সহজ বাস্তববাদে আস্থা মোটেই হারাতেন না। কিন্তু এই ভ্রান্তি-জ্ঞান সাধারণ মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের এক অতি পরিচিত ঘটনা। ঈষৎ অন্ধকারের ভিতর দড়িকে সাপ মনে ক'রে আমরা কত না ত্রস্ত ও আতঙ্কিত হই। ছোটবেলা পুকুরের পানিতে আঙ্গুল ডোবাবার পর আঙ্গুলগুলো ছোট হয়ে গেছে দেখে আমরা দৌড়ে গিয়ে মায়ের কাছে ভয়ত্রস্তভাবে সেকথা বলেছি, কত রং-কানা এক রংকে ভুল করে অন্য রং বলে দেখে। আর মরুভূমিতে কত তৃষ্ণার্ত পর্যটকের বালুকায় জল-ভ্রম, এরই নাম মরীচিকা! আর রাত্রিবেলা ঘুমের ঘোরে স্বপ্নলোকে আমাদের কত বিচিত্র অনুভূতি, কত ভয়-আবেগ-বিস্ময় কিন্তু চোখ মেলার সঙ্গে সঙ্গে সব নিখোঁজ, সব নিঃশেষ। কতদিন না ঘুমের ভিতর দেখেছি ভীষণ ভয়ঙ্কর বিষধর সাপ ফোঁস ফোঁস ক'রে এগিয়ে এসে গায়ে ছোঁ মারবার উপক্রম করেছে, আর আতঙ্কে চোখের পানিতে মাথার বালিশ ভিজে গেছে, হৃদয়ের স্পন্দনও দ্রুততর হয়েছে। কিন্তু যেই ঘুম ভাঙ্গা, অমনি সাপ, তার সোঁ সোঁ শব্দ সব হাওয়ায় বিলীন। কিন্তু হৃদয়ের দ্রুত স্পন্দন তখনও শেষ হয়নি, আর বালিশ ত ভেজাই। এই যে ভ্রম জ্ঞান, এই যে ভ্রান্ত প্রতীতি, তা-তো আমাদের জীবনের এক অতি-পরিচিত, প্রাত্যহিক ঘটনা। সহজ বাস্তববাদ যেমন বলে, বস্তু যদি সত্যিই আমরা তাকে যেমন জানি ঠিক সে রকমই হয়, তাহলে এই ভ্রম প্রতীতি কি ক'রে সম্ভব। এটাই হলো সহজ বা লৌকিক বাস্তববাদের বিরুদ্ধে প্রবল যুক্তি।

লকের আংশিক বাস্তববাদ

সতেরো শতকের ইংরেজ দার্শনিক জন্ লক সহজ লৌকিক বস্তুবাদকে তাই লেজামুড়ো বাদ দিয়ে মেনে নিয়েছেন। লক নিউটনেরই প্রায় সমসাময়িক। নিউটনের মতে, জড়বস্তু শূন্যস্থান জুড়ে থাকে অর্থাৎ শূন্যস্থান পরিপূরণই জড়বস্তুর এক বিশেষ ধর্ম। দেকার্তে এরই নাম দিয়েছেন বিস্তৃতি। যাই হোক, জড়বস্তুর যে সব ধর্ম তার বিস্তৃতি বা শূন্যস্থান পরিপূরণ করার সাথে জড়িত তারাই লকের মতে জড়বস্তুর আসল ধর্ম। জড়বস্তুর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, পরিমাপ ইত্যাদি যে সব গুণ তার বিস্তৃতির সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত, তারাই হলো তার মুখ্য গুণ। জড়বস্তুর এই মুখ্য গুণের প্রতীতি হয় একাধিক ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে। যেমন বস্তুর চেহারা, তার দৈর্ঘ্য-প্রস্থ, ইত্যাদি আমরা চোখ দিয়েও দেখি, আর স্পর্শ ক'রেও অনুভব করি। এই মুখ্য গুণ ছাড়াও বস্তুর আর কতকগুলো গুণ আছে, তার সঙ্গে তার বিস্তৃতির কোনও সাক্ষাৎ যোগ নাই। বস্তুর এইসব গুণ আমরা এক ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে প্রত্যক্ষ করি—যেমন তার রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ। লকের মতে, বস্তুর এইসব ধর্ম তার গৌণ গুণ। আর মুখ্য গুণগুলোই বাস্তবস্তুতে আছে, গৌণ গুণগুলো নাই। কাজেই বাইরের জগৎকে আমরা যেমন দেখ্‌ছি তা ঠিক সেই রকম, এমন ক া বলা যায় না। বাইরের জগতের মুখ্য গুণগুলোই আমাদের মনের, আমাদের অভিজ্ঞতার বাইরে আছে, আর তার গৌণ গুণগুলো আমাদের মনের মধ্যেই আছে, বাইরের জগতে নাই। তাই লক সহজ বাস্তববাদ আংশিক গ্রহণ ও আংশিক বর্জন করেছেন।

যা হোক, যেহেতু লক বিনাবিচারে সহজ বাস্তববাদ গলাধঃকরণ করেননি, বিচার ক'রে তার কিছুটা রেখেছেন, সেজন্যই তাঁর বাস্তববাদের নাম 'সবিচার বাস্তববাদ'। আর যেহেতু বস্তুর মুখ্যগুণ ও গৌণগুণের বিভাগ সেদিনের বিজ্ঞানের দান, সেজন্য লকের বাস্তববাদের আর এক নাম 'বৈজ্ঞানিক বাস্তববাদ'।

বিজ্ঞান থেকে প্রেরণা নিয়ে সহজ বাস্তববাদের বিরোধিতা ক'রে লক যে উল্টো-পুরান শুরু করলেন, তার শেষ পরিণতি হলো বার্কলের ভাববাদে। একে সহজ বুদ্ধিতে 'বামাচার' বলা চলে। বামপন্থায় বা উল্টোপথে চলাই বামাচার কথার আক্ষরিক অর্থ। সহজ বুদ্ধিতে এই বামাচার মার্গেই বার্কলের দার্শনিক পদচারণা। তিনি খুব জোরের সঙ্গে বলেছেন যে, দুনিয়ার সব জিনিস পত্র, সব সাজ-সরঞ্জাম ও আকাশের অগণিত গ্রহ-তারা মনের চিন্তা ছাড়া আর কিছুই নয়। তিনি আর একটি কথা এর সঙ্গে যোগ দিয়ে সহজবুদ্ধি সাধারণ

মানুষকে বেশ বিভ্রান্ত করেছেন। তিনি বলেছেন, বাহ্য জগতের সব জিনিসকে মনের ধারণা বলে জানায় তাদের সত্যিকার সত্তাহানি হয় না, কারণ আসলে যা আছে তা বাইরের জগতের বস্তু নয়, মনেরই ধারণা। এ দৃষ্টিকোণ থেকেই তাঁর দর্শনের মূলসূত্র ঃ অনুভূত বস্তুর সত্তা, অনুভূতিতেই, অনুভূতির বাইরে নয় বিরচিত।

বার্কলের ভাববাদ

লকের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে বার্কলে বলেন যে, বস্তুর মুখ্য ও গৌণ গুণের ভিতর কোনও দুর্বিগ্রাহ্য সীমারেখা টানা যায় না। দ্রব্য ও গুণের সম্বন্ধ বিশ্লেষণে আমরা এ বিষয়ের আলোচনা করেছি। বার্কলে দেখিয়েছেন, বস্তুর গৌণ গুণগুলোর মতো তার মুখ্য গুণগুলো আমাদের মনের ভিতরই রয়েছে, বাইরের বস্তুতে নাই, আর বস্তুর তথাকথিত মুখ্য ও গৌণ গুণ দুই-ই যদি মনেতেই থাকে, তাহলে বাইরের জগতে জড়বস্তু বলে তাদের কোন অধিষ্ঠান কল্পনা করাও নিরর্থক। মাথা না থাকলে যেমন মাথাব্যথা হতে পারে না, তেমনি বাইরের জগতে বস্তুর মুখ্য ও গৌণ গুণ না থাকলে তার অধিষ্ঠান বা আশ্রয় বলে কোন বস্তুও বাইরের জগতে থাকতে পারে না। এভাবেই বার্কলে প্রমাণ করবার চেষ্টা করলেন যে বাইরের জগতের বস্তুগুলো মনের ধারণা ছাড়া আর কিছুই নয়।

বাইরের জগতের বস্তুগুলোকে যদি আমরা আমাদের মনের ধারণা বলে ধরে নেই, তাহলে আমরা যখন বস্তুকে জানি না, তখন বস্তু থাকে কোথায়? এ আপত্তি বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদের বিরুদ্ধে যেমন উঠেছিল, ঠিক তেমনি বার্কলের বিরুদ্ধেও উঠেছিল। এ প্রসঙ্গে বার্কলে বলেছেন ঃ আমরা যখন বস্তুকে জানি তখন বস্তু আমাদের মনে থাকে, আর আমরা যখন বস্তুকে জানি না, তখন বস্তু থাকে বিরাট বিশ্বমনে। সোজা কথায়, আমরা যাকে আমাদের মনের বাইরের বস্তু-জগৎ ব'লে মনে করি, তা আসলে বিশ্বব্যাপী চেতন সত্তা বা ঈশ্বরের অন্তর্নিহিত কতকগুলো ধারণা ছাড়া আর কিছুই নয়। আমরা যখন বাইরের দুনিয়ার বস্তুগুলো অনুভব করি, তখন সেই বিরাট বিশ্বমন থেকে তারা আমাদের মনের ভিতর প্রেরিত হয়। টেলিফোনের তারের মারফত যেমন দুইজনে কথাবার্তা হয়, ঠিক সেই রকমই আমরা যখন বাইরের বস্তু অনুভব করি বলে মনে করি তখন বিরাট বিশ্বমনের সঙ্গেই আমাদের সাক্ষাৎ যোগ। কাজেই আমরা যাকে জড়বস্তুর অনুভূতি বলে মনে করি, তা আসলে ঈশ্বরের সঙ্গেই আমাদের সংযোগ। দিনরাত বস্তু প্রত্যক্ষের মাধ্যমে বিশ্বস্রষ্টার সঙ্গে আমাদের নিজের অজান্তে আমাদের সংযোগ। এভাবেই বার্কলের ভাববাদের সর্বব্যাপী বিশ্ব-চেতন-সত্তার স্বীকৃতিতে রূপান্তর।

আমরা আগে দেখিয়েছি বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদের পেছনে বুদ্ধ প্রচারিত নীতি-বোধের প্রেরণা। বার্কলের ভাববাদ ও বিশ্বচেতনার স্বীকৃতির মূলেও রয়েছে খ্রীস্টীয় ধর্মবোধের প্রেরণা। খ্রীস্টীয় চার্চে ধর্মবোধের শেষ লক্ষ্য ঈশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ যোগ—বাহ্য বস্তুর সত্তা অস্বীকার ক'রে বৌদ্ধেরা যেমন বৈরাগ্যকে অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়েছেন, বার্কলেও ঠিক তেমনি জড় সত্তা অস্বীকার ক'রে তার স্বকীয় ধর্মীয় আদর্শ—অর্থাৎ জীবনের প্রতি মুহূর্তে ঈশ্বরের সঙ্গে যোগাযোগের পথ সুগম করেছেন। এ দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, নীতিবোধ বা ধর্মবোধই বিজ্ঞান-বাদ বা ভাববাদের মূল উৎস।

আগেই বলেছি, বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদের মতো বার্কলের মতেরও অনেক তিক্ত অথচ হাস্যোদ্দীপক সমালোচনা হয়েছে। বার্কলে নিজেই বলেছেন যে, তার বাহ্য বস্তুর মনোভাব রূপান্তরের সমালোচনা করে সহজবুদ্ধি অনেকে বলেছেন: আমাদের ডিনারের টেবিলের রুটি-মাখন যদি মনের ধারণাই হয়ে থাকে, তা'হলে আমরা রুটি-মাখন খাই একথা না ব'লে মনের ধারণাই খেয়ে থাকি, একথা বলাই সঙ্গত। এই আপত্তির উত্তরে বার্কলে বলেছেন: আমাদের মনের ধারণা দু'রকমের (১) কাল্পনিক ও (২) প্রত্যক্ষ। আমাদের কাল্পনিক ধারণাগুলো আমাদেরই সৃষ্টি, আমরা সোনার পাহাড় কল্পনা করতে পারি, কিন্তু আমাদের মনের বাইরে তার সত্তা নাই। কাজেই এ-জাতীয় ধারণা সম্পূর্ণভাবে আমাদের ইচ্ছার অধীন। কিন্তু আমাদের প্রত্যক্ষ ধারণাগুলো আমাদের মনে বিশ্বমন থেকেই আসে, কাজেই তাদের সত্তা আমাদের ইচ্ছার অধীন নয়। আমাদের কল্পনার সোনার পাহাড় আর আমাদের প্রত্যক্ষের গাছ-পাথর দুই-ই মনের ধারণা হলেও প্রথমটির অস্তিত্ব আমাদের ইচ্ছার অধীন, আর দ্বিতীয়টির অস্তিত্ব আমাদের ইচ্ছার পরিধির বাইরে, বিরাট বিশ্বমনে। আমরা যে রুটি-মাখন খাই, তা এই প্রত্যক্ষ ধারণারই অন্তর্গত। কাজেই তাকে কাল্পনিক ধারণার পর্যায়ে ফেলে আমরা ইচ্ছা-মাত্র রুটি-মাখন মনের ভিতর তৈরী ক'রে ফেলতে পারি, এমন কথা বলা নেহাত অযৌক্তিক। বার্কলে তাই বলেছেন যে, তথাকথিত জড়বস্তুর বাহ্যসত্তা অস্বীকার করায় তার আসল সত্তার কোন হানি হয় না। বস্তুর আসল সত্তা আমাদের কাল্পনিক ধারণার মতো আমাদের মনে নয়, আমাদের মনের বাইরে বিরাট বিশ্বমনে।

সহজ বুদ্ধির জোর তাগিদে অনেকে আবার নানা রকম উদ্ভট উপায়ে বার্কলের জড় বস্তুর বাহ্যসত্তা নিরাসের বিরূপ সমালোচনা করেছেন। আঠারো শতকের প্রসিদ্ধ সাহিত্য-সমালোচক জনসনের সম্বন্ধে এ বিষয়ে এক চিত্তাকর্ষক ও হাস্যোদ্দীপক আখ্যায়িকা প্রচলিত আছে। কথিত আছে, বার্কলের মতের

আলোচনা প্রসঙ্গে জন্সন তাঁর সামনের কাচের স্তম্ভে হঠাৎ সবুট পদাঘাত করে বলে ওঠেন : "বার্কলের মত যে ভুল তা খুব ভাল ক'রে আমি প্রমাণ ক'রে দিলাম।" জন্সনের কথার অর্থ এই যে : 'বাইরে যদি কাচের কোন স্তম্ভ না থাকত, তাহলে তার পদাঘাতে তা চুরমার হতো না। কিন্তু জন্সন ভুলে গেছেন যে, কাচের স্তম্ভটি যেমন বার্কলের মতে বিশ্বমনের কতকগুলো ধারণা, ঠিক তেমনি তা চুরমার হয়ে যাওয়াও সেই বিশ্বমনের আর কতকগুলো ধারণা। কাজেই বার্কলের দৃষ্টিকোণ থেকে বলা চলে যে. জন্সনের পদাঘাতে কাচের স্তম্ভ চুরমার হয়েছে সন্দেহ নাই ; কিন্তু বার্কলের ভাববাদ চুরমার হয়নি বার্কলের ভাববাদের ভিত্তি এমনই সুদৃঢ়।

ক্যাণ্টের ভাববাদ ও বাস্তববাদ

ক্যাণ্টের সমীক্ষণবাদের আলোচনায় আমরা তাঁর ভাববাদের প্রতি পক্ষপাতের ইঙ্গিত করেছি। ক্যাণ্ট দেখিয়েছেন : যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতে আমাদের চলাফেরা, তা আমাদের বুদ্ধিরই সৃষ্টি। এদিক থেকে ক্যাণ্টের মতকে ভাববাদের কোঠায় ফেলা যায়। তথাপি ক্যাণ্টকে বার্কলের মত ভাববাদী বলা মোটেই যায় না। ক্যাণ্ট নিজেই তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ বুদ্ধিসমীক্ষণে বার্কলের ভাববাদের যে তিনি সমর্থক নন তা স্পষ্ট ক'রে বলেছেন। আসল কথা, ক্যাণ্টকে এক দৃষ্টিকোণ থেকে যেমন ভাববাদী বলা চলে, তেমনি আর এক দৃষ্টিকোণ থেকে বাস্তব-বাদীও বলা চলে। বুদ্ধির তৈরী ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের পেছনে ক্যাণ্ট অজ্ঞাত, অজ্ঞেয় বস্তুসত্তা স্বীকার করেছেন। কাজেই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য যে জগতে আমাদের বাস, তা আমাদের বুদ্ধিরই সৃষ্টি, সন্দেহ নাই ; কিন্তু তার চারপাশে অতীন্দ্রিয় জগতের যে বেড়াজাল, সেখানে বুদ্ধির প্রবেশ নিষেধ। তার দুয়ারে বড় হরফে যেন লেখা আছে : 'এখানে বুদ্ধির প্রবেশ নিষেধ।' সে নিষেধ অমান্য করার ক্ষমতাও বুদ্ধির নাই। সে-নিষেধ অমান্য করতে গিয়ে মাকড়সা যেমন নিজের বুক থেকে জাল বের ক'রে তাতে আটকা পড়ে, বুদ্ধিও তেমনি তার নিজের সৃষ্ট স্ববিরোধের বেড়াজালে আটকা পড়ে। তাই ঈশ্বরের মত কোন অতীন্দ্রিয় সত্তা বুদ্ধি প্রমাণ করতে পারে না। বুদ্ধি যেমন ঈশ্বরের অস্তিত্বের পক্ষে যুক্তি দিতে পারে, তেমনি বিপক্ষেও যুক্তি দিতে পারে। ঠিক এমনিভাবে বুদ্ধি মানুষের আত্মা অমর ও অবিনশ্বর, এ-কথা যেমন প্রমাণ করতে পারে, তেমনি মরণেই মানুষের আত্মার বিনাশ এ-কথাও বুদ্ধি প্রমাণ করতে পারে। কোন্ এক আদিমতম মুহূর্তে এই বিশ্বের সৃষ্টি হয়েছে, এ-কথা বুদ্ধি যেমন প্রমাণ করতে পারে, তেমনি বিশ্বের সৃষ্টি হঠাৎ কোন দিন কোন সময় হয়নি—এ কথাও বুদ্ধি প্রমাণ করতে

পারে। অতীন্দ্রিয় তত্ত্ব সম্বন্ধে বুদ্ধির সিদ্ধান্ত এমনি পরস্পর-বিরোধী। তাই অতীন্দ্রিয় জগতে বুদ্ধির প্রবেশ নিষেধ এবং সে-অগম্য দেশে প্রবেশের অপরিহার্য ফল বুদ্ধির ব্যর্থতা। এই ভাবেই ক্যাণ্ট বুদ্ধির সৃষ্ট ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের পেছনে বুদ্ধির অগম্য এক অতীন্দ্রিয় সত্তা স্বীকার ক'রে ভাববাদের বিরোধিতা ও বাস্তববাদের সমর্থন করেছেন।

ভাববাদ ও বাস্তববাদের দ্বন্দ্বে ক্যাণ্ট উভচর। একদিক দিয়ে তিনি ভাববাদী, আর একদিক দিয়ে তিনি বাস্তববাদী। ক্যাণ্টের মতে জ্ঞানের উৎপত্তি-বিশ্লেষণ ভাববাদকে যেমন সমর্থন করে, বাস্তববাদকেও তেমনি সমর্থন করে। তবে তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে ক্যাণ্টকে হয়তো ভাববাদীও বলা যায় না, বাস্তববাদীও বলা যায় না। বিশ্বের চরমতত্ত্ব ক্যাণ্টের মতে যখন অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়, তখন সেই অনাবিষ্কৃত রহস্যের উপর ভাববাদ বা বাস্তববাদ কারো মুখোস পরানো হয়তো সম্ভব নয়, সঙ্গতও নয়। সুতরাং ক্যাণ্ট সম্বন্ধে একথা মনে রাখা হয়তো প্রয়োজন যে, জ্ঞান বিশ্লেষণে তিনি ভাববাদ ও বাস্তববাদের সমন্বয়েরই সমর্থক কিন্তু তত্ত্ব নিরূপণে তাঁর নীরবতা ভাববাদ ও বাস্তববাদ কাউকেই সমর্থন করে না।

ফিক্‌টেতে ভাববাদের পরিণতি

ক্যাণ্টের ভাবে অনুপ্রাণিত তাঁর প্রিয় শিষ্য ফিক্‌টে (১৭৬২—১৮১৪) ক্যাণ্টের দর্শন থেকে বুদ্ধির অতীত এই অজ্ঞেয় বস্তুকে বাদ দিয়ে এক উগ্রনীতিবাদী ভাববাদের গোড়া পত্তন করেন। ক্যাণ্ট তাঁর ইচ্ছা সমীক্ষণে বিশুদ্ধ নীতিবোধের আলোচনায় বলেছেন: মানুষের নৈতিক ইচ্ছা, তার শুভবুদ্ধি সম্পূর্ণরূপে বস্তুর দাসত্ব থেকে মুক্ত, শুভবুদ্ধির অনুপ্রেরণা ক্যাণ্টের মতে তাই সম্পূর্ণরূপে নিষ্কাম ও বাসনাবর্জিত। আমরা যখন কোন ফল কামনা করে কোন কাজ করি, তখন আমাদের ইচ্ছা স্বতন্ত্র নয়, তা তখন বস্তুর অধীন। তাই ফল-কামনা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ইচ্ছার কোন নৈতিক মূল্য নাই। মানুষের ইচ্ছা যেখানে শুধু কর্তব্যবোধে উদ্বুদ্ধ ও ফল-কামনা-বর্জিত সেখানেই তার ইচ্ছা স্বতন্ত্র ও স্বাধীন, বস্তুর দাসত্ব থেকে পুরোপুরি মুক্ত।

ক্যাণ্টের নৈতিক প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ফিক্‌টে এই স্বাধীন নৈতিক বিষয়-সম্বন্ধ-রহিত ইচ্ছাকেই বিশ্বের আদি কারণ ব'লে মেনে নিয়েছেন। এরই নাম বিরাট "আমি"। এই 'আমি' সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে নিজের ভিতর বস্তু-সত্তা সৃষ্টি করে। তাই মনের অতীত অজ্ঞেয় বস্তু বলে কিছু থাকতে পারে না। কিন্তু দুঃখ ও পরিতাপের কথা এই যে, নিজের ভিতর এই বিষয়ের সত্তা সৃষ্টি করা মাত্রই সেই স্বতন্ত্র ও স্বাধীন বিষয়ের দাসত্বমুক্ত বিরাট 'আমি'র রূপান্তর হয় সীমাবদ্ধ

'আমি'তে, যা প্রত্যেক সসীম জীবের সত্তা, এ থেকেই মানুষের বন্ধনের উৎপত্তি, এ থেকেই বস্তুর দাসত্ব, তার প্রতি আসক্তি, এ থেকেই তার পেছনে ছুটে ছুটেও আমাদের হয়রানির শেষ নাই। চলতি প্রবাদের ঈষৎ রূপান্তর ক'রে একেই বলা যায়: নিজেরই নাক কেটে নিজেরই যাত্রা ভঙ্গ করা; অথবা নিজের হাতে মাটি খুঁড়ে পানি বের ক'রে সেই পানিতে ডুবে মরা, খাল কেটে কুমীর আনা।

যাই হোক, নিজের সত্তার অভ্যন্তরে বস্তু-সত্তা সৃষ্টি করার পর থেকেই সীমাবদ্ধ জীবের বন্ধন-দশা, অজস্র দুঃখ ও ক্লেশ। কিন্তু বস্তু সৃষ্টি করবার পর তার সত্তা অস্বীকার করার উপায় নাই, একমাত্র উপায় নৈতিক ইচ্ছার সাহায্যে তার দাসত্ব থেকে মুক্তি। সংক্ষেপে ফিক্‌টের মতে, বস্তুর সত্তার আত্ম-সত্তা থেকেই উৎপত্তি, আর সেই আত্মসত্তাকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে স্বাধীন নীতিবোধ অভ্যাস ও অনুশীলনের দ্বারা ইচ্ছার স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা করাই মানুষের লক্ষ্য।

শেলিং-এর নিরপেক্ষ সত্তাবাদ

ফিক্‌টের পরবর্তী জার্মান দার্শনিক শেলিং (১৭৭৫—১৮৫৪) এই উগ্র আত্ম-পক্ষপাত ও বস্তুসত্তা অবজ্ঞা মোটেই সমর্থন করেন নাই। তাঁর মতে, বস্তুসত্তায় ও আত্মসত্তায় কোন মৌলিক পার্থক্য নাই। কাজেই বস্তুসত্তাকে যেমন আত্মসত্তায় রূপান্তরিত করা যায় না, তেমনি আত্মসত্তাকেও বস্তুসত্তায় রূপান্তরিত করা যায় না। শেলিং-এর এই বস্তু ও আত্মসত্তার অভেদবাদ ভাববাদ বা বস্তুবাদ কোনটারই আওতায় পড়ে না। সেজন্যে এ-প্রসঙ্গে তার বিস্তারিত আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক।

হেগেলের অধ্যাত্মবাদ

আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনে ভাববাদের চরম পরিণতি হেগেল। বার্কলের ভাববাদের সঙ্গে হেগেলের ভাববাদের পার্থক্য প্রচুর। বার্কলে অবশ্য শেষ পর্যন্ত বাইরের জগতের অসংখ্য পদার্থ গাছপালা, ঘড়-বাড়ী, গ্রহ-তারা সবকিছুকে ব্যক্তি-মনের ভাবনায় রূপান্তরিত করেননি। তিনি তাদের সত্তা খুঁজে পেয়েছেন এক সর্বব্যাপী বিরাট বিশ্বমনের চিন্তাধারায়। তথাপি একথা সুস্পষ্ট যে, বার্কলে শেষ পর্যন্ত বস্তু ও জ্ঞানের, বস্তুসত্তা ও ভাবসত্তার তফাত মোটেই মানেন নি। বস্তুসত্তার ভাবসত্তায় রূপান্তরই বার্কলের ভাববাদের আসল কথা।

হেগেল বস্তুসত্তা ও ভাবসত্তার তফাত আগাগোড়া মেনেছেন। বার্কলে দেখিয়েছেন: ভাবনা ছাড়া বস্তুর সত্তার প্রতীতি হয় না, তাই বস্তুর সত্তা তার

ভাবনা ছাড়া আর কিছুই নয়। হেগেল এথেকেই বার্কলের ঠিক উল্টো সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। তিনি দেখিয়েছেন: ভাবনা ছাড়া যেমন বস্তুকে খুঁজে পাওয়া যায় না, ঠিক তেমনি বস্তু ছাড়াও ভাবনাকে খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই বস্তু ও ভাবনা বিষয় ও বিষয়ী, তুমি ও আমি, আত্মা ও অনাত্মা, উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর মতো পরস্পর-সাপেক্ষ। একৰে বাদ দিয়ে অন্যকে পাওয়া যায় না।

এই পরস্পর-সাপেক্ষত্ব কি ক'রে সম্ভব, এ-প্রশ্নের উত্তরও হেগেল দেবার চেষ্টা করেছেন। আমরা যখন নিজেকে জানি, তখন আমরা নিজেরাই বিষয় ও বিষয়ীর, জ্ঞাত ও জ্ঞেয়ের, 'আমি' ও 'তুমি'র ক্রিয়া একসঙ্গে করি। ব্যক্তির এই আত্মজ্ঞানের বিশ্লেষণের আলোকে একথা বলা চলে; এ-বিশ্বের সমস্ত জ্ঞাতা ও সমস্ত জ্ঞেয়, সমস্ত বিষয় ও বিষয়ী, অগণিত 'আমি' ও অগণিত 'তুমি' এক বিরাট বিশ্বচেতনায়ই শেষ পর্যন্ত একীভূত হয়ে রয়েছে। এই একীভাব বিষয় ও বিষয়ীর, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের, 'আমি' ও 'তুমি'র অভেদ বোঝায় না, তাদের তাদের ভেদাভেদই বোঝায়। সুতরাং শেষ পর্যন্ত একথা অনস্বীকার্য যে, এই বিরাট বিশ্বের মূলে এক বিশ্ব-চেতনা, এক বিশ্বমন। আর সেই বিশ্বমনে জগতের অনন্ত ভাবধারা ও অনন্ত বিষয়-প্রবাহ, দুই-ই রয়েছে। তা'রা দুয়ে এক, একে দুই। বহুত্বের ভিতর এই একত্ব আর একত্বের ভিতর এই বহুত্ব, অর্থাৎ ভেদাভেদ-বাদই হেগেলীয় দর্শনের শেষ কথা।

কেউ কেউ বলতে পারেন যে, ভেদ আর অভেদ, এক আর বহু, আলো-অন্ধকারের মত বিপরীত-ধর্মী। কাজেই তাদের মিলন অযৌক্তিক ও অসম্ভব। হেগেল তাঁর দ্বান্দ্বিক (ডায়েলেক্‌টিক) পদ্ধতিতে আগাগোড়া দ্বন্দ্ব সমাধানের মাধ্যমে এ-প্রশ্নেরই উত্তর দিয়েছেন। কাজেই তাঁর মতে, ভেদ ও অভেদ, এক ও বহু পরস্পর-বিরোধী হলেও তাদের বিরোধের সমাধান সম্ভব। আর এ-বিরোধ সমাধানে ও সমন্বয়েই দর্শনের চরম পরিণতি।

এ-আলোচনা থেকে একথা সুস্পষ্ট যে, হেগেল যখন বিশ্বচেতনায় বস্তুসত্তা স্বীকার করেছেন তখন তিনি বাস্তববাদী, আর এ-বস্তুসত্তার অধিষ্ঠান যখন তিনি খুঁজে পেয়েছেন এক বিশ্বচেতনায়, তখন তিনি ভাববাদীও। এজন্যেই হেগেলের মতকে ভাববাদী বাস্তববাদ বা বাস্তববাদী ভাববাদ এই আপাত-বিরোধী আখ্যা কখনও কখনও দে'য়া হয়।

হেগেলের দর্শনের আসল কথাকে ভাববাদী বাস্তববাদ ও বাস্তববাদী ভাববাদ না ব'লে 'অধ্যাত্মবাদ' নাম দেওয়াই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। কারণ, এই বিরাট বিশ্বের পেছনে এক সর্বব্যাপী অধ্যাত্ম-চেতনার, অর্থাৎ বিরাট 'আমি'র স্বীকৃতিই

হেগেলের আসল কথা। এ সর্বব্যাপী চেতনার দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে বস্তুজগতে ও মনোজগতে বিবর্তনের কথাই হেগেল মুক্তকণ্ঠে প্রকাশ করেছেন। তাঁর এই অধ্যাত্মবাদী বিবর্তনবাদের কথা শুনলে "সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর"—কবির এ-সার্থক উক্তি আমাদের কর্ণে যেন ধ্বনিত হয়।

উনিশ শতকের শেষের দিকে ও বিশ শতকের প্রথমে বার্কলের ভাববাদ ত দূরের কথা, হেগেলের অধ্যাত্মবাদের প্রতিও মানুষের আকর্ষণ কমে যায়। অবশ্য ইংলণ্ডে স্টার্লিং, এডওয়ার্ড কেয়ার্ড ও তাঁর ভাই জন্ কেয়ার্ড, বিশেষতঃ ব্র্যাডলি বোসাংকে আর আমেরিকায় রোয়েসের লেখার মাধ্যমে হেগেলীয় মত কিছুটা নতুনভাবে প্রচারিত হয়। এ নতুন ব্যাখ্যারই নাম নব্য-হেগেলীয় মত।

জর্জ মুরের নব্য-বাস্তববাদ

এর জোর প্রতিবাদ হয়েছে নব্য-বাস্তববাদের মারফত। ১৯০৪ খ্রীস্টাব্দে ক্যাম্বিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জর্জ মুর তাঁর প্রসিদ্ধ প্রবন্ধ "ভাববাদ খণ্ডনে" বাস্তববাদের পক্ষে কতকগুলো সহজ বুদ্ধিগম্য যুক্তি দেন। এথেকেই নব্য-বাস্তববাদের সূচনা হয়।

মুর বলেন : সব রকম ভাববাদ 'বস্তুর সত্তা তার জ্ঞানে, জ্ঞানের বাইরে নয়"—এই নীতির উপরই প্রতিষ্ঠিত। নানা আলোচনা দ্বারা মুর দেখাবার চেষ্টা করেছেন যে, বস্তু ও তার জ্ঞান কখনও এক হতে পারে না। সবুজ ঘাসের জ্ঞান ও সবুজ ঘাস কখনও এক হয় না। মুরের ভাববাদের প্রতিবাদ শঙ্করের বিজ্ঞানবাদের সমালোচনাকেই মনে করিয়ে দেয়, যার উল্লেখ আমরা আগেই করেছি।

সাম্প্রতিক যুগে মুরই নব্য-বাস্তববাদের পথিকৃৎ। তাঁর কাছ থেকেই অনুপ্রেরণা পেয়ে হোল্টের নেতৃত্বে আমেরিকার ছয়জন বাস্তববাদী লেখক ভাববাদের নানারকম দোষ দেখিয়ে এক যৌথ গ্রন্থ লেখেন। এই বইয়ের বৈশিষ্ট্য এই যে, তার লেখকদের নিজেদের ভিতর নানা বিষয়ে নানা সূক্ষ্ম মতভেদ থাকা সত্ত্বেও তাঁরা সকলেই ভাববাদের ঘোর বিরোধী। এই বিরোধে বা নিষেধাত্মক দৃষ্টিতেই তাঁদের মতৈক্য, অন্য বিষয়ে তাঁদের প্রচুর মতানৈক্য।

আমেরিকায় ভাববাদের সমালোচনা

আমেরিকার নব্য-বাস্তববাদী দার্শনিকরা ভাববাদের বিরুদ্ধে নানা রকমের আপত্তি তুলেছেন। তাঁদের দু'টি প্রধান আপত্তি এখানে একটু বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। তাঁদের প্রথম আপত্তির নাম দেয়া যেতে পারে : আত্মকেন্দ্রিক বিভ্রান্তি-

দোষ। ভাববাদীরা বলেন ঃ "আমরা যখনই বস্তুকে জানি, তখনই বস্তুর সত্তার যোগ আমাদের মনের সঙ্গে ; বস্তুকে জানার এ ছাড়া অন্য কোন উপায়ও নাই। কাজেই বস্তু আত্মধর্মী, তার কোন নিজস্ব সত্তা নাই।" এ-যুক্তি অসার। বস্তুকে যখন আমরা জানি, তখন বস্তু আমাদের মনের সঙ্গে সংযুক্ত, এ-উক্তির অর্থ দু'রকমের হতে পারে। এ-কথার এক অর্থ হলো, যে-বস্তুকে আমরা জানছি তার সঙ্গে আমাদের মনের যোগ অপরিহার্য। জ্ঞাত বস্তুর সঙ্গে জ্ঞাতার সম্বন্ধ কখনও অস্বীকার করা চলে না। কিন্তু এথেকে এ-কথাই প্রমাণ হয় যে, জ্ঞাত বস্তুর সঙ্গেই জ্ঞাতার সম্বন্ধ, বস্তুর সঙ্গে নয়। জ্ঞাত বস্তুর সঙ্গে জ্ঞাতার সম্বন্ধ এ তো স্বতঃসিদ্ধ। জ্ঞাত বস্তুর সঙ্গে জ্ঞাতার সম্বন্ধ প্রমাণ করাই যদি ভাববাদের অভিপ্রেত হয়, তাহলে বলতে হয় এটা দ্বিরুক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। আর জ্ঞাত বস্তুর সঙ্গে জ্ঞাতার অপরিহার্য সম্বন্ধকে ভিত্তি ক'রে যদি ভাববাদীরা বলেন যে, বস্তুর স্বভাবই হচ্ছে জ্ঞাতার অধীন, তাহলে বলতে হবে, এ-সিদ্ধান্ত অতিরঞ্জিত। বস্তু যখন জ্ঞাত হয়, তখন জ্ঞাতার সঙ্গে তার অপরিহার্য সম্বন্ধ থেকে এ-কথা বলা যায় না যে, সব অবস্থায়ই—অর্থাৎ বস্তু যখন জ্ঞাত হয় না তখনও জ্ঞাতার সঙ্গে তা সংযুক্ত। জ্ঞাতাই বস্তুকে জানে, বস্তু জ্ঞাতাকে জানে না। কাজেই নিজের সত্তার অভিব্যক্তির জন্যে বস্তুকে জ্ঞাতার সাহায্য নিতে হয়। এটা বস্তুর নিজস্ব স্বভাব নয়, এটা হলো তার স্বভাবের অপূর্ণতা। এ-অপূর্ণতা আকস্মিক। একে বস্তুর নিজস্ব স্বভাব বলা চলে না। স্ত্রী ছাড়া স্বামী হওয়া চলে না, আর স্বামী ছাড়া স্ত্রীও হওয়া যায় না, মা ছাড়া বাবা হয় না আর বাবা ছাড়াও মা হয় না ; এ থেকে যেমন বলা চলে না যে, স্ত্রীর সত্তাই স্বামীর সত্তা, অথবা স্বামীর সত্তাই স্ত্রীর সত্তা, অথবা মা-এর সত্তাই বাপের সত্তা, আর বাপের সত্তাই মায়ের সত্তা—ঠিক তেমনি এ কথা বলা চলে না যে, জ্ঞানকালে বস্তু জ্ঞাতার উপর নির্ভরশীল বলে তার নিজের কোন স্বতন্ত্র সত্তা নাই। সুতরাং জ্ঞানকালে বস্তুর আত্মকেন্দ্রিকতার সুযোগ নিয়ে ভাববাদীরা যে বলেন, আত্মসত্তাই বস্তু-সত্তা, তা একেবারেই অযৌক্তিক।

ভাববাদের বিরুদ্ধে নব্য-বাস্তববাদীদের দ্বিতীয় আপত্তির নাম বিশ্ব-চেতনায় অন্ধবিশ্বাস। মন বা চেতনা স্নায়বিক উত্তেজনারই প্রতিক্রিয়া, যেখানে স্নায়বিক উত্তেজনা নাই সেখানে মন থাকতে পারে না। তাই আমাদের শরীরের সঙ্গে আমাদের মনের সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য ও অপরিহার্য। এ-দৃষ্টিকোণ থেকে বলা চলে ; অসীম বিশ্বমন বলে কিছু হতেই পারে না। যেহেতু স্নায়ু-প্রবাহের সঙ্গে মনের অচ্ছেদ্য যোগ, সেজন্য মন সীমিত হতে বাধ্য। সারা বিশ্বে মহাশূন্যে ত আর স্নায়ু-প্রবাহ নাই, কাজেই সেখানে কোন মনের কল্পনা নেহাত অযৌক্তিক। তাই

নব্য-বাস্তববাদীরা মনে করেন যে, শুধু বাস্তব জ্ঞান বর্জিত তর্কের খাতিরেই ভাববাদীরা শেষ পর্যন্ত এক বিশ্বচেতনা কল্পনা ক'রে বস্তুসত্তার ব্যাখ্যা করতে নিষ্ফল চেষ্টা পেয়েছেন।

নব্য-সবিচার বাস্তববাদ

নব্য-বাস্তববাদীদের মতে, বস্তু-সত্তাকে আমরা সাক্ষাৎভাবেই জানি। জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের মাঝখানে আর কোন ব্যবধান নাই। আর একদল বাস্তববাদী বলেন: যদিও বস্তুর সত্তাকে জ্ঞাতার সত্তায় রূপান্তরিত করা যায় না, তথাপি এ-কথা বলা চলে না যে, বস্তুকে আমরা সাক্ষাৎভাবেই জানি। সহজ বা লৌকিক বাস্তব-বাদের সমালোচনায় আমরা যেমন দেখিয়েছি, এ-দলের বাস্তববাদীরাও তেমনি বলেন: যদি জ্ঞানে বিষয়ের সঙ্গে জ্ঞাতার সাক্ষাৎ যোগ হয়, তাহলে আমরা বস্তুকে কখনো ভুল জানতে পারি না। তাই ভ্রমজ্ঞান একথাই প্রমাণ করে দেয় যে, বস্তুকে আমরা সাক্ষাৎভাবে জানি না। এ-দলের বাস্তববাদীরা আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্য নিয়ে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে, বস্তুকে আমরা সাক্ষাৎ-ভাবে জানি না। তাঁরা তাঁদের মত প্রতিপাদনে আজকের দিনের জ্যোতির্বিদ্যার সাহায্য বিশেষভাবে নিয়েছেন। জ্যোতির্বিদরা খুব জোরালো দূরবীক্ষণের সাহায্যে মহাকাশে এমন তারার সন্ধান পেয়েছেন, যার আলো তার সৃষ্টির পর আজও পৃথিবীতে এসে পৌঁছায়নি, অথচ আলোর গতি প্রতি সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল। এ থেকেই বোঝা যায়, বস্তুকে আমরা সাক্ষাৎভাবে জেনে ফেলি এ-মত যাঁরা পোষণ করেন তাঁদের দৃষ্টি অবৈজ্ঞানিক।

নব্য-বাস্তববাদ থেকে তাঁদের মতকে পৃথক করার জন্য এ-দলের বাস্তববাদীরা তাঁদের মতের নাম দিয়েছেন নব্য-সবিচার বাস্তববাদ। বস্তুর সাক্ষাৎ জ্ঞানে বিশ্বাস এঁদের মতে অযৌক্তিক ও অবৈজ্ঞানিক কুসংস্কার ছাড়া আর কিছুই নয়।

তাই বলে এ কথা তাঁরা বলেন না যে, বস্তুকে আমরা মনের চিন্তার মাধ্যমে জানি। আমাদের সাধারণ ধারণা বস্তুর সঙ্গে আমাদের যোগ আমাদের মনের চিন্তার মাধ্যমে; যেমন—আমরা যখন একটি ছবি দেখি, তখন আমরা সাধারণতঃ মনে করি ছবিটি আমাদের মনের বাইরে রয়েছে, আর ছবির প্রতিফলন হিসাবে আমাদের মনের ভিতর তার সম্বন্ধে একটি চিন্তা রয়েছে। এ-মত যদি সত্যি হতো, তা'হলে আমরা আমাদের মনের ভিতর বস্তুর যে ধারণা রয়েছে তাকেই জানতাম, বস্তুকে কখনো জানতে পারতাম না।

আমরা যে বস্তুকে জানি এটাই প্রমাণ করে দেয় যে, আমরা ভাবনার মাধ্যমে বস্তুকে জানি না, অথচ ভ্রমজ্ঞান এ-কথা প্রমাণ করে দেয় যে, বস্তুকে আমরা

সাক্ষাৎভাবে জানি না। আমরা একটু আগেই দেখেছি যে, আজকের দিনের বিজ্ঞানও এ ধারণা সমর্থন করে। তাই নব্য-সবিচার বাস্তববাদের সমর্থকরা বলেন: আমরা বস্তুকে যার মাধ্যমে জানি, সে-সত্তা বস্তুর মতো জড়ও নয়, আর আমাদের মনের চিন্তা-ভাবনার মতো তা চেতনও নয়। বস্তুর সঙ্গে আমাদের যোগ কোনও অজড়, অচেতন নিরপেক্ষ সত্তার মাধ্যমে।

বিশ শতকের আদিপর্বে আমেরিকার নব্য-বাস্তববাদীরা এই দু'দলে বিভক্ত হয়ে পড়েন। তাঁদের প্রথম দলের নেতা হোল্টের কথা আগেই বলেছি। দ্বিতীয় দলের প্রখ্যাত সমর্থক সাহিত্যশ্রী-মণ্ডিত রচনার জন্য যশস্বী দার্শনিক সেণ্টায়ানা।

হেগেলের মতের অযৌক্তিকতা

ভাববাদ বস্তুর সত্তাকে উড়িয়ে দিয়ে মনের ধারণায় রূপান্তরিত করেছে দেখে হেগেল বস্তুসত্তার দাবি মানতে গিয়ে বিরাট বিশ্বচেতনায় বস্তু ও তার ভাবনা এ-দু'টিকে এক সঙ্গে স্থান দিলেন। কিন্তু তাতে কি বস্তুসত্তা-সত্যই সংরক্ষিত হলো? আমাদের পড়ার ঘরের টেবিল ও তার ধারণা দুই-ই যদি বিরাট বিশ্বমনে থাকে তাহলে তা'রা দু'টিই ত ধারণার পর্যায়ে পড়ে গেল। টেবিল মনের বাইরে থাকে বলেই তাকে আমরা বিষয় বলি, আর টেবিলের ধারণা মনের বাইরে না থেকে মনের ভিতরে থাকে বলেই তাকে আমরা ধারণা বলি। হেগেল যা বলেছেন, তাই যদি ঠিক হয়, অর্থাৎ বিশ্বমনে যদি টেবিল ও তার ধারণা দুই-ই থাকে, তাহলে মনের ভিতর থাকার দরুন তা'রা দুটিই ত ধারণায় রূপান্তরিত হয়ে গেল। সুতরাং বার্কলে বিশ্বমনে বস্তুর ধারণা আছে বলে যে-তত্ত্ব প্রমাণ করলেন, হেগেল সেই বিশ্বমনে বস্তু ও তার ধারণা দুই-ই আছে বলে সেই একই কথা প্রমাণ করলেন। কাজেই হেগেলের ভাববাদী বস্তুবাদ শেষ পর্যন্ত নির্জলা ভাববাদেই রূপান্তরিত হয়ে গেলো, বস্তু সত্তা ত তাতে রইল না। অতএব মুর যে বলেছেন: ভাববাদের মূলনীতি বস্তুর বাহ্য সত্তা অস্বীকার, এটা খুব সত্যি কথা।

অধ্যাত্মবাদের সার্থকতা

অধ্যাত্মবাদের বৈশিষ্ট্য বস্তুবাদের সঙ্গে ভাববাদের সামঞ্জস্যে নয়, আর বস্তু-সত্তার ভাবসত্তায় রূপান্তরেও নয়। অধ্যাত্মবাদের আসল বৈশিষ্ট্য আদর্শবাদের সমর্থনে। প্লেটোকে এ-দৃষ্টিকোণ থেকেই য়ুরোপীয় দর্শনে আইডিয়্যালিজমের প্রবর্তক বলা হয়। বস্তুসত্তাকে প্লেটো মনের ভাবনায় রূপান্তরিত করেছেন,

এমন কথা বলা চলে না। কিন্তু একথা অনস্বীকার্য যে, আমাদের এই ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য জগতের অসম্পূর্ণতা থেকে মুক্ত, এ-জগতের বাইরে একটি আদর্শ জগতের কল্পনা প্লেটোর দর্শনের সবচেয়ে বড় দান। সে-আদর্শ জগৎকে যিনি জানেন, প্লেটোর মতে তিনিই দার্শনিক, তিনিই বাস্তব জগতে আদর্শের রূপায়ণে সক্ষম।

যাই হোক, অধ্যাত্মবাদে ও বিশ্বচেতনায় স্বীকৃতির পেছনেও এক অনুপ্রেরণা-দায়ক আদর্শ যে রয়েছে, একথা সুস্পষ্ট। তাই ভাববাদের চরম পরিণতি যদি অধ্যাত্মবাদেই হয়, তাহলে একথা বলা চলে যে, কর্মজীবনের দৃষ্টিকোণ থেকে ভাববাদ আদর্শবাদেরই নামান্তর। আমরা সহজ দৃষ্টিতে দুনিয়ার এক জিনিসকে আর এক জিনিস থেকে আলাদা করে দেখি। আমাদের সহজবুদ্ধির দৃষ্টি তাই সীমার মধ্যেই আবদ্ধ। কিন্তু আমরা যদি ভাববাদীদের মতো এ-কথা স্বীকার করি যে, বিশ্ব জগতের অসংখ্য বৈচিত্র্যের পেছনে এক সর্বব্যাপী চেতনা, তা'হলে বিশ্বের পার্থক্যের পেছনে আমরা খুঁজে পাব এক সর্বব্যাপী একত্ব, তাতে সারা বিশ্বের সঙ্গে আমাদের যোগ হবে নিবিড় ও আত্মিক, তা আমাদের ভিতর সার্বভৌম ও সর্বজনীন প্রেমেরই অফুরন্ত প্রেরণা জাগাবে। যখন এ-প্রেমের দৃষ্টিকোণ থেকে সারা জগৎকে দেখতে আমরা অভ্যস্ত হব, তখন তার সব গ্লানি, সব কদর্যতা আমাদের দৃষ্টির কাছ থেকে দূরে চলে যাবে ও বিশ্বের এক প্রেমময়, শাশ্বতসুষমা-মণ্ডিত ভাস্বর রূপ তখন আমরা দেখতে পাব।

দর্শনের ইতিহাসের আদিযুগ থেকে বিশ্বের সীমাহীন অপূর্ণতায়, ক্রমবর্ধমান দ্বেষ-দ্বন্দ্ব-প্রবাহের ভিতর অধ্যাত্মবাদ মানুষের সামনে এই সুনিবিড় ঐক্য, শাশ্বত সুষম ও প্রেমের বার্তাই ঘোষণা করে আসছে, এখানেই তার বৈশিষ্ট্য। উইলিয়াম জেমস্ ঠিকই বলেছেন: অধ্যাত্মবাদীদের একাত্মবোধের মূলে প্রেমেরই প্রেরণা, আর বাস্তববাদীদের বহুত্ববোধের মূলে অভিজ্ঞতাবাদী বিজ্ঞানের প্রেরণা। এই দুই প্রেরণার সমঝোতা ও সামঞ্জস্যের মাধ্যমেই সুষ্ঠু জীবন-দর্শন গড়ে তোলা সম্ভব, যা আজকের দিনের মানুষের জটিল জীবন-যাত্রা ও সমস্যার মোকাবিলা করতে সমর্থ।

অষ্টম অধ্যায়

সৃষ্টি ও বিবর্তন

ভাববাদ ও বাস্তববাদের আলোচনাতে আমাদের ধী-বিদ্যার নাতিদীর্ঘ আলোচনা শেষ হলো বলা চলে। তাই অতি স্বাভাবিকভাবেই এবার আমরা বিশ্বজগতের স্বরূপ আলোচনায় প্রবৃত্ত হতে চাই।

এ বিশ্বজগতের সৃষ্টি কি করে হলো, এর বিভিন্ন পদার্থের জড়বস্তু, প্রাণ ও মনের স্বভাব কি, সর্বোপরি এ বিশ্বের স্রষ্টা আল্লাহ্‌তালা বা ঈশ্বর বলে কেউ আছেন কি না, থাকলে এ বিশ্বজগতের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ কি, এসব চিরন্তন সমস্যার সমাধানে দর্শনের ইতিহাসের আদিযুগ থেকে ভাবুক দার্শনিকরা যেসব কথা বলেছেন, সংক্ষেপে তার একটু আলোচনা আমাদের উদ্দেশ্য। ধী-বিদ্যা থেকে এইভাবেই তত্ত্ববিদ্যায় আমাদের প্রথম পদক্ষেপ।

সৃষ্টি সম্বন্ধে আস্তিক ও নাস্তিক মত

প্রথমেই আমরা আলোচনা করতে চাই এ বিশ্বের উৎপত্তি। যাঁরা এ বিশ্বের নিয়ন্তা আল্লাহ্‌তালা বা ঈশ্বরের সত্তা স্বীকার করেন না, পরলোক মানেন না, পাপপুণ্যের পুরস্কার ও তার শেষ উপলক্ষ রোজকেয়ামত মানেন না, তাঁরাও এ বিশ্বসৃষ্টির সম্বন্ধে নিজস্ব মত পোষণ করেন। আর যাঁরা ধর্মবিশ্বাসী, অর্থাৎ যাঁরা আল্লাহ্‌তালা বা ঈশ্বর মানেন, পরকাল মানেন, রোজকেয়ামত মানেন, বিশ্বের সৃষ্টি সম্বন্ধে তাঁদের নিজস্ব মত আছেই। সহজ সরল ভাষায় হৃদয়ের অকপট আবেগের সঙ্গে তাঁরা এ বিশ্বের সৃষ্টি সম্বন্ধে মানুষের আঁকাবাঁকা ইতিহাসের শুরু থেকে যে সব কথা বলেছেন, জগতের বিভিন্ন ধর্ম শাস্ত্রের সৃষ্টিকাহিনীই তার এক বড় নিদর্শন। এরই ভিতর সৃষ্টিতত্ত্বের দার্শনিক ব্যাখ্যার সংকেত হয়তো নিহিত। তাঁদের মূল বক্তব্য: জগৎ একদিন ছিল না এবং জগতের একজন সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান সর্বগুণান্বিত স্রষ্টা রয়েছেন, তাঁরই ইচ্ছায় এ বিশ্বের সৃষ্টি।

উপনিষদে ও পুরাণে সৃষ্টি-কাহিনী

হিন্দুদের দার্শনিক চিন্তার অতি প্রাচীন নিদর্শন, প্রাক-বুদ্ধ খ্রীস্ট-পূর্ব যুগের উপনিষদে আছে সৃষ্টির আদিমতম মুহূর্তে এক চেতনা-সত্তাই ছিলেন, তাঁর ইচ্ছা হলো এক থেকে বহুর সৃষ্টি করার:

"তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়"

তিনি ঈক্ষণ বা চিন্তা করলেন : "আমি এক থেকে বহু সৃষ্টি করবো।" মানবীয় ভাবের আরো সহজতর অভিব্যক্তি হলো যখন তাঁরা বললেন : তার নিরালা একা থাকতে ভাল না লাগা—"একাকী ন রমেত"—আনন্দের সম্ভোগের জন্য বহুর প্রয়োজন। তাই আনন্দ-সম্ভোগের অভিলাষ থেকেই সৃষ্টির সূচনা।

আবার সৃষ্টির পিছনে আরো গভীর তাৎপর্য খুঁজতে গিয়ে তাঁরা বললেন : বিশ্ব সৃষ্টি করতে গিয়ে সৃষ্টিকর্তা বেশ মানসিক বিভ্রান্তিতে পড়ে গেলেন। কি সৃষ্টি করবেন, আর কি সৃষ্টি করবেন না, এ নিয়ে তাঁর মনে বিরাট তোলপাড়! এ বিভ্রান্তির ভিতর তিনি আকাশবাণী শুনলেন; এটা তাঁর অন্তরের ভাবেরই প্রতিধ্বনি। সে-বাণী হলো : "তপঃ"—যার অর্থ হলো তপস্যা। এ আকাশ-বাণীর মর্ম হলো : শুধু আকস্মিক ভাবনা থেকেই বিশ্ব সৃষ্টি করা যায় না, এর জন্য গভীর তপস্যা ও অনুধ্যান প্রয়োজন। তাই সেই মহান্ পুরুষ, স্রষ্টা গভীর তপস্যায় প্রবৃত্ত হলেন : "স তপঃ অতপ্যত"। তিনি গভীর তপস্যা করলেন, আর তাঁর তপঃপ্রভাবেই বিরাট এ-বিশ্বের সৃষ্টি।

বহুর জগতে যে দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ, যে-পাপ ও মালিন্যের স্পর্শ, তারও ইঙ্গিত এ সৃষ্টি-কাহিনীতে আছে। প্রজাপতি অর্থাৎ সমস্ত সৃষ্ট-জীবের আদিপিতা প্রথমেই সাতজন মানসপুত্র সৃষ্টি করলেন, যাঁদের মধ্যে সত্ত্বগুণ অর্থাৎ ত্যাগের প্রবৃত্তি প্রবল। সৃষ্টি ক'রে তিনি তাদের আদেশ করলেন; "তোমরা সব প্রজা সৃষ্টি করো।" তাঁরা সৃষ্টিকর্তার সে আদেশে কর্ণপাত করলেন না। সৃষ্টি করতে গেলে যে ভোগস্পৃহা প্রয়োজন, তাঁদের ভিতর তার পাঁচসিকে পাঁচআনা অভাব। তাঁর আদেশ লঙ্ঘনের জন্য তিনি তাঁদের অভিশাপ দিতে গেলেন। তথাপি তাঁরা সৃষ্টি-কার্যে প্রবৃত্ত হলেন না, সন্ন্যাস-ব্রত অবলম্বন করে তাপস-জীবন ও সংসার-বিরতি অভ্যাস করতে লাগলেন। প্রজাপতি নিজের ফাঁপরে নিজে আটক পড়ে তখন আরো সাতজন মানসপুত্র সৃষ্টি করলেন, যাদের মধ্যে রজোগুণ বা ভোগের প্রবৃত্তি প্রবল। প্রজাপতির প্রজা সৃষ্টির সমস্যা এবার সহজেই সুরাহা হয়ে গেল। তার ভোগী মানসপুত্রের দল সৃষ্টি হবার পরেই কোমর বেঁধে সৃষ্টির কার্যে লেগে গেলো। শুধু সৃষ্টি নয়, সৃষ্টির যে সংকট তা থেকে তারও উৎপত্তি। এভাবেই দার্শনিক আখ্যায়িকার মাধ্যমে নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে সৃষ্টি-রহস্য বর্ণনার প্রয়াস।

আবার বাস্তব দৃষ্টিকোণে থেকে সৃষ্টি-রহস্যের বিশ্লেষণে পৌরাণিক আখ্যায়িকাও প্রচুর। সে-আখ্যায়িকার মূল কথা : সৃষ্টির আদিতে জগৎ জলময় ছিল।

আর বিশ্ব তারই পরিণতি। সে-জল থেকে এক বিরাট মৎস্যের উৎপত্তি, তার পৃষ্ঠদেশই স্থূল পৃথিবীতে রূপান্তরিত। তারপর কূর্মের উৎপত্তি, আর সেই কূর্মপৃষ্ঠে মহাশূন্যে পৃথিবীর অধিষ্ঠান। সে-পৃথিবীতে পর পর বরাহের ও বামন অর্থাৎ স্বল্পকায় মানুষের সৃষ্টি. আর তারই শেষ পরিণতি পুরোপুরি মানুষের সৃষ্টিতে। এ-সব কাহিনীর সঙ্গে কত নৈতিক বিশ্বাস ও প্রচলিত সংস্কারের যোগ, তার ইয়ত্তা নাই। তবে শেষ পর্যন্ত বিশ্ববিধাতার ইচ্ছায় এ জগৎ সৃষ্টি, এ-বাণী এইসব সহজ সরল আখ্যায়িকায় বার বার উচ্চারিত হয়েছে।

বাইবেলের আদিপর্বে সৃষ্টি-কাহিনী

অতি প্রাচীন যুগে হিন্দুদের ধর্মশাস্ত্র ও দর্শনের মাধ্যমে যে সৃষ্টি-কাহিনী প্রচলিত হয়েছিল, খ্রীস্টধর্মের প্রাধান্যের কালে বাইবেলের আদি-পর্বে ইহুদী-পুরাণে যে সহজ, সরল সৃষ্টি-কাহিনী ধর্মবিশ্বাসী জনসাধারণের ভিতর অত্যন্ত প্রসার লাভ করেছিল, তা থেকে পেছনে ঠেলে ফেলে দিয়েছে। তবে তাতে বিস্মিত হবার কিছু নেই। স্রষ্টার ইচ্ছা থেকেই যে বিশ্বসৃষ্টি, একথা ইহুদী ও খ্রীস্ট-ধর্মের সৃষ্টি-কাহিনীতে বিশেষভাবে প্রচারিত। আজকের দিনে সৃষ্টি-কাহিনী বলতে আমরা সাধারণতঃ এ বর্ণনাই বুঝে থাকি।

বাইবেলের আদিপর্ব প্রথম গ্রন্থ জেনেসিস্ বা 'বিশ্বের উৎপত্তিতে'ই এ-কাহিনী বর্ণিত। এতে আছে: সৃষ্টির আদিতে কিছুই ছিল না। আর বিধাতা-পুরুষের ইচ্ছামাত্রই সৃষ্টির প্রথম মুহূর্তে আলো সৃষ্টি হলো। এভাবেই সৃষ্টির শুরু, আর এভাবেই সৃষ্টি ছ'দিন ধরে চললো। স্রষ্টা ক্রমে ক্রমে এ ছ'দিনে গ্রহ, তারা, নক্ষত্র, জীবজন্তু সব সৃষ্টি করলেন. সৃষ্টির শেষ মুহূর্তে তিনি সৃষ্টি করলেন মানবের আদি-পিতা আদমকে। আদমের অস্থিপঞ্জর থেকে তাঁর পত্নী ইভকে সৃষ্টি করলেন। আর আদমকে তিনি নির্দেশ দিলেন তিনি যেন এ-সৃষ্টিধারা বাড়িয়ে চলেন। সৃষ্টি-শেষের পর সপ্তম দিনে স্রষ্টার বিশ্রাম সুখ উপভোগ—যার জন্যে আজও ধর্ম-বিশ্বাসী খ্রীস্টানরা রবিবারে সৃষ্টির শেষ দিনে সাংসারিক সব কাজ থেকে বিশ্রাম নেন।

সৃষ্টির উদ্দেশ্য

এ সৃষ্টি-কাহিনীর ভিতর সবচেয়ে বড় দার্শনিক কথা: স্রষ্টা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর প্রতিরূপ ক'রে। এ-তত্ত্বের উপরই খুব জোর দে'য়া হয়েছে ইসলামে। কুরআন শরীফে আছে: আল্লাহতা'লা তাঁর নিত্য-উপাসক ফেরেশতাদের ডেকে যখন মানুষ সৃষ্টির কথা বললেন তখন তাঁরা প্রতিবাদ ক'রে বলেছিলেন

যে, এ-সৃষ্টির তো প্রয়োজন নেই, বরং তা থেকে বিশ্বে যত সব যুদ্ধ-বিগ্রহ, অত্যাচার-নিপীড়ন শুরু হবে। আল্লাহ্‌তা'লা তাঁদের ভুল দেখিয়ে তাঁদের বুঝিয়ে দিলেন যে, মানুষ হবে স্রষ্টার খলিফা বা প্রতিনিধি, তার স্থান ফেরেশ-তাদেরও ঊর্ধ্বে।

আজকের দিনের জগতের দিকে দৃষ্টিপাত করলে এ-কথা বলা হয়তো অসঙ্গত হবে না যে, মানুষের সম্বন্ধে ফেরেশতাদের আশঙ্কা ও আতঙ্ক সত্যিই বাস্তবায়িত হয়েছে; কিন্তু আল্লাহ্‌তা'লার আশীর্বাদ সে আজো সফল ও বাস্তব করতে পারেনি।

ইহুদী বাইবেলের সৃষ্টি-কাহিনীর ভেতর দু'টি দার্শনিক সত্য রয়েছে: এক, সৃষ্টির আদিতে তার কোন বীজ ছিল না যা থেকে আল্লাহ্‌তা'লা জগৎ সৃষ্টি করেছেন; কাজেই আল্লাহ্‌তা'লার ইচ্ছার প্রভাবেই কিছু না থেকেই এ-জগতের সৃষ্টি। দার্শনিক ভাষায় একে বলে অসৎ থেকে সতের উৎপত্তি। দুই, হঠাৎ আল্লাহ্‌তা'লার আকস্মিক ইচ্ছায় এক আদিতম ক্ষণে বিশ্ব সৃষ্টি।

অনেকে এ-মতের বিরোধিতা করে বলেন: 'না' থেকে কখনো 'হাঁ'র উৎপত্তি হতে পারে না, যা নাস্তিবাচক তা থেকে অস্তিবাচক পদার্থের উৎপত্তি অসম্ভব। তাই এক প্রাচীন উপনিষদে আছে, সৃষ্টির আদিতে সৎ অর্থাৎ একটি সত্তাবান পদার্থ ছিল, তা থেকেই বিশ্বের উৎপত্তি। কারণ যা সত্তাহীন বা অসৎ, তা থেকে সত্তাবানের বা সতের উৎপত্তি হতে পারে না। আরিস্টটলের তর্কশাস্ত্রে সক্রেটিস্‌-পূর্ব গ্রীক-দর্শনের আলোচনায় তিনি এ-কথাই দেখিয়েছেন যে, সৃষ্টির আদি উপাদান আগে থেকেই কিছু ছিল, তা থেকেই জগতের উৎপত্তি।

বাইবেলের সৃষ্টিবাদের বিরুদ্ধে অনেক দার্শনিকই এ-আপত্তি তুলেছেন। তাঁরা বলেছেন, অসৎ থেকে সতের উৎপত্তি একটা অলৌকিক ব্যাপার; আর যুক্তির মাপকাঠিতে অলৌকিক ব'লে কিছু স্বীকার করা যায় না। এক প্রাচীন উপনিষদেও আছে, "কথমসতো সজ্জায়েত", অর্থাৎ সত্তাহীনতা থেকে সত্যের উৎপত্তি অসম্ভব।

বাইবেলের সৃষ্টিতত্ত্বের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে মনে হয় যে, সৃষ্টির আদিতে তার মূল উপাদান কিছু ছিল না, এ-কথার অর্থ এই যে, তখন অন্ধকারই ছিল। সৃষ্টির আদিতে কিছুই ছিল না, আল্লাহ্‌তা'লার ইচ্ছায় আলো সৃষ্টি হলো, এ-দু'টি কথাকে যুক্তির মাপকাঠিতে একত্র বিশ্লেষণ করলে এ-সিদ্ধান্তেই পৌঁছা যায় যে, সৃষ্টির আদিতে অন্ধকার অর্থাৎ আলোর অভাবই ছিল। তাই ভারতীয় দর্শনের অতি আদিযুগে বলা হয়েছে: আদিতে শুধু অন্ধকারই ছিল না, সে অন্ধকার অন্ধকারের প্রলেপে আবৃতও ছিল। "তম আসীৎ তমসা গূঢ়ম্‌"।

সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের ধারা

হঠাৎ একদিন জগতের সৃষ্টি হয়েছে, এ-কথা মানলেও প্রাচীন গ্রীস ও ভারতের দার্শনিকরা আকস্মিক সৃষ্টিবাদ পুরোপুরি সমর্থন করেন নি। হিন্দু দার্শনিকদের মতে সৃষ্টির পর স্থিতি, তারপর প্রলয়। এ-তিনটিকে নিয়ে এক কল্প, এক কল্পের শেষে আর এক কল্প শুরু, আবার সৃষ্টি, আবার স্থিতি আবার প্রলয়। এভাবে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় অনন্তকাল ধরে চলেছে, অনন্তকাল ধরে চলবে। একেই বলে কল্প-আরম্ভে সৃষ্টিতে পুরাতনেরই পুনরাবৃত্তি।

"সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ—ধাতা যথা পূর্বমকল্পয়ৎ"।

[নতুন সৃষ্টির শুরুতে বিশ্ববিধাতা আগের মতোই চন্দ্র-সূর্য সৃষ্টি করেছেন।] গ্রীক দর্শনেও হিরাক্লিটাস ও এ্যানাক্সেগোরাস সৃষ্টি ও প্রলয়ের কথা বলেছেন, আর প্রলয়ের পর সৃষ্টির ইঙ্গিতও করেছেন।

মুসলিম দার্শনিকদের সৃষ্টিবাদ

কিন্দি থেকে শুরু করে ইব্‌নে রুশ্‌দ্ পর্যন্ত মুসলিম দার্শনিকরা আরিস্টটলের প্রভাবে অসৎ থেকে সতের উৎপত্তি স্বীকার করেন নি। তাঁদের মতে সৃষ্টির আগে জগৎ অব্যক্ত আকারে ছিল, সৃষ্টিতে তার অভিব্যক্তি। গাজ্জালী ইস্‌লামের সৃষ্টিবাদকে অসৎ থেকে সতের উৎপত্তি বলেই মেনে নিয়েছেন, আর সেই জন্যেই সৃষ্টিবাদ নিয়ে মুসলিম দার্শনিকদের সঙ্গে তাঁর প্রবল ভাব-সংঘর্ষ।

বিজ্ঞান ও আকস্মিক সৃষ্টিবাদ

সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে ধর্মশাস্ত্রে যে সমস্ত কাহিনী আছে তাদের সকলের সঙ্গেই আজকের দিনের বিজ্ঞানের বিরোধ। সাধারণতঃ চল্‌তি সৃষ্টি-কাহিনী বলতে, জগৎ হঠাৎ একদিন ঈশ্বরের ইচ্ছায় সৃষ্টি হয়েছে, আর একদিন সেদিন যতোই দূরবর্তী হোক্, তাঁরই ইচ্ছায় ধ্বংস হয়ে যাবে—একথাই আমরা বুঝি।

উনিশ শতকের বৈজ্ঞানিক গবেষণা এ-কথা প্রমাণ করে দেয় যে, জগৎ একদিন হঠাৎ সৃষ্টি হয়নি। এ-মতের সমর্থনে বহু বৈজ্ঞানিক তথ্য জ্যোতির্বিদ্যা, ভূতত্ত্ববিদ্যা ও জীববিদ্যা থেকে পাওয়া যায়। ফরাসী মনীষী লাপ্লাস জগতের উৎপত্তি সম্বন্ধে একটি নতুন থিওরী প্রচার করেন। তাঁর মতে আকাশের গ্রহ-তারা-নক্ষত্রের উৎপত্তি কতকগুলো আদিম নীহারিকাপুঞ্জ থেকে। বিশ্বসৃষ্টি সম্বন্ধে এ মতেরই নাম নীহারিকা সৃষ্টিবাদ। লাপ্লাসের আগে ক্যাণ্টের লেখায় নীহারিকাপুঞ্জ থেকে জগতের উৎপত্তির আভাস ও ইঙ্গিত পাওয়া যায়। লাপ্লাস

বলেন : আমরা যে সৌরজগতে বাস করি তার কেন্দ্র সূর্য, আর সূর্যের চারপাশে যে কতকগুলো গ্রহ-উপগ্রহ ঘুরছে, তাদের সকলেরই সৃষ্টি এ-আদিম নীহারিকা-পুঞ্জ থেকে। সুতরাং এ-মতে আল্লাহ্‌তা'লার ইচ্ছায় হঠাৎ একদিন পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছিল, এ-কথা বলা নেহাত অবৈজ্ঞানিক।

শুধু তাই নয়। ভূবিজ্ঞানীরা পৃথিবীর স্তর বিশ্লেষণ করে এমন অনেক নতুন তথ্য আবিষ্কার করেছেন যা দেখিয়ে দেয় যে, পৃথিবী হঠাৎ একদিনে সৃষ্টি হয়নি। তাঁরা পৃথিবীর স্তর বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন : পৃথিবীর বিভিন্ন স্তর হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ বছর ধরে তৈরী হয়েছে। এমন কি আজ যেখানে মহাসমুদ্র, একদিন সেখানে ছিল স্থলভূমি, আর আজকে যেখানে স্থলভূমি, সুদূর-অতীতে সেখানে ছিল বিরাট সমুদ্র।

পৃথিবী মানুষের বাসযোগ্য হতেও তার সৃষ্টির পর লক্ষ লক্ষ বছর লেগেছে। আদিম অবস্থায় পৃথিবী এত উষ্ণ ছিল যে, তাতে মানুষ তো দূরে থাক্‌, অন্য কোন জীবন্ত প্রাণী থাকাও সম্ভব ছিল না। এই উষ্ণতা আস্তে আস্তে চলে গিয়ে পৃথিবী ক্রমে ক্রমে প্রাণীদের বাসযোগ্য হয়েছে। সে উষ্ণতার চাপ আজও পৃথিবীতে প্রচুর। পৃথিবী আজও অগ্নিগর্ভ, আর সেই অগ্নির উদ্‌গীরণ থেকেই ভূকম্পনের ব্যাপক ধ্বংস।

ভূবিজ্ঞান ও জ্যোতির্বিদ্যা বিশ্বজগতের সৃষ্টি সম্বন্ধে যে সংশয় বৈজ্ঞানিক-মনোবৃত্তি সম্পন্ন মানুষের মনে উনিশ শতকে জাগিয়েছিল, তারই স্বাভাবিক পরিণতি হলো জীববিদ্যায়। তার ফলে আকস্মিক সৃষ্টিবাদে শিক্ষিত মানুষের বিশ্বাস একেবারে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল। এ-পরিবর্তন সাধিত হলো প্রধানতঃ দু'জন প্রাণীবিদ্যাবিদের গবেষণায়, তাঁদের একজন ডারউইন, আর একজন ল্যামার্ক। প্রথম ব্যক্তি ইংরেজ, দ্বিতীয় ব্যক্তি ফরাসী। এ-দুয়ের ভিতর প্রাণীবিদ্যায় ডারউইনের দানই হয়তো অনেক বেশী।

ডারউইনের চ্যালেঞ্জ

বাইবেলের আকস্মিক সৃষ্টিবাদের বিরুদ্ধে ডারউইন সাক্ষাৎ যুদ্ধ ঘোষণা করে চল্‌তি ধর্মের সমর্থকদের অত্যন্ত বিরাগভাজন হয়েছিলেন একথা সুধী-জনের সুবিদিত। বাইবেলে আছে, ঈশ্বর সৃষ্টির আদি-পর্বে স্ব-ইচ্ছায় বিভিন্ন শ্রেণীর প্রাণী সৃষ্টি করেছেন। এক জাতের প্রাণীর পরিবর্তনের পরিণতিই যে আর এক জাতের প্রাণীর সৃষ্টি, এ-কথা ধর্মশাস্ত্রের ঘোরতর বিরোধী। ডারউইন তাঁর দু'টি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ "শ্রেণীসমূহের উৎপত্তি" ও "মানুষের আবির্ভাব"-এ

নানা বৈজ্ঞানিক তথ্য বিশ্লেষণ করে এ কথা দেখালেন যে, জগতের প্রাণীগুলো আগে থেকেই আলাদা আলাদা শ্রেণীতে সৃষ্টি হয়নি। ওয়ালেস ঠিক এই সময়ে প্রাণী জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে অনুকূল মত প্রকাশ করে ডারউইনকে বিস্ময়াবিষ্ট করেন।

তাঁদের মূল বক্তব্য হলো: এক শ্রেণীর প্রাণীর দেহ অন্য শ্রেণীর প্রাণীর দেহেরই রূপান্তর। তাই কত বিভিন্ন রকমের প্রাণী পৃথিবী থেকে একেবারে লুপ্ত হয়ে গেছে, আর তার পর কত নতুন শ্রেণীর প্রাণীর সৃষ্টি হয়েছে। শুধু তাই নয়, যে মানুষকে সৃষ্টির সেরা বলে ধর্মশাস্ত্রে উল্লেখ করা হয়েছে, সে মানুষও সৃষ্টির আদিতে ছিল না, সে মানুষ তার বানরগোত্রীয় পূর্বপুরুষের অতি দূরবর্তী অধস্তন পুরুষ। এ মত প্রচারের ফলে চার্চে যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল, তার বিস্তারিত আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন। ধর্মপ্রচারকেরা যে এ-মতকে অত্যন্ত ধর্মবিরোধী বলে মনে করেছিলেন, তা সন্দেহাতীত। যাই হোক্, ডারউইনের মত ফরাসী প্রাণীবিদ্যাবিদ্ ল্যামার্কও মোটামুটি সমর্থন করেন।

ল্যামার্ক ও ডারউইন, এঁদের দু'জনের কেউই সারা জগতের উৎপত্তি সম্বন্ধে কোনও ক্রমিক পরিবর্তনের কথা বলেন নি। তাঁদের গবেষণা প্রাণীজগতেই সীমাবদ্ধ ছিল। আর প্রাণীদের বিভিন্ন শ্রেণীর উৎপত্তির ক্ষেত্রেই তাঁরা তাঁদের আলোচনা সীমাবদ্ধ রেখেছেন। কাজেই দার্শনিক বিবর্তনবাদের সঙ্গে তাঁদের যোগ পরোক্ষ। প্রাণীজগতে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ দ্বারা বিবর্তনবাদ প্রয়োগ করে দার্শনিক বিবর্তনবাদের পথ তাঁরা সুগম করেছিলেন, একথা নিশ্চয়ই বলা চলে।

স্পেনসারের বিশ্ব-বিবর্তনবাদ

এই বৈজ্ঞানিক পরিবেশে সারা বিশ্বের উৎপত্তি ব্যাখ্যায় হার্বার্ট স্পেনসারই এই প্রথম বিবর্তনবাদ প্রয়োগ করেন। তিনিই এ বৈজ্ঞানিক যুগে দার্শনিক বিবর্তনবাদের পথিকৃৎ। উনিশ শতকের শেষের দিকে লেখা তাঁর প্রসিদ্ধ পুস্তক "মৌলিক সত্যসমূহ"-এ তিনি দেখিয়েছেন: শুধু প্রাণীজগতে নয়, মানুষের মনোজগতে, তার সামাজিক পরিবর্তনে, নীতিবোধের পরিণতিতে, সর্বত্রই ক্রমিক পরিবর্তন বা বিবর্তন দেখতে পাওয়া যায়। স্পেনসারের লেখার মাধ্যমে বিবর্তনবাদ ক্রমে এত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে যে, বিশ শতকের শিক্ষিত সমাজে বিবর্তনবাদ চিন্তার সর্বক্ষেত্রে স্বতঃসিদ্ধ সত্য, তার মধ্যমণি বলেই গৃহীত। দর্শনই হোক্, বিজ্ঞানই হোক্, সমাজতত্ত্বই হোক, রাজনীতিই হোক, নীতিবোধ বা ধর্মবোধই হোক্, যে-কোন বিষয়ে আজ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিসম্পন্ন শিক্ষিত সমাজকে কিছু বোঝাতে

হলে ক্রমিক পরিবর্তনের মারফত তা বোঝাতে হয়। স্পেনসারের বিবর্তনবাদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি আজ এতই ব্যাপক।

বিবর্তনের বিশ্লেষণে স্পেনসার ক্রমিক পরিবর্তন ছাড়া আর একটি কথা বলেছেন: তা হলো অগ্রগতি। স্পেনসার দেখিয়েছেন: বিবর্তনের আসল কাজ পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য স্থাপন, আর এই সামঞ্জস্যের ফল সুখ। কাজেই স্পেনসারের শেষ কথা হলো: বিবর্তনের ফলে মানুষের সভ্যতা-সুখ-সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। উনিশ শতকের স্পেনসারের এই অগ্রগতিবাদ পণ্ডিত সমাজে একরকম সর্বজনগ্রাহ্য বলে বিবেচিত হয়েছিল। বিশ শতকের প্রথমার্ধে মাত্র পঁচিশ বছরের ব্যবধানে দু'টি বিশ্বযুদ্ধের তাণ্ডবলীলা স্পেনসারের প্রচারিত অগ্রগতির নীতিতে চিন্তাশীল মানুষের গভীর সংশয় জাগিয়েছে। যাঁরা ভাবুক, যাঁদের কিছুমাত্র মানবত বোধ আছে, তাঁরা আজ আর মানুষের স্বাভাবিক প্রগতিতে বিশ্বাস করেন না। আজকের দিনে চিন্তাবিদরা স্পেনসারের বিবর্তনের নীতি অস্বীকার করেন না বটে, কিন্তু তার স্বাভাবিক প্রগতিবাদে তাঁদের বিশেষ আস্থা নাই।

স্পেনসারের বিবর্তনবাদের তাত্ত্বিক ভিত্তি এক অজ্ঞেয়তত্ত্বে বিশ্বাস, এরই পারিভাষিক নাম 'অজ্ঞেয়বাদ'; বিশ্ববিবর্তনের পেছনে যে সত্তা, তার স্বভাব আমরা জানি না, তা আমাদের অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়। শুধু তার বিবর্তনের সঙ্গেই আমাদের পরিচয়; তার স্বরূপ আমাদের চির অপরিচিত।

স্পেনসার বিশ্ববিবর্তনের যে তিনটি অপরিহার্য লক্ষণ বিভিন্ন বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তের তুলনামূলক আলোচনায় নির্ণয় করেছেন, তার ভিতরই তাঁর ব্যাখ্যাত ও প্রচারিত বিবর্তনের সাধারণ ফরমুলা দেখতে পাওয়া যায়। ভূতত্ত্ব থেকে একটি সহজ উদাহরণ নিয়ে এইগুলো আমরা বুঝবার চেষ্টা করতে পারি। সমুদ্রের অতল তলে হঠাৎ একদিন একটি দ্বীপের আবির্ভাব দেখে অনেকে বিস্মিত হয়ে পড়েন। তাঁরা একে একটি আকস্মিক ঘটনা বলে মনে করতে পারেন; কিন্তু এ ঘটনাটি মোটেই আকস্মিক নয়। ঐটা বছরের পর বছরের, কোন কোন ক্ষেত্রে যুগ-যুগান্তের লোকলোচনের অন্তরালে সংঘটিত এক বিরাট ঘটনা-প্রবাহেরই যোগফল। নদ-নদীর মারফত নানা জায়গা থেকে ছোট-খাটো জিনিসের সমুদ্রের গর্ভে প্রবেশ, ক্রমে ক্রমে এসব জিনিসের আর বিচ্ছিন্ন না থেকে একত্র হয়ে একটি জমাট-বাঁধা রূপ গ্রহণ, আর তারই পরিণতি, সেই জমাট বাঁধা রূপের স্বতন্ত্র সত্তা নিয়ে দ্বীপের আকারে সমুদ্রের জলরাশির মধ্যে আবির্ভাব। স্পেনসারের মতে বিবর্তনের তিনটি স্তর। তাদের প্রথমটির নাম সংযোজন, দ্বিতীয়টির নাম পৃথকীকরণ আর তৃতীয়টির নাম সমীকরণ।

জৈবিক বিবর্তন

স্পেনসারের বিশ্ববিবর্তনের আলোচনা শেষ করার আগে জৈবিক বিবর্তন সম্বন্ধে ল্যামার্ক ও ডারউইন যেসব কথা বলেছেন, তার একটু আলোচনা করা প্রয়োজন। একথা প্রথমেই বলা দরকার: স্পেনসার, ল্যামার্ক ও ডারউইন এঁরা কেউই বিবর্তনের পিছনে কোনও অভীষ্ট সিদ্ধির প্রেরণা স্বীকার করেন না, তাঁদের বিবর্তনবাদ উদ্দেশ্য-প্রণোদিত নয়, অচেতন যান্ত্রিক পদ্ধতিতেই সংঘটিত।

ছোটবেলা থেকেই ডারউইনের স্বভাব ছিল ডানপিটে, বনজঙ্গলে ঘুরে তখন থেকেই পোকা-মাকড় থেকে শুরু করে অগণিত প্রাণীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। পরিবারবর্গের সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদের ফলে হঠাৎ নাবিকদের সঙ্গে জাহাজে তাঁর আমেরিকা যাত্রা। তারপর ইংল্যাণ্ডে ফিরে এসে এই ভূয়োদর্শনের সাহায্যেই তিনি তাঁর জৈবিক বিবর্তনবাদের গোড়াপত্তন করেন।

ডারউইন প্রাণীজগতে বিবর্তনের যে চিত্র এঁকেছেন তা সত্যিই ভয়ানক মারাত্মক। তিনি বলেন: দুনিয়ার প্রাণীর সংখ্যা তাদের খাদ্যের প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশী। তাই প্রাণীজগতে সবসময় খাদ্য-সংগ্রহের জন্য সংঘর্ষ। এরই নাম জীবন-সংগ্রাম (struggle for existence), বেঁচে থাকার তাগিদে একে অন্যের নিধনের ব্যবস্থা। এ জীবন-সংগ্রামে যে জাতির প্রাণী জয়ী হয় তারাই শেষ পর্যন্ত বেঁচে থাকে, অন্যেরা সব পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। আজও মাটি খুঁড়ে পৃথিবীর অভ্যন্তরে অতীত যুগের জীবন-সংগ্রামে পরাজিত ও পর্যুদস্ত কত কত প্রাণীর মৃত কঙ্কাল খুঁজে পাওয়া যায়। তাদের আর কোন বংশধর পৃথিবীর বুকে বেঁচে নেই। তাদের সত্তা পৃথিবী থেকে একেবারে বিলুপ্ত। খাদ্য সঙ্কটের জন্যই প্রাণীজগতে জীবন-সংগ্রাম আর এই জীবন-সংগ্রামে যারা জয়ী তারাই পৃথিবীর বুকে দুর্বলকে মেরে বেঁচে থাকে। এরই নাম যোগ্যতমের প্রাণরক্ষা (survival of the fittest), যার আর এক অর্থ দুর্বল ও অযোগ্যের প্রাণনাশ। প্রকৃতির বিধানে এই যে সবলের প্রতি অনুগ্রহ ও দুর্বলের প্রতি আক্রোশ, এরই নাম প্রাকৃতিক নির্বাচন (natural selection)।

মানুষের ইতিহাসে এ নিষ্ঠুর, নির্মম দ্বন্দ্বের আংশিক পুনরাবৃত্তি। এখানেও একদিকে খাদ্যাভাব অন্যদিকে জনসংখ্যার ক্রমিক বৃদ্ধি। আবার বিশ্বযুদ্ধেরও আশঙ্কা ও আতঙ্ক যা মহা প্রলয়ের পথেই পদক্ষেপ। তাই ডারউইনের বিবর্তন আজ হয়তো মনুষ্য জগতেও প্রযোজ্য।

এই হোল ডারউইনের বিবর্তনবাদের মূলনীতি। প্রাণীজগতের বিবর্তনে ডারউইন সে নীতির যেভাবে প্রয়োগ করেছেন তার কথাও একটু বলা প্রয়োজন।

মানুষের দেহকোষে যে সব আকস্মিক পরিবর্তন ঘটে, তাদের ভিতর যেগুলো জীবন-সংগ্রামে জয়ী হবার অনুকূল, সেগুলো বংশ-পরম্পরায় তাদের সন্তান-সন্ততিতেও সংক্রমিত হয়। এরই নাম বংশানুক্রমিক সংক্রমণ। মোটামুটি জীবন-সংগ্রাম, সমর্থের জীবন-সংগ্রামে জয়, জীবন-সংগ্রামে জয়ী প্রাণী শ্রেণীর সংরক্ষণ বা প্রাকৃতিক নির্বাচন, প্রাণীর দেহকোষের আকস্মিক পরিবর্তন ও তার দেহকোষে জীবনযাত্রার অনুকূল পরিবর্তনের বংশানুক্রমিক সংক্রমণ এই হলো প্রাণী-জগতের বিবর্তনের মূলনীতি।

ল্যামার্কের মতো

ডারউইন যেমন প্রাণীর দেহকোষের পরিবর্তন আকস্মিক অর্থাৎ উদ্দেশ্য-প্রণোদিত নয় বলেছেন, ল্যামার্কের মতও তাই। শুধু এইখানেই তাঁদের দু'-জনের মতের তফাৎ যে, প্রাণীর দেহকোষে যে সব পরিবর্তনের ফলে প্রাণীদেহের বিবর্তন, ল্যামার্ক ডারউইনের মতো তাকে একেবারে আকস্মিক বলেন নি। ল্যামার্কের মতে প্রাণীর দেহকোষের এসব পরিবর্তন পারিবেশিক। যেমন শীত-প্রধান দেশে প্রাণীদেহে বেঁচে থাকার তাগিদে বড় বড় লোমের উৎপত্তি, আর সে প্রাণীরই দেহে উষ্ণ আবহাওয়ায় এ জাতীয় বড় লোমের অভাব। এ থেকেই বুঝা যায় প্রাণীদেহের পরিবর্তন পরিবেশের উপর নির্ভরশীল—একেবারে আকস্মিক নয়। ল্যামার্ক আবার প্রাণী-দেহের পরিবর্তনকে তার প্রাণ-সত্তার পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টাপ্রসূত বলে মনে করেছেন। আগের দে'য়া উদাহরণের সাহায্যে বলা চলে যে, শীতপ্রধান আবহাওয়ায় প্রাণীদেহে যে বড় বড় লোমের উৎপত্তি আর উষ্ণ আবহাওয়ায় যে তার অভাব, প্রাণীদেহে এ পরিবর্তন শুধু পরিবেশ-প্রসূত নয়, এর পেছনে তার প্রাণ-সত্তার তাগিদও প্রবল। প্রাণবান পদার্থে পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানের যে একটা অজ্ঞাত চেষ্টা দেখা যায়, যার ফলে প্রাণীদেহের বিবর্তন, তা পারিবেশিক প্রভাব ও প্রাণ-সত্তার অজ্ঞাত আবেগ এ দু'য়েরই ফল, শুধু একের নয়।

যদিও ল্যামার্ক ও ডারউইন উভয়েই বিবর্তনের পিছনে কোন অজ্ঞাত ইচ্ছা শক্তির আবেগ বা সঙ্কেত স্বীকার করতে মোটেই রাজী নন, তথাপি অনেকের মতে ল্যামার্কের পারিবেশিক পরিবর্তন ও প্রাণবান পদার্থের পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানের অজ্ঞাত চেষ্টার পিছনে উদ্দেশ্যবাদেরই এক অস্পষ্ট ইঙ্গিত নিহিত। কোনও চেতন সত্তার ইচ্ছা বা উদ্দেশ্য সিদ্ধির ফলে যে বিশ্ব-

সৃষ্টি হয়েছে, একথা ল্যামার্ক মনে করেন নি সত্য; কিন্তু তথাপি উদ্দেশ্যবাদী বিবর্তনের অজ্ঞাত স্পর্শ তাঁর ভিতর একটু-আধটু দেখতে পাওয়া যায়, একথা কেউ কেউ বলে থাকেন।

দেহকোষে পরিবর্তনের বংশানুক্রমিক সংক্রমণ ডারউইন ও ল্যামার্কের একটু পরবর্তী আর একজন প্রাণীবিদ্যাবিদ্ ভাইস্‌ম্যান স্বীকার করেন না। তাঁর মতে প্রাণীর দেহকোষে যেসব পরিবর্তন সংঘটিত হয় তা তাদের বংশধরদের দেহে সংক্রমিত হয় না তাদের পূর্বপুরুষদের জনন-কোষে যে সব পরিবর্তন হয় সেগুলোই তাদের সন্তানদের ভিতর সংক্রমিত হয়, অন্যগুলো হয় না।

শুধু ডারউইন ও ল্যামার্কের জৈবিক বিবর্তনবাদ নয়, স্পেনসারের বিশ্ব-বিবর্তনবাদও বিবর্তনের পেছনে কোনও উদ্দেশ্য স্বীকার করে না। এজন্যে স্পেন্‌সারের বিশ্ববিবর্তনবাদ ও যান্ত্রিক বিবর্তনবাদই মূল কথা। তথাপি স্পেনসার খুব জোরের সঙ্গে বলেছেন যে, বিবর্তনের ফলে মানুষ তার অবস্থার সঙ্গে উত্তর-উত্তর সামঞ্জস্য বিধান করে চলেছে, তার ফলে তার দুঃখ কমেছে ও সুখ বাড়ছে। এই হলো স্পেনসারের মতে অগ্রগতির লক্ষণ, যার কথা আগেই একটু বলেছি। স্পেনসারের বিশ্ববিবর্তনবাদের আলোচনায় এ-কথাই মনে হয় যে, প্রকৃতির বিবর্তন যেন একটা আজগুবী অস্বাভাবিক ব্যাপার—তার পেছনে কোন সচেতন ইচ্ছার আবেগ নাই, আছে একটি অজ্ঞাত অজ্ঞেয় তত্ত্ব। যান্ত্রিক পদ্ধতিতে যে বিবর্তনের শুরু, তার ফলেই মানুষের প্রয়োজন সিদ্ধি। এ যেন একটা কুজ্ঝটিকা-সমাচ্ছন্ন রহস্যাবৃত ব্যাপার। এর অর্থ হলো, প্রকৃতির বিবর্তনের পেছনে কোন উদ্দেশ্য খুঁজে পাওয়া যায় না; অথচ তার সামনের ধাপে প্রাণী-জগতে বিশেষতঃ মনুষ্যলোকে এই নিরুদ্দেশ যাত্রা থেকেই এক অতি লোভনীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধি, অর্থাৎ মানুষের সুখ-সম্ভোগের পরিপূরণ। এ যেন সেকালের রূপকথার রাজ-হস্তীর আকস্মিক আমহণে গরীবের ছেলের রাজসিংহাসন প্রাপ্তি ও রাজকন্যার শুভ-পরিণয়। চলতি গল্পে বলে, রাজা নিঃসন্তান হয়ে মারা গেলে তার রাজ-হস্তী বেরিয়ে আসত। সে অগণতান্ত্রিক, নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রের যুগে রাজসিংহাসনের উত্তরাধিকারীকে খুঁজে বের করার জন্য সে হস্তী যে যুবককে সামনে পেতো, জাতি-বিদ্যা-রূপ গুণ কোন কিছু বিবেচনা না ক'রে তাঁকেই শুঁড়ে বেঁধে নিয়ে এসে রাজসিংহাসনে বসিয়ে দিত; আর রাজকন্যার সঙ্গে পরিণয় সূত্রের মাধ্যমে সেই আকস্মিক উত্তরাধিকারী রক্তের বন্ধনে দৃঢ়ভিত্তিতে হতো প্রতিষ্ঠিত।

যে প্রাণীবিদ্যা থেকে আধুনিক যান্ত্রিক বিবর্তনবাদের প্রাথমিক প্রেরণা ও উদ্দীপনা, তা-ই তারই পরবর্তী গবেষণা ও আবিষ্কারে আজকের দিনের যান্ত্রিক

বিবর্তনবাদের সবচেয়ে বড় শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রাণ-সত্তার সঙ্গে নিষ্প্রাণ জড়সত্তার গরমিলই যান্ত্রিক বিবর্তনবাদের বিপক্ষে আজ প্রবল যুক্তি। নিষ্প্রাণ জড়ের স্বাতন্ত্র্য বলে কোন জিনিস নাই, তাই তার ভাবী পরিণতি ও গাণিতিক নিয়মে আগে থেকেই বলা চলে। কিন্তু প্রাণ-সত্তার বৈশিষ্ট্য, স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা, তার ভাবী ব্যবহার গণিতের কোন ফরমূলার সাহায্যে আগে থেকে ভালো ক'রে বলা চলে না। প্রাণের স্বরূপ বিশ্লেষণে ও ব্যাখ্যানে যান্ত্রিকতার এই পরাভব যান্ত্রিক বিবর্তনবাদে শিক্ষিত মনের আস্থা আজ কিছুটা শিথিল করে দিয়েছে, একথা অস্বীকার করা চলে না।

উদ্দেশ্যবাদী বিবর্তন

যান্ত্রিক বিবর্তনবাদের প্রাণের স্বরূপ ব্যাখ্যায় এই পরাভব থেকেই উদ্দেশ্য-বাদী বিবর্তনবাদের সৃষ্টি। সতেরো শতকে আধুনিক বিজ্ঞানের বিজয় অভিযান থেকে শুরু করে দার্শনিকরা সব সময় বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তের সঙ্গে তাল মিলিয়ে তাঁদের দার্শনিক গবেষণাকে প্রাণবন্ত করার চেষ্টা করেছেন। একদল দার্শনিকের উদ্দেশ্যবাদী বিবর্তনবাদের সমর্থন এই প্রচেষ্টারই এক বড় উদাহরণ। আধুনিক বিবর্তনবাদের আদি-পর্বে প্রচলিত ধর্মের সঙ্গে সংঘর্ষে যখন বৈজ্ঞানিক বিবর্তনবাদ জয়ী হলো, তখন থেকে একদল ধর্মীয় চেতনা-সম্পন্ন দার্শনিক তাঁদের ধর্মবোধের সঙ্গে বিবর্তনবাদের একটা আপোষ করার চেষ্টা করতে লাগলেন। এই হলো উদ্দেশ্যবাদী বিবর্তনবাদের আধুনিক যুগে প্রাথমিক প্রেরণা। এই প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে এদলের দার্শনিক দেখাবার চেষ্টা করলেন যে, ধর্মশাস্ত্রে সৃষ্টির যে আখ্যায়িকা আছে, তার সঙ্গে বিবর্তনবাদের বিরোধ নাই, যান্ত্রিকতাবাদেরই বিরোধ। আর যখন যান্ত্রিকতাবাদের সাহায্যে প্রাণের স্বভাব সঠিক বিশ্লেষণ করা যায় না, তখন যান্ত্রিকতাবাদকে বাদ দিয়ে বিবর্তনবাদকে ধর্মসম্মত এক নতুনরূপে দেখা যেতে পারে। এরই নাম উদ্দেশ্যমূলক বিবর্তনবাদ।

সাংখ্যদর্শনে উদ্দেশ্যবাদ

এই বিরাট বিশ্ব যে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে সৃষ্টি হয়নি, তার সপক্ষে তাঁরা যে সব যুক্তি দিয়েছেন তার কিছুটা এখানে আলোচনা করা প্রয়োজন।

বিশ্বের বিবর্তনের পেছনে যে কোন চেতন সত্তার উদ্দেশ্য-সিদ্ধির প্রেরণা রয়েছে, এ ধারণা অতি প্রাচীন। ভারতীয় দর্শনের এক অতি প্রাচীন ধারা সাংখ্য-দর্শনে বিশ্বের আদি উপাদান জড়শক্তি অব্যক্ত প্রকৃতির বিবর্তনের পেছনে পুরুষ বা চেতন সত্তার উদ্দেশ্য সিদ্ধির স্বীকৃতি এর এক বড় দৃষ্টান্ত। সাংখ্য-দর্শনের

ব্যাখ্যাতা ও অনুগামীরা বলেন: এই বিশ্ব-জগতের সব বস্তুই এক সংমিশ্রণ বা সংঘাতেরই ফল। মানুষের মন থেকে আরম্ভ করে ক্ষুদ্র তৃণখণ্ড পর্যন্ত সমস্ত পরিবর্তনশীল পদার্থের ভিতর তাঁরা তিনটি পরস্পর-বিরোধী অথচ সহভাবী ও সহকারী শক্তির পরিচয় পেয়েছিলেন, তাঁরা এদের নাম দিয়েছেন সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। প্রথমটি জ্ঞান ও প্রশান্তির, দ্বিতীয়টি কর্ম-প্রেরণা ও চাঞ্চল্যের, আর তৃতীয়টি আলস্য ও অজ্ঞানের সহায়ক, একথা আমরা আগেই বলেছি। এদের সংমিশ্রণে বিশ্বের সমস্ত বস্তুর উৎপত্তি। পুরুষ বা চেতনের স্বার্থসিদ্ধির জন্যেই এই অচেতন প্রকৃতির স্তরে স্তরে বিরাট বিশ্বের আকারে বিবর্তন। এ বিবর্তন প্রকৃতির দৃষ্টিকোণ থেকে যান্ত্রিক, কিন্তু পুরুষে দৃষ্টিকোণ থেকে উদ্দেশ্যমূলক। পুরুষ বা চেতন জন্ম-জন্মান্তর চক্রের ভিতর গিয়ে প্রকৃতির সৃষ্ট এই বিরাট বিশ্ব উপভোগ করেন, আর এই উপভোগের ফলে শেষ পর্যন্ত তার অনুভূতি হয় প্রকৃতির সৃষ্ট এই বিরাট জগৎ তার কোন প্রয়োজনই নির্বাহ করতে পারে না; কারণ প্রকৃতি থেকে পুরুষ স্বতন্ত্র এবং পুরুষের নিজস্ব স্বভাব পূর্ণতা। পুরুষের এই প্রাথমিক অভিজ্ঞতার নাম ভোগ, আর তার চরম পরিণতি, তার স্বরূপের সঙ্গে এই পরিচিতি অপবর্গ, তাই সাংখ্য-দর্শনের মতে চেতন পুরুষের ভোগ ও অপবর্গের জন্যেই অচেতন প্রকৃতির বিরাট বিশ্বের আকারে বিবর্তন।

এ বিবর্তন অচেতন প্রকৃতির দৃষ্টিকোণ থেকে যান্ত্রিক হলেও আসলে উদ্দেশ্যমূলক। কারণ কোন সংমিশ্রণ বা সংঘাত সাংখ্য-দর্শনের মতে কখনো তার নিজের প্রয়োজন সিদ্ধি করতে পারে না, তার দ্বারা অপরের প্রয়োজনই সিদ্ধ হয়। তাঁরা এর দু'টি রসালো উদাহরণ দিয়েছেন; একটি সজ্জিত শয্যা আরেকটি চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয়ের একত্র সমাবেশ।

আজকের দিনের পরিবেশের আলোকে এই দুই উদাহরণ একটু বিশ্লেষণ করলে এ সত্য অতি সহজে হৃদয়ঙ্গম হয়। অভিজাত শ্রেণীর সাময়িক বাসস্থান কোন হোটেলের শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে দেখা যায় সুন্দর খাট, বিছানা, গদি, লেপ, তোষক, বালিশ, ও মশারি সুন্দরভাবে সাজানো রয়েছে; পাশে মস্তবড় গোসলখানা, তাতে একটি বিরাট মার্বেল পাথর নির্মিত গহ্বর আর তার উপর বারি বর্ষণের সুষ্ঠু ব্যবস্থা। এই যে বহু জিনিসের একত্র সংযোগ, এটা কি লেপ, তোষক, গদি, বালিশ ইত্যাদির প্রয়োজন নির্বাহের জন্যে। কে না জানে, এ বিরাট আয়োজন অভিজাত শ্রেণীর সেইসব ভাগ্যবানদের নিদ্রা ও বিশ্রামের জন্য—চলতি কথায় যাদের সংজ্ঞা, সাহেব ও মেম সাহেব।

আর একথা বলাও নিষ্প্রয়োজন যে, সেই হোটেলের ভোজনাগারে বড় বড় টেবিলের উপর হরেক রকম ভোজ্য দ্রব্য, যা পরিষ্কৃত বেশভূষাধারী, কখনো

যষ্টির মতো দণ্ডায়মান আর কখনো ঘড়ির কাঁটার মতো চলমান আজ্ঞাবহ ভৃত্যের দল সযত্নে প্রস্তর থালায় সাজিয়ে, প্রেমিকা যেমন প্রেমিকের জন্য চঞ্চল ও ব্যস্ত হৃদয়ে তাকিয়ে থাকে, সে রকম কারো অপেক্ষায় অপেক্ষমান, সেই লোভনীয় ব্যবস্থা, মহাভাগ্যবান অভিজাত অতিথি ও তাদের মহার্ঘ, দ্বিতীয় সংস্করণ অতিথিনীদেরই জন্যে, তাদের নিজের জন্যে নয়।

সাংখ্য-দর্শনে যান্ত্রিকতা ও প্রয়োজন সিদ্ধির সমঝোতার মাধ্যমে বিবর্তনের এই ব্যাখ্যা বৈদান্তিকরা মোটেই স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে, অচেতন প্রকৃতি কখনো বিশ্ববিবর্তনের কারণ হতে পারে না। বিশ্বে বৈচিত্র্যের ভিতর যে ঐক্য; পার্থক্যের ভিতর যে সামঞ্জস্য, অচেতন প্রকৃতির বিবর্তনে তা সম্ভব হতে পারে না। তাঁরা এর নাম দিয়েছেন, "রচনা"। এই "রচনা" কথাটি পাশ্চাত্য লজিকে, যাকে প্রকৃতির সামঞ্জস্য-নিয়ম অর্থাৎ ইউনিফর্মিটি অাব ন্যাচার বলা হয়, তারই নামান্তর।

প্রকৃতির অসংখ্য বৈচিত্র্যের ভিতর এই যে কতকগুলো নিয়ম, কতকগুলো মূলীভূত ঐক্য, যার ব্যতিক্রম দেখা যায় না, যেমন দিনের পর রাত, রাতের পর দিন, আর বাল্যের পর যৌবন, যৌবনের পর পরিণত বয়স, তারপর বার্ধক্য, প্রকৃতিতে নানা ঋতুর আবর্তন, অসংখ্য গ্রহতারার স্বচ্ছন্দ গতিবিধি, অথচ সংঘর্ষের অভাব, মানুষের মনের অসংখ্য ভাবনা-চিন্তার ভিতর ভাব-সঙ্গতি, প্রকৃতিতে এই যে নিয়মের রাজত্ব এরই নাম 'রচনা'। বিশ্বের কোন চেতন কারণ না থাকলে এ রচনা বা নিয়মানুমোদিত পরিবর্তন মোটেই সম্ভব নয়। তাই অচেতনের বিবর্তনেই জগতের সৃষ্টি, এ কথা বলা অনেকটা আমার হাতে অন্যের তামাক খাওয়ার মতো। পুরনো দিনের কঠোর প্রশাসন ব্যবস্থায় ছাত্রদের ধূমপান একেবারে নিষিদ্ধ, অমার্জনীয় অপরাধ বলে বিবেচিত হতো। কিন্তু বার বার ফেল ক'রে যেসব ছেলে পাকা হয়ে যেতো, তারা সেই সিগারেটহীন যুগে শিক্ষকদের আড়ালে অতি গোপনে বড় হুঁকো হাতে নিয়ে তার উপর কল্কে সাজিয়ে নল লাগিয়ে ধূমপান করতো। বার বার ধূমপান করার ফলে কোন হতভাগা ছেলের করতলে প্রকৃতির অলংঘনীয় নিয়মে হুঁকোর দাগ খুব ভাল করে গড়ে ওঠে। একদিন এক নীতি-জ্ঞানশীল কঠোর শিক্ষক সেই ছাত্রের হাতে এক কুক্ষণে হুঁকোর দাগ দেখে তাকে যখন বার বার বেত্রাঘাত করেন, তখন সে সপক্ষ সমর্থনে পাকা উকিলের মতো বলেছিলো: "স্যার, আমি তামাক খাইনি, অন্যলোকে আমার হাত দিয়ে তামাক খেয়েছে, তাতেই আমার হাতে হুঁকোর দাগ।" সাংখ্য-দর্শনে অচেতন প্রকৃতির চেতন পুরুষের ভোগের জন্য বিরাট বিশ্ব-সৃষ্টির কথা মনে হলে একজনের হাতে অন্যের তামাক খাওয়ার এই রসালো গল্প মনে পড়াই স্বাভাবিক।

যাই হোক, বিশ্বে নিয়মের রাজত্বই এই যান্ত্রিকতাবাদী বিবর্তনের বিরুদ্ধে বড় যুক্তি। প্রকৃতির এই নিয়ম-আনুগত্য খুব ভালো করেই দেখিয়ে দেয় : বিশ্বের বিবর্তনের পিছনে চেতনের স্পর্শ।

মার্টিনোর উদ্দেশ্যবাদ

ডারউইন্-পরবর্তী যুগে যে সব ধর্মবিশ্বাসী দার্শনিক উদ্দেশ্যমূলক বিবর্তনবাদ প্রমাণ করবার নানাভাবে চেষ্টা করেছেন তাঁদের মত এবার আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করতে চাই।

সৃষ্টি পেছনে যে কোন চেতনের অদৃশ্য হস্ত রয়েছে, সৃষ্টি যে তারই ইচ্ছার অভিব্যক্তি এর পক্ষে অনেক যুক্তি, অনেক আলোচনা আমি আমার ছাত্রবয়সে ডক্টর মার্টিনোর বড় বইয়ে পড়েছিলাম। নাস্তিক, যান্ত্রিক বিবর্তনবাদের সঙ্গে তার ধর্ম-বিশ্বাসের গভীর বিরোধ থাকার দরুনই এই ধর্মপ্রাণ মনীষী প্রকৃতিতে উদ্দেশ্যের অভিব্যক্তি আবিষ্কারের চেষ্টার কোন কসুর করেননি। তাঁর হৃদয়-আবেগ এত প্রবল যে, শেষ পর্যন্ত যখন তিনি প্রকৃতির রাজত্বে অনেক ক্ষেত্রে উদ্দেশ্যের অভিব্যক্তি আবিষ্কার করতে অপারগ হলেন, তখন তিনি খুব জোরের সঙ্গে বললেন : যা সুস্পষ্ট, তাকে অজ্ঞতার দোহাই দিয়ে উড়িয়ে দে'য়া যায় না। সোজা কথায় তিনি বললেন : প্রকৃতির ভিতর উদ্দেশ্যমূলক ব্যবস্থার যে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে তাকে প্রকৃতির বহু ব্যাপারে অর্থ-আবিষ্কারে আমাদের অক্ষমতার দোহাই দিয়ে অপ্রমাণ করা যায় না। যেমন আমাদের পৃথিবীর শত শত ঘটনার ভিতর উদ্দেশ্যের সঙ্কেত সুস্পষ্ট, কিন্তু বিরাট আকাশের অনেক গ্রহ-নক্ষত্রের সঙ্গে আমাদের পরিচয় নাই, তাই তারা কোন স্রষ্টার উদ্দেশ্যের অভিব্যক্তি কি না, আমরা বলতে পারি না। কিন্তু এ অজ্ঞতা উদ্দেশ্যবাদের বিরুদ্ধে যুক্তি বলে বিবেচিত হতে পারে না। জ্ঞাতের অজ্ঞাতে যথাযথ প্রয়োগেই যুক্তির বৈশিষ্ট্য। যুক্তির সাহায্যে অজ্ঞাতকে কখনও জ্ঞাতের মাপকাঠি বলে ধরে নেয়া যেতে পারে না। ডক্টর মার্টিনো এবং তাঁর মতো যাঁরা ধর্ম-বিশ্বাসী যেমন ডক্টর ফ্লিণ্ট, এ'রা সবাই বিশ শতকের প্রথম দিকে ডারউইনের নাস্তিকতার প্রভাব থেকে চলতি ধর্মকে মুক্ত করবার উদ্দেশ্যে নানারকম যুক্তির সাহায্যে উদ্দেশ্যবাদ খাড়া করবার চেষ্টা করেছেন।

পাশ্চাত্ত্য দর্শনের ইতিহাসে অতি প্রাচীনকালেও উদ্দেশ্যবাদ দেখতে পাওয়া যায়। সক্রেটিস-পূর্ব গ্রীক-দর্শনের শেষ পর্বে এ্যানাক্সোগোরাস্ সৃষ্টির ব্যাখ্যায় চেতনের প্রাথমিক প্রেরণা স্বীকার করে, এই উদ্দেশ্যবাদই ঘোষণা করেছেন। সৃষ্টির আগে তার যে স্তূপাকৃতি বীজ ছিল, চেতনার প্রাথমিক স্পর্শেই তা থেকে সৃষ্টি শুরু। কার্য-কারণ-সম্বন্ধ বিশ্লেষণে আগেই বলেছি, তার কারণের তালিকায়

আরিষ্টটল উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন সিদ্ধিকেও সমস্ত ঘটনার অন্যতম প্রধান কারণ বলে নির্ণয় করেছেন। এই উদ্দেশ্যবাদের সপক্ষে মার্টিনো বলেছেন : নির্বাচন, সংযোজন ও স্তরবিন্যাস, এই তিনটি উদ্দেশ্যমূলক ক্রিয়ার অপরিহার্য লক্ষণ। প্রকৃতির রাজত্বে তার অসংখ্য অগণিত বৈচিত্র্যের ভিতর এই তিনটি ধর্ম দেখতে পাওয়া যায়। মহাসাগরের ভিতর যে দ্বীপের সৃষ্টি, এ তো একটা প্রকৃতির নির্বাচন ছাড়া আর কিছুই নয়। যেখানে আরো দশটা ঘটনা ঘটতে পারতো, কিন্তু তা না ঘটে বিশেষ কোনও ঘটনা ঘটেছে, তাকেই তো বলে নির্বাচন। প্রকৃতিতে এরই দৃষ্টান্ত ভূরি ভূরি। মার্টিনোর এই কথা লাইবনিজের সুপ্রসিদ্ধ মতেরই প্রতিধ্বনি। লাইবনিজ বলেছেন : বিশ্বসৃষ্টির আগে স্রষ্টার সামনে নানারকম সৃষ্টি-পরিকল্পনা ছিল, আমরা যে দুনিয়ায় বাস করছি, তা এই পরিকল্পনাগুলোর ভিতর সর্বোত্তম বলেই সৃষ্টিকর্তা শুভ প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে এ জগৎ সৃষ্টি করেছেন।

আগেই যে দ্বীপ সৃষ্টির দৃষ্টান্ত দিয়েছিলাম তা বহুদিনের উপাদান সংগ্রহের বা সংযোজনের ফল। প্রকৃতিতে এই সংযোজনের উদাহরণও প্রচুর। এই উপাদান সংযোজন অচেতন যান্ত্রিক পদ্ধতিতে কখনো সম্ভব হতে পারে না।

তা ছাড়া প্রকৃতিতে স্তরবিন্যাসও যথেষ্ট। যেমন, জগতের অচেতন বস্তুর দ্বারা নিম্নস্তরের প্রাণীর প্রয়োজন সিদ্ধি হতে দেখা যায়, আর নিম্নস্তরের প্রাণীদের দ্বারা উচ্চস্তরের প্রাণীদের উদ্দেশ্য সিদ্ধি হতেও দেখা যায়। জগতের বিভিন্ন স্তরের বস্তুর ভিতর এই যে উপায়-উপেয় ভাব, এটা কখনো যান্ত্রিক পদ্ধতিতে সম্ভব হতে পারে না।

যাই হোক, নির্বাচন, সংযোজন ও স্তর-ভেদ, বিশ্বের বিভিন্ন বস্তুর এই ত্রিবিধ লক্ষণ মার্টিনোর মতে এটাই প্রমাণ করে দেয় যে, এই বিশ্বজগতের পিছনে কোন চেতন সত্তার উদ্দেশ্য সিদ্ধির প্রেরণা কাজ করে যাচ্ছে।

এই উদ্দেশ্যবাদকে দুটি ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যেতে পারে। সৃষ্টি যে চেতন সত্তার ইচ্ছার অভিব্যক্তি, সে সত্তা জগতের বাইরে থেকে জগৎকে চালাচ্ছেন, অনেক উদ্দেশ্যবাদীর এই হলো মত। তাঁদের আর একদলের মত হলো : সে চেতন সত্তা বিশ্বের ভিতরে থেকেই তাকে চালাচ্ছেন। প্রথম মতের নাম দে'য়া যেতে পারে বাহ্য-উদ্দেশ্যবাদ, আর দ্বিতীয় মতের নাম দেয়া যেতে পারে আন্তর-উদ্দেশ্যবাদ।

বাহ্য উদ্দেশ্যবাদ

বাহ্য-উদ্দেশ্যবাদের বিরুদ্ধে অনেকে অনেক আপত্তি তুলেছেন। তাঁরা মনে করেন : বিশ্বের চালক চেতনা যদি তার বাইরে থেকে তাকে চালান, তাতে

তাঁর অসীমত্বের হানি হয়। স্রষ্টার সৃষ্ট বিশ্ব যদি তার বাইরে থাকে, তাহলে সে বিশ্বের দ্বারা স্রষ্টাই স মাবদ্ধ হয়ে যাবেন, এ আশঙ্কাই তাঁরা পোষণ করেন। এই আপত্তি আরো বিশ্লেষণ করে তাঁরা বলেছেন যে, স্রষ্টা যদি সৃষ্টির বাইরে থেকে সৃষ্টির ভিতর দিয়ে তাঁর উদ্দেশ্য রূপায়িত করেন তা হলে তাঁর কাজ অনেকটা ছুঁতোর-মিস্ত্রীর মতোই বলা চলে। ছুঁতোর মিস্ত্রী যেমন বাহির থেকে কাঠ নিয়ে তার বাটালি, করাত ও হাতুড়ি দিয়ে টেবিল, চেয়ার ইত্যাদি জিনিস তৈরী করে, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর যদি ঠিক সেভাবেই জগৎ সৃষ্টি করেন তবে তাঁর সর্বশক্তিমত্তা থাকে কি ক'রে? তাহলে তিনি কেমন ক'রে অসীম হতে পারেন?

ডারউইনের প্রচলিত ধর্মবিরোধী মত প্রচারিত হবার বেশ কিছু আগে হেগেল বাহ্য-উদ্দেশ্যবাদের ও যান্ত্রিক বিবর্তনের দোষ-ত্রুটি বেশ বুঝতে পেরে এই দু'টি মতকে পরস্পর-বিরোধী বলে অভিমত প্রকাশ করেন। আর তাঁর দ্বন্দ্ব-সমন্বয়কারী ডায়েলেক্‌টিকের মুগুরের সাহায্যে এ দু'টি মতের বিরোধ মিটিয়ে তিনি তাদের সমন্বয় ও সামঞ্জস্য খুঁজে পান আন্তর-উদ্দেশ্যবাদে।

আন্তর-উদ্দেশ্যবাদ

হেগেলের মতে এই বিশ্ব তার অন্তর্নিহিত এক বিরাট চেতনারই অভিব্যক্তি, তারই স্তরে স্তরে বিবর্তন। এ সত্তার বিবর্তন প্রথম মানুষের মনোজগতে, তার ভাবনা ক্ষেত্রে, তারপর এ চেতনার বিবর্তন বহির্বিশ্বে। তার শেষ অভিব্যক্তি এ-দুই পরস্পর বিরুদ্ধ, বিবর্তন-ধারার সমন্বয়ে। ইতিহাসের বিশ্লেষণের মাধ্যমে হেগেল আরো দেখিয়েছেন যে, মানুষের ইতিহাসের আগা থেকে গোড়া পর্যন্ত এই দ্বন্দ্ব-সমন্বয়াত্মক বিবর্তন।

তাঁর চিন্তার আদিপর্বে হেগেলের শিষ্য ও শেষ-পর্ব তাঁর উগ্র সমালোচক ও আজকের দিনের বাস্তববাদী কম্যুনিজমের পথিকৃৎ কার্ল মার্কস্ (১৮১৮—১৮৮৩) হেগেলের দ্বন্দ্বমূলক বিবর্তনবাদ থেকে বিশ্বচেতনার স্বীকৃতিকে সরিয়ে দিয়ে ও তাকে পুরোপুরি উদ্দেশ্যবাদ মুক্ত করে বহির্বিশ্বের বিবর্তনে হেগেলের দ্বান্দ্বিক সমন্বয়-নীতির প্রয়োগ করেছেন। তাঁর মতে, আমাদের অন্তর্জগতে যে বিবর্তন, তা এ বাহ্য বিবর্তনেরই প্রতিফলন। তাই হেগেলের দ্বান্দ্বিক বিবর্তন অধ্যাত্মবাদী· মার্কসের দ্বান্দ্বিক বিবর্তন পুরোপুরি বস্তুবাদী।

বিজ্ঞানে উদ্দেশ্যের সঙ্কেত

যান্ত্রিক বিবর্তনবাদের পরাজয় ও পরাভব যেমন প্রাণসত্তার বিশ্লেষণে, ঠিক তেমনি আজকের মতে উদ্দেশ্যবাদী বিবর্তনের পরাজয় ও পরাভব বিশ্ব-

চেতনার স্বীকৃতিতে। অনেক বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি-সম্পন্ন লোক বলে থাকেন: দুনিয়ার সত্তা-বিশ্লেষণে তার আদিতে কোন চেতনার সত্তা খুঁজে পাওয়া যায় না আমরা যে পৃথিবীতে বাস করছি, তার সৃষ্টির লক্ষ লক্ষ বছর পরে তাতে প্রাণের প্রথম আবির্ভাব। সেই প্রাণসত্তার লক্ষ লক্ষ বছর পরে নানা শ্রেণীর প্রাণীর বিবর্তন, আর তার কত পরে সচেতন মনের উৎপত্তি। নিষ্প্রাণ জড়সত্তা থেকে প্রাণ-সত্তার আবির্ভাব, আর প্রাণসত্তা থেকে চেতনার উৎপত্তির আঁকাবাঁকা ইতিহাস এত সুদীর্ঘ যে, আমাদের চলতি সহজ গণিতের অঙ্কের মারফত তার একটা হিসাব করাই অসম্ভব। তাই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে একথা বলা নিশ্চয়ই চলে না যে, বিশ্বের শুরুতে এক সর্বব্যাপী চেতনসত্তা বিদ্যমান।

ঠিক তেমনি এমন কথাও বলা চলে না যে, নিষ্প্রাণ জড়-সত্তা থেকে প্রাণের উৎপত্তি হলেও সে প্রাণ আর জড়সত্তা একেবারেই একজাতীয় পদার্থ। নিষ্প্রাণ জড়ের সঙ্গে প্রাণের তফাৎ সম্বন্ধে যে মন্তব্য করা হোল, প্রাণ ও চেতনার পারস্পরিক সম্বন্ধের ব্যাপারেও এ মন্তব্য পুরোপুরি প্রযোজ্য। প্রাণের লক্ষণ হলো তার আভ্যন্তরীণ প্রয়োজনেই বৃদ্ধি, পরিণতি ও ধ্বংস। কিন্তু এই প্রাণবান পদার্থের চিন্তা-ভাবনা, সুখ-দুঃখের অনুভূতি বা ইচ্ছার সংঘর্ষ নেই। এইখানেই চেতন মনের স্বধর্ম ও স্বাতন্ত্র্য। তাই জড়-সত্তা থেকে যারা প্রাণের উৎপত্তি অস্বীকার করেন, অথবা প্রাণবান পদার্থ থেকে চেতন মনের উৎপত্তি যাঁরা অস্বীকার করেন, তাঁদের মত গ্রহণযোগ্য নয়। শুধু আকাশচারী বৈজ্ঞানিক তথ্য-বিরোধী যুক্তি দ্বারা তত্ত্ব নির্ণয় হয় না। কাজেই জড়-সত্তা থেকে প্রাণের উৎপত্তি, প্রাণ থেকে মনের উৎপত্তি অনস্বীকার্য। কিন্তু এর সঙ্গে সঙ্গে আর একটা সত্যও অনস্বীকার্য: তা হলো জড়ের সঙ্গে প্রাণের ও প্রাণের সঙ্গে মনের বৈষম্য, অর্থাৎ প্রাণ ও মনের স্বাতন্ত্র্য। জড় ও প্রাণের এবং প্রাণ ও মনের এই নিবিড় যোগ ও গভীর পার্থক্য বোঝাবার জন্যে একদল দার্শনিক দ্বিবিধ পার্থক্য স্বীকার করেছেন: (১) পরিমাণগত পার্থক্য ও (২) প্রকারগত পার্থক্য। এক জড়বস্তুর সঙ্গে আর এক জড়বস্তুর, এক প্রাণবান পদার্থের সঙ্গে আর এক প্রাণবান পদার্থের, এক চেতনার সঙ্গে আর এক চেতনার তফাৎ প্রকারগত নয়, পরিমাণগত। তাদের কারো ভিতর জড়সত্তা কিছু বেশী, কারো ভিতর কিছু কম; আবার কারো ভিতর প্রাণসত্তা কিছু বেশী, আর কারো ভিতর কিছু কম। চেতনের সঙ্গে চেতনের বিভেদে ঠিক একই কথা বলা চলে। কিন্তু জড়ের সঙ্গে চেতনের, প্রাণের সঙ্গে মনের বিভেদে এ নিয়ম খাটে না, তাদের পার্থক্য পরিমাণগত নয়, প্রকারগত।

অভিনব উৎপত্তিবাদ

বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে জড় ও প্রাণের, প্রাণ ও মনের এই যে নিকট যোগ ও প্রকারগত পার্থক্য আবিষ্কৃত হয়েছে, তার ভিত্তিতে বিবর্তনবাদের এক নতুন ব্যাখ্যা আজকের দিনের দর্শনে পাওয়া যায়। এই নাম অভিনব-উৎপত্তিবাদ। ইংরেজীতে একেই বলে 'ইমারজেন্স'। এই অভিনব-উৎপত্তিবাদ ন্যায় বৈশেষিক দর্শনের অসৎকার্যবাদ বা আরম্ভবাদেরই পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ, অর্থাৎ বিশ্ব-বিবর্তনের ক্ষেত্রে প্রয়োগের অপরিহার্য ফল। এই অভিনব উৎপত্তিবাদী বিবর্তনের তিনজন বড় সমর্থকের মত আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করতে চাই। তাঁরা হলেন: জীববিজ্ঞানী লয়েড মর্গ্যান, বাস্তববাদী দার্শনিক স্যামুয়েল আলেকজাণ্ডার, আর সাম্প্রতিক স্বজ্ঞাবাদী দার্শনিক আঁরি বের্গসঁ।

লয়েড মর্গ্যানের অভিমত

লয়েড্ মর্গ্যান তাঁর বিবর্তনবাদের ব্যাখ্যায় বিশ্বজগতের বিভিন্ন স্তরে অভিনব উৎপত্তি স্বীকার করেছেন। তিনি বলেন: বিবর্তনের শুরু নিষ্প্রাণ জড় পদার্থ নিয়ে। এ নিষ্প্রাণ জড় থেকেই প্রাণের উৎপত্তি। এই প্রাণসত্তার সঙ্গে তার আদি উপাদান জড় বস্তুর পার্থক্য প্রকারগত। কাজেই প্রাণ বিবর্তনের একটি অভিনব সৃষ্টি। এই প্রাণ থেকেই চেতনার সৃষ্টি। এ চেতনা বা মানসসত্তার সঙ্গে প্রাণের পার্থক্যও প্রকারগত, তাই প্রাণ যেমন বিবর্তনের এক অভিনব সৃষ্টি, তেমনি চেতন বা মনও বিবর্তনের আর একটি অভিনব সৃষ্টি। লয়েড্ মর্গ্যানের মতে বিবর্তনের তাই তিনটি স্তর। তার নিম্নস্তরে জড়সত্তা মধ্যস্তরে প্রাণসত্তা, আর সর্ব উচ্চস্তরে চেতনা বা মন। তবে এ স্তরগুলো অতি নিকট সম্বন্ধে জড়িত। জড়ের পরিধি ব্যাপকতম। তার একাংশেই প্রাণের উৎপত্তি। আর সেই প্রাণের একাংশেই চেতনার উৎপত্তি। অতি পুরোনো দিনের ইজিপ্টের পিরামিডের ভিত্তিভূমি যেমন বিস্তারিত, আর তার অগ্রগতির পরিধি যেমন সঙ্কীর্ণ থেকে সঙ্কীর্ণতর, ঠিক সেই রকম লয়েড্ মর্গ্যানের অভিনব উৎপত্তিবাদের ভিত্তিভূমিও খুব বিস্তারিত, আর তার অগ্রগতি সঙ্কীর্ণ থেকে সঙ্কীর্ণতর। সেজন্য লয়েড মর্গ্যানের বিবর্তনবাদকে পিরামিডের সঙ্গে তুলনা করা বেশ কিছুটা রেওয়াজ।

লয়েড মর্গ্যান মনে করেন: ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জড়-জগতের সত্তা যেমন অস্বীকার করা চলে না, তেমনি বিশ্বের বিবর্তনের পেছনে ঐশী সত্তার প্রেরণাও অস্বীকার করা চলে না। প্রয়োজনের তাগিদে এ-দুয়ের সত্তা তুল্যভাবে স্বীকার্য। জড়সত্তা বিবর্তনের আদি উপাদান, আর ঐশী সত্তা বিবর্তনের আদি প্রেরণা। এ দু'টির কোন একটিকে বাদ দিয়ে বিশ্ববিবর্তনের সঙ্গত ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায় না।

অভিনব উৎপত্তির রহস্য জড়-সত্তার সাহায্যে ব্যাখ্যা করতে অপারগ হয়ে লয়েড মর্গ্যান শেষ পর্যন্ত ঈশ্বর-বিশ্বাসের মাধ্যমে তাঁর অভিনব-উৎপত্তিবাদী বিবর্তনবাদের সঙ্গত ব্যাখ্যা খুঁজে বের করবার চেষ্টা করেছেন।

আলেকজাণ্ডারের অতি মানস-সত্তা

লয়েড্ মর্গ্যানের সমসাময়িক আর একজন দার্শনিক ঈশ্বরের সত্তা আগে থেকে না মেনেই অভিনব-উৎপত্তিবাদ স্বীকার করেছেন। তিনি মর্গ্যানেরই স্বদেশবাসী বিবর্তনবাদী দার্শনিক স্যামুয়েল আলেকজাণ্ডার। লয়েড মর্গ্যান জড়সত্তাতেই বিশ্বের আদি উপাদান খুঁজে পেয়েছেন। আলেকজাণ্ডার জড়সত্তারও মূল উপাদান খুঁজতে গিয়ে বিশ শতকের বিজ্ঞানে আবিষ্কৃত দেশ-কালকে বিশ্বের মূল উপাদান বলে মেনে নিয়েছেন। দেশ বা স্থানের স্বভাব হলো স্থিতি, আর কালের স্বভাব হলো গতি। দেশ ও কাল আসলে যদি একই সত্তার এ-পিঠ আর ও-পিঠ হয়, তাহলে তার স্বভাব গতিশীলই হ'য়ে গেল। এই গতিশীল সত্তা থেকেই বিশ্বের বিবর্তন শুরু। সর্বব্যাপী ঈশ্বর বলে কিছু সৃষ্টির আদিতে পাওয়া যায় না। তাই ঈশ্বর থেকেই বিশ্ব-বিবর্তনের প্রেরণা, এ-কথা বলা চলে না। দেশ-কালের গতিশীলতাই তার বিবর্তনের কারণ। আর এই বিবর্তনের প্রথম ধাপ গতিশীল দেশ-কালে জড়-পদার্থের উদ্ভব। এই জড়ত্ব দেশ-কালে আগে থেকে ছিল না। কাজেই এই জড়ত্ব দেশ-কালের এক নতুন স্বভাব, তবে দেশ-কালের সঙ্গে জড়-পদার্থের যোগ অত্যন্ত নিকট, তাদের ভিতর কোন ব্যবধান নাই। আর এই গতিশীলতার প্রভাবেই জড়-সত্তায় প্রাণের আবির্ভাব। এই প্রাণসত্তা জড়-বস্তুতে নাই, তাই প্রাণও বিবর্তনের এক অভিনব সৃষ্টি। তথাপি এ দু'য়ের মাঝখানে কোন অলঙ্ঘনীয় ব্যবধান নাই। দেশ-কাল ও জড়-পদার্থের মতোই, জড় পদার্থ ও প্রাণের সম্বন্ধ অতি নিকট ও নিবিড় আর এই বিবর্তনের প্রভাবেই কালক্রমে প্রাণ থেকে মনের সৃষ্টি। এই মনও প্রাণ থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, অথচ মন ও প্রাণের ভিতর কোন অচলায়তন নাই। তাই জড়বস্তু প্রাণ ও মন পরস্পর থেকে অত্যন্ত স্বতন্ত্র, একথা মেনে নিয়েও তাদের নৈকট্য ও ব্যবধান-রাহিত্য আলেকজাণ্ডার স্বীকার করেছেন।

আলেকজাণ্ডারের মতে বিশ্ব-বিবর্তন ও তার সুনিশ্চিত ফল, নতুনের সৃষ্টির শেষ নাই। বিবর্তনের ফলে মনের পর দেশ-কালে যে নতুন ধর্ম উৎপন্ন হবে বা হয়তো আমাদের অজ্ঞাতে হয়েছে, আলেকজাণ্ডার তার নাম দিয়েছেন দেবত্ব-ধর্মী অতি-মানস-সত্তা।

আমরা মনের সাহায্যে তার নিম্নস্তরের পদার্থগুলোকে, যেমন জড়বস্তু ও প্রাণকে, জানতে পারি। বিবর্তন-ধারায় যা মনের অগ্রবর্তী, মন তাকে কখনো

জানতে পারে না। যাই হোক, অতি-মানস-সত্তার সৃষ্টিও বিবর্তনের শেষ-পর্ব নয়, যে গতিশীলতার দরুন বিবর্তনের সূচনা, সেই গতিশীলতার ফলেই দেশ-কালে অতি-মানস-সত্তার চেয়েও পূর্ণতর কিছু আবির্ভূত হবে, আর এই পূর্ণতার দিকে ক্রমিক অগ্রগতি বিবর্তনের বিশেষ ধর্ম। গতিশীল দেশ-কালের চেয়ে তার প্রথম সৃষ্ট জড়বস্তুর স্বভাব পূর্ণতর। জড়ের চেয়ে প্রাণসত্তায়, প্রাণের চেয়ে মনে, আর মনের চেয়ে পূর্ণত্বের অধিক প্রকাশ অতি-মানস-সত্তায়। এই ভাবেই বিবর্তনের স্বভাব হলো পূর্ণতার দিকে ক্রমিক পদক্ষেপ। ধর্মশাস্ত্রে বিশ্বের স্রষ্টা পরিপূর্ণ ঈশ্বরের যে পরিকল্পনা, আসলে তা দেশ-কালের অন্তর্নিহিত এই পূর্ণত্ব লাভের প্রেরণা ছাড়া আর কিছুই নয়। সুতরাং বিশ্বের স্রষ্টা ঈশ্বর না মেনেও আলেকজাণ্ডার বিশ্বের অন্তর্নিহিত পূর্ণতা লাভের প্রেরণাকেই ঈশ্বর বলে মেনে নিয়েছেন।

বের্গসঁর সৃজনী বিবর্তন

লয়েড মর্গ্যান ও আলেকজাণ্ডার প্রকৃতির বিভিন্ন স্তরে নতুনের সৃষ্টি স্বীকার করেছেন। কিন্তু ফরাসী দার্শনিক বের্গসঁ বলেন: বুদ্ধির দাসত্ব থেকে মুক্তি পেয়ে মানুষ যদি স্বজ্ঞার সাহায্যে প্রকৃতির সঙ্গে গভীর যোগ সাধন করতে পারে, তখন সে দেখে প্রকৃতিতে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সর্বত্রই নতুনের সৃষ্টি। পুরাতন নতুনের ভিতর নিজের সত্তা মিশিয়ে ফেলে নতুনের সৃষ্টির পথ প্রশস্ত করে, এই-ই হলো বের্গসঁর সৃজনী বিবর্তনবাদের মূল কথা। তাই লয়েড মর্গ্যান ও আলেকজাণ্ডার আংশিক অভিনব উৎপত্তিবাদী আর বের্গসঁ পূর্ণ অভিনব-উৎপত্তিবাদী।

বের্গসঁর মতে যান্ত্রিকতাবাদ ও উদ্দেশ্যবাদ বিবর্তনে যে স্বাতন্ত্র্যের অভিব্যক্তি তার পুরোপুরি বিরোধী। যান্ত্রিকতাবাদ অতীতের দ্বারা বর্তমানকে আর উদ্দেশ্য-বাদ ভবিষ্যতের দ্বারা বর্তমানকে নিয়ন্ত্রিত করে। একটি যন্ত্রের, যেমন আমাদের হাত-ঘড়ির কোন স্বাতন্ত্র্য বা স্বাধীনতা নাই, বারোটার সময় ঘড়ির প্যাণ্ডুলামে বার বার ঠিক একই রকমের আওয়াজ হয় আর ঘড়ির ঘণ্টা, মিনিট ও সেকেণ্ডের কাঁটা পূর্বনির্ধারিত নিয়ম অনুসারেই নিজের নিজের জায়গায় থাকে। যান্ত্রিক বিবর্তনে কোন স্বাতন্ত্র্য নাই, থাকতে পারে না। ঠিক তেমনি উদ্দেশ্যবাদী বিবর্তনও সম্পূর্ণরূপে স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যের বিরোধী। যে ছাত্র পরীক্ষা পাশের জন্য দিনরাত পড়াশোনা করছে তার স্বাতন্ত্র্য বা স্বাধীনতা নাই তার পরীক্ষা পাশ করার ইচ্ছাই তার চলাফেরাকে সম্পূর্ণরূপে একই ধারায় চালাচ্ছে। কাজেই বের্গসঁ বলেন : যান্ত্রিকতাবাদ ও উদ্দেশ্যবাদের বিবাদ ভিত্তিহীন ও অমূলক, তাদের আসল কথা এক। মানুষের বুদ্ধি নতুনের সৃষ্টি বুঝে উঠতে পারে না,

কারণ বুদ্ধির কাজ হলো : যা জানা আছে, তারই ভিতরই অজানাকে খুঁজে বের করা। প্রতিজ্ঞা বাক্যের ভেতর সিদ্ধান্ত খুঁজে না পেলে বুদ্ধির অনুমোদিত তর্ক হয় না, হেত্বাভাস বা দোষযুক্ত তর্কই হয়। তাই বুদ্ধিবাদী উদ্দেশ্যবাদ প্রকৃতির বিবর্তনে স্বাতন্ত্র্য ও তার সার্থক ব্যাখ্যা খুঁজে পায় না।

ল্যামার্ক বলেছেন : পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য স্থাপনই বিবর্তনের উদ্দেশ্য। কিন্তু একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যায় যে, প্রকৃতির বিবর্তনের কোন উদ্দেশ্য নাই, এ বিবর্তন নিরুদ্দেশ যাত্রা ছাড়া আর কিছুই নয়। একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে এ কথা বুঝিয়ে দেয়া যেতে পারে। এই যে আমাদের চোখের সৃষ্টি পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য স্থাপনই যদি এর উদ্দেশ্য হতো তাহলে প্রকৃতির ভাণ্ডারে চোখের মতো এমন একটি জিনিস সৃষ্টি হতো না, এর অনেক উপাদান না থাকলেও দেখার কাজ হয়তো আরও ভালোভাবে হয়ে যেতো। তাই চোখের সৃষ্টির মূলে কোন উদ্দেশ্য খুঁজে পাওয়া যায় না। তেমনি ডারউইনের আকস্মিক উৎপত্তিবাদও স্বীকার করা যায় না। আকস্মিক উৎপত্তিবাদ অনুসারে বিবর্তনের গতি গ্রীক পুরাণের কচ্ছপের মতোই ধীর ও মন্থর। এ ধীর-মন্থর পদ্ধতিতে লক্ষ লক্ষ বছর এক জাতের প্রাণীর দৈহিক পরিবর্তনের ফলে আর এক জাতের প্রাণীর সৃষ্টি হতে পারে, যেমন ডারউইনের মতে মানুষও বানরের এক আদি পুরুষ থেকে উৎপত্তি। কিন্তু প্রকৃতির বিবর্তনের গতি সব সময় এতো মন্থর নয়। মাঝে মাঝে প্রকৃতির বিবর্তনের গতি অত্যন্ত আঁকাবাঁকা। তাতে ওঠা-নামা প্রচুর। প্রকৃতিতে আবার আকস্মিকভাবে স্বভাবের পূর্ণ পরিবর্তনের উদাহরণও প্রচুর। ইংরেজীতে একেই বলে 'মেটামরফোসীস'। হনুমান যেমন সহজ পদ্ধতি ছেড়ে লাফ দিয়ে সমুদ্র লঙ্ঘন করেছিল, প্রকৃতির বিবর্তনেও এ রকম অস্বাভাবিক গতি প্রচুর দেখা যায়। এক জাতের প্রাণীর দেহ আস্তে আস্তে পরিবর্তিত না হয়ে হঠাৎ আর এক জাতের প্রাণী-দেহে পরিবর্তিত হয়ে যায়। অনেক পোকা-মাকড়ের বেলায় এ জাতীয় পরিবর্তন দেখা যায়।

বের্গস্ বলেন : আরিষ্টটল থেকে আরম্ভ করে হার্বার্ট স্পেনসার পর্যন্ত সকলেই বিবর্তনের ব্যাখ্যায় এক মারাত্মক ভুল করেছেন। তাঁরা মনে করেন : বিশ্ব-বিবর্তনের গতি ইউক্লিডের জ্যামিতির সরলরেখার গতির মতোই একমুখী। তাই তাঁরা সবাই জড় পদার্থ থেকে প্রাণের, প্রাণ থেকে মনের উৎপত্তি দেখিয়ে বিবর্তনের গতি সরলরেখার গতির মতোই কল্পনা করেছেন। আসলে প্রকৃতির বিবর্তন বহুমুখী, অনন্ত ধারায় প্রবাহিত, তার তিনটি ধারার অর্থাৎ জড়, প্রাণ ও মনের বিবর্তনের সঙ্গেই আমাদের পরিচয়। প্রকৃতির এই বিবর্তনের কোন উদ্দেশ্য খুঁজে পাওয়া যায় না; আর এ-বিবর্তন যান্ত্রিকতার প্রভাব থেকেও সম্পূর্ণরূপে

মুক্ত, যদিও প্রকৃতির বিবর্তনে, বিশেষতঃ প্রাণের ব্যাখ্যায় যান্ত্রিকতার চেয়ে উদ্দেশ্যবাদ অধিকতর সঙ্গত বলে মনে হওয়া স্বাভাবিক।

আমরা যে পুরাতন থেকে নতুনের উৎপত্তি বুঝতে পারি না, এটা আমাদের বুদ্ধিরই ত্রুটি। যেটা নাই, তার উৎপত্তি যে আমরা স্বীকার করি না, তার কারণ বুদ্ধির দাসত্ব। এ-দাসত্ব থেকে মুক্তি পেলে আমরা বুঝতে পারি চলাই প্রকৃতির স্বভাব। আর এই চলার স্বভাব স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা। অসৎ থেকে সত্তের উৎপত্তি স্বীকার ক'রে বের্গসঁ সৃষ্টিবাদ মেনে নিয়েছেন। আর এই সৃষ্টিবাদকে প্রকৃতির স্বাধীন উদ্দেশ্যহীন অনন্ত ধারার বিবর্তনে রূপায়িত ক'রে সৃষ্টি ও বিবর্তনের ভিতর সহজ দৃষ্টিতে যে ব্যবধান তা-ও তিনি দূর করেছেন। এই জন্যেই তাঁর বিবর্তনবাদের নাম সৃজনী বিবর্তনবাদ।

প্রকৃতির এই উদ্দেশ্যহীন স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীন অভিব্যক্তির নাম বৈদান্তিকরা দিয়েছেন লীলা, আর তাঁদেরই পাশ্চাত্ত্য দোসর প্লোটাইনাস এরই নাম দিয়েছেন 'উৎসরণ', অর্থাৎ 'ইম্যানেশন'। বেদান্ত-দর্শনের ব্যাখ্যাতারা বলেছেন: আপ্ত-কাম আত্ম-তৃপ্ত ব্রহ্মের বিশ্বসৃষ্টির পেছনে কোন প্রয়োজনসিদ্ধির প্রেরণা থাকতে পারে না। কাজেই রাজা যেমন প্রজাদের কাছ থেকে কিছু পাওয়ার ইচ্ছা না থাকলেও পুরনো কালের রাজতন্ত্রের যুগে ছদ্মবেশে প্রজাদের অবস্থা পরিদর্শন করতেন, আর ছোট ছোট ছেলেরা যেমন কিছু পাওয়ার জন্যে নয়, শুধু আনন্দের জন্য খেলাধুলায় মেতে থাকে, তেমনি বিশ্বস্রষ্টা বিনা প্রয়োজনেই শুধু তাঁর অন্তর্নিহিত আনন্দ-উপভোগের জন্যেই বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন। প্লোটাইনাস্‌ও অনেকটা এভাবেই বলেছেন: পানির আতিশয্য ও স্বাভাবিক গতির জন্যেই যেমন তা থেকে ফোয়ারার সৃষ্টি, ঠিক সে-রকম বিশ্বের আদি সত্তা থেকে তার পূর্ণত্বের প্রভাবে বিশ্বের সৃষ্টি। সুতরাং বের্গসঁর সৃজনী বিবর্তনবাদের সঙ্গে অতি প্রাচীন বেদান্তের ও প্লোটাইনাসের সৃষ্টিবাদের যে কিছুটা মিল আছে, তা অস্বীকার করা চলে না।

নবম অধ্যায়

জড়-পরিচিতি

সৃষ্টির তিন স্তর

সৃষ্টি ও বিবর্তনের আলোচনা শেষ করার পর বিশ্বের অসংখ্য বৈচিত্র্যের ভিতর যে তিনটি ভিন্ন পৃথক সত্তা সহজবুদ্ধিতে আমাদের চোখে পড়ে, তাদের স্বরূপ ও স্বভাব একটু বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। তারা হলো: নিষ্প্রাণ জড় বস্তু, সজীব, প্রাণবান পদার্থ, আর চেতনা বা মন। জড় সত্তাকে নিয়ে আমরা আলোচনা শুরু করতে চাই; কারণ, অন্ততঃ আপাতদৃষ্টিতে, জড় সত্তা থেকেই প্রাণের, আর প্রাণ থেকেই চেতনার উৎপত্তি। সুতরাং জড়কে বাদ দিয়ে প্রাণের স্বরূপ বিশ্লেষণ, আর প্রাণকে বাদ দিয়ে চেতনার স্বরূপ বিশ্লেষণ অসম্ভব।

জড়ের স্বভাব নিয়ে আলোচনা দর্শনের আদি যুগ থেকে দেখতে পাওয়া যায়। প্রাচীন গ্রীসে খ্রীস্টপূর্ব পঞ্চম শতকে ডেমোক্রিটাস তাঁর পরমাণুবাদে জড়ের স্বভাব নিয়ে বেশ কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা করেন।

কণাদ ও ডেমোক্রিটাসের পরমাণুবাদ

ন্যায়-দর্শনেরও পূর্ববর্তী কণাদের বৈশেষিক দর্শনের সূত্রে এই পরমাণুবাদের আলোচনা দেখতে পাওয়া যায়। কারো কারো মতে ডেমোক্রিটাসের পরমাণুবাদের ধারা কণাদের পরমাণুবাদের দ্বারা প্রভাবিত। আবার কেউ কেউ এর ঠিক উল্টো সিদ্ধান্ত করে থাকেন। তাঁদের মতে ডেমোক্রিটাসের পরমাণুবাদ কণাদের পরমাণু-বাদের দূর প্রতিধ্বনি।

সে সুদূর অতীতের ইতিহাস আজও পুরোপুরি আবিষ্কৃত হয়নি, কখনো হবে কি-না জানি না। তাই একের প্রভাব অন্যের ওপর আরোপের এই চেষ্টা স্বদেশি-কতা ও আঞ্চলিক প্রীতির আর এক উদাহরণ বলে ধরে নিলে হয়তো বিশেষ ভুল হবে না। সে খ্রীস্টপূর্ব যুগে যখন যান-বাহনের যোগাযোগ ব্যবস্থা অত্যন্ত সংকীর্ণ ছিলো, তখন ডিমোক্রিটাস ও কণাদ, উভয়েরই অজ্ঞাতসারে তাঁদের স্বাধীন চিন্তা ও সৃজনী প্রতিভার ফলেই পরমাণুবাদের সৃষ্টি—এ-অনুমানই যুক্তিযুক্ত মনে হয়।

একেই অধ্যাপক রাধা কৃষ্ণন নাম দিয়েছেন হিস্টোরিক্যাল প্যারালালিজম. ঐতিহাসিক সাদৃশ্য বা ইতিহাসের মিল।

নিষ্প্রাণ জড়ের ব্যাখ্যায় অতি স্বাভাবিকভাবেই নানা জায়গায় নানা যুগে পরমাণুবাদের সৃষ্টি। খ্রীস্টীয় সপ্তম শতকে ও তারপরে মধ্যযুগের মুসলিম দার্শনিকদের ভিতরও পরমাণুবাদ দেখা যায়। যে সমস্ত বৌদ্ধ দার্শনিক বাইরের জগতের সত্তায় বিশ্বাসী, তাঁরাও পরমাণুবাদ স্বীকার করেছেন। এঁদের মতের প্রসার হয়েছে খ্রীস্ট-যুগে, সম্ভবতঃ পঞ্চম শতকের কাছাকাছি সময়ে।

আমাদের সহজ অভিজ্ঞতায় আমরা দেখতে পাই, নিষ্প্রাণ জড়বস্তুকে ভেঙে টুকরো টুকরো করা যায়। এই সুপরিচিত অভিজ্ঞতাকে সহজবুদ্ধিতে বিশ্লেষণ করে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, জড় পদার্থকে টুকরো টুকরো করে শেষ পর্যন্ত এমন এক জায়গায় পোঁছা যায়—যেখানে তার উপাদানকে আর ভেঙে টুকরো টুকরো করা যায় না। জড় পদার্থের এই অবিভাজ্য অন্তিম উপাদানের নামই পরমাণু।

ডেমোক্রিটস বলেন: মহাশূন্যের ভিতর মাটি, জল, বায়ু ও তেজ এই চার রকম জড় পদাথের অবিভাজ্য অংশ সব ছড়িয়ে রয়েছে। তাঁর মতে সব পরমাণুর পরিমাণ এক রকম নয়। কোনোটা বড়, কোনোটা ছোট। আর তাদের চেহারাতেও নানা রকম তফাত। পারস্পরিক আকর্ষণে মাটির এক পরমাণুর সঙ্গে তার অন্য এক পরমাণুর যোগ। এভাবেই ক্রমে ক্রমে স্থূল পৃথিবী ও তার যাবতীয় পদার্থের সৃষ্টি। জল, বাতাস ও আগুন সৃষ্টির বেলায়ও এই একই নিয়ম। ডেমোক্রিটাস বলেন: জড়বস্তুর পরিমাণের তারতম্য সদৃশ পরমাণুর সঙ্গে বিসদৃশ পরমাণুর অনিবার্য সংযোগের ফল। সাধারণতঃ সদৃশ পরমাণুই সদৃশ পরমাণুকে আকর্ষণ করে, কিন্তু কখনো কখনো সদৃশ পরমাণুর সঙ্গে বিসদৃশ পরমাণু এসে যুক্ত হয়। তার জন্যেই বস্তুর চেহারায় খানিকটা মিল ও খানিকটা গরমিল। যেমন মানুষের শরীরের মধ্যভাগে যে সামঞ্জস্য অপর অঙ্গে তার ব্যতিক্রম।

যাই হোক, কণাদ ও ডেমোক্রিটাস উভয়েই জড় পদার্থকে শুধু নিষ্প্রাণ বলেই মনে করেননি, তাঁদের মতে জড় পদার্থের চলার ক্ষমতাও নেই। তবে পরমাণু-বাদকে কণাদ যে রূপ দিয়েছেন, তা যে অধিকতর যুক্তিসঙ্গত—তা অস্বীকার করা চলে না। কণাদ মাটি, পানি, বাতাস ও আগুন এই চার রকম জড়বস্তুর সত্তা স্বীকার করেছেন, আর কল্পনায় তাদের ভাগ করতে করতে শেষ পর্যন্ত চার রকম পরমাণুর সত্তাও স্বীকার করেছেন। তবে এই পরমাণুগুলো ডেমোক্রি-টাসের পরমাণুর মতো চেহারায় ছোট বড় নয়, সবগুলোই পরিমাণে ও চেহারায়

সমান। তাদের দৈর্ঘ্যও নেই, প্রস্থও নেই ; কাজেই তারা অবিভাজ্য। ডেমোক্রিটাসের পরমাণু কোনটা ছোট, কোনটা বড়, তাদের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ আছে। কাজেই কার্যতঃ না হোক অন্ততঃ চিন্তায় তাদের ভাগ কল্পনা করা যায়। কিন্তু কণাদের পরমাণুগুলো দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-বিহীন হওয়ায় সর্বতোভাবে অবিভাজ্য। কণাদ আবার তাঁর পরমাণুবাদের পক্ষে বেশ কিছু যুক্তিও দিয়েছেন। তিনি বলেন : কোন জড়বস্তু যে পরিমাণে ছোট আর বড়, তার কারণ, প্রথমটির ভিতর পরমাণুর সংখ্যা কম, আর দ্বিতীয়টির ভিতর বেশী। আর জড়বস্তুর বিভাগের যদি একটা সীমারেখা না থাকে, তবে শেষ পর্যন্ত তাদের সকলেরই পরিমাণ সীমাহীন হওয়া উচিত। একটি ছোট জিনিসকে যদি অসংখ্য ভাগে ভাগ করা যায়, তাহলে সেই অসংখ্য ভাগগুলোর যোগফল হিসাবে সে বস্তুটি আর সসীম হতে পারে না, অসীমই হয়ে যায়। এই সব যুক্তির সাহায্যে কণাদ তাঁর পরমাণুবাদের ভিত্তি যুক্তিসঙ্গত করার চেষ্টা করেছেন।

কণাদ আবার দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-বিহীন পরমাণু থেকে কি করে দৈর্ঘ্য-প্রস্থযুক্ত জড় পদার্থের উৎপত্তি, তারও কিছুটা কাল্পনিক ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। দু'টি দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-বিহীন পরমাণুর সংযোগে যে বস্তুর সৃষ্টি, তার নাম দ্ব্যণুক। দ্ব্যণুকের প্রস্থ আছে, কিন্তু দৈর্ঘ্য নাই। আর দুটি দ্ব্যণুকের সংযোগে যে বস্তুর সৃষ্টি, তার নাম ত্রসরেণু। এর দৈর্ঘ্য-প্রস্থ দুই-ই আছে। এই ত্রসরেণুই ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য জড় পদার্থের আদিরূপ, এরই সম্মিলনে সমস্ত জড়বস্তুর উৎপত্তি।

ডেলটনের বৈজ্ঞানিক পরমাণুবাদ

কণাদে ও ডেমোক্রিটাসে পরমাণুবাদের যে অবৈজ্ঞানিক রূপ দেখতে পাওয়া যায়, আঠারো শতকের শেষে ও উনিশ শতকের প্রথমে তাকে বৈজ্ঞানিক রূপ দিয়েছেন ব্রিটিশ বিজ্ঞানী ডেলটন তাঁর পরমাণুবাদে। নানা রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাহায্যে ডেলটন প্রমাণ করেন যে, জড় পদার্থের আদিম উপাদান কতগুলো অবিভাজ্য পরমাণু। সেই পরমাণুগুলো স্থির ও নিশ্চল। তাদের সবগুলোর চেহারা এক রকমের নয়। কোনটি ছোট, কোনটি বড়। এ পরমাণুগুলো নিচ্ছিদ্র। এই ছোট বড় পরমাণুর সংযোগে বিভিন্ন রকম জড়পদার্থের সৃষ্টি হওয়ায় তাদের পরিমাণে এত তারতম্য। তাই একথা সুস্পষ্ট যে, ডেলটনের পরমাণুবাদ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ডেমোক্রিটাসের পরমাণুবাদেরই মোটামুটি সমর্থন ও পুনরাবৃত্তি। ডেমোক্রিটাস, কণাদ ও ডেলটন, এঁদের সকলের পরমাণুবাদেরই মূলকথা হলো জড়বস্তুর আদি-উপাদান অবিভাজ্য, নিচ্ছিদ্র ও নিশ্চল। জড়বস্তু সম্বন্ধে এই ধারণা আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগে বিশেষভাবে

প্রচার করেছেন মহাবিজ্ঞানী নিউটন। জড়বস্তুর সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য এই যে, জড় সর্বতোভাবেই পরতন্ত্র ও পরাধীন। জড় আপনা থেকে চলতে পারে না, আর চালিয়ে দিলে চলা বন্ধ করার ক্ষমতাও তার নাই। তাই জড় দু'দিকেই নিষ্ক্রিয়। নিউটনের আবিষ্কৃত এ সত্যেরই নাম 'নিষ্ক্রিয়তার নিয়ম'।

আজীবন অবিবাহিত ভাবুক বিজ্ঞানী নিউটন মানস-নেত্রে আজকের দিনের বিবি সাহেবাদের আদেশে নিশ্চল ও চলমান সুসভ্য স্বামীদের দেখে জড়ের নিষ্ক্রিয়তার নিয়ম আবিষ্কার করেছিলেন কি-না জানি না। তবে উভয়ের সাদৃশ্য যে সুস্পষ্ট, তা অনস্বীকার্য।

সাংখ্য-দর্শনে জড়ের সক্রিয়তা

ভারতীয় দর্শনের আদি যুগে সাংখ্য-দর্শনে এর ঠিক উল্টো মতই দেখতে পাওয়া যায়। সাংখ্য-দর্শনের মতে জড়ের স্বভাব চলা, আর জড়ের এই চলা কখনো বন্ধ হয় না। জড়ের অত্যন্ত বিপরীত চেতনই অচঞ্চল। জড়ের তিনটি ধর্ম : সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। সত্ত্ব জ্ঞান উৎপত্তির সহায়ক, রজঃ চাঞ্চল্যকর, আর তমঃ আলস্যকর। এই তিনটি গুণ যখন জড়বস্তুর ভিতর সমানভাবে থাকে, তখন জড়ের পরিবর্তন থেকে নতুন কিছুর উৎপত্তি হয় না। যখন জড়-বস্তুর ভিতর এই তিন ধর্মের কোনোটি বেশী কোনোটি কম থাকে, তখনই তা থেকে নতুন জিনিসের উৎপত্তি হয়। এইসব সৃষ্ট পদার্থ আগে থেকেই তাদের জড় উপাদানে অব্যক্ত বা লুক্কায়িত অবস্থায় আছে। তাই নতুনের উৎপত্তির মানে বিকাশ বা অভিব্যক্তি।

সাংখ্য-দর্শনে জড়বস্তুর পারিভাষিক নাম 'প্রকৃতি', আর জড়ের অত্যন্ত বিপরীত চেতনের নাম 'পুরুষ'। 'প্রকৃতি' কথার আক্ষরিক অর্থ, যা বিশেষ কিছু করে। প্রকৃতির এই আক্ষরিক অর্থ থেকেই জানা যায় যে, প্রকৃতি বা জড়ের স্বভাব চলা বা পরিবর্তন। 'পুরুষ' কথার আক্ষরিক অর্থ জীবের অন্তরে যিনি অধিষ্ঠিত। এ থেকেই বোঝা যায় পুরুষের স্বভাব না চলা বা স্থির থাকা। সাংখ্য-দর্শনের মতে আমরা যাকে মন বলি তাও জড়; কারণ মনের স্বভাবও চলা বা পরিবর্তন। আমরা যাকে প্রাণ বলি, তাও জড়, কারণ প্রাণের স্বভাবও বদলানো। সাংখ্যের অচঞ্চল চেতন পুরুষ মন ও প্রাণ উভয়েরই অতীত।

লাইবনিজের সক্রিয় জড়

সতেরো শতকের জার্মান দার্শনিক লাইবনিজ জড়ের স্বভাব যে চলা এ-মত প্রকাশ করেছেন। দেকার্ত, নিউটনের মতোই জড়বস্তু যে চলতে পারে না,

এ-মতই পোষণ করেছেন। দেকার্তে'র মতেও, জড়ের স্বভাব বিস্তৃতি,—বিস্তৃতি মানে বেড়ে যাওয়া নয়, স্থিতি। লাইবনিজ বলেন, এ-মত গ্রহণযোগ্য নয়।

জড়বস্তুর স্বভাব বদলানো। যদিও অনেক সময় জড়ের এই পরিবর্তন আমাদের নজরে পড়ে না, তাহলেও জড় যে সব সময়ই বদলাচ্ছে, তা অস্বীকার করার উপায় নাই। কারণ জড়ের স্বভাব যদি বিস্তৃতি হয়, তাহলে তাকে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে আমরা এমন অবস্থায় পৌঁছাতে পারি যেখানে তার আর পরিমাণ থাকে না। জড়বস্তু যতই ছোট হোক, তার যদি পরিমাণ থাকে তাহলে তাকে নিশ্চয়ই ভাঙ্গা যায়, কাজেই জড়ের আদি সত্তা যে অবিভাজ্য পরমাণু, তার পরিমাণ থাকতে পারে না। আর তার কোন পরিমাণ না থাকলে আমাদের আত্মসত্তার মতোই জড়সত্তা অবিভাজ্য, আর এই জড়সত্তা ও আত্মসত্তা উভয়েরই ধর্ম পরিবর্তন।

সাম্প্রতিক বিজ্ঞানে সক্রিয় জড়

আজকের দিনের বিজ্ঞানে নিচ্ছিদ্র পরমাণু একেবারেই পরিত্যক্ত। এডিংটন বলেন: মানুষের শরীরের ভিতর যে সব ছিদ্র রয়েছে, কোন উপায়ে সেগুলোকে যদি সরিয়ে দেয়া যায়, তাহলে তার শরীর সূর্যকিরণে উদ্ভাসিত দু'চারটি বালুকণার মতোই দেখাবে। কাজেই নিচ্ছিদ্র পরমাণুর স্থান আজকের দিনের পদার্থ-বিদ্যায় নাই।

সাম্প্রতিক বিজ্ঞানে জড়ের নিষ্ক্রিয়তাও একেবারে অস্বীকৃত। নিউটনের প্রচারিত জড়ের 'নিষ্ক্রিয়তার নিয়ম' আজকের দিনের বিজ্ঞান স্বীকার করে না। ব্রিটিশবিজ্ঞানী রাদারফোর্ড পরমাণুর বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন, পরমাণু মোটেই অবিভাজ্য নয়। তার ভিতর দু'রকম বৈদ্যুতিক শক্তি রয়েছে, একটি পজিটিভ, অপরটি নিগেটিভ। পরমাণুর ভিতর যে সব পজিটিভ বিদ্যুৎ-শক্তি রয়েছে, রাদারফোর্ড তার নাম দিয়েছেন 'প্রোটোন'। তার ধারে যে সব নিগেটিভ শক্তি রয়েছে তিনি তাদের নাম দিয়েছেন 'ইলেকট্রোন'। সোজা কথায়, নিউটন যাকে স্থির জড়পদার্থ বলে মনে করেছিলেন ও যার বিশ্লেষণে ডেলটন কতকগুলো অবিভাজ্য নিচ্ছিদ্র পরমাণু আবিষ্কার করেছিলেন—আসলে তা স্থিরও নয়, নিচ্ছিদ্রও নয়, অবিভাজ্যও নয়, তা বৈদ্যুতিক শক্তির কেন্দ্র। অতি-আধুনিক পরবর্তী গবেষণায় তথাকথিত জড় পদার্থের ভিতর ইলেকট্রোন ও প্রোটোন ছাড়া নিউট্রোন ও পজিট্রোন নামে আরো দু'টি বৈদ্যুতিক পদার্থের সন্ধান পাওয়া গেছে।

বিজ্ঞানে নিষ্ক্রিয় সত্তার অস্বীকৃতি

আর এক দৃষ্টিকোণ থেকেও স্থির নিশ্চল পদার্থের সত্তা সাম্প্রতিক বিজ্ঞানে অস্বীকৃত। আমরা আগেই বলেছি, আজকের দিনের বিজ্ঞান দেশ ও কালকে পৃথক করে দেখে না, আজকের দিনের বিজ্ঞান স্থির নিশ্চল দেশ ও চলমান কালের সত্তা মিশিয়ে দিয়ে এক করে ফেলেছে। দেশ ও কালের এই একীকরণের ফলে আমরা আর দেশ ও কালের ভিন্ন সত্তায় বিশ্বাস করি না, তাদের সম্মিলিত একক সত্তা দেশ-কালে বিশ্বাস করি। তাই কথাকথিত নিশ্চল দৈশিক সত্তা চলমান কালের সংযোগে তার স্থিরত্ব হারিয়ে চলমান হয়ে গেছে। তাই আজ আমরা আর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও দূরত্ব এই ত্রিধর্মী জড়বস্তু স্বীকার করি না; আমরা স্বীকার করি দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, দূরত্ব ও চলন্ত এই চতুর্ধর্মী সত্তায়। সুতরাং গাছ-পাথর, টেবিল-চেয়ার, বাড়ী-ঘর আর হরেক রকমের জড়বস্তু, যা নিয়ে এই বাইরের জগতের সৃষ্টি তাদের আজ আর স্থির নিশ্চল বলা যায় না। তারা আসলে গতিশীল ও চলমান। আজকের দিনের বিজ্ঞান বৌদ্ধদর্শনের যে ক্ষণিকবাদ, বস্তুর স্থিতিশীলতা একেবারেই স্বীকার করেনি, তারই স্বীকৃতি ও পুনরাবৃত্তি।

এই ভাবে উদ্বুদ্ধ হয়েই কবি 'বলাকার' পক্ষধ্বনির ভিতর চলমান, চঞ্চল সত্তার সঙ্কেত পেয়েছেন :

"মনে হ'ল এ পাখার বাণী
দিল আনি'
শুধু পলকের তরে
পুলকিত নিশ্চলের অন্তরে অন্তরে
বেগের আবেগ
... ...
ধ্বনিয়া উঠিছে শূন্য নিখিলের
পাখার এ গানে :
হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা,
অন্য কোনখানে।"

বিজ্ঞান ও সহজ অভিজ্ঞতা

এই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে জড়ের সত্তা বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে এডিংটন হাস্য-রসের সৃষ্টি করে বলেছেন : "আমি যে টেবিলে বসে এই লিখছি, সে টেবিলের দু'টি রূপ। একটি সহজ অভিজ্ঞতার টেবিল যার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও দূরত্ব আছে ও যা স্থির ও নিশ্চল। আর এক টেবিল আছে আধুনিক পদার্থবিদ্যায় যার স্থান; তার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, দূরত্ব নাই, তা বৈদ্যুতিক শক্তি দিয়েই তৈরী।"

বার্ট্রেণ্ড রাসেলও বিস্ময়ের সঙ্গে বলেছেন : "আজকের দিনের পদার্থ-বিজ্ঞার বিশ্লেষণে আমরা যাকে জড়-পদার্থ বলি তা কাল্পনিক জড়সৃষ্টিতে পর্যবসিত হয়েছে। আমাদের নিত্যব্যবহার্য টেবিল-চেয়ার ও আমাদের প্রাত্যহিক আহার্য রুটি-মাখনের সত্তা বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে স্বীকার করা যায় না। জড়ের অন্যতম প্রধান ধর্ম প্রতিঘাত করার ক্ষমতা আজ আর তার নাই।"

এতকাল আমরা মনে করতাম : জড়ের ধর্ম স্থৈর্য, আর মনের ধর্ম গতিশীলতা। আজ জড়ের ধর্ম গতিশীলতা প্রমাণিত হওয়ায় নিশ্চল জড় ও গতিশীল মনের মাঝখানে যে গভীর ব্যবধান, তা বিজ্ঞানের প্রভাবে অনেকটা দূর হয়ে গেল আর তাদের যোগসূত্রও নিকটতর হলো।

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে জড়ের স্থৈর্য কাল্পনিক প্রমাণ হলেও আমাদের সহজ অভিজ্ঞতার সঙ্গে স্থির-নিশ্চল জড়ের যে নিকট সংযোগ ও গভীর পরিচিতি, তা তো আর বিজ্ঞানের প্রভাবে নিশ্চিহ্ন হতে পারে না। প্রাচীনকালের ভারতীয় দার্শনিকরা ঠিকই বলেছেন যে, আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের অর্থাৎ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বকের সঙ্গে বহির্জগতের পাঁচটি ধর্মের অর্থাৎ রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শের অপরিহার্য যোগ। যতদিন মানুষ এই পঞ্চেন্দ্রিয়ের দ্বারা বাহ্যজগৎকে জানার চেষ্টা করবে, ততদিন রূপ, রস, গন্ধ শব্দ ও স্পর্শের সত্তা অস্বীকার করা তার পক্ষে অসম্ভব। অতএব জড়ের এই পঞ্চধর্মী জড় সত্তায় বিশ্বাস আমাদের স্বভাবসিদ্ধ।

এই জন্যেই বোধ হয়, আজকের দিনের এক বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তিসম্পন্ন দার্শনিক হোয়াইটহেড বিজ্ঞানের দে'য়া জড়ের গতিশীলতা ও আমাদের সহজ অভিজ্ঞতার দে'য়া জড়ের স্থিতিশীলতার ভিতর একটা আপোষ করার চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেন : বিজ্ঞানের গতিশীল জড়-পদার্থেই আমাদের সহজ অভিজ্ঞতার স্থিতিশীল জড় পদার্থের স্থিতি। সহজ কথায় একেই বলে, উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপানো। স্বয়ং প্রকৃতিই যদি এই অস্বাভাবিক সংযোগে সচেষ্ট হন, তাহ'লে আর তার্কিকরা তা স্বীকার না ক'রে যান কোথা ?

দশম অধ্যায়

প্রাণ-পরিচিতি

জড়ের স্বভাব বিশ্লেষণের পর তত্ত্ব নিরূপণে প্রাণের স্বভাব বিশ্লেষণই স্বাভাবিক। আগেই বলেছি, নিষ্প্রাণ জড়সত্তাই প্রাণের ভিত্তি ও অধিষ্ঠান্। জড় সত্তাহীন প্রাণ আমরা কল্পনা করতে পারি, কিন্তু আমাদের সহজ অভিজ্ঞতায় তার কোন স্থান নাই।

প্রাণের আলোচনায় ও বিশ্লেষণে দু'টি পরস্পর-বিরোধী ধারণা দেখতে পাওয়া যায়। একদল মনীষী প্রাণের এমনভাবে বিশ্লেষণ করেছেন যে: চেতনা বা মনের সঙ্গে তার যেন কোন তফাৎ নাই। এ-মতে প্রাণ ও চেতনা সমার্থক। আর একদল মনীষীর বিশ্লেষণে মনে হয় যে, জড়-সত্তার সঙ্গে প্রাণের বিশেষ কোন তফাৎ নাই।

উপনিষদে প্রাণের আলোচনা

ভারতীয় দার্শনিক চিন্তার অতি প্রাচীন স্তরে এ-জাতীয় দ্বিমুখী ভাবের অভিব্যক্তি দেখতে পাওয়া যায়। উপনিষদে অনেক জায়গায় প্রাণ বলতে সর্বব্যাপী, বিশ্বচেতনাকেই বোঝানো হয়েছে। কোনও কোনও উপনিষদে ব্রহ্ম বা বিশ্ব-চেতনাকে প্রাণ বলা হয়েছে। উপনিষদের ভাষ্যকারেরা এসব উক্তির ব্যাখ্যায় বলেছেন: প্রাণের অর্থ এ-সব জায়গায় শ্বাস-প্রশ্বাস নেবার শক্তি নয়, প্রাণের অর্থ বিশ্বচেতনা বা ব্রহ্ম। এ হলো প্রাণ শব্দের এক বিশেষ অর্থ।

উপনিষদের এবং ভারতীয় দর্শনের নানা শাখায় প্রাণকে শ্বাস-প্রশ্বাস নেবার শক্তি বা প্রাণবায়ু হিসাবেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এ-দৃষ্টিকোণ থেকে পাঁচ-রকম প্রাণের বর্ণনা দেখা যায়। তাদের নাম—প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান। প্রাণবায়ুর কাজ উপরের দিকে যাওয়া, অপানের কাজ নীচের দিকে যাওয়া, ব্যান সমস্ত শরীরে পরিব্যাপ্ত এবং সমস্ত শরীর জুড়েই তার কাজ। উদানের স্থান কণ্ঠে, আর উদানই শরীর থেকে বেরিয়ে আসে। সমানের কাজ আমাদের ভুক্ত বস্তুগুলোকে পরিপাক করিয়ে নানাভাবে তার রূপান্তর সাধন।

এ-বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে, এখানে প্রাণকে অত্যন্ত স্থূল অর্থে গ্রহণ করা হয়েছে। এ-মতে সোজা কথায়, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়াই প্রাণের লক্ষণ।

এ-দৃষ্টিকোণ থেকে প্রাণকে জড় বলা নিশ্চয়ই চলে, তবে এ সত্ত্বেও প্রাণকে ইন্দ্রিয় থেকে কিছুটা প্রাধান্য দে'য়া হয়েছে। ছান্দোগ্য উপনিষদের এক সার্থক হাস্যকর উপাখ্যানই এর বড় প্রমাণ। সেখানে আছে: ইন্দ্রিয় ও প্রাণের ভিতরে এক সময় এক জোর ঝগড়া বেধে যায়, তা'রা কে ছোট, কে বড়, এ নিয়ে। সে-শক্তির লড়াইয়ে শেষ পর্যন্ত প্রাণেরই জয় হয়, কারণ দেখা গেলো প্রাণ কাজ না করলে ইন্দ্রিয়েরা কাজ করতে পারে না। এ-ভাবে প্রাণকে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নেবার শক্তি হিসাবে গ্রহণ করেও তার প্রাধান্য স্বীকার করার চেষ্টা মাঝে মাঝে দেখা যায়।

প্রাণের পরিধি

প্রাণের পরিধি বা ক্ষেত্র নিয়েও নানা রকম চিত্তাকর্ষক আলোচনা দেখা যায়। ভারতীয় দর্শনে গাছপালার ভিতর যে শুধু প্রাণ আছে তাই বলা হয়নি; তাতে যে মন বা চেতনাও কোনো না কোনো ভাবে আছে, তাও বলা হয়েছে। ভগবান বুদ্ধ তাঁর মৈত্রী বা অহিংসার সমর্থনে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের জীবন্ত বৃক্ষের গাছপালা কাটতে বারণ করেছেন। অন্যদিকে সতেরো শতকে দার্শনিক দেকার্তে মানুষ ছাড়া অন্য প্রাণীর ভিতর প্রাণ ও চেতনা, কোনটির সত্তা স্বীকার করেননি। কাজেই তাঁর মতে, মানুষ ছাড়া অন্য সব প্রাণী জড় ছাড়া আর কিছুই নয়।

শুনা যায়, দেকার্তের পরবর্তী দার্শনিক মেলব্রাঞ্চ তাঁর কুকুরকে খুব মার দিতেন, আর সে আঘাত পেয়ে ঘেউ ঘেউ করতো, তিনি তা দেখে বলতেন: এর পেছনে কোন বেদনার অনুভূতি নাই, কারণ কুকুরটি ত স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয়। এভাবে খ্রীস্টধর্মের সার্বভৌম প্রেমের নীতি অক্ষুণ্ণ রেখে দেকার্তে ও মেলব্রাঞ্চ প্রমুখ মনীষী প্রাণিহত্যার অকুণ্ঠ সমর্থন আবিষ্কার করেছিলেন।

এটা ভগবান বুদ্ধ ও তাঁর প্রায় সমসাময়িক গ্রীক দার্শনিক পিথাগোরাসের নীতির পুরোপুরি উল্টো পদ্ধতি। বুদ্ধ ও পিথাগোরাস দু'জন জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস করতেন। মানুষ এবং অন্য প্রাণীর ভিতর তাঁ'রা তফাৎ দেখতেন না। পিথাগোরাসের সম্বন্ধে বিদ্রূপ করে বলা হয়েছে, একটা কুকুরকে মার দে'য়া হয়েছে দেখে তিনি খুব ব্যথিত হয়েছিলেন, কারণ এ কুকুরই পূর্বজন্মে তাঁর বন্ধু ছিলো। এ-বিদ্রূপাত্মক আখ্যায়িকার পেছনে সম্ভবতঃ এ-সত্যই নিহিত যে, পিথাগোরাস সর্বপ্রাণীর মধ্যে চেতনা-সত্তা স্বীকার করতেন। তাঁর নিরামিষ আহারের সমর্থন থেকেও এ-সত্যের এক প্রমাণ পাওয়া যায়। আর ভগবান বুদ্ধ ত তদানীন্তন মগধের রাজা বিম্বিসারের যজ্ঞশালায় ছাগ-শিশু বধ করতে দেখে নিজেই যূপকাষ্ঠে প্রাণ বিসর্জন দিতে উদ্যত হয়ে মগধে পশুবলি নিষিদ্ধ করার ব্যবস্থা করেছিলেন।

এ থেকে এ-সত্যেরই উপলব্ধি হয় যে, জগতের অনেক প্রাচীন দার্শনিক চিন্তায় প্রাণ ও মনের ভিতর সাধারণতঃ কোন সীমারেখা টানা হয়নি। জড়-সত্তার ভিতরও অনেক সময় প্রাণ আছে, একথা অতীত যুগে দার্শনিকেরা স্বীকার করেছেন। পূর্বজন্মের অশুভ কর্মের ফলে জীব যেমন তরু-লতা হয়ে জন্মায়, তেমনি প্রস্তর আদি স্থাবর-যোনিও লাভ করে, এটাই তাঁদের মত।

জড়বস্তু, মন ও প্রাণের তফাৎ

জড়বস্তু, প্রাণ ও মনের ভিতর খুব ভালো করে সীমারেখা টানার চেষ্টা বিজ্ঞান-প্রভাবিত উনিশ শতকের দর্শনেই দেখা যায়। এই শতকের দর্শনে জড়কে স্থির-নিশ্চল বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। প্রাণ তা থেকে স্বতন্ত্র, কারণ প্রাণের জন্ম, বৃদ্ধি, পরিণতি এবং নাশ এ-চারিটি ধর্মই দেখা যায়। আর জড়বস্তুতে এ-সব ধর্ম নাই। জড়ের উৎপত্তি ও বিনাশ তার অবস্থায় পরিবর্তন ছাড়া আর কিছুই নয়। মন প্রাণ থেকে স্বতন্ত্র, কারণ চিন্তা বা অনুভূতিই মনের বিশেষ ধর্ম। জড়বস্তু বা প্রাণে এ-অনুভূতি নাই।

এ-দৃষ্টিকোণ থেকেই অতি আধুনিক বিজ্ঞানে তরু-লতার প্রাণ আছে কি-না, এ- বিষয়ে জোর গবেষণা চলে। প্রথমে মনে করা হতো, তরুলতার প্রাণ নাই, তা'রা একেবারেই নিষ্প্রাণ জড়। আস্তে আস্তে প্রমাণ হয়ে গেল যে, প্রাণের ধর্ম উৎপত্তি, বৃদ্ধি, পরিণতি ও নাশ যখন তরু-লতায় আছে তখন তাদের নিষ্প্রাণ বলা চলে না। তরু-লতার প্রাণ-সত্তা আবিষ্কারে উনিশ শতকের শেষার্ধ ও বিশ শতকের প্রথমার্ধের একজন প্রাচ্য-বিজ্ঞানী আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসুর দান যথেষ্ট। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাহায্যে তিনি দেখিয়ে দিয়েছিলেন যে, গাছেরও প্রাণ আছে। স্বাদেশিকতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি তাঁর এই নতুন থিয়োরীর মূল খুঁজে পেয়েছিলেন মনুস্মৃতিতে। প্রাক-পৌরাণিক যুগে মনু বলেছিলেন:

অন্তঃসংজ্ঞা ভবন্ত্যেতেঃ সুখদুঃখ সমন্বিতাঃ

[বৃক্ষলতার ভেতর চেতনা আছে, আর তাদের সুখ-দুঃখের উপলব্ধিও আছে।]

মনুর এই উক্তি—গাছপালার যে শুধু প্রাণ আছে তাই বলেনি, তাদের যে মন বা চেতনাও আছে তাও বলেছে। সুতরাং মনুর এই উক্তি যে প্রাচীন চিন্তা-ধারায় প্রাণ ও মনের ব্যবধান অস্বীকৃতির এক উদাহরণ, তাতে সন্দেহ নাই।

আজকের দিনের বিজ্ঞান ও বিজ্ঞান-প্রভাবিত দর্শনে জড় ও প্রাণের তফাৎ নিয়ে নানা রকমের আলোচনা এবং তারই আর এক অভিব্যক্তি মন ও প্রাণের তারতম্যের আলোচনায়। অনেকে আবার এ আলোচনাকে সম্ভবত কিছুটা জটিল

করার উদ্দেশ্যে পশুমন ও মনুষ্যমনের ভিতর আর একটি অলঙ্ঘনীয় সীমারেখা টানবার চেষ্টা করেছেন।

উনিশ শতকের বিজ্ঞানে প্রাণের স্বাতন্ত্র্য

উনিশ শতকের বৈজ্ঞানিকরা বেশ জোরের সঙ্গেই প্রাণকে নিষ্প্রাণ জড়ের স্তরে নামিয়ে আনার চেষ্টা করেছেন। যে-যান্ত্রিকতার সাহায্যে তাঁরা জড়বস্তুর স্বভাব বিশ্লেষণ করেছেন তারই সাহায্যে তাঁরা প্রাণের ব্যাখ্যায়ও কোমর বেঁধে লেগেছিলেন। কিন্তু আস্তে আস্তে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় ধরা পড়লো যে, প্রাণের এমন কতগুলো ধর্ম আছে যা জড়বস্তুতে নেই; তখন তাঁরা প্রাণের উৎপত্তি নিয়ে বেশ ফাঁপরে পড়লেন। এর এক চিত্তাকর্ষক নিদর্শন গত শতকের প্রসিদ্ধ ব্রিটিশ বিজ্ঞানী লর্ড কেল্‌ভিনে দেখা যায়। জড়সত্তা থেকে প্রাণের উৎপত্তি বিশ্লেষণে অক্ষম ও অপারগ হয়ে তিনি বললেনঃ পৃথিবীতে প্রাণসত্তা এসেছে চন্দ্রলোক থেকে। বৈজ্ঞানিক গবেষণার উগ্র চাপে লর্ড কেল্‌ভিন ভুলে গিয়েছিলেন যেঃ পৃথিবীতে যদি নিষ্প্রাণ জড় থেকে প্রাণের উৎপত্তি অসম্ভব হয়, তাহলে চন্দ্রলোকেও তা সমভাবে অসম্ভব।

নিষ্প্রাণ জড় ও প্রাণসত্তার তফাৎ তাঁরা বিশেষ করে অনুভব করলেন জড় উপাদানে তৈরী যন্ত্র ও সপ্রাণ পদার্থের ভিতর বিরাট পার্থক্য ও ব্যবধান দেখে। তাঁরা দেখলেন, জড় যন্ত্র, যেমন একটি ঘড়ি, অন্যের প্রয়োজনই সিদ্ধ করে, কিন্তু একটি অতি ক্ষুদ্র প্রাণবান পদার্থ, যেমন প্রটোপ্লাজম বা তার ঈষৎ পরিণতি এমিবা, নিজেই নিজের উদ্দেশ্য সাধন করে। আবার একটা যন্ত্র, যেমন ঘড়ি, ভেঙ্গে গেলে তাকে অন্যের দ্বারা সারাতে হয়, কিন্তু প্রাণবান পদার্থ ত তার ভিতর কিছুটা বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হ'লে অনেক সময় আপনা থেকেই তা সেরে নেয়।

নিষ্প্রাণ জড় ও প্রাণসত্তার ভিতর আরও অনেক তফাৎ। প্রাণের উৎপত্তি ব্যাখ্যায় যে সমস্ত চলতি মত সাম্প্রতিক বিজ্ঞানে ও দর্শনে প্রচলিত, তার আলোচনায় তা স্পষ্ট ও পরিষ্কার হয়ে উঠবে। সেজন্য এখানে তার আলোচনা করতে চাই না।

প্রাণের উৎপত্তি সম্বন্ধে আমরা সাধারণতঃ তিনটি মত দেখতে পাই। একটি উনিশ শতকের উগ্র বৈজ্ঞানিক মতঃ তার নাম দেওয়া যেতে পারে 'যান্ত্রিকতাবাদ' —যা জড় ও প্রাণের তফাৎ এক নিঃশ্বাসে উড়িয়ে দিতে চায়। আর একটি মত তার ঠিক উল্টো। তা একেবারে কোমর বেঁধে জড় ও প্রাণের ভিতর অসংখ্য অচলায়তন গড়ে তুলতে চায়। এ-মতের নাম 'প্রাণস্বাতন্ত্র্যবাদ'। আর

অতি-আধুনিক কালে যাঁরা জড় ও প্রাণের নিকটযোগ ও গভীর পার্থক্যে, 'শ্যাম রাখি না কুল রাখি' এ-দ্বন্দ্বে দোলায়মান হয়ে শেষ পর্যন্ত প্রাণের সম্বন্ধে উপরোক্ত দু'টি উগ্র মতের ভিতর একটা যোগসূত্র বের করার চেষ্টা করেছেন তাঁদের মতের নাম দে'য়া যেতে পারে 'অভিনব উৎপত্তিবাদ'। প্রাণের স্বভাব ও স্বরূপ নির্ণয়ে এ-তিনটি প্রধান মতের সার্থকতা প্রচুর। তাই আমরা এ-তিনটি মত একটু বিস্তারিতভাবে আলোচনা করতে চাই।

যান্ত্রিকতাবাদে প্রাণের স্বরূপ

যান্ত্রিকতাবাদীরা নিষ্প্রাণ জড় ও প্রাণবান পদার্থের ভিতর কোন মৌলিক পার্থক্য আছে, একথা স্বীকার করেন না। প্রাণবান পদার্থ নিষ্প্রাণ জড়েরই শুধু পরিণতিই নয়, তার একটু মিশ্র জটিল রূপ। প্রাণের বিবর্তনের ইতিহাস বিশ্লেষণ থেকেই তাঁরা এ-সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। সৃষ্টির শুরু যখন আদিম নীহারিকাপুঞ্জ থেকে, তখন প্রাণের যে মূল উপাদান জড় পদার্থ তা অস্বীকার করা চলে না। নিষ্প্রাণ জড়ের ভিতর প্রাণসত্তা লুক্কায়িত আছে, আর প্রাণের উৎপত্তিতে তার অভিব্যক্তি, একথা বলা অবাস্তব কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়। জড়ের ভিতর প্রাণ লুকিয়ে আছে, একথা যদি বলা চলে, তাহলে জড়ের আর জড়ত্ব মোটেই থাকে না। জড়ের প্রাণ আছে বলাও যা, আর ঘোড়ার ডিম আছে বলাও তা।

প্রাণের বিবর্তনের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায়, আদিম নীহারিকা-পুঞ্জ থেকেই লক্ষ লক্ষ বছর পর প্রাণের আদিরূপ প্রোটোপ্লাজমের উৎপত্তি আর প্রোটোপ্লাজম থেকে তার আর একটু বর্ধিত রূপ এমিবার উৎপত্তি, সমস্ত প্রাণবান পদার্থ এরই বর্ধিতরূপ। জড়বস্তু থেকে যার উৎপত্তি, আর জড়বস্তুতে যার রূপান্তর তাকে জড় থেকে স্বতন্ত্র বলা অযৌক্তিক ও নিরর্থক। এতে প্রাণের স্বভাবকে প্রাচীন কুসংস্কারের প্রভাবে রহস্য আবৃত করে রাখা চলতে পারে, কিন্তু এ থেকে প্রাণের স্বরূপ সম্বন্ধে কোন সঠিক ধারণা করা যায় না।

নিষ্প্রাণ জড় ও প্রাণের পার্থক্যে উদ্বুদ্ধ হয়েই জগতের ধর্মীয় সাহিত্যের লেখকেরা প্রাণের স্বরূপকে একটা হেঁয়ালির মতো করে সাধারণ মানুষকে বোঝাতে চেয়েছেন। এটা অবৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তিরই ফল। বাইবেলের আদি পর্বে সৃষ্টি-কাহিনীতে আছে: আল্লাহ্‌তালা আদি-মানব আদমের শরীর সৃষ্টি ক'রে তাঁর নাসা-রন্ধ্রের ভিতর প্রাণ ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। এ-কথার অর্থই হলো: প্রাণ যখন নিষ্প্রাণ জড় থেকে আলাদা, তখন জড়বস্তু থেকে তার উৎপত্তি হতে পারে না।

এ-জাতীয় কল্পনা অযৌক্তিক ও অবৈজ্ঞানিক, কারণ স্বামীর আদিতে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে আমরা জড় পদার্থই দেখতে পাই, প্রাণ দেখতে পাই না।

জড় থেকে প্রাণের উৎপত্তি একটি ঐতিহাসিক সত্য। কতগুলো প্রাচীন কুসংস্কারের বশবর্তী হয়ে এ ঘটনাকে অস্বীকার করা নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কিছুই নয়। বস্তুর স্বভাব সম্বন্ধে আগে থেকে একটা মামুলী ধারণা আঁকড়ে ধরে তারপর যুক্তি দ্বারা তার সাফাই গাওয়া যে অত্যন্ত কুসংস্কার-পরায়ণতার ফল, একথা বলাই নিষ্প্রয়োজন। এ-দৃঢ়বদ্ধ কুসংস্কার দূর করার উদ্দেশ্যেই কোন কোন বৈজ্ঞানিক বলেছেন: জড় পদার্থের ভিতর নাইট্রোজেনের আধিক্য থেকেই প্রাণের উৎপত্তি।

যান্ত্রিকতাবাদীরা বলেন: জড় পদার্থ ও প্রাণের ভিতর যাঁরা আকাশ-পাতাল ব্যবধান সৃষ্টি করেন, তাঁরা তাদের ধারাবাহিকতা নষ্ট করেন। জড় থেকেই প্রাণের উৎপত্তি, তাই প্রাণ ও জড়ের মাঝখানে কোন দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান নাই। যাঁরা এ-সত্য অস্বীকার করেন, তাঁরা প্রকৃতির ঐক্য অস্বীকার করে একই জগতের ভিতর জড়-জগৎ ও প্রাণী-জগৎ বলে দু'টি আলাদা জগৎ সৃষ্টি করেন।

সুতরাং বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদ এ-কথাই বলে যে, জড় পদার্থে তৈরী যন্ত্রের মতোই প্রাণও একটি যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয়। শুধু জড়যন্ত্রের গঠনের চেয়ে প্রাণের গঠন আরো সূক্ষ্ম, আরও জটিল, এটুকুই তফাৎ।

প্রাণস্বাতন্ত্র্যবাদের মূলকথা

উনিশ শতকের শেষের দিকে প্রাণী-বিজ্ঞানের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নিষ্প্রাণ জড়ের সঙ্গে প্রাণের তফাৎ বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাই অনেক প্রাণী-বিজ্ঞানী জড় থেকে প্রাণকে একটি আলাদা স্বাধীন স্বতন্ত্র সত্তা বলে দেখতে শুরু করেন। এ থেকেই প্রাণ-স্বাতন্ত্র্যবাদের উৎপত্তি।

প্রাণ-স্বাতন্ত্র্যবাদীরা বলেন: জড়ের সঙ্গে প্রাণের সর্বাপেক্ষা বড় তফাৎ হলো এই যে: জড়যন্ত্রের গতিবিধি গাণিতিক নিয়মে আগে থেকেই বলা চলে, কিন্তু কোন প্রাণবান পদার্থের গতিবিধি আগে থেকে জানা চলে না। জড় পরতন্ত্র ও পরাধীন, প্রাণ স্বতন্ত্র ও স্বাধীন।

প্রাণের এই বৈশিষ্ট্য দেখাতে গিয়ে এক আধুনিক লেখক বলেছেন: রেল-লাইনের উপর দিয়ে একটি বড় জোরালো ইঞ্জিন ষাট মাইল বেগে এগিয়ে চলেছে, আর তারই সামনে একটি ছোট পিপীলিকা অত্যন্ত ধীরভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে, চোখের পলকে ইঞ্জিনটি ক্ষুদ্র পিপীলিকাকে নস্যাৎ করে দেবে। কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, চোখের পলকে সেই পিপীলিকা

রেললাইন থেকে সরে গেল, আর সেই শক্তিমান ইঞ্জিন তার কিছুই করতে পারলো না। তার কারণ, ইঞ্জিনের চলার পথ আগে থেকেই নির্দিষ্ট, তা থেকে এক চুল এদিক ওদিক করার ক্ষমতা ইঞ্জিনের নেই। কিন্তু প্রাণবান ক্ষুদ্র পিপীলিকার ক্ষমতা খুব কম হলেও চলার ব্যাপারে সে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র। আর সে যে কোন্ পথে এগুবে, তা কোনো বড় গণিতজ্ঞই আগে থেকে অঙ্ক কষে বের করতে পারবেন না। এই হলো প্রাণ ও নিষ্প্রাণ জড়ের তফাৎ।

আর জড়যন্ত্রের কাজ হলো অন্যের উদ্দেশ্য সাধন। আজকের দিনের টেকনোলজির প্রভাবে মানুষের কত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য। হরেক রকমের নতুন নতুন যন্ত্রপাতি আবিষ্কার হচ্ছে, আর মানুষের কাজে লেগে তারা তার নিত্য-নতুন প্রয়োজন মেটাচ্ছে। প্রাণকে আমরা কখনও এ-ধরনের যন্ত্র বলতে পারি না। প্রাণকে বাস্তব অর্থে নয়, রূপক হিসাবেই যন্ত্র বলা চলে। প্রাণ যদি যন্ত্রই হয়, তবে সেই যন্ত্রে আর জড়যন্ত্রে প্রচুর তফাৎ। কারণ, জড়যন্ত্রের মতো প্রাণ অন্যের উদ্দেশ্য সাধন করে না, তার নিজের উদ্দেশ্যই সাধন করে। ছোট ছোট গাছ-গাছড়াগুলোও প্রকৃতি থেকে আহার্য সংগ্রহ করে তাকে শরীর রক্ষার কাজে লাগায়। প্রকৃতির বিবর্তনের ব্যাখ্যায় যাঁরা অন্তর-উদ্দেশ্যবাদ স্বীকার করেন, তাঁরা আজকের দিনের প্রাণবিদ্যা থেকে প্রেরণা পান।

জড়যন্ত্র আপনা থেকে বাড়ে না, জড়ের বংশ বৃদ্ধি করার ক্ষমতাও নাই। আর জড়যন্ত্র বিকল হয়ে গেলে আপনা থেকেই তার সংস্কার হয় না। কিন্তু প্রাণবান পদার্থের ভিতর কোন দোষত্রুটি উপস্থিত হলে, তার সংস্কার সে নিজেই করে নেয়।

জড়যন্ত্রের সঙ্গে প্রাণের আর এক তফাৎ তাদের অবয়ব বিশ্লেষণে দেখতে পাওয়া যায়। জড়যন্ত্রের বেলা তার অবয়ব থেকেই অবয়বীর উৎপত্তি হয়। একটা ঘড়ির কথাই দেখা যাক। ঘড়ির অংশগুলো আগে থেকে পেলে তবেই তাদের একত্র করে ঘড়ি তৈরী করা যায়; কিন্তু প্রাণবান পদার্থের বেলায় অবয়ব ও অবয়বীকে এভাবে আলাদা করে দেখা যায় না। সেখানে অবয়বী ও অবয়ব অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। অবয়বীর ভিতর অবয়বগুলো আগে থেকেই থাকে, আর অবয়বীর বৃদ্ধির সঙ্গে অবয়বেরও বৃদ্ধি; শিশু যখন মায়ের পেটে থাকে, তখন তার অবয়বগুলো অবয়বীর ভিতর লুক্কায়িত থাকে। জন্ম হবার পর বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার শরীরের অবয়বগুলো আস্তে আস্তে বাড়ে।

নিষ্প্রাণ জড়ের সঙ্গে প্রাণের এ-গভীর পার্থক্য দেখে অনেকেই জড়কে যন্ত্রের পর্যায়ে আর প্রাণবান পদার্থকে যন্ত্রীর পর্যায়ে ফেলেন। তাঁরা বলেন,

যন্ত্রী থেকেই যন্ত্রীর উৎপত্তি হতে পারে, যন্ত্র থেকে নয়। তাই এঁদের মত হলো, প্রাণ থেকেই প্রাণের উৎপত্তি।

অভিনব-উৎপত্তিবাদে প্রাণের স্বরূপ

প্রাণ থেকেই প্রাণের উৎপত্তি—প্রাণ-স্বাতন্ত্র্যবাদের মূলকথা ; আর নিষ্প্রাণ জড় থেকে প্রাণের উৎপত্তি—যান্ত্রিকতাবাদের মূলকথা। আজকের দিনের অভিনব-উৎপত্তিবাদীরা প্রাণের স্বরূপ বিশ্লেষণে যান্ত্রিকতাবাদও মানেন না, প্রাণ-স্বাতন্ত্র্য-বাদও মানেন না। তাঁদের মতে, এ-দুটি মতই যুক্তিবাদী বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে অগ্রাহ্য ও উপেক্ষণীয়। যান্ত্রিকতাবাদ নিষ্প্রাণ জড় ও প্রাণের মাঝখানে কোন ব্যবধান না মেনে তাদের ধারাবাহিকতা স্বীকার করেছে। নিষ্প্রাণ জড় ও প্রাণের ধারাবাহিক সম্বন্ধ অস্বীকার করলে প্রাণকে এক অজ্ঞেয়, দুর্ভেদ্য রহস্য মনে ক'রে তার স্বরূপ ব্যাখ্যায় নানা রকম অলীক কল্পনার আশ্রয় নিতে হয় না, যেমন চলতি ধর্মে দেখা যায়। যান্ত্রিকতাবাদের এ-দৃষ্টি সত্যিই প্রশংসনীয়।

কিন্তু বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদের আর একটি দিক যান্ত্রিকতাবাদীরা ভুলে গেছেন ; তা হলো বস্তুর প্রতি আনুগত্য। আগে থেকে মন-গড়া কোন থিয়োরী খাড়া করে বস্তুকে অস্বীকার করা বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদের পরিচয় নয়। হঠাৎ যদি আমরা দেখি, আমগাছে কাঁঠাল ধরেছে, আর বিড়ালের বাচ্চা বাঘ হয়েছে, তাহলে এ-কথা বলা আমাদের পক্ষে সমীচীন হবে না যে, আম আর কাঁঠালে কোনও তফাৎ নাই, বিড়াল ও বাঘে কোনও তফাৎ নাই। পুরোনো জিনিস থেকে যে তার সমজাতীয় জিনিসই উৎপন্ন হবে, আর তা থেকে যে নতুন কিছু উৎপন্ন হবে না, এটা হলো একটা মন-গড়া থিয়োরী। সেই থিয়োরীর দাপটেই প্রাণের বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্যের উপর মোটেই জোর না দিয়ে—যান্ত্রিকতাবাদীরা প্রাণকে জড়েরই জটিল রূপ বলে ধরে নিয়েছেন।

প্রাণ-স্বাতন্ত্র্যবাদীরা তার বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্যের উপর আলোকপাত করতে গিয়ে একটি বিরাট সত্য এক নিঃশ্বাসে অস্বীকার করেছেন ; তা'হলো নিষ্প্রাণ জড় থেকে প্রাণসত্তার উৎপত্তি। প্রাণ-স্বাতন্ত্র্যবাদীরাও যান্ত্রিকতাবাদীদের মতো পুরাতন থেকে নতুনের উৎপত্তি স্বীকার করেন না। তাঁরাও যান্ত্রিকতাবাদীদের মতোই একই মন-গড়া থিয়োরীর সমর্থক। এজন্যই তাঁরা প্রাণ থেকে প্রাণের উৎপত্তি স্বীকার করে প্রাণের স্বভাবকে একেবারে রহস্যাবৃত করে রেখেছেন।

আমরা এ-মন-গড়া থিয়োরীকে অস্বীকার করে যদি বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদের আশ্রয় নেই, তা হলে আমাদের বলতে হবে যে, যদিও জড় থেকে প্রাণের উৎপত্তি তথাপি নিষ্প্রাণ জড় থেকে প্রাণের স্বাতন্ত্র্য অনস্বীকার্য। এ-দৃষ্টিকোণ থেকে বলা

চলে যে, যান্ত্রিকতাবাদ ও প্রাণস্বাতন্ত্র্যবাদের দ্বন্দ্ব অমূলক, অর্থাৎ সীমাবদ্ধ দৃষ্টিরই অপরিহার্য ফল।

বিবর্তনে প্রাণের পূর্ণতার ইঙ্গিত

অভিনব-উৎপত্তিবাদীরা তাই বলেন, প্রাণের স্বভাব বুঝতে গেলে বিশ্ব-বিবর্তনের মূলে যে প্রগতির সঙ্কেত, তার প্রতি আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে। প্রকৃতির বিবর্তনের রহস্য ও তার অপরিহার্য ফলই হলো উত্তরোত্তর পূর্ণতার পথে অগ্রগতি। তাই অপূর্ণ নিষ্প্রাণ জড় থেকে পূর্ণতর প্রাণসত্তার উৎপত্তি। মন বা চেতনার বিবর্তনে প্রকৃতির পূর্ণতার পথে আর এক ধাপ অগ্রগতি। তাই অভিনব-উৎপত্তি-বাদীরা বলেন: সৃষ্টির পিছনে কোনও উদ্দেশ্যের প্রেরণা আছে, তা আমরা বলতে পারি না, কারণ, নিষ্প্রাণ জড় থেকেই প্রাণের সৃষ্টি। কিন্তু এই নিরুদ্দেশ যাত্রা আমাদের পূর্ণতা ও অগ্রগতির দিকে নিয়ে যাচ্ছে এ-কথা অনস্বীকার্য। তাই অভিনব-উৎপত্তিবাদীরা বলেন: পিছন-ঘেঁষা দৃষ্টি নিয়ে বিবর্তনের উদ্দেশ্য আবিষ্কারের চেষ্টা নিরর্থক, কিন্তু সম্মুখে সম্প্রসারিত দৃষ্টির সাহায্যে বিবর্তনের অগ্রগতির ভিতর উদ্দেশ্যসিদ্ধির সার্থক সঙ্কেত পাওয়া সম্ভব।

বের্গসঁর নিরুদ্দেশ প্রাণবাদ

সাম্প্রতিক দর্শনে অবাধ অভিনব-উৎপত্তিবাদী বের্গসঁ কোন রকম উদ্দেশ্য-সিদ্ধির ভিতর প্রাণের ধর্ম আবিষ্কার করতে নারাজ। তাঁর মতে, প্রাণ উদ্দেশ্য-ধর্মী নয়, সৃজনধর্মী। কোন উদ্দেশ্যসিদ্ধির বা কোন অলব্ধ লক্ষ্যের সিদ্ধির জন্য প্রাণের বিবর্তন হয় না। প্রাণ তার স্বাধীন প্রাচুর্যের জন্যেই নিজেকে অভিব্যক্ত করে। তাই স্বাধীন অবাধ সৃষ্টিই প্রাণ-ধর্ম, আর নিষ্প্রাণ জড় সেই আত্মবিকাশের পথে তার নিজেরই সৃষ্ট অন্তরায়। সে অন্তরায় অতিক্রম করার দুর্বার চেষ্টাই প্রাণধর্ম।

একাদশ অধ্যায়

চেতন-পরিচিতি

জড় ও প্রাণের স্বরূপ বিশ্লেষণের পর মনের স্বরূপ বিশ্লেষণেরই পালা। আধুনিক পাশ্চাত্ত্য দর্শনে মন কথাটি "আমি"-রই প্রতিশব্দ। এক বড় দার্শনিক বিশ্বের যাবতীয় বস্তুকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন। তাঁর মতে এদের একটি "অস্মৎ প্রত্যয় গোচর", অর্থাৎ 'আমি'-পদবাচ্য, আর একটি "যুস্মৎ প্রত্যয় গোচর," অর্থাৎ 'তুমি'-পদবাচ্য। এই বিভাগ সাংখ্য মতেরই প্রতিধ্বনি। সাংখ্য-দর্শনে বিশ্বের দু'টি মৌলিক তত্ত্ব স্বীকৃত হয়েছে ঃ একটি পুরুষ বা চেতন, আর একটি তার বিপরীত প্রকৃতি বা অচেতন। যা-ই হোক, নিষ্প্রাণ জড় ও প্রাণবান পদার্থ উভয়েই 'তুমি'-পদবাচ্য, কাজেই এ দৃষ্টিকোণ থেকে তারা অচেতনেরই অন্তর্গত আর এই অচেতনেরই এক ব্যাপক নাম জড়।

আমিত্ব-বোধক চেতনা

সহজ কথায় মন বলতে আমরা নিষ্প্রাণ জড় ও প্রাণবান পদার্থের অতিরিক্ত আমিত্ব-বোধক চেতনাকেই বুঝি। এই 'আমি'রই আর এক নাম আত্মা, আরবীতে একেই বলে 'রূহ্'। অতি আদি যুগ থেকেই মানুষের মনে এই প্রশ্ন জাগে যে, সে যাকে 'আমি' বলে, তা কি তার শরীরের অতিরিক্ত অজড় কিছু, না মৃত্যুতে শরীরের ধ্বংসের সাথেই তারও ধ্বংস। কঠউপনিষদে এক মনোরম উপাখ্যানের মারফত এই সত্য বুঝিয়ে দে'য়া হয়েছে যে, মৃত্যুর পর মানুষের 'আমি' বা আত্মা থাকে। সে 'আমি' দেহাতীত, সংসারের প্রতি আকর্ষণ বা বিষয়াসক্তি চলে গেলে তার অনুভূতি হয়।

এ-জাতীয় ধারণা সুপ্রাচীন প্লেটোর দর্শনেও পাওয়া যায়। প্লেটো নানা যুক্তি দিয়ে মানুষের আত্মা যে দেহাতীত ও অবিনশ্বর তা দেখাবার চেষ্টা করেছেন। আরিস্টটল আত্মাকে একেবারে দেহাতীত না বললেও আত্মার একটি শুদ্ধ সত্তা স্বীকার করেছেন। তাঁর মতে এই শুদ্ধ সত্তা ব্যক্তিতেই সীমাবদ্ধ নয়, তা সর্বব্যাপী; যিনি এ-শুদ্ধ আত্মার জ্ঞান লাভ করতে পারেন, তিনিই অমর ও মৃত্যুঞ্জয়ী। আরিস্টটলের ভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে এ-শুদ্ধ আত্মার সর্বব্যাপিত্ব ও অবিনশ্বরত্ব মুসলিম দার্শনিক ইবনে রুশ্‌দ প্রচার করেছেন, যাঁর প্রভাব সেদিনের খ্রীস্টান-জগতে ছিল প্রচুর।

জগতের প্রাচীন দর্শনে এই আত্মজ্ঞানের মাহাত্ম্য নানাভাবে বিবৃত। সাংখ্য-দর্শনে এ নিয়ে কত উপদেশাত্মক ও অনুপ্রেরণাদায়ক গল্পের সৃষ্টি। সাংখ্য-দর্শনের মতে পুরুষ বা শুদ্ধ আত্মা সর্বতোভাবে বন্ধনমুক্ত। অনাদি অবিবেকের প্রভাবে আত্মা তার সেই বিমুক্ত অবস্থার কথা ভুলে গিয়ে জড়ের দাসত্ব গ্রহণ করে। সুখ-দুঃখের তিক্ত-মধুর অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে হঠাৎ যখন তার নিত্য-মুক্ত স্বরূপের কথা আত্মার মনে পড়ে, তখনই তার মুক্তি হয়। আত্মা তখন তার শুদ্ধ অবস্থা, কৈবল্য বা কেবলতা লাভ করে, জড়ের দাসত্ব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।

সাংখ্য-দর্শনের আখ্যায়িকা

সাংখ্য-দর্শনে এ-সম্বন্ধে এক মজার গল্প আছে। পুরানো দিনের এক বাদশাহ্ তাঁর শিশু-পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে জঙ্গলে শিকার করতে গিয়েছিলেন। তিনি শিকারে ব্যাপৃত থাকার সময় অসাবধানতাবশতঃ ছেলেটি নিখোঁজ হয়ে যায়। বনের এক অপুত্রক ব্যাধ একটি সুন্দর ছোট ছেলে এদিক-ওদিক দিশেহারা হয়ে ঘুরছে দেখে তাকে নিজের বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে রাখে। এদিকে বাদশাহ্‌র পাত্র-মিত্র-পারিষদরা জঙ্গলে তন্ন তন্ন অনুসন্ধান করেও ছেলেটিকে খুঁজে পেলেন্ না। এভাবে বছরের পর বছর কেটে যায়। ছেলেটি আত্মবিস্মৃত হয়ে ব্যাধের পুত্র হিসাবেই তাঁর গৃহে পরম স্নেহে লালিত-পালিত হয়। হঠাৎ বাদশাহ্ এন্তেকাল করলেন। তখন তার শূন্য সিংহাসনে তাঁর সেই নিখোঁজ পুত্রকে এনে বসাবার চেষ্টা শুরু হলো ও জঙ্গলে গিয়ে তাকে খুঁজে বের করা হলো। এতকাল যে নিজেকে ব্যাধপুত্র বলে ভেবেছিল, সে আজ অতি সহজেই জেনে গেল : সে ব্যাধপুত্র নয়, সে বাদশাহ্‌রই ছেলে। ঠিক তেমনি বিষয়াসক্তি চলে গেলে জ্ঞানী আচার্যের উপদেশ পাওয়া মাত্রই মানুষ তার আত্মস্বরূপ উপলব্ধি করে ও তার যুগযুগান্তের আত্মবিস্মৃতি কেটে যায়—যেমন বাদশাহ্‌র ছেলের কেটে-ছিল।

প্লেটোতে শুদ্ধ আত্মার পূর্বস্মৃতি

প্লেটোর সংলাপে দেহ-পিঞ্জরে আবদ্ধ সুখ-দুঃখে জর্জরিত মানবাত্মার দেহাতীত শুদ্ধ সত্তার পূর্বস্মৃতির যে সংকেত, তার সঙ্গে সাংখ্য-দর্শনের পূর্ব-বর্ণিত আখ্যায়িকার মিল প্রচুর। যাই হোক, এই 'আমি' বা আত্মার যথার্থ স্বরূপের জ্ঞানে মানুষের যে বন্ধনমুক্তি ও সর্ব-দুঃখ-নিবৃত্তি এ-ধারণা জগতের প্রাচীন চিন্তায়, তার ধর্মীয় সাহিত্যে প্রচুর দেখা যায়।

আত্ম-আবরণবাদ

আত্ম-স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বেদান্ত দর্শনে মানুষের অন্নপানাদি সংযোগে রক্ষিত ও বর্ধিত শরীরকে তার 'আমি'র বা আত্মার প্রথম আবরণ বা খোলস বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তরবারি যেমন চর্মনির্মিত আবরণে বা কোষে আবৃত থাকে, মানুষের আত্মসত্তাও তেমনি তার জড় দেহের দ্বারা আবৃত, এই জন্যেই বেদান্ত-দর্শনে এ-দেহের নাম অন্নময় কোষ। কিন্তু এ-অন্নময় কোষই আত্মার একমাত্র আবরণ নয়, তার আরো চারটি আবরণ আছে। যে অন্নপানাদির ফলে আমাদের প্রাণশক্তি সজাগ থাকে, তা-ই আমাদের আত্মার দ্বিতীয় আবরণ। আমাদের যে মনোবৃত্তির সাহায্যে আমরা এটা করণীয় এ-সংকল্প, এটা অকরণীয় এ-বিকল্প সৃষ্টি করি, সেই চঞ্চল মনোবৃত্তি আত্মার তৃতীয় আবরণ; এর নাম মনোময় কোষ। আর আমাদের মনের যে বৃত্তির দ্বারা আমরা বস্তুর স্বরূপ ও কর্তব্য নির্ণয় করি, সেই বুদ্ধি বা জানার বিশেষ ক্ষমতা আত্মার আরেকটি আবরণ, এর নাম বিজ্ঞানময় কোষ। আর সুষুপ্তি বা সুনিদ্রায় আমরা যখন সারা জগৎ বিস্মৃত হয়ে আনন্দে আবৃত হয়ে থাকি, তখনো আমরা আত্মাকে ঠিক ঠিক জানি না, তখনো অজ্ঞানজ আনন্দের অনুভূতির দ্বারা আত্মার আসল স্বরূপ আমাদের কাছে আবৃত। তাই সুষুপ্তির অজ্ঞানজ সুখানুভূতি আত্মার পঞ্চম আবরণ, এর নাম আনন্দময় কোষ। এই পঞ্চ আবরণের বন্ধন থেকে মুক্ত হলে তবেই আত্মার বা 'আমি'র যথার্থ স্বরূপ জানা যায়। তারই ফল মুক্তি বা দুঃখ-নিবৃত্তি।

বেদান্ত-দর্শনের মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় কোষকে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে যাকে আমরা চিন্তাধারা বলে থাকি, তাই বলা যেতে পারে। তাই বেদান্তের বর্ণিত আত্মার পঞ্চকোষকে সোজাসুজিভাবে আমাদের জড়-দেহের, প্রাণের ও মনের ক্রিয়া বলেই বর্ণনা করা যেতে পারে। আমরা যাকে মন বলি তার ক্রিয়ার বাইরে নিত্যমুক্ত আসল 'আমি' বা সত্যিকার মন, সেই আসল আমি বা মনকে জানলে তবেই মুক্তি।

যদিও আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে আমরা আত্মা বা 'আমি'কে 'তুমি' বা বিষয়ের সঙ্গে বিযুক্তভাবে অনুভব করি না, তথাপি জগতের দার্শনিক চিন্তায় এই 'আমি' বা আত্মার যথার্থ স্বরূপ-বিশ্লেষণের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। তার আসল কারণ হয়তো নৈতিক বিশ্বাস অর্থাৎ আত্ম-জ্ঞানে মুক্তি, এই চির-প্রসিদ্ধ ধারণা।

'তুমি' ও 'আমি'র অবিচ্ছেদ্য যোগ

এ-চিরপ্রসিদ্ধ ধারণার বশবর্তী হয়েই শঙ্কর বলেছেন : 'আমি'র বা আত্মার স্বরূপ-নির্ণয়ই তত্ত্ব-জ্ঞান। তিনি বলেছেন : আত্মার স্বরূপ নিয়ে দার্শনিকদের ভিতর যতই মতভেদ থাকুক না কেন, আত্মা বা 'আমি'র প্রতীতি কেউ অস্বীকার করতে পারেন না। শঙ্করের এই উক্তি দেকার্তের আত্মার অসন্দিগ্ধত্বের কথাই (যার ভিত্তিতে তিনি তাঁর দর্শনের ইমারত গড়ে তুলেছেন) মনে করিয়ে দেয়।

যদিও 'আমি' ও 'তুমি' নিয়েই এ-জগৎ, যদিও যখনই আমরা প্রাত্যহিক জীবনে আমি আমাকে জানি বলি, তার সঙ্গে পরোক্ষভাবে 'তুমি'-বোধক বিষয়ের যোগ থাকে তথাপি 'আমি' ও 'তুমি'র, বিষয় ও বিষয়ীর এই ঘাত-প্রতিঘাতে আমরা 'আমি'র ওপরেই জোর দিয়ে থাকি। আজকের দিনের নব্য-বাস্তববাদী দার্শনিকরা এ-চেষ্টাকে কুযুক্তি বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু আসল কথা হলো এই যে : এটা কুযুক্তিই হোক, আর সুযুক্তিই হোক, তার প্রাত্যহিক জীবনের আচরণে মানুষ 'আমি' বা আত্মার সাহায্যেই 'তুমি' বা বিষয়কে বুঝে থাকে। কেউ কেউ বলতে পারেন : নাক দিয়ে নিঃশ্বাস না নিয়ে চোখ দিয়ে নিলে ভালো হতো, কান দিয়ে না শুনে জিহ্বা দিয়ে শুনলে ভালো হতো, কিন্তু প্রকৃতির দাপটে তা হবার জো নাই। ভালোর জন্যেই হোক আর মন্দের জন্যেই হোক, আমরা চোখ দিয়েই দেখি, কান দিয়েই শুনি, আর নাক দিয়েই নিঃশ্বাস নেই। তাই বলা চলে 'তুমি' ও 'আমি' বিষয় ও বিষয়ী, উভয়ের সত্তা সমান হলেও 'আমি' বা আত্মার ওপরই আমাদের সাধারণ পক্ষপাত, তাই 'আমি' বা আত্মার স্বরূপ-বিশ্লেষণেই দর্শনের সূচনা ও দর্শনের আত্মবিশ্লেষণের এত প্রাধান্য।

আত্ম-পক্ষপাতের পরিবেশ

এ-আত্ম-পক্ষপাত দর্শনে প্রাচীন ও মধ্যযুগে বিশেষ প্রকট। সে যুগে মানুষের জীবনে বিষয়ের প্রাচুর্য আজকের তুলনায় নগণ্য ছিল বলেই হয়তো সেই দর্শনে আত্মানুরাগের এতো আধিক্য। আজকের দিনে বিজ্ঞান ও টেকনোলজির দৌলতে বিষয়-সম্ভারের, ভোগের বস্তুর এতো ছড়াছড়ি। তাই হয়তো আমরা পুরানো দিনের আত্ম-পক্ষপাত ভুলে গিয়ে আমাদের আত্মাকে বিষয়ের ভিতর খুঁজতে, এমনকি হারাতে বসেছি। আমাদের আত্ম-সত্তার সন্ধান আজ খুঁজে পাওয়া যায় পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের অজস্র সংঘাতে, বৃহত্তর জীবনে শক্তির নেশায়। তবে এ-মাদকতা কতদিন থাকবে জানি না, কারণ বিজ্ঞানের দৌলতে ইসরাফিলের ধ্বংসের বাঁশী একটু একটু করে যেন বাজতে শুরু করেছে, এরই অনিবার্য চাপে মানুষ হয়তো আবার আত্মানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হবে। তাই

'আমি' বা আত্মার স্বরূপ বিশ্লেষণের এই হলো উপযুক্ত কাল ও পরিবেশ। ইতিহাসের এই সঙ্কটময় মুহূর্তকে তার আগমনীর ইঙ্গিত বলে মনে করা হয়তো অসঙ্গত হবে না।

'আমি'র স্বরূপ সম্বন্ধে তিনটি মত

বিশ্বের আদি যুগ থেকে নানা দেশের দার্শনিকরা 'আমি' বা আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে যে সমস্ত মত পোষণ ও প্রচার করেছেন, তাকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। তাঁদের এক দল আত্মাকে শুধু দেহাতীত বলেই মনে করেননি, মনের চিন্তা-প্রবাহের সম্পূর্ণরূপে অতীত বলেও মনে করেছেন। এ-মতের নাম দে'য়া যেতে পারে পরম-আত্মবাদ। আর এক দল এই মতের ঠিক উল্টো মতের প্রচার করেছেন। তাঁদের মতে, জন্ম থেকে মরণ পর্যন্ত মানুষের চিন্তা-প্রবাহের নামই আত্মা। এ-মতের নাম আত্ম-প্রবাহবাদ। আর যাঁরা এই দুই বিরোধী মতকে মিশিয়ে এক ক'রে মানুষের চিন্তা-প্রবাহের ভিতর অনুস্যূত একক আত্ম-সত্তা স্বীকার করেছেন, তাঁদের মতের নাম দে'য়া যেতে পারে আত্ম-সমন্বয়বাদ বা ব্যক্তিত্ববাদ। এবার আমরা এ-তিন মতের একটু বিস্তারিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হবো।

পরম-আত্মবাদ

দেহের অতীত অজর, অমর, অবিনশ্বর আত্মায় যাঁরা বিশ্বাস করেন, তাঁদের মতে আমরা যাকে মন বলি তার সঙ্গে আত্মার যোগ অবিচ্ছেদ্য নয়, বিচ্ছেদ্য। প্লেটো এ-মতের এক বড় সমর্থক। মধ্যযুগের খ্রীস্টীয় চার্চে প্লেটোর প্রভাবে এ-মতের বহুল প্রচার ও অনুশীলন হয়। এ-মতের অনুসারীরা মনে করেন, আত্মা যখন অবিনাশী, অমর, তখন আত্মা কখনো আমাদের মনের চিন্তাধারা, সুখ-দুঃখের অনুভূতি, ইচ্ছা-দ্বেষ-সংঘাতের দ্বারা সংশ্লিষ্ট হতে পারে না। জন্ম থেকে মরণ পর্যন্ত আমাদের ভিতর এক 'আমিত্ব'-বোধ বিদ্যমান। আমি শিশু, আমি বালক, আমি তরুণ, আমি পরিণত বয়স্ক, আমি বৃদ্ধ, অতি বৃদ্ধ, সব বিচিত্র অনুভূতির পিছনে আমিত্বের এক প্রতীতি বিদ্যমান। এ থেকেই প্রমাণ হয় যে, 'আমি'র স্বভাব বদলায় না, মনের চিন্তাধারায় তার বিচিত্র অনুভূতিই বদলায়। সুতরাং আত্মা দেহেরও অতীত, চিন্তারও অতীত।

এই দেহাতীত, ভাবনাতীত আত্মার স্বরূপের সঙ্গে নিকট-পরিচিতি লাভ করার উদ্দেশ্যে ক্যাথলিক চার্চের ধর্মপ্রাণ আচার্যেরা তাঁদের দৈনিক প্রার্থনার অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে বেত্রাঘাতের অসহ্য যাতনা সহ্য করতেও দ্বিধা বোধ

করতেন না। বেত্রাঘাত ও তজ্জনিত যন্ত্রণা সহ্য করা অভ্যস্ত হলে তা থেকে এই অনুভূতি হওয়াই স্বাভাবিক যে, আত্মা শুধু দেহের অতীত নয়, সুখ-দুঃখেরও অতীত।

গীতায় আছে, আত্মীয়-স্বজনের নিধন-আশঙ্কায় অর্জুন যখন কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে উপস্থিত হয়ে যুদ্ধত্যাগের সঙ্কল্প করেছিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে এ-দেহাতীত, অজর, অমর আত্মার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাঁর কর্তব্য-কর্ম যুদ্ধে লিপ্ত করেছিলেন।

উপনিষদে পরম-আত্মবাদ

আত্মা যে সুখ-দুঃখের অতীত, একথা ছান্দোগ্য উপনিষদে এক মনোরম আখ্যায়িকার মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে। দেবরাজ ইন্দ্র ও অসুররাজ বিরোচন আত্মার যথার্থ স্বরূপজ্ঞানেই জীবের দুঃখমুক্তি এ-সত্য লোক-পরম্পরায় জেনে তাঁদের আদিপিতা প্রজাপতির কাছে আত্ম-তত্ত্ব-উপদেশের জন্য হাজির হয়েছিলেন। প্রজাপতি প্রথম তাঁদের যে উপদেশ দেন তার মর্ম হলো: দেহই আত্মা আর দেহ-সেবাই জীবের মহাব্রত, তাতেই তার পরম কল্যাণ। এ-রসালো উপদেশ পেয়ে দৈত্যরাজ বিরোচন অসুরদের কাছে গিয়ে উৎফুল্ল হৃদয়ে দেহাত্মবাদের মাহাত্ম্য ঘোষণা করেন। ইন্দ্রও উপদেশ পেয়ে স্বগৃহে ফিরে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তার মনে হঠাৎ সংশয় জাগায় আবার ফিরে এসে প্রজাপতিকে বল্লেন, 'আপনি যে আত্ম-তত্ত্বের উপদেশ দিলেন, তাতে আমি কোন আশ্বাস পেলাম না। শরীরই যদি আত্মা হয়, তাহলে শরীরের কোন অংশ ভেঙে গেলে আত্মাও ভেঙে যাবে, ফলে দুঃখ অনিবার্য। প্রজাপতি মুচকি হেসে বললেন: তুমি ঠিকই বলেছ, দীর্ঘকাল এখানে থেকে সংযত জীবন যাপন কর, তারপর তোমাকে আবার উপদেশ দেবো।

অনেক বছর পর জাগ্রত জীবনের দেহানুভূতিকে বাদ দিয়ে প্রজাপতি স্বপ্নের স্বাধীন অনুভূতির মাধ্যমে ইন্দ্রকে আত্মতত্ত্ব উপদেশ দিলেন। ইন্দ্র আগের মতো ঘরে ফিরে যাবার সময় ভাবতে লাগলেন: স্বপ্নেও তো দুঃখের নানা রকম অনুভূতি। সুতরাং দুঃখাতীত আত্মার অনুভূতি ত স্বপ্নে নাই। ফিরে এসে একথা প্রজাপতিকে জানালে তিনি আগের মতোই মুচকি হেসে বললেন: ঠিকই বলেছ, আবার দীর্ঘকাল এখানে থেকে সংযত জীবন যাপন কর, তখন তোমাকে আত্ম-তত্ত্বের উপদেশ দেবো। সুদীর্ঘ সংযত সাধনা শেষ হবার পর প্রজাপতি ইন্দ্রকে বললেন: সুষুপ্তি অর্থাৎ স্বপ্নবিহীন নিদ্রাতে আমরা কিছু জানতে পারি না আর সেখানে দুঃখের অনুভূতি নাই। এ-সুষুপ্তিই তাই আত্মার স্বরূপ। আগের

বারের মতো এবারও ইন্দ্র খানিক দূর গিয়ে ফিরে এলেন, কারণ সুষুপ্তি তো অজ্ঞতারই নামান্তর, সুষুপ্তির আত্মা গাছ-পাথরের মতোই জড় পদার্থ। ফিরে এসে আগের বারের মতো প্রজাপতিকে তাঁর আশংকা জানালে প্রজাপতি তাঁকে আবার কিছুদিন সংযত জীবন যাপনের উপদেশ দিলেন। সে-সাধনার শেষে প্রজাপতির কাছ থেকে ইন্দ্র জানলেন: জাগরণ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি আমাদের মনো-জীবনের এই তিনটি স্তর ছাড়িয়ে অশরীরী দেহাতীত আত্মার অস্তিত্ব। সে আত্মার সুখ দুঃখের বোধ নেই, শরীরেরই দুঃখ, অশরীরীত্বেই শাশ্বত আনন্দ।

উপনিষদের সমন্বয়

মুণ্ডক-উপনিষদে আবার এই দেহাতীত সুখ-দুঃখের অতীত আত্মাকে আসল আত্মা বলে, আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের বিচিত্র অনুভূতির সঙ্গে জড়িত আত্মাকে তারই ছায়া বলে অভিহিত করা হয়েছে। মুণ্ডক-উপনিষদে আছে: এই দেহ-বৃক্ষে দু'টি সুন্দর পাখীর বাস, একটি থাকে তার উপরের ডালে আর একটি থাকে তার নীচের ডালে। উপরের ডালে যে পাখীর বাস, তা হলো পরম-আত্মা। এ-পাখী দেহ-বৃক্ষের তিক্ত-মধুর ফল আস্বাদ করে না। আর নীচের ডালের পাখী দেহ-বৃক্ষের মধুর ফল আস্বাদন করে সুখ আর তার তিক্ত ফল আস্বাদন করে দুঃখ অনুভব করে। কিন্তু এই হলো এক অদ্ভুত সত্য যে, এ-নীচের পাখী যেই উপরের পাখীকে জানে, তখনি সে তার স্বতন্ত্র সত্তা হারিয়ে, সেই উপরের পাখীর সঙ্গে মিশে এক হয়ে যায়। মুণ্ডক-উপনিষদে রূপকের সাহায্যে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে যাকে আমরা 'আমি' বা আত্মা বলি, তাকে একেবারে উড়িয়ে না দিয়ে, তারও যে একটা প্রতীয়মান সত্তা আছে, তাই একই বৃক্ষে দু'টি পাখীর বাস-কল্পনা করে সহজভাবে দেখানোর চেষ্টা হয়েছে।

আগেই বলেছি, এই পরমাত্মবাদের সঙ্গে পুরনো দিনের ধর্ম বিশ্বাসের গভীর যোগ। আজ বৈজ্ঞানিক সভ্যতার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে সে পুরনো দিনের ধর্ম-বিশ্বাসের ইমারৎ চুরমার হতে চলেছে। কাজেই এ-দেহাতীত ভাবনাতীত আত্মায় শিক্ষিত মানুষ আজ আর তেমন বিশ্বাস করে না, তারা আত্মা বলতে মানুষের চিন্তাধারা ও সুখ-দুঃখের প্রবাহকেই বোঝে। এর অতিরিক্ত স্থির আত্মা বা 'আমি' বলে কিছুর সঙ্গে তাদের যোগসূত্র খণ্ডিত ও বিচ্যুত।

বৌদ্ধ-দর্শনে অনাত্মবাদ

অত্যন্ত বিস্ময়ের বিষয় এই যে, জগতের একটি প্রাচীন ধর্মমত ও তার প্রভাবিত দর্শনেও এই স্থির আত্মবাদের জোরালো প্রতিবাদ দেখতে পাওয়া যায়।

এখানে বৌদ্ধধর্ম ও দর্শনের কথাই মনে পড়ছে। আত্মা বলতে বৌদ্ধ দার্শনিক ও ধর্ম-প্রচারকরা সাধারণতঃ স্থির, শাশ্বত আত্মাকেই বুঝতেন। আর এ-জাতীয় কোনও আত্মসত্তা নাই এটাই তাঁরা নানাভাবে দেখাবার চেষ্টা করেছেন। এ জন্যেই তাঁদের মতের নাম অনাত্মবাদ, অর্থাৎ স্থির আত্মার নিষেধ ও প্রত্যাখ্যান।

এই অনাত্মবাদের সঙ্গে তথাগত বুদ্ধ ও তাঁর শিষ্যদের প্রচারিত বিষয়-বৈরাগ্যের অতি নিকট যোগ। তাঁরা মনে করেন জগতের সমস্ত জিনিস যদি অনিত্য ও ক্ষণিক হয়, তাহলে আর তার প্রতি আকর্ষণ কিসের? আমি নিজে একটি স্থির পদার্থ, কাজেই আমার আত্মীয়-স্বজন, ঘর-বাড়ী, ধন-দৌলত এগুলোর সঙ্গে আমার সম্পর্ক ও সম্বন্ধ স্থির—এ ধারণাই হলো বিষয়াসক্তির মূল কারণ। কিন্তু একথা যদি আমাদের জানা থাকে যে, যে-স্থির 'আমি'র সত্তা কল্পনা করে আমরা বিষয়ের পেছনে ছুটেছি, সে 'আমি'ই একটি কাল্পনিক পদার্থ, তাহলে নিন্দা-প্রশংসা, ধন-বৃদ্ধি, ধন-হানি, স্বজনলাভ, স্বজন-বিয়োগ কিছুতেই আমরা বিচলিত হবো না। তাই বৈরাগ্যই হলো বৌদ্ধ অনাত্মবাদের প্রাণকেন্দ্র।

আজকের দিনের ধারণা ঠিক তার বিপরীত। বিশ শতকের বিজ্ঞানের দৌলতে আজ সব কিছুই ক্ষণিক, স্থির আত্মা ও স্থির বস্তু উভয়েরই নিখোঁজ। কাজেই আজকের দিনের দার্শনিক আবহাওয়া বৌদ্ধ ক্ষণিকবাদের প্রভাবেই প্রভাবিত। শুধু এক জায়গায় তফাৎ। বৌদ্ধ ক্ষণিকবাদ আবিষ্কৃত হয়েছিল বৈরাগ্যের অকুণ্ঠ সমর্থনে। আজকের দিনের ক্ষণিকবাদের সঙ্গে এমন নৈতিক-বোধ, এমন বৈরাগ্যপ্রবণ জীবন-দর্শনের যে কোন যোগ আছে তা মনে হয় না। বিষয় ক্ষণিক হোক, আর 'আমি'ই ক্ষণিক হই, অথবা আমরা দুই-ই ক্ষণিক হই, তাতে কি আসে যায়? ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে ভোগ্যবস্তুর যোগে যে মাদকতা, তাকে এ-জাতীয় যুক্তি দিয়ে উড়িয়ে দে'য়া যায় না। কাজেই যতক্ষণ ইন্দ্রিয়ের বিষয়-ভোগের ক্ষমতা আছে, ততক্ষণ বিষয়-ভোগ করে জীবন-আনন্দ সম্ভোগ করাই বুদ্ধিমানের কর্তব্য। এটাই হলো সাম্প্রতিক ক্ষণিকবাদী জীবন দর্শনের মূলনীতি।

ক্ষণিকবাদের নৈতিক মানের আলোচনা দীর্ঘ না ক'রে বুদ্ধ এবং তাঁর শিষ্যেরা খ্রীস্ট-পূর্ব যুগে যে অনাত্মবাদের প্রচার ও অনুশীলন করেছিলেন, তার একটু আলোচনা এখানে করতে চাই।

বৌদ্ধ-দর্শনে মনের স্বভাব

আজকের দিনের মনস্তত্ত্বে যাকে চিন্তা বা ভাবনা বলা হয়, বৌদ্ধ-দর্শনে তারই মোটামুটি প্রতিশব্দ স্কন্ধ। আজকের দিনে মনস্তাত্ত্বিকরা মনকে ভাবনার সমষ্টি বা চিন্তার প্রবাহ বলেন। বৌদ্ধ-দার্শনিকরা বলতেন: আমরা যাকে মন বা

'আমি' বলি তা পাঁচটি ক্ষণস্থায়ী জিনিসের সমষ্টি ; তাদের নাম রূপ, সংজ্ঞা, বেদনা, সংস্কার ও বিজ্ঞান। বৌদ্ধ-দর্শনে এদেরই পারিভাষিক নাম পঞ্চস্কন্ধ। রূপ বলতে বৌদ্ধ-দার্শনিকরা পৃথিবী, জল, তেজ ও বায়ু এ-চারটি ভূতকে বুঝতেন। বেদনা বলতে তাঁরা বুঝতেন, এ-চারটি ভূতের আমাদের মনের উপর ক্রিয়া। আর সংজ্ঞা বলতে তাঁরা বুঝতেন, এ-ক্রিয়ার ওপর আমাদের প্রতিক্রিয়া। আর এই সংজ্ঞার ফলে আমাদের মনে যে ছাপ থাকে তাকে তাঁরা সংস্কার বলতেন। আর বেদনা, সংস্কার, সংজ্ঞা ও রূপের সংযোগে যে চেতনার সৃষ্টি, তারই নাম বিজ্ঞান। এই পাঁচটি স্কন্ধকে বৌদ্ধ-দার্শনিকরা ক্ষণিক বলে থাকেন। সোজা কথায়, আমরা যাকে আত্মা বলি তার মূলে আছে বস্তু-সংস্পর্শ বা বেদনা, বস্তু-সংস্পর্শের প্রতিক্রিয়া বা জ্ঞান, জ্ঞান চলে যাবার পর তার যে ছাপ আমাদের মনে থাকে অর্থাৎ সংস্কার, আর এ সব নিয়ে যে প্রবাহ বা বিজ্ঞান। অতএব বৌদ্ধেরা ক্ষণিক আত্মার ভিতর ক্ষণিক বস্তুকেও ঢুকিয়েছেন।

মিনিন্দার ও নাগসেনের সংলাপে অনাত্মবাদ

এ-অনাত্মবাদের এক সুন্দর বর্ণনা আমরা পাই খ্রীস্ট-পূর্ব যুগের শেষপর্বে গ্রীক রাজা মিনিন্দারের সঙ্গে বৌদ্ধ-ভিক্ষু নাগসেনের সংলাপে, যা পালি সাহিত্যে মিলিন্দ পঞ্‌হ্ অর্থাৎ মিলিন্দ প্রশ্ন নামে পরিচিত। আলেকজাণ্ডারের ভারত-আক্রমণের পর পাঞ্জাবের উত্তর-সীমান্তে গ্রীকরা অনেকদিন রাজত্ব করেন, তাঁদেরই একজনের নাম মিনিন্দার, পালি ভাষায় তাঁর নামেরই পরিণতি হয়েছে মিলিন্দে। মিনিন্দার তত্ত্বজিজ্ঞাসু ও তর্কপ্রবীণ দুই-ই ছিলেন। বৌদ্ধেরা স্থির আত্মা স্বীকার করেন না, একথা জেনে তিনি বৌদ্ধদের প্রচারিত অনাত্মবাদ বিশ্লেষণের জন্য পাঞ্জাবের উত্তর-সীমান্তে বৌদ্ধমঠের অধ্যক্ষ নাগসেনের নিকট উপস্থিত হন।

তিনি নাগসেনের কাছে হাজির হয়ে তাঁকে সশ্রদ্ধ প্রণতি জানিয়ে প্রশ্ন করেন : "ভদন্ত (পরম পূজনীয়), আপনি স্থির আত্মা বলে কিছু স্বীকার করেন না, অথচ আপনার শিষ্যেরা সকাল বেলা আপনাকে একবার সভক্তি প্রণাম করেন, আর সন্ধ্যা বেলা আবার করেন। নাগ সেন বলে যদি কোন স্থির ব্যক্তি না থাকে তাহলে সকাল-সন্ধ্যায় এই প্রণাম গ্রহণ কি করে আপনার পক্ষে সম্ভব ?"

মিনিন্দারের এই প্রশ্নে মোটেই বিচলিত না হয়ে ভিক্ষু নাগসেন অন্য বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হলেন। তিনি মিনিন্দারকে জিজ্ঞাসা করলেন, "মহারাজ, আপনি এ-মঠে এলেন কি ক'রে ? পায়ে হেঁটে নিশ্চয়ই আসেননি ?"

মিনিন্দার উত্তর দিলেন : "ভদন্ত, আমি রথে চড়ে আপনার কাছে এসেছি।"

নাগসেন পুনরায় প্রশ্ন করলেন : "মহারাজ, রথ পদার্থটি কি ?"

মিনিন্দার উত্তর দিলেন : ' ভদন্ত, কাঠের টুকরো, লোহা ও দড়ির সমষ্টিই রথ।"

মিনিন্দারের এ-উত্তরের ওপর আলোকপাত ক'রে ভিক্ষু নাগসেন বললেন : "মহারাজ, কাঠের টুকরো, দড়ি ও লোহা নিয়েই যখন রথের সৃষ্টি, তখন এদের অতিরিক্ত রথ বলে আর কিছু নেই। রথ কথাটি একটি নাম মাত্র।"

মিনিন্দার অবনত মস্তকে উত্তর দিলেন : "ভদন্ত, সত্যিই তাই"।

ভিক্ষু নাগসেন আত্মতত্ত্ব বিশ্লেষণে একপদ অগ্রসর হয়ে বললেন : "মহারাজ, রথের বেলায় যে নিয়ম প্রযোজ্য, নাগসেনের বেলায়ও তা প্রযোজ্য। রথ যেমন কাঠ, দড়ি ও লোহার সমষ্টি ছাড়া আর কিছু নয়, তেমনি নাগসেনও রূপ, সংজ্ঞা, বেদনা, সংস্কার ও বিজ্ঞান এই পাঁচটি স্কন্ধের সমষ্টি ছাড়া আর কিছু নয়।"

"রথের মতো নাগসেন কথাটিও নামমাত্রেই পর্যবসিত। অবিদ্যার বশবর্তী হয়ে নাগসেন বলে স্থির কিছু আছে মনে ক'রে লোকে তাকে সকাল-সন্ধ্যায় প্রণাম করলেও আসলে ক্ষণিক পঞ্চস্কন্ধের অতীত নাগসেন বলে আর কিছু নাই।"

হিউমের আত্ম-প্রবাহবাদ

বৌদ্ধ ভিক্ষু নাগসেনের প্রায় দু'হাজার বছর পরে ডেভিড্ হিউম্ তাঁর 'মানব-স্বভাবের' বিশ্লেষণে এই তত্ত্ব বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। তিনি খুব জোরের সঙ্গে বলেছেন : আমি যখন আমার মানসলোকে গভীরভাবে প্রবেশ করি, তখন আমি সেখানে একক আমিত্ব বলে কোন পদার্থ খুঁজে পাই না, তখন আমার নজর পড়ে ক্ষণিক মনোবৃত্তির ওপর। এই ক্ষণিক মনোবৃত্তিগুলো সাহচর্য নিয়মে একটি আর একটির সাথে মিলে যায়, আর এই মিলিত প্রবাহকেই আমরা স্থির আত্মা বলে ভুল করি।

হিউমের প্রায় একশো বছর পরে বিশ শতকের শুরুতে দার্শনিক উইলিয়াম জেম্স তাঁর মনোবিজ্ঞানে এ-কথাই দেখাবার চেষ্টা করেন যে, আমরা যাকে আত্মা বলি, তা চিন্তাধারার প্রবাহ ছাড়া আর কিছুই নয়, চিন্তা আর চিন্তার কর্তাতে কোন প্রভেদ নাই। এভাবেই তিনি দেকার্তের প্রচারিত চিন্তা ও চিন্তার কর্তার ভেদের মূলে কুঠারাঘাত করেন।

যারা ক্ষণিক আত্মা স্বীকার করেন না, তাঁরা বলেন : আত্ম-প্রবাহবাদের বড় দোষ দু'টি : এক, স্মৃতির ব্যাখ্যায় তার অক্ষমতা, দুই, পূর্বানুভূতির সঙ্গে বর্তমান অনুভূতির যোগসূত্র আবিষ্কারে তার অসামর্থ্য।

আত্ম-প্রবাহবাদের সমালোচনা

অষ্টম শতকের শঙ্কর থেকে আরম্ভ ক'রে হিউমের পূর্ববর্তী কাল অর্থাৎ প্রায় এক হাজার বছর ধরে আত্ম-প্রবাহবাদের বিরোধী দার্শনিকরা খুব জোরের সঙ্গে এই দুই আপত্তির উল্লেখ করেছেন। তাঁরা মনে করেন, স্থির আত্মা বলে যদি কিছু না থাকে তা হলে আগের দিন যে আমি বন্ধুর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ খেতে গিয়েছিলাম, সে আমি আবার আজ তাকে আমার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ খাওয়াচ্ছি, এমন অনুভূতি কি ক'রে সম্ভব? পূর্ব-স্মৃতি মানুষের মানস জীবনের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এ-স্মৃতি যদি স্বীকার না করা হয়, তা হলে মানুষের পূর্ব-অভিজ্ঞতা বলে আর কিছু থাকে না, তা হলে সব জিনিসই আমাদের নতুন ক'রে শিখতে হয়। স্থায়ী আত্মা যদি আমরা স্বীকার না করি তা হলে আমাদের আগের দিনের অনুভূতির সঙ্গে আজকের দিনের অনুভূতির কোন যোগ থাকে না। এ-কথাই একটু ঘুরিয়ে বলা চলে: তা হলে আমাদের আজকের অভিজ্ঞতার সঙ্গে আমাদের আগামী দিনের অভিজ্ঞতারও কোন যোগ থাকে না।

বড় মুস্কিলের কথা এই যে, স্থির 'আমি' বলে যদি আমরা মোটেই কিছু স্বীকার না করি, তা হলে আমাদের দৈনন্দিন জীবনেও এক বড় বিপর্যয় শুরু হবে। আজ যে 'আমি' রাস্তার এক লোককে দিবালোকে হত্যা করলো, কাল সে বিচারকের সামনে দাঁড়িয়ে জোর গলায় বলবে: কাল যে-লোক হত্যা করেছিল, সে আজ আর নাই, কাজেই হত্যার অপরাধে তাকে শাস্তি দেওয়া অনুচিত ও অসঙ্গত।

তাই অনেক দার্শনিকের মতে, আমাদের অভিজ্ঞতার সঙ্গে কোন যোগ নাই বলে পরম-আত্মবাদ যেমন আমাদের অগ্রাহ্য, ঠিক তেমনি আমাদের বিচিত্র অভিজ্ঞতার ভিতর যে মূল-সূত্র, তা আবিষ্কারে অক্ষম বলে আত্ম-প্রবাহবাদও অগ্রাহ্য। এজন্যই এগারো শতকের প্রসিদ্ধ বৈদান্তিক বাচস্পতি মিশ্র বৌদ্ধদের আত্ম-প্রবাহের সমালোচনায় বলেছেন:

যোঽহং বাল্যে পিতরমন্বভবম্
সোঽহং বার্দ্ধক্যে প্রণপ্তৄননুভবামি

["যে আমি বাল্যে মাতাপিতাকে দেখেছি সেই আমি বার্ধক্যে আমার প্রপৌত্রদের দেখছি।]

অনুভূতির এই যোগসূত্র বৌদ্ধ অনাত্মবাদে কোথায়? তাই প্রয়োজন পরমাত্মবাদ ও আত্ম-প্রবাহবাদের সমন্বয়। তারই আলোচনায় এবার আমরা প্রবৃত্ত হবো।

আধুনিক য়ুরোপীয় দর্শনে

আধুনিক য়ুরোপীয় দর্শনে দেকার্তেই আত্মসমন্বয়বাদের প্রথম পুরোধা। আগেই বলেছি দেকার্তে বলেছেন : চিন্তার আধার, তার কর্তাই আমি বা আত্মা। আমি বা আত্মাকে দেকার্তে একটি দ্রব্য বলে কল্পনা করেছেন, তার অপরিহার্য বিশেষ ধর্ম-চিন্তা বা ভাবনা। মানুষের আত্মাকে এভাবে চিন্তার আধার একটি বস্তুরূপে কল্পনা লক্ ও বার্কলের ভিতরও দেখা যায়।

লাইবনিজ মানুষের আত্মাকে বস্তুরূপে কল্পনা করেছেন সত্য, কিন্তু তাঁর মতে আত্মার বিশেষ ধর্ম চিন্তা বা ভাবনা নয়, ক্রিয়াশীলতা, আর ক্রিয়াশীলতারই এক বিশেষ প্রকাশ চিন্তা বা ভাবনা। ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বে যে নির্জ্ঞান মনের কথা আছে, তার অস্পষ্ট স্বীকৃতি লাইবনিজে দেখা যায়। দেকার্ত যাকে চিন্তা বলেছেন, তা সজ্ঞান মনেরই ক্রিয়া। তাই মনে হয়, এই চিন্তাকে যখন লাইবনিজ আত্মার ক্রিয়াশীলতার একরূপ বলে ধরে নিয়েছেন, তখন নির্জ্ঞান মনের ধারণা স্পষ্টভাবে নয়, অস্পষ্টভাবে তাঁর ভিতর ছিল।

আত্মাকে জ্ঞান বা চিন্তার আধার বলে কল্পনা ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের ভিতর পাওয়া যায়। তাদের মতে আত্মা একটি দ্রব্য, আর জ্ঞান তার একটি বিশেষ গুণ। কিন্তু এ বিশেষ গুণ আত্মাতে সব সময় থাকে না। সুষুপ্তি বা স্বপ্নবিহীন গভীর নিদ্রায় আত্মার সঙ্গে বিষয়ের সম্বন্ধ থাকে না, কাজেই আত্মার তখন জ্ঞান বা চিন্তা থাকে না। আর মুক্তিতে বা অপবর্গে আত্মা দেহাতীত অবস্থায় থাকায় তখনো আত্মাতে জ্ঞান থাকে না। কাজেই ন্যায় ও বৈশেষিকের মতে জ্ঞান আত্মার বিশেষ গুণ হলেও আত্মাতে জ্ঞান সব সময় থাকে না। প্রভাকর-মতবাদী মীমাংসকদের মতও ন্যায়-বৈশেষিক মতেরই অনুরূপ।

দেকার্তে, লক্, বার্কলি, লাইবনিজ, ন্যায়, বৈশেষিক ও প্রভাকর-মতবাদী মীমাংসকদের ভিতর আত্ম-সমন্বয়বাদের সূচনাই আমরা দেখতে পাই। মোটা-মুটিভাবে তাঁরা জ্ঞানকে আত্মার গুণ ও আত্মাকে সেই গুণের আধার কল্পনা করেছেন। তাঁদের মতে, 'আমি' বা আত্মা আমাদের ভাবনার একেবারে অতীত নয়, আর আত্মা ভাবনার প্রবাহ বা সমষ্টিও নয়। এইভাবে ভাবনা-প্রবাহ ও তার অধিষ্ঠান আত্মা, এ দু'টি কথা স্বীকার করে এইসব দার্শনিক-চিন্তায় আত্মসমন্বয়ের পত্তন।

হেগেলীয় দর্শনে আত্ম-সমন্বয়বাদ

আত্ম-সমন্বয়বাদের পুরোপুরি অভিব্যক্তি হয়েছে হেগেল ও তাঁর অনুগামীদের ভিতর। তাঁরা একদিকে আত্মাকে এক বলেছেন, অন্যদিকে তার বহুত্বও স্বীকার

করেছেন। এক দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁরা আত্মাকে অপরিবর্তনশীল বলেছেন, আবার আর এক দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁরা তাকে পরিবর্তনশীলও বলেছেন। আমাদের মনের অসংখ্য ভাবনা-প্রবাহ ও তাদের পিছনে যে একক আত্মসত্তা, এ দু'টি একই সত্যের এ-পিঠ আর ও-পিঠ। দক্ষিণ মেরুকে বাদ দিয়ে যেমন উত্তর-মেরুর কথা ভাবা যায় না, জ্ঞাতাকে বাদ দিয়ে যেমন জ্ঞেয়ের কল্পনা করা যায় না, ঠিক তেমনি আত্মার পরিবর্তনশীল সত্তাকে বাদ দিয়ে তার অপরিবর্তনশীল সত্তার কথা ভাবা যায় না, আর তার অপরিবর্তনশীল সত্তাকে বাদ দিয়ে তার পরিবর্তনশীল সত্তাকেও ভাবা যায় না। এ দু'টি নিয়েই আমাদের আত্মা বা আমি। এদু'টি একই মুদ্রার এ-পিঠ আর ও-পিঠের মতো অবিচ্ছেদ্য ও অবিভাজ্য।

হেগেলীয় মতবাদীরা বলেন, বহুর ভিতর ঐক্য, বৈচিত্র্যের ভিতর সামঞ্জস্য, বিভেদের ভিতর সমন্বয় সাধন করাই আত্মার বা 'আমি'র বিশেষ ধর্ম। এটাই তার ব্যক্তিত্ব, তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। জড়বস্তুর বহু গুণের বৈচিত্র্যের ভিতর তার ঐক্যকে আমরা অনুভব করি, কিন্তু জড়বস্তু নিজে সে ঐক্য অনুভব করতে পারে না। এখানেই তার সীমাবদ্ধতা, এখানেই তার অপূর্ণতা, আর মানুষের আত্মা বা 'আমি'র এটাই হলো স্বভাব যে সর্বদাই তার অন্তর্জগতের অশেষ বৈচিত্র্যের ভিতর সে নিজের ঐক্য অনুভব করে। এইজন্য আত্ম-সমন্বয়বাদের আর এক নাম—ব্যক্তিত্ববাদ।

ব্যক্তিত্বের বিকাশ

ব্যক্তিত্বের বিকাশের ফলে 'আমি' বা আত্মা শুধু তার নিজের ক্ষুদ্র দেহের ভিতরই তার সত্তা অনুভব করে না, সারা জগতের অগণিত বস্তুর ভিতরও তার ব্যক্তিত্ব সে অনুভব করতে পারে। হৃদয়ের বিস্তারের ফলে মানুষের আত্মা নিজেকে তার পরিবার-পরিজনের ভিতর, সমাজের ভিতর, জাতির ভিতর, মনুষ্য-সমাজের এমনকি বিশ্বের সমস্ত চেতন পদার্থের ভিতর পরিব্যাপ্ত ও অনুস্যূত দেখতে পারে। এটাই হলো ব্যক্তিত্বের সত্যিকার বিকাশ ও পরিণতি।

অতি পুরনো দিনের এক মুফতী এ-ব্যাপক দৃষ্টির নাম দিয়েছেন আত্ম-যজ্ঞ। এক আদিম যুগে ঘৃত-সংযোগে পশুর মাংস জলন্ত অগ্নিতে দেব-দেবীর স্তুতিসহকারে আহুতি দিয়ে মানুষ মনে করতো সে ধর্মানুষ্ঠান করছে, আর মৃত্যুর পর অনন্ত স্বর্গে যাবার এটাই তার ছিল বড় পাথেয়। মানুষের মনোবৃত্তির বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে উচ্চতর দৃষ্টির অধিকারী হয়ে সে বুঝতে পারলো এ-যজ্ঞ স্থূল-যজ্ঞ, আসল যজ্ঞ হলো তার আমিত্বকে প্রসারিত করে সর্বজীবে পরিব্যাপ্ত করা, যার ফলে সে নিজের ভিতর সকলকে আর সকলের ভিতর নিজেকে

দেখতে পারে, এটাই সত্যিকার আত্মদৃষ্টি। এভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে গৌতম বুদ্ধ উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন: "সর্বে সত্ত্বা সুখিতা হোন্তু"—"সব প্রাণীরা সুখী হোক।"

ব্যক্তিত্বের এমন বিকাশের সম্ভাবনা আজকের দিনের সংশয়বাদী পরিবেশে অনেকেই স্বীকার করবেন না জানি। তথাপি সত্যানুরোধে একথা বলা প্রয়োজন যে, ব্যক্তিত্বের এমন বিকাশ অনেক অধ্যাত্মবাদী দার্শনিকই স্বীকার করেছেন এবং এ-বিকাশকেই তাঁরা মানবাত্মার সর্বশ্রেষ্ঠ পরিণতি বলেও ধরে নিয়েছেন।

অনেকে আবার এই পরিণতির সম্ভাবনায় বিহ্বল হয়ে ব্যাপক বিশ্বচেতনার ভিতর নিজেদের হারিয়ে ঘোষণা করেছেন—'অহং ব্রহ্মাস্মি': "আমি সেই সর্বব্যাপী পরম তত্ত্ব ব্রহ্ম।" প্রাচীন পারস্য দেশীয় সুফী মনসুর এই অনুভূতির আবেগে উদ্বেল হয়েই বলেছিলেন: 'আনাল হক', 'আমি চরম সত্য'।

বিশ্বের চরম সত্য: তার মূল উপাদান আল্লাহ্‌তালাকে যাঁরা পরম উপাস্য জেনে তাঁর প্রতি অনুরাগকে মানুষের চরম আদর্শ মনে করেন, তাঁরা কেউ কেউ অনেক সময় এ জাতীয় অনুভূতিকে নাস্তিকতার সমপর্যায়ে ফেলে তার বিরোধিতাও করেছেন। শঙ্কর এ-সমস্যার এক সুন্দর সমাধান বের করেছেন। তিনি বলেছেন: সাগরের ঢেউ যখন বড় হতে হতে সাগরের সঙ্গে মিশে যায় তখন তাকে সাগরের ঢেউই বলা উচিত, ঢেউ-এর সাগর বলা উচিত নয়। ঠিক তেমনি আত্মার প্রসারে মানুষ যখন বিশ্বসত্তাতে নিজেকে হারিয়ে ফেলে তখন তার সত্তারই রূপান্তর হয় বিশ্বসত্তায়, বিরাট বিশ্বসত্তার জীবের সসীম সত্তায় রূপান্তর হয় না।

দেহ ও মনের সম্বন্ধ

আমাদের 'আমিত্ব'-বোধ বা চেতন-সত্তা সম্বন্ধে দর্শন শাস্ত্রে যে-সব মত প্রচলিত, মোটামুটি তার একটা আলোচনা করে আত্মবিকাশে তার কি প্রয়োজনীয়তা তা বোঝাবার চেষ্টা করা গেলো। এবার যে দেহের ভিতর আমাদের আত্মসত্তা সীমাবদ্ধ, তার সঙ্গে দেহের কি সম্বন্ধ তা একটু আলোচনা করা প্রয়োজন।

মনীষী দেকার্তে দেহ ও আত্মাকে দু'টি বিপরীত-ধর্মী বস্তু বলে মনে করেছেন: মনের বিশেষ ধর্ম ভাবনা, দেহের বিশেষ ধর্ম বিস্তৃতি। এ-দু'য়ের ভিতর কোনও মিলন-সূত্র পাওয়া যায় না, তথাপি দেহ ও মন পরস্পরের ওপর প্রভাব বিস্তার করে, তাই পারস্পরিক বা অন্যোন্যপ্রভাবই দেহমনের সম্বন্ধের স্বরূপ। শরীর দুর্বল হলে মনও দুর্বল হয়ে পড়ে, আর মানসিক দুর্বলতার সঙ্গে শরীরও দুর্বল হয়ে যায়, এ-সত্য আমরা সব সময় অনুভব করি। সুতরাং শরীর ও মনের

পারস্পরিক প্রভাব সুবিদিত। সহজ দৃষ্টিতে এ-পারস্পরিক প্রভাবের কোন ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায় না। ব্যাপ্তিশীল দেহ ও চিন্তাশীল মনের পারস্পরিক সম্বন্ধ এক অলৌকিক ঘটনা, যা অলৌকিক তার সৃষ্টি একমাত্র সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের ইচ্ছায়ই সম্ভব। অতএব আমাদের দেহ ও মনের পারস্পরিক ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া ঈশ্বরের অনিবার্য ইচ্ছারই ফল।

আমাদের মস্তিকের বিশ্লেষণে আমরা এই অলৌকিক ক্রিয়ার একটি সার্থক সঙ্কেত খুঁজে পাই। আমাদের মস্তিকের সমস্ত অঙ্গগুলোই দু'টো ক'রে। একমাত্র পিনিয়্যাল গ্রন্থিতেই এ-নিয়মের ব্যতিক্রম। এ-গ্রন্থি মাত্র একটি। এ থেকেই বুঝতে হবে যে, পিনিয়্যাল গ্রন্থিতে ঈশ্বরের ঈচ্ছায় শরীর ও মনের সাক্ষাৎ যোগ। তার ফলেই তাদের পারস্পরিক ক্রিয়া সাধিত হয়। এই হলো শরীর ও মনের সম্বন্ধ-বিষয়ে দেকার্তের কথা।

ম্যালব্রাঞ্চের উপলক্ষবাদ

দেকার্তের ভাবানুপ্রাণিত ম্যালব্রাঞ্চ শরীর ও মনের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া যে একটি অলৌকিক ঘটনা; এ-কথা স্বীকার করেননি। তাঁর মতে, অনন্ত শক্তিমান ঈশ্বর শরীর ও মনের এই যোগসাধন অনন্তকাল ধরে করে যাচ্ছেন, আর অনন্ত-কাল ধরে করে যাবেন। এ-সংযোগ সাধনের বিরাম নেই। যখনই আমাদের শরীরের মনের ওপর ক্রিয়া আর যখনই আমাদের মনের শরীরের ওপর ক্রিয়া, ঠিক সেই মুহূর্তে ঈশ্বর তার অলঙ্ঘনীয় ইচ্ছার প্রভাবে তা সম্ভব করে দিচ্ছেন। তাই ম্যালব্রাঞ্চের দেহ-মন-সংযোগের থিয়োরীর নাম উপলক্ষবাদ। দেকার্তের বর্ণিত পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া-বাদের এই হলো যৌক্তিক পরিণতি। শরীর ও মনের সৃষ্টিক্ষণে আল্লাহ্‌র ইচ্ছায়ই এক বারেই যা দেকার্তের মতে সংগঠিত, ম্যালব্রাঞ্চ তাকে অনন্তকাল ধরে বার বার সংগঠিত বলে মনে করেছেন। এ থেকেই বোঝা যায়, দেকার্তের চেয়ে ম্যালব্রাঞ্চের অলৌকিকতার প্রতি দরদ অনেক বেশী।

দেহ ও মনের সমান্তরালত্ববাদ

দেকার্তে ও ম্যালব্রাঞ্চের পরবর্তী দার্শনিক স্পিনোজা শরীর-মনের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া মোটেই স্বীকার করেন না। স্পিনোজা অলৌকিকতায়ও বিশ্বাসী ছিলেন না। ইহুদী ও খ্রীস্টধর্মে যে অসংখ্য অলৌকিক কাহিনী, স্পিনোজা তা বাদ দিয়ে ইহুদী ও খ্রীস্টধর্মের যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছেন, এ-কথা আমরা আগেই বলেছি।

ব্যাপ্তিশীল জড়দেহ ও ভাবনাশীল চেতন-মন ঈশ্বরের ইচ্ছায় পরস্পরের ওপর প্রভাব বিস্তার করে, যুক্তিবাদী স্পিনোজা একথা স্বীকার করেন না। আমাদের সহজ অভিজ্ঞতার বিশ্লেষণে তিনি এ-সিদ্ধান্তেই উপনীত হয়েছেন যে, আমাদের মনের চিন্তাধারা আমাদের দৈহিক পরিবর্তনের অবশ্যম্ভাবী ফল, তথাপি তাদের ভিতর কোন সাক্ষাৎ যোগ নাই। স্পিনোজা তাই বলেছেন: "পিটারের মন তার দেহ-বিষয়ক ভাবনা ছাড়া আর কিছুই নয়।" স্পিনোজার মতে আমাদের শরীর ও মন দু'টি সমান্তরাল নদী-প্রবাহের মতো। এ-দুই প্রবাহের ভিতর কোন সাক্ষাৎ যোগ না থাকায় তাদের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া অসম্ভব।

এই সমান্তরাল-প্রবাহ দুটি কেন পাশাপাশি চলেছে তার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে স্পিনোজা শেষ পর্যন্ত বলেছেন যে, আমাদের দেহ-প্রবাহ ও ভাবনা-প্রবাহ আসলে একই মূলীভূত বিশ্বসত্তার দু'টি ভিন্নমুখী অভিব্যক্তি। সুতরাং শরীর ও মনের সমান্তরাল-প্রবাহের আসল কারণ তাদের মূলীভূত ঐক্য। স্পিনোজার এ-মতেরই নাম দেহ-মন-সমান্তরালত্ববাদ।

লাইবনিজের পূর্বনির্দিষ্ট সামঞ্জস্যবাদ

লাইবনিজ স্পিনোজার মতোই দেহমনের সাক্ষাৎ যোগ স্বীকার করেননি। তাঁর মতে, আমাদের আত্মা একটি চেতন পরমাণু, আর আমাদের জড় দেহ কতগুলো চেতন-পরমাণুর সমষ্টি। এ-দু'য়ের ভিতর পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া অসম্ভব, কারণ এক চেতন-পরমাণুর সঙ্গে অন্য চেতন-পরমাণুর ঘাত-প্রতিঘাত সম্ভব নয়। কাজেই লাইবনিজের মতে শরীর ও মনের সম্বন্ধকে সমান্তরালত্ব বলেই নির্দেশ করা যেতে পারে। তবে লাইবনিজ মনে করেন: পারস্পরিক সম্পর্ক-বর্জিত চেতন-পরমাণুগুলো স্বাধীনভাবে চলেও সারাবিশ্বে দেহ-মনের সামঞ্জস্য যে অটুট তা একটি অলৌকিক ঘটনা ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না, আর এই অলৌকিক ঘটনা ঈশ্বর-ইচ্ছায়ই সম্ভব।

এরই পারিভাষিক নাম পূর্ব-নির্দিষ্ট সামঞ্জস্য। সৃষ্টির আদিমতম মুহূর্তে অনন্ত শক্তিমান, কল্যাণময় ঈশ্বর দেহ ও মনকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করে দিয়েছেন যে, তারা স্বাধীনভাবে পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া মুক্ত হয়ে চলেও বৃহৎ বিশ্বের ঐক্য সম্পূর্ণভাবে রক্ষা করে চলেছে।

শরীর ও মনকে যদি আমরা দু'টি ঘড়ি কল্পনা করি, তাহলে দেকার্তের মতে এ-দুটি ঘড়ি বিপরীত ও বিচ্ছিন্ন হলেও ঈশ্বরের ইচ্ছায় তাদের দু'টির ভিতর

একটি বাহ্য যোগসূত্র স্থাপিত, যার ফলে তারা পরস্পরের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছে !

আর ম্যালব্রাঞ্চের মতে এ-দু'টি ঘড়ির ভিতর কোন সংযোগ-সূত্র স্থাপন না করে অনন্ত শক্তিমান ঈশ্বর অনবরত তাদের ঠিকপথে চালিয়ে যাচ্ছেন আর লাইবনিজের মতে সৃষ্টির আদিমতম মুহূর্তে ঈশ্বর এ দু'টি ঘড়িকে এমনভাবে ঠিক করে দিয়েছেন যে, তাদের ভিতর বাহ্য যোগ না থাকলেও তারা সেই পরম শক্তিমান সত্তার নিখুঁত সৃষ্টি বলে অনন্তকাল ধরে সমান তালে চলে যাচ্ছে।

অভিনব উৎপত্তিবাদে দেহ ও মনের সম্বন্ধ

আজকের দিনের অভিনব-উৎপত্তিবাদীরা দেহ-মনের সম্বন্ধ বিষয়ে এ-তিনটি মতের একটিও স্বীকার করেন না। তাঁদের আবিষ্কৃত বিবর্তনের ফরমূলা-অনুসারে তাঁরা বলেন: দেহ মনের অধিষ্ঠান, আর দেহ থেকেই মনের উৎপত্তি, তথাপি দেহ ও মন আলাদা। দেহ-মনের সম্পর্ক তাই আধার-আধেয় ভাব। জড়জগতে আধার ও আধেয় এক জাতীয় পদার্থ, যেমন তৈল ও তার আধার পাত্র। কিন্তু জড়জগৎ ছাড়িয়ে যখন আমরা প্রাণের সন্ধান পাই, তখন আর এক নতুন রকমের আধার-আধেয় সম্বন্ধ দেখতে পাই। এখানে আধার জড়, আধেয় চেতন, আধার নিষ্প্রাণ, আধেয় সপ্রাণ। অভিনব-উৎপত্তিবাদীদের মতে, আধার-আধেয় সম্বন্ধের এই নতুন ফরমূলার সাহায্যে জড়দেহ ও চেতন-মনের ও নিষ্প্রাণ জড় ও প্রাণ-সত্তার সম্বন্ধ আমাদের বুঝতে হবে।

অভিনব-উৎপত্তিবাদীরা তাই বলেন: অপরিণতের ভিতর পরিণতের সত্তা খুঁজে পাওয়া যায় না কিন্তু পরিণতের ভিতর অপরিণতের সত্তা খুঁজে পাওয়া যায়। দেহের চেয়ে পরিণত প্রাণে, দেহ-সত্তা খুঁজে পাওয়া যায় কিন্তু অপরিণত দেহে প্রাণসত্তা খুঁজে পাওয়া যায় না। আর দেহের চেয়ে আরো পরিণত চেতন বা মানস-সত্তায় দেহকে খুঁজে পাওয়া যায়, কিন্তু দেহ-সত্তায় মানস-সত্তা খুঁজে পাওয়া যায় না।

দ্বাদশ অধ্যায়

তত্ত্ব-নিরূপণ

আমাদের অভিজ্ঞতার তিনটি ভিন্ন স্তর: নিষ্প্রাণ জড়, প্রাণসত্তা ও চেতন মনের স্বরূপ আমরা মোটামুটি আলোচনা করেছি। এবার আমরা আবহমান কাল থেকে দর্শনে বিশ্বের মূল উপাদান আবিষ্কারের যে চেষ্টা, তারই একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিতে চাই। ছোট পাখী যেমন তার ছোট ডানা আকাশের উপর অবাধ গতিতে চালিয়ে একটি মস্ত বড় দেশের ঘরবাড়ী, গাছপালা, জন্তু-জানোয়ার ও অগণিত বৈচিত্র্য তড়িৎ-গতিতে দেখতে চেষ্টা করে, আমরাও তেমনি প্রাগ্-ঐতিহাসিক যুগ থেকে এই উপমহাদেশে, খ্রীস্টপূর্ব যুগে প্রাচীন গ্রীসে ও রোমে, মধ্যযুগে য়ুরোপে ও তার শেষের দিকে মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশসমূহে, সবার শেষে সতেরো শতকের আধুনিক য়ুরোপীয় দর্শনে তত্ত্ব নির্ণয়ের যে বহুমুখী প্রচেষ্টা, তার বিরাট ইতিহাসের উপর কল্পনার ডানায় আবেগের আতিশয্যে মুহূর্তে উড়ে চলে যাবার চেষ্টা করছি।

মানুষের ইতিহাসের যেদিন শুরু, সেদিন থেকে তার দার্শনিক চিন্তারও শুরু। গ্রীক দর্শন, মুসলিম দর্শন, ভারতীয় দর্শন, চৈনিক দর্শন, জাপানীয় দর্শন, আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শন ইত্যাদি নামের অর্থ আপেক্ষিক। দার্শনিক চিন্তা সারা বিশ্বে পরিব্যাপ্ত; তার পরিধি কোনও দেশবিশেষে সীমাবদ্ধ নয়। তাই দর্শন সাগরের মতোই গভীর ও সীমাহীন। সহজ দৃষ্টিতে সাগরের যেমন সীমারেখা খুঁজে পাওয়া যায় না, বিশ্বের দার্শনিক চিন্তারও তেমনি সীমারেখা খুঁজে পাওয়া যায় না।

এক বড় মনীষী বলেছেন: সত্যের জিয়োগ্রাফি নাই। দর্শন শাশ্বত সত্যের সন্ধানেরই নামান্তর। এ-দৃষ্টিকোণ থেকে বলা চলে, দর্শনেরও জিয়োগ্রাফি নাই। যদিও তার স্থান, কাল ও পরিবেশের সঙ্গে দর্শন অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত, তথাপি তার আসল সত্তা শাশ্বত ও সনাতন, সর্বজনীন ও সার্বভৌম। ইতিহাসের আদি যুগ থেকে দর্শন বৈচিত্র্যময়, সুখ-দুঃখ-সংঘাত-বহুল, প্রাণ-চাঞ্চল্যে ভরপুর অথচ মৃত্যুভয়ে ভয়াতুর মানবমনের ও তার সঙ্গে অতি নিকট সম্বন্ধে জড়িত বিরাট বহির্জগতের পিছনে কোন শাশ্বত সত্তা আছে কি-না নানাভাবে তা আবিষ্কারের চেষ্টা করে আসছে। দার্শনিক তত্ত্ববোধ ও তার সহভাবী সার্থক জীবন-দর্শনই

দার্শনিকদের পরম লক্ষ্য, এ-পরশ-পাথরই তাঁরা যুগ যুগ ধরে খুঁজে বেড়াচ্ছেন।

উনিশ শতকের শেষের ও বিশ শতকের প্রথম দিকের অধ্যাত্মবাদী মনীষী ফ্র্যান্সিস হার্বার্ট ব্র্যাডলি খুব আন্তরিকতা ও আবেগের সঙ্গে বলেছেন: যেদিন মানুষের মন বস্তুর দাসত্বে নিজের স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দিয়ে নবারুণ ও সন্ধ্যা-সূর্যের রক্তিম রাগের প্রতি আকর্ষণ হারিয়ে ফেলবে, যেদিন তার ধর্মীয় মূল্যবোধ চলে যাবে, আর যেদিন অচেনা-অজানার প্রতি তার কোন আকর্ষণ থাকবে না, এক কথায় মানুষ যেদিন পশুস্তরে নেমে আসবে, দার্শনিক তত্ত্ব বোধের প্রচেষ্টা সেদিনই সে ছেড়ে দেবে।

দর্শনের ইতিহাস এত বড় যে, আমার পক্ষে তার একটা অনবদ্য সারসংক্ষেপ করা যে অসম্ভব তা বলাই বাহুল্য। অগস্ত্য মুনির এক গণ্ডূষে সমুদ্রের সব বারি নিঃশেষ করার পৌরাণিক কাহিনী এ-প্রসঙ্গে মনে পড়া খুবই স্বাভাবিক। আমার সে ক্ষমতা নাই, আমার কাছে সে কাহিনী কাহিনীই। আমি দর্শনের সাগর থেকে তার অমৃতবারির এক গণ্ডূষ পান করে আমার ক্ষুদ্র জীবন সুন্দর ও সার্থক করতে চাই। তত্ত্ব-নিরূপণের যে বৈচিত্র্যপূর্ণ, ভাবগম্ভীর ও তথ্যবহুল প্রচেষ্টা দার্শনিকরা আবহমান কাল থেকে করে আসছেন, হৃদয়ের আবেগে তারই "হিং টিং ছটের" মতো একটা দোষযুক্ত, অস্পষ্ট ও রহস্যাবৃত বিকৃত ছবি আঁকবার চেষ্টা করছি, অনুরাগের দৃষ্টিকোণ থেকে এ-আলোচনার মূল্যায়ন তাই আশা করি।

তত্ত্বনির্ণয়ে বহির্দৃষ্টি

তত্ত্ব নির্ণয়ের প্রথম পর্যায়ে মানুষ তার মনোজগতের চেয়ে যে বাহিরের জগতে তার বাস, যেখানে তার প্রাত্যহিক জীবনের দ্বন্দ্ব ও সংগ্রাম, তাকেই খুব বড় করে দেখেছে। ঘর-বাড়ী, স্ত্রী-পুত্র-পরিবার, বন্ধু-বান্ধব, শত্রু-মিত্র, ধন-দৌলত, প্রভাব-প্রতিপত্তি এদের মারফতই আমরা সাধারণত আমাদের বুঝে থাকি। যদি হঠাৎ কোনও অস্বাভাবিক কারণে এগুলো থেকে আমরা বঞ্চিত হই, তাহলে তার প্রতিক্রিয়ায় অনেক সময় আমরা মনের স্বাভাবিকতাই হারিয়ে ফেলি। 'আমি' 'তুমি'র বিষয়-বিষয়ীর জ্ঞাতা-জ্ঞেয়ের দ্বন্দ্বে মানুষ প্রায় সবসময়ই 'তুমি'কে, বিষয়কে, জ্ঞেয়কে অধিকতর গুরুত্ব দেয়। এটা যে তার শান্তির পরিপন্থী একথা বলাই বাহুল্য; তথাপি সে নানা চেষ্টায়ও এ মনোভাব পরিত্যাগ করতে পারে নি। বিষয়-আসক্তি আরব্য উপন্যাসের সিন্দবাদ নাবিকের ঘাড়ে চাপা বিরাট পুরুষের মতোই মানুষকে যেন গ্রাস করে বসে আছে, হাজার দার্শনিক আলোচনা, হাজার ওয়াজ-নসিহতেও তা থেকে তার অব্যাহতি পাবার যো নাই।

এক উপনিষদে আছে: স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা মানুষের ইন্দ্রিয়গুলোকে সৃষ্টি করে তাদের বাইরের বিশ্বের দিকে চালিয়ে দিয়েছেন, তাই তারা ভিতরের দিকে তাকাতে পারে না। এ-বর্ণনা রূপক হলেও এর ভিতর এক গভীর সত্য নিহিত। এ-উক্তির ব্যাখ্যায় এক পণ্ডিত দুঃখ করে বলেছিলেন, যে বিধাতা পুরুষই মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু, তিনিই তার ইন্দ্রিয়গুলোকে বহির্মুখী করে অন্তরাত্মার অমৃতরসের আস্বাদন থেকে তাকে বঞ্চিত করেছেন।

যাই হোক, তার স্বাভাবিক বহির্দৃষ্টির চাপে মানুষ অনেক সময় যে নিজের সত্তাকেই শুধু বহির্বিশ্বে হারিয়ে ফেলে তা নয়; সে তার অন্তরাত্মাকেও বহির্বিশ্বের এক অপরিহার্য প্রতিবিম্ব বলেই মনে করে। এ-মনোভাব থেকে তত্ত্ব নির্ণয়ের যে চেষ্টা চলেছে তারই পারিভাষিক নাম জড়বাদ ও দেহাত্মবাদ, আধুনিক লেখায় এরই নাম দেহবাদ ও বস্তুবাদ।

প্রাণসত্তা ও চেতনাকে যাঁরা নিষ্প্রাণ জড়ের শুধু রূপান্তর বলেই মনে করেন না, তাদের জড়ের সমজাতীয় মনে করেন, তাঁদেরই নাম বস্তুবাদী। বস্তুবাদ নামটির পেছনে কিছু নিগূঢ় অর্থও লুক্কায়িত। যার সত্তা আছে তাকেই সাধারণত আমরা বস্তু বলে থাকি, আর বস্তুর উল্টো হলো অবস্তু, অর্থাৎ যা অসার, সত্তাহীন। সুতরাং জড়বাদের নাম বস্তুবাদ বলাতে একথাই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলা হয় যে, জড়ই বস্তু, আর চেতন অবস্তু অর্থাৎ অসার। জড়বাদ নামের ভিতর এমন কোন কটাক্ষ নাই, কারণ তার অর্থ হলো জড়বস্তুই বিশ্বের আদি উপাদান; কিন্তু আজকের দিনের জড়বাদীরা যখন এ মতকেই বস্তুবাদ নাম দেন, তখন মনে হয় তাঁরা জড়কে শুধু বস্তু বলতে চান না, চেতনকে অবস্তু বলেও উপেক্ষা করতে চান।

সাম্প্রতিক বস্তুবাদীদের ঠিক উল্টো কাজ করেছেন এক আধুনিক অধ্যাত্মবাদী মনীষী। তাঁর মতে চেতনের মূল্যই জীবনে সর্বাধিক। তাই তিনি বলেছেন: ঈশ্বরই বস্তু আর সবই অবস্তু। জড়বাদের যে নতুন আখ্যা আধুনিক লেখায় পাওয়া যায়, তার পিছনে অধ্যাত্মবাদের ওপর যে শ্লেষ, তা স্পষ্ট করে দেখানোর জন্যেই এখানে এ-উক্তি উদ্ধৃত করা হলো।

অনেকে মনে করেন, নানা রকম তর্ক-যুক্তির খাতিরে, হয়তো বা একটা বড় বিতর্ক-সভার নির্দেশ অনুসারে আমরা জড়বাদীদের খাতায় নাম লেখাই; আসলে তা নয়। জড়বাদে বিশ্বাস সম্ভবত আমাদের স্বাভাবিক বহির্দৃষ্টি, বিষয় আসক্তিরই অপরিহার্য ফল। জড়বাদের উল্টোমত অধ্যাত্মবাদ সম্বন্ধেও আমরা এ-মন্তব্য করতে পারি। আমাদের মতে অধ্যাত্মবাদও শুধু যুক্তিতর্কে প্রতিষ্ঠিত এক থিওরী নয়, অন্তর্মুখী আত্মদৃষ্টিই তার আসল উৎস।

এজন্যেই দর্শনের ইতিহাস আলোচনায় দেখতে পাওয়া যায়, বহির্দৃষ্টির প্রসারের সঙ্গে দেহবাদের প্রসার, আর অন্তর্দৃষ্টির প্রসারের সঙ্গে অধ্যাত্মবাদের প্রসার। উভয়েরই প্রভাব মানুষের উপর তাই ব্যাপক।

প্রাচীন ভারতের জড়বাদের একটি সুন্দর নাম দেখতে পাওয়া যায়, সে-নামের অর্থ বিশ্লেষণে জড়বাদের সঙ্গে মানুষের স্বাভাবিক বহির্দৃষ্টির নিকট যোগ খুব ভাল করে বোঝা যায়।

প্রাচীন ভারতে জড়বাদের দু'টি প্রসিদ্ধ নাম; চার্বাক মত ও লোকায়ত মত। চার্বাক নামে জড়বাদের প্রচারক কোন মনীষী ছিলেন কি-না তা আজও আবিষ্কৃত হয়নি, তবে চার্বাকের মতের সমালোচকেরা অনেক সময় চার্বাক নামে কোনও ব্যক্তিবিশেষ ছিলেন কল্পনা করে তাঁর উপর শ্লেষাত্মক সমালোচনা-বাণ নিক্ষেপ করেছেন একথা আগেই অন্য প্রসঙ্গে বলেছি।

চার্বাক নামের অর্থ নিয়ে যতোই বিতর্ক থাক না কেন, লোকায়ত কথার অর্থঃ লোকেষু আয়তঃ অর্থাৎ জনসাধারণের ভিতর পরিব্যাপ্ত। বিশ্বের অগণিত সাধারণ মানুষ অতি সাধারণ ভাবেই খেয়ে পরে বেঁচে থাকতে চায়, তাদের স্বাভাবিক দৃষ্টি বহির্মুখী ও বিষয়-প্রবণ। কাজেই জড়বাদের আরেক নাম লোকায়ত মত।

প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারতের অধ্যাত্মভাব-প্রভাবিত দার্শনিক আবহাওয়ায় যে জড়বাদ বা দেহাত্মবাদ একটি বিশেষ চিন্তাধারার আকারে চালু ছিল, তার যথেষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। উপনিষদে জড়বাদের নানা রকম ব্যাখ্যা আছে। চেতনের স্বরূপ আলোচনা-প্রসঙ্গে ছান্দোগ্য উপনিষদের যে ইন্দ্র-বিরোচন-সংবাদের উল্লেখ করেছি, তার আদিপর্বে দেহাত্মবাদ বিঘোষিত। বুদ্ধের সংলাপে বহু জড়বাদী আচার্যের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতের কথা আছে।

প্রাচীন য়ুরোপে জড়বাদ '

প্রাচীন গ্রীস এবং রোমেও এ-নিয়মের ব্যতিক্রম নাই। থেলিসের পানিতত্ত্ববাদ ও এ্যানেক্সিমিনিসের বায়ুতত্ত্ববাদকে একেবারে জড়বাদ বলা যায় না। কারণ এ-সব জড়পদার্থকে তাঁরা প্রাণবান বলে মনে করেছেন। কিন্তু ডিমোক্রিটাস ও লিউসিপ্পাশের পরমাণুবাদ যে জড়বাদ, তা হয়তো নিঃসংশয়ে বলা চলে। প্রাচীন রোমের কবি লুক্রেসিয়াস তাঁর দার্শনিক কাব্যে জড়বাদের মাহাত্ম্য মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন।

চার্বাকের জড়বাদের বিশ্লেষণে জড়বাদ যে যুক্তি তর্কের ফল নয়, বাহ্যভোগের প্রতি আসক্তিরই ফল, তাও খুব পরিষ্কারভাবে বোঝা যায়। অনেক

সময় দেখা যায় অগণিত জনগণের পরলোকের প্রতি উগ্র আসক্তি। চার্বাক দেখিয়েছেন ; বৈদিক যাগযজ্ঞকে যারা সহজ জীবনযাত্রার এক বড় হাতিয়ার করে তুলেছিল, তারাই অগণিত মানুষকে বুঝিয়েছিল যে, বেদের যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠান করলে তারা মৃত্যুর পর স্বর্গে অনন্ত সুখলাভ করবে। এই শোষণ ও আত্মপ্রবঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রাচীন ভারতে জড়বাদের বিপ্লব।

বৈজ্ঞানিক সভ্যতা ও জড়বাদ

সতেরো শতক থেকে বৈজ্ঞানিক সভ্যতার প্রসার ও প্রতিপত্তি মানুষের বহির্দৃষ্টি ও বিষয়প্রবণতাকে তার জীবনে খুব উচ্চ স্থান দিয়েছে, তা থেকেই এ-বৈজ্ঞানিক যুগে জড়বাদী মনোবৃত্তির প্রসার। বিজ্ঞানের বিস্তারের ফলে ফরাসী বিপ্লবের পূর্ব মুহূর্তে ভলটেয়ারের সহকর্মী লা মেট্রি (১৭০৯—১৭৫১), হেলভেসিয়াস্ (১৭১৫—১৭৭১) ও দিদেরো (১৭১৩—১৭৮৪) প্রভৃতি মনীষীর ভিতর এই জড়বাদের অকুণ্ঠ সমর্থন দেখতে পাওয়া যায়।

প্রাচীন চার্বাক মত

জড়বাদের দার্শনিক বিশ্লেষণের প্রথম পর্বেই চার্বাকের কথা মনে পড়ে। চার্বাক দর্শনের পেছনে যে মনস্তাত্ত্বিক বিপ্লব, তার কথা আগেই উল্লেখ করেছি। বৈদিক ধর্মকে অবলম্বন করে যে পৌরহিত্যবাদী শোষণ-ব্যবস্থা সে সুদূর অতীতের সমাজে গড়ে উঠেছিল, চার্বাকের প্রচারিত জড়বাদ বা দেহাত্মবাদ তারই এক বিশেষ প্রতিবাদ। খ্রীস্টীয় চোদ্দ শতকে মাধবাচার্যের সর্বদর্শন-সংগ্রহে চার্বাক মতের যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তার আলোকেই আজকাল আমরা চার্বাকের দেহাত্মবাদ বুঝতে অভ্যস্ত হয়েছি।

চার্বাকের জড়বাদের মূল কথা দু'টি : তার একটি ইতিবাচক আর একটি নেতি-বাচক। চার্বাকের মতে মানুষের আত্মা তার দেহেরই এক অভিনব রূপান্তর। এ হলো চার্বাকের ইতিবাচক সিদ্ধান্ত। আর মানুষের আত্মা যখন তার দেহেরই রূপান্তর তখন মরার পর তার আত্মার অস্তিত্বের কোন সম্ভাবনাই নাই। কাজেই পরলোকে বিশ্বের স্রষ্টিকর্তা ঈশ্বর বলে কেউ মানুষকে তার শুভ কর্মের জন্য সুফল আর অশুভ কর্মের জন্য কুফল দেবেন এমন কল্পনা নেহাত নিরর্থক। এটা হলো চার্বাকের নেতিবাচক সিদ্ধান্ত।

চার্বাক মতে অনুমানের স্থান

মাধবাচার্যের মতে চার্বাক এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, একমাত্র ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য প্রত্যক্ষকে প্রমাণ বলে গ্রহণ করে। এ-মত অনুসারে চার্বাক অনুমান-প্রমাণ

স্বীকার করেন না। পাশ্চাত্ত্য লজিকের ছাত্রদের এ-কথা খুব ভালো করেই জানা যে: একটি ব্যাপক, সার্বভৌম সত্য স্বীকার না করে কোন অবরোহ অনুমান হয় না, তাই আরোহ অনুমানের উদ্দেশ্য সেই ব্যাপক, সার্বভৌম সত্য প্রমাণ করে অবরোহ-অনুমানের ভিত্তি দৃঢ় করা। কিন্তু চার্বাক বলেন: কোন সার্বভৌম সত্যই আমরা অসংশয়ে প্রমাণ ক'রতে পারি না। যেমন আমরা এ-কথা অসংশয়ে প্রমাণ করতে পারি না যে, সব মানুষই মরণশীল। আমরা যখন সব মানুষের মৃত্যু হবে বলি, তখন আমরা এ-কথা ধরে নেই যে, আগে যা ঘটেছে তা পরেও ঘটবে। কিন্তু এটা প্রমাণিত সত্য নয়, আমাদের অভিজ্ঞতা-প্রসূত একটি দৃঢ় বিশ্বাস মাত্র।

তাই অনুমানের প্রামাণ্য স্বীকার করা চলে না, আর অনুমানের প্রামাণ্য যদি স্বীকার করা না যায়, তাহলে কোনও মহৎ ব্যক্তির কথাই পুরোপুরি বিশ্বাসযোগ্য বলে গ্রহণও করা যায় না। কারণ এ বিশ্বাসের মূলেও এক বড় অনুমান। এখানে আমরা বিশ্বস্ত লোকদের সম্বন্ধে একটি সার্বভৌম সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে আমাদের খুশী-মতো কতগুলো লোককে বিশ্বস্তের পর্যায়ে ফেলে তাদের কথা প্রমাণ বলে মেনে নেই।

যাই হোক, একমাত্র প্রত্যক্ষই যদি প্রমাণ হয়, তা হলে দুনিয়ার কর্তা ঈশ্বর স্বীকার করা যায় না। পরলোকও স্বীকার করা যায় না, কারণ এ দু'টি-ই ইন্দ্রিয়জ প্রত্যক্ষের অতীত। আর এদের সত্তা অনুমান করারও উপায় নাই, কারণ অনুমান অগ্রাহ্য। ধর্মশাস্ত্রের দোহাই দিয়েও এ-দু'টি সত্য প্রমাণ করা চলে না, কারণ চার্বাকের মতে আপ্তবাক্য বা শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির কথায় বিশ্বাসও অনুমানেরই অন্তর্গত এবং তাই অবিশ্বাস্য।

অতএব ঈশ্বর যখন নাই তখন পরকালে পাপের শাস্তি ভোগ করতে হবে এ বিশ্বাস আঁকড়ে ধরে থাকার পক্ষে কোনও যুক্তি নাই। আর মরার পর পরলোকে গিয়ে আমরা অনন্ত সুখ ভোগ করব, ইহকালে আমাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রয়োজন নাই, এমন মনোভাব পোষণ করাও তাই নির্বুদ্ধিতা। কাজেই চার্বাকের মতে মানুষ যাতে সুখে-স্বচ্ছন্দে ইহলোকে বেঁচে থাকতে পারে তার জন্যেই তার চেষ্টা করা দরকার। কারো কারো মতে মাধবাচার্য চার্বাকের অনুমান-বিরোধিতার যে বর্ণনা দিয়েছেন তা তার স্বকপোল-কল্পিত। তাঁদের মতে চার্বাকের আসল প্রতিবাদ অনুমানের বিরুদ্ধে নয়, বৈদিক পৌরোহিত্যবাদের বিরুদ্ধে।

অনুমান প্রমাণ নিরসনের মাধ্যমে দেহাত্মবাদ প্রতিষ্ঠার সমালোচনাও সেকালের ভারতীয় দর্শনে দেখতে পাওয়া যায়। এ-শ্রেণীর সমালোচকরা বলেন: অনুমান প্রমাণকে অস্বীকার করাও একটি প্রচ্ছন্ন অনুমান ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ

যেখানে যেখানে ধূম আছে সেখানে বহ্নি আছে, এ-অনুমানটি যেমন একটা ব্যাপক সার্বভৌম সত্য, ঠিক তেমনি সব অনুমানই প্রামাণ্য-বর্জিত, একথাটিও একটি ব্যাপক সার্বভৌম সত্য। প্রথমটি যদি চার্বাকের মতে অগ্রাহ্য হয়, দ্বিতীয়টিও তাহলে তাঁর মতে অগ্রাহ্য হওয়া উচিত। তাই যদি কোন অনুমানেরই প্রামাণ্য না থাকে তাহলে চার্বাকের অনুমান নিষেধও টিকে না, আর তা হলে তাঁর প্রত্যক্ষ-ভিত্তিক দেহাত্মবাদের প্রামাণ্যও থাকে না।

চার্বাকের দেহাত্মবাদের দার্শনিক রূপ ঈষৎ বিশ্লেষণ করার পর এবার আমরা পাশ্চাত্ত্য দর্শনে জড়বাদের বিবর্তন আলোচনা করতে চাই। এ-আলোচনা থেকে আমরা একথাই বুঝতে পারব যে, যদিও জড়বাদের মূলকথা জড়সত্তাকেই বিশ্বের আদি উপাদান বলে স্বীকৃতি ও আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে দৈহিক প্রয়োজনের পূর্ণ মূল্যবোধ, তথাপি পরিবেশের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে জড়বাদের বাহ্যরূপে কত প্রভেদ।

পাশ্চাত্ত্য দর্শনে জড়বাদের আদিরূপ

পাশ্চাত্ত্য দর্শনে জড়বাদের আদিরূপের উল্লেখ ডিমোক্রিটাসের পরমাণু-বাদের আলোচনায় আমরা কিছুটা করেছি। ডিমোক্রিটাস মানুষের আত্মাকেও জড়-পরমাণু বলে বর্ণনা করেছেন। সাধারণভাবে একথা বলা চলে যে, এ্যানাক্সে-গোরাসের আগে গ্রীক-দর্শনে প্রকাশ্যভাবে চেতনের স্বীকৃতি নাই। তবে গ্রীক-দর্শনের শুরু থেকে অতীন্দ্রিয় অলৌকিক দেবদেবীতে বিশ্বাস ব্যাপকভাবে দেখা যায়। তাই তাদের জড়বাদের সঙ্গে অলৌকিকতার যোগ। আগেই এ-বিষয়ে থেলিস ও এ্যানেক্সিমেনিসের মতের কথা বলেছি। এ-প্রসঙ্গে হয়তো হেরাক্লিটাসের মতেরও উল্লেখ করা যেতে পারে। জগতে অপরিবর্তনশীল কিছু নাই দেখাতে গিয়ে চঞ্চল লেলিহামান অগ্নি বিশ্বের আদি উপাদান একথা তিনি বলেছেন। এ-অগ্নির যে বর্ণনা হেরাক্লিটাসে পাওয়া যায় তা থেকে তাকে অনেকটা আত্ম-জ্যোতির মতোই মনে হয়। তবে আগেই বলেছি, মনের স্বতন্ত্র স্বাধীন সত্তার স্পষ্ট স্বীকৃতি যখন এ্যানেক্সেগোরাস-পূর্ব গ্রীকদর্শনে নাই—যা আরিস্টটলও বিনা দ্বিধায় বলেছেন—তখন থেলিস, এ্যানোক্সেমেনিস ও হেরাক্লিটাসের মতকে এক অতীত, অলৌকিক-প্রবণ যুগের জড়বাদ বলেই মোটামুটি ধরে নেওয়া যেতে পারে।

জড় ও চেতন সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা না থাকায়, গ্রীকদর্শনের কোনও কোনও ব্যাখ্যাতা জেনোফিনিস যে অপরিবর্তনশীল সত্তাকে বিশ্বের উপাদান বলে নির্ণয় করে চলমান বিশ্বকে নাস্তিত্বের কোঠায় ফেলে দিয়েছেন, তাকেও জড় বলে অভিহিত করতে দ্বিধ বোধ করেন নাই। তাঁরা বলেন: জেনোফিনিস এই

আদিসত্তাকে গোলাকার বলেছেন, তাই এ-সত্তা চেতন হতে পারে না, তা জড়ই। এ উগ্রমত সমর্থন করা চলে না। এ-আকারের বর্ণনা রূপক, তাই একে আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ না করাই যুক্তিসঙ্গত। জড় ও চেতনের সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা যে গ্রীক-দর্শনের আদি যুগে ছিল না, তা দেখানোর জন্যই এখানে এ আলোচনার অবতারণা।

আরিস্টটল-উত্তর গ্রীক-দর্শনে উগ্রসংশয়বাদী টাইমন (মৃত্যু: ২৮৫ খ্রীস্ট-পূর্বাব্দ)-এর মত আলোচনা করলে মনে হয়, তিনি চার্বাকের মতোই ইন্দ্রিয়াতীত সত্তায় অবিশ্বাসী ছিলেন। টাইমনের অনুমান-বিরোধিতা অনেকটা চার্বাকের মতোই। টাইমন বলেছেন: আমাদের সমস্ত অনুমানের ভিত্তি কতগুলো সার্বভৌম সত্য—যেমন "সক্রেটিস মরণধর্মী" এ-কথা প্রমাণ করতে হলে আমাদের মেনে নিতে হবে "সব মানুষই মরণধর্মী", আর এই ব্যাপক সত্য নিঃসংশয়ে প্রমাণ করার আর কোন হাতিয়ার আমাদের কাছে নাই। তাই সব অনুমানের ভিত্তিই শিথিল, এক কথায় অনুমান মাত্রেই অপ্রমাণ, অগ্রাহ্য।

যদিও তাঁদের নৈতিক দৃষ্টির সঙ্গে চার্বাকের সুখবাদের আকাশ-পাতাল তফাৎ, তথাপি গ্রীসের স্টোয়িকমতবাদী দার্শনিকরা জড়বাদে আস্থাবান ছিলেন। রোমের সামরিক শক্তির কাছে পদানত লুপ্ত-গৌরব গ্রীসের বাহ্য পরিবেশ সুখবাদের অত্যন্ত বিরোধী ছিল বলেই তাঁরা সমস্ত দুঃখ অক্লেশে বরণ করাকেই মানুষের চরম উদ্দেশ্য বলে মেনে নিয়েছিলেন। তথাপি তাঁদের তাত্ত্বিক দৃষ্টি ছিল মুখ্যতঃ জড়বাদী। তাই জড়বাদের সঙ্গে সুখবাদের সম্বন্ধ একেবারে অবিচ্ছেদ্য বলে মেনে নেয়া ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে অনস্বীকার্য নয়।

গ্রীক দার্শনিক এপিকিউরাস উগ্রসুখবাদী হয়েও দেবদেবীর ইন্দ্রিয়াতীত সত্তায় বিশ্বাসী ছিলেন, এ-কথা এ-প্রসঙ্গে অতি স্বাভাবিকভাবেই মনে হয়।

মুসলিম চিন্তাধারায় জড়বাদ

মুসলিম-চিন্তানায়কদের ভিতর আল্‌বিরুনী (মৃত্যু: ১০৪৮ খ্রীস্টাব্দ) ও ইবনে হাইসাম (মৃত্যু: ১০৩৮ খ্রীস্টাব্দ) অনেকটা জড়বাদী ছিলেন বলেই মনে হয়। আর্যভট্টের শিষ্যদের নিম্নোক্ত মতের অকুণ্ঠ প্রশংসা থেকেই আল্‌বিরুনীর জড়বাদ-পক্ষপাতের ইঙ্গিত পাওয়া যায়: "সূর্যের আলো যে সব জিনিসের ওপর পড়ে, তা জানাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। তার বাইরের যা কিছু আছে, তা প্রচুর হলেও আমাদের কোনও কাজে লাগে না। সূর্যের আলো যার ওপর পড়ে না, তাকে আমাদের ইন্দ্রিয় জানতে পারে না, যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়, তাকে আমরা

কখনও জানতে পারি না।" —এ থেকেই দেখা যায়, আলবিরুনী ইন্দ্রিয়াতীত সত্তায় বিশ্বাস করতে একেবারেই নারাজ। ইবনে হাইসানের মতও আল্‌বেরুনীর অনুরূপ।

আধুনিক ইউরোপীয় দর্শনে জড়বাদ

আধুনিক ইউরোপীয় দর্শনে জড়বাদের প্রেরণা জুগিয়েছে প্রাণবিদ্যা, ভূতত্ত্ব, জ্যোতির্বিজ্ঞান, আধুনিক মনস্তত্ত্ব ও সবার ওপরে ডারউইন ও ল্যামার্কের প্রবর্তিত যান্ত্রিক বিবর্তনবাদ। বিবর্তনের আলোচনায় এ বিষয়ে আমরা অনেক কথা বলেছি, তার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন।

আজকের দিনের জ্যোতির্বিজ্ঞানের মতে, সৃষ্টির আদিতে মন ছিল না, প্রাণ ছিল না, শুধু ছিল জড় নীহারিকাপুঞ্জ, কাজেই এক আদিম চেতনা থেকে বিশ্বসৃষ্টির ধারণা নেহাৎ অবৈজ্ঞানিক, ধর্মীয় কুসংস্কারই এর প্রধান উৎস। এভাবে পাশ্চাত্য দর্শনে জড়বাদের পত্তন ও প্রচার।

তা'ছাড়া, যাঁরা আদিম চেতনা মানেন, তাঁরা সাধারণত একথা বলেন যে, সৃষ্টিকর্তা জগতের সব জাতের প্রাণীকে আলাদা করে সৃষ্টি করেছেন, আর মানুষই তার সৃষ্টির সেরা। ডারউইনের বিবর্তনবাদ একথাই প্রমাণ করে দিয়েছে যে, এ-জাতীয় বিশ্বাস নিছক কুসংস্কার ছাড়া আর কিছুই নয়।

আবার মধ্যযুগীয় ইউরোপে খ্রীস্টধর্ম প্রভাবিত এলাকায় মানুষই সৃষ্টির সেরা, একথা প্রমাণ করবার জন্যে বলা হতো: পৃথিবীই সৌরজগতের কেন্দ্র, আর স্বয়ং সূর্য পৃথিবীর চতুর্দিকে আবর্তনশীল। মোটামুটি যুক্তিটি ছিল এইরূপ: পৃথিবী সৌরজগতের কেন্দ্র, আর মানুষের স্থান পৃথিবীর কেন্দ্রে, তাই মানুষই সৃষ্টির কেন্দ্র। কোপারনিকাস্‌ ও গ্যালিলিওর প্রভাবে যখন প্রমাণ হয়ে গেল যে, পৃথিবী সূর্যের চারধারে ঘুরছে তখন মানুষের এই প্রাধান্যের ধারণাও কুসংস্কারে পরিণত হলো।

বিজ্ঞান-প্রভাবিত প্রাণবিদ্যা জড় থেকেই প্রাণের উৎপত্তি একথা দেখিয়ে দিয়ে জড়বাদের অগ্রগতির পথ সুগম করে দিল। আর আজকের দিনে এমনও মনোবিজ্ঞানী অনেকে আছেন যাঁরা মনের সত্তাই স্বীকার করেন না। তাঁরা বলেন: চিন্তা বলে কোন পদার্থই নাই; আমরা যাকে মানসিক অবস্থা বলি তা আসলে বাইরের বস্তু, আমাদের স্নায়ুর ওপর যে ক্রিয়া করে, তার প্রতিক্রিয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। মনোবিদ্যায় মনের এই নির্বাসনের নাম ব্যবহারবাদ। রাশিয়ার প্যাভলোভ ও আমেরিকার ওয়াটসন্‌ এ ব্যবহারবাদের দু'জন বড় ব্যাখ্যাতা ও প্রচারক।

সংক্ষেপে এভাবেই পাশ্চাত্ত্য দর্শনে জড়বাদের ক্রমিক রূপায়ণ। তার মূল কথা: প্রচলিত ধর্ম ও নীতির বিরোধিতা, জড়সত্তা থেকে বিশ্বের উৎপত্তি বর্ণনা ও দৈহিক ভোগ সুখই মানুষের আদর্শ, তার পরম লভ্য এই রসালো পরিকল্পনা।

আধুনিক দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ী জড়বাদ

এই জড়বাদের অত্যন্ত প্রভাবশীল যে অতি আধুনিক রূপ দেখতে পাওয়া যায়, তার আলোচনাই আমরা এখন করতে চাই। এরই নাম ডায়েলেকটিক্যাল ম্যাট্যারিয়েলিজম্ বা দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ী জড়বাদ। উনিশ শতকে কার্ল মার্কস ও তাঁর সহকর্মী এঙ্গেলসের লেখা, প্রচেষ্টা ও প্রচারণার মাধ্যমে আধুনিক দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ী জড়বাদের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা।

উনিশ শতকের প্রথম দিকে পুরানো দিনের কৃষিপ্রধান অর্থনীতির কাঠামো আধুনিক বিজ্ঞানের প্রভাবে বদলে গিয়ে শ্রমিক-প্রধান অর্থনীতির বুনিয়াদ হলো দৃঢ় ও শ্রমপ্রতিষ্ঠানের মুষ্টিমেয় মালিক ও তার অগণিত শ্রমিকের স্বার্থে হলো সংঘাত। নতুন পরিবেশে অগণিত শ্রমিকের পরিশ্রমে উপার্জিত অর্থ শ্রম-প্রতিষ্ঠানের মালিকরা সহজেই আত্মসাৎ করতে লাগলেন। বিজ্ঞানের দেওয়া নতুন যন্ত্রপাতি মালিকের স্বার্থসিদ্ধির সহায়ক হলো। আগে যেখানে হাজার হাজার শ্রমিকের পরিশ্রমে প্রয়োজনীয় দ্রব্য তৈরী হতো, তা এখন যন্ত্রের সাহায্যে অতি সহজেই তৈরী হতে লাগলো। শ্রম-প্রতিষ্ঠানের মালিকরা সামান্য মজুরী দিয়ে তাঁদের প্রতিষ্ঠানগুলোর বড় মুনাফা নিজেরা ভোগ করতে লাগলেন। এরই নাম পুঁজিবাদী সভ্যতা। এই যে শোষণ-ব্যবস্থা, এরই প্রতিবাদে আধুনিক দ্বান্দ্বিক জড়বাদের উৎপত্তি।

আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে দ্বান্দ্বিক জড়বাদের মূলকথা তিনটি। পুঁজিবাদী যান্ত্রিকতা-প্রধান সভ্যতায় মালিক ও মজুরের যে শ্রেণী-সংঘর্ষ সুস্পষ্ট, দ্বান্দ্বিক জড়বাদীরা মানুষের ইতিহাসের শুরু থেকেই তার অস্তিত্ব মোটামুটি মেনে নিয়েছেন। একমাত্র অতি আদিম যুগের শ্রেণীবিহীন সমাজ ছাড়া মানুষের সভ্যতার পরবর্তী সব স্তরে কোন-না-কোন প্রকারে শ্রেণী সংঘর্ষের স্বীকৃতি দ্বান্দ্বিক জড়বাদের এক মুখ্য কথা। তার দ্বিতীয় মুখ্য কথা এই যে, অর্থনৈতিক উৎপাদন-ব্যবস্থাই মানুষের সভ্যতার নিয়ামক। উৎপাদন-ব্যবস্থা উৎপাদনের হাতিয়ারের ওপর নির্ভরশীল, আর উৎপাদন-ব্যবস্থার সঙ্গে ধনবণ্টন-ব্যবস্থার নিকট যোগ। তাই ধন-উৎপাদন ও ধনবণ্টন ব্যবস্থাই হলো মানুষের অর্থনৈতিক জীবনের প্রধান

উপাদান। আর এই অর্থনৈতিক পরিবেশই মানুষের চিন্তা, ভাবনা, তার সমাজ-বোধ, রাজনৈতিক চেতনা, নীতিবোধ, সাহিত্য, দর্শন, ধর্ম-বিশ্বাস সকলকেই নিয়ন্ত্রিত করে।

আজকের দিনের অর্থনৈতিক জীবন সম্বন্ধে তাঁদের তৃতীয় বক্তব্য হলো: যন্ত্রের সাহায্যে মানুষের পরিশ্রমের বিনিময়ে যে অর্থ মালিকের কাছে আসে, তার নগণ্য অংশই মজুর পায়। সুতরাং মালিক মজুরের মুনাফাকেই নিজের বলে নিয়ে যাচ্ছে। দ্বান্দ্বিক জড়বাদে এরই নাম বাড়তি মুনাফা। দ্বান্দ্বিক জড়বাদ এমন এক শোষণহীন সমাজ-ব্যবস্থা নিয়ে আসতে চায়, যেখানে এ-জাতীয় বাড়তি মুনাফা পাওয়া অসম্ভব।

এ-নতুন সমাজ-ব্যবস্থারই চল্‌তি নাম সমাজতন্ত্রবাদ। এমতে কোন বৃহত্তর সমাজ প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তিবিশেষের একচেটিয়া অধিকার হতে পারে না। এ সমাজ-ব্যবস্থারই শেষ পরিণতি কমিউনিজম; যার উদ্দেশ্য প্রাত্যহিক জীবনে যার যা প্রয়োজন, তা-ই তাকে দেয়া। এ-আলোচনা থেকে এ-কথা সুস্পষ্ট যে, দ্বান্দ্বিক জড়বাদেরও ভিত্তি মনস্তাত্ত্বিক, শুধু তার্কিক নয়।

হেগেলের দ্বান্দ্বিক-পদ্ধতির রূপান্তর

দ্বান্দ্বিক জড়বাদীরা হেগেলের দ্বান্দ্বিক-পদ্ধতিকে নিজেদের মতো পরিবর্তিত করে নিয়েছেন। এ-মতের পথিকৃৎ কার্ল মার্কস্ তাঁর চিন্তাধারার আদিযুগে হেগেলেরই ভাবশিষ্য ছিলেন। অপেক্ষাকৃত পরিণত বয়সে তিনি দেখতে পান যে, হেগেলের মতো যদি আমরা এক পরিপূর্ণ, দোষবর্জিত কল্যাণময় অধ্যাত্ম-তত্ত্বকে বিশ্বের আদি উপাদান বলে মেনে নিই তা'হলে শেষ পর্যন্ত জগতে ভালো-মন্দের দ্বন্দ্ব আর থাকে না, সব কিছুকেই ভালো বলে আমাদের মেনে নিতে হয়। এমন সমাজ-ব্যবস্থায় অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিপ্লবের স্থান নাই, অগণিত জনগণের অর্থনৈতিক শোষণ থেকে মুক্তির সার্থকতাও নাই। তাই মার্কস্ ও তাঁর শিষ্যেরা অধ্যাত্মবাদের ঘোরতর বিরোধী। আর যেহেতু তাঁরা বিশ্বাস করেন যে, হেগেলীয় অধ্যাত্মবাদই অধ্যাত্মবাদের পরিপূর্ণ রূপ, তাই তাঁরা মনে করেন সব রকমের অধ্যাত্মবাদই প্রগতি-বিরোধী।

হেগেলের সর্বব্যাপী অধ্যাত্ম-চেতনাকে বাদ দিয়ে তাঁর দ্বান্দ্বিক-পদ্ধতি মার্কস্ স্বীকার করেছেন, এ-কথা আমরা একটু আগেই বলেছি। মার্কস্‌পন্থীরা বলেন: অধ্যাত্মবাদীরা আগে থেকেই এক মৌলিক চেতন-সত্তা স্বীকার করে জড়সত্তাকেই তার অভিব্যক্তি বলে ধরে নেন; কিন্তু বিজ্ঞান আমাদের সামনে বিশ্বের যে ইতিহাস তুলে ধরে তার আলোচনায় আমরা দেখতে পাই, বিশ্বের বিবর্তনে আগে

জড়, তারপর প্রাণ, তারপর চেতন। জড়ের এই বিবর্তনে পদে পদে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি, আর তারপর তার সমন্বয়; কিন্তু হেগেল যেমন বলেছেন: সমস্ত দ্বন্দ্বের সমন্বয় ও সমাধান এক বিশ্বচেতনায় একথা মানা চলে না, দ্বন্দ্বের শেষ সমন্বয় বলে কিছু নাই, হতে পারে না। আজকের দিনের সমন্বয় থেকে আগামীদিনের দ্বন্দ্বের সৃষ্টি, আর তা থেকেই সভ্যতার অগ্রগতি।

দ্বান্দ্বিক জড়বাদ জড়পদার্থকে নিশ্চল, নিষ্ক্রিয় মনে করে না, যেমন পুরোনা দিনের জড়বাদ করতো। দ্বান্দ্বিক জড়বাদ আধুনিক বিজ্ঞান-প্রভাবিত। তার মতে কি জড়-সত্তা, কি তার প্রতিরূপ চেতন-সত্তা, কোনটিই স্থির, নিশ্চল নয়। বিশ্বের স্বভাব স্থৈর্য নয়, গতি। তাই যা কিছু আছে, চলাই তার স্বভাব।

দ্বান্দ্বিক জড়বাদে ধর্ম ও নীতিবোধ

আগেই বলেছি, দ্বান্দ্বিক জড়বাদে প্রচলিত ধর্মীয় ধারণা ও নীতিবোধের বিরুদ্ধে এক বড় অভিযান। প্রচলিত ধর্মে সাধারণ মানুষকে তার প্রাত্যহিক জীবনের অগণিত নির্যাতনের প্রতিকার হিসাবে পরকালে অনন্ত স্বর্গসুখের যে পরিকল্পনা ও প্রচার, আর প্রচলিত নীতিবোধে পরকালে পুণ্যের ফলপ্রাপ্তির যে আশ্বাস, দ্বান্দ্বিক জড়বাদীরা তার প্রতিবাদ করেছেন। তাঁদের মতে, প্রচলিত ধর্ম ও নীতিবোধ এ-ধরনের প্রতারণার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের শোষণের ব্যবস্থা দৃঢ় করে তুলেছে। তাই দ্বান্দ্বিক জড়বাদে ঐতিহাসিক ধর্মবিশ্বাস ও প্রচলিত নীতিবোধের বিরুদ্ধে এক বড় জেহাদ।

দ্বান্দ্বিক জড়বাদীরা ব্যক্তিগত জীবনে ধর্ম ও নীতিবোধের খুব বিরোধী নন, তবে সামাজিক জীবনে ধর্মের তাঁরা খুব বিরোধী। ব্যক্তিগত ধর্মবিশ্বাস ও প্রচলিত নীতিবোধ সম্বন্ধে তাঁদের ধারণা এই যে, মানুষ যত বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি-সম্পন্ন হবে ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে তার অর্থনৈতিক উন্নতির ব্যবস্থা হবে, ততই প্রাচীনপন্থী ধর্ম ও নীতিবোধ দুনিয়া থেকে চলে যাবে। লেনিন সেজন্যই বলেছেন ধর্মবিশ্বাস ও নীতিবোধের সাক্ষাৎভাবে বিরোধিতা না করে আদর্শ সমাজ-ব্যবস্থা প্রবর্তনের চেষ্টা করাই বুদ্ধিমানের কাজ; এতে অতি স্বাভাবিকভাবেই এ-জাতীয় ধারণা মানুষের মন থেকে চলে যাবে।

দ্বান্দ্বিক জড়বাদের সম্বন্ধে আর এক উল্লেখনীয় কথা হলো এই যে, এই দার্শনিক দৃষ্টি বিশ্বের এক বিরাট অংশে তার রাজনৈতিক চেতনা ও অর্থনৈতিক কাঠামো, এক কথায় তার সমগ্র সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করেছে। দর্শন যে শুধু থিওরী নয়, দর্শন যে জীবন-যাত্রার এক সুনিপুণ সার্থক পদ্ধতি এই বৈজ্ঞানিক

দর্শন-বিতৃষ্ণার যুগে দ্বান্দ্বিক জড়বাদীরা এ ধারণা যেভাবে বাস্তবে রূপায়িত করেছেন তার তুলনা ইতিহাসে বিরল।

দ্বান্দ্বিক জড়বাদের গুরুত্ব

দ্বান্দ্বিক জড়বাদের যৌক্তিক ভিত্তি কতটা দৃঢ় তা জানি না, তবে যে মনস্তাত্ত্বিক কারণে ও যে ঐতিহাসিক পরিবেশে দ্বান্দ্বিক জড়বাদের প্রচার ও প্রসার, দ্বান্দ্বিক জড়বাদের মূল্যায়নে তাকে গুরুত্ব দে'য়া প্রয়োজন। এ-কথা অনস্বীকার্য যে, যে-গণমুক্তির বাণী আঠারো শতকে ফরাসী-বিপ্লবের মাধ্যমে বিঘোষিত হয়েছিল, কিন্তু নেপোলিয়নের রাজতন্ত্র প্রবর্তনের ফলে, যার প্রভাব খুব বিস্তারিত হয়নি, ১৯১৭ সালের রুশ-বিপ্লবের মাধ্যমে তার গুরুত্ব আজকের দিনের সভ্যজগতে স্বীকৃত। গণচীনের জাগরণে তা আজ আরও পরিস্ফুট। এক কথায়, দ্বান্দ্বিক জড়বাদের এটাই হলো বড় দান যে, যাঁরা দ্বান্দ্বিক জড়বাদে বিশ্বাস করেন না, তাঁরাও আজ এ-কথা স্বীকার করেন যে সভ্যতার এমন কাঠামো গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারে না, যাতে গণস্বার্থ সুরক্ষিত নয়, যাতে অগণিত জনগণের অর্থনৈতিক আত্মাভিব্যক্তি উপেক্ষিত। এখানেই দ্বান্দ্বিক জড়বাদের সার্থকতা।

আগামী দিনের সমন্বয় দর্শন

তবে খুব ভেবে দেখার কথা এই যে, এই বৈজ্ঞানিক যুগে মানুষের অর্থনৈতিক সংহতির সঙ্গে পারস্পরিক সমঝোতাও অপরিহার্য প্রয়োজন। আজ বিজ্ঞান মানুষের সামনে শুধু সার্থক জীবন-যাত্রার সম্ভাবনাই তুলে ধরেনি, তা তার সামনে সামগ্রিক ধ্বংসের সম্ভাবনাও তুলে ধরেছে। এ থেকে অব্যাহতি পেতে হলে যে সমঝোতার দরকার, তার জন্য চাই হৃদয়ের বিস্তার। এই হৃদয়ের বিস্তারের নামই প্রেম, এ-প্রেমই হলো ধর্ম ও নীতিবোধের আসল কথা। এর সঙ্গে যে অন্ধতা ও কুসংস্কারের আকস্মিক যোগ, তা'হলো ধর্ম ও নীতিবোধের খোলস। কাজেই মানুষের সফল, সার্থক জীবন যাত্রার জন্যে যেমন আদর্শ অর্থনৈতিক সমাজ-ব্যবস্থা প্রয়োজন, ঠিক তেমনি তার সত্যিকার ধর্মবোধ, নীতিবোধও প্রয়োজন। এ-দু'য়ের মিলনেই আদর্শ মানব সভ্যতা গড়ে উঠতে পারে। তাই মনে হয়, জড়-বাদের সঙ্গে গভীর ধর্মবিশ্বাস ও নির্মল নীতিবোধের সমঝোতা মানুষের বৃহত্তর জীবন যাত্রার তাগিদেই গড়ে উঠবে। সেই সমন্বয়-দর্শনই হবে আগামী দিনের মানুষের জীবন-দর্শন, তত্ত্বনির্ণয়ে তা এক সার্থক পদক্ষেপ। আমাদের পরিবেশের তাগিদে এ-দুটি আপাত-বিরোধী জীবন-দর্শন পরস্পরের উপর যে প্রভাব বিস্তার করছে, তারই সার্থক পরিণতি হবে এই সমঝোতা ও সমন্বয়।

ইসলামের মধ্যপথের, 'দীন' ও 'দুনিয়ার' সামঞ্জস্যের যে নির্দেশ, তা এই সমন্বয়-দর্শনের সহভাবী সামগ্রিক জীবন-বোধেরই দ্যোতক। গীতার ভাষায় এরই নাম, 'কর্মযোগ'—প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির আপাতঃবিরোধের সমাধান। ধর্ম ও বিজ্ঞানের মিলন ও সমঝোতার এই হলো সত্যিকার পথ।

জড়বাদের সার্থকতা ও পরিণতি

আঠারো শতকে জড়বাদের এক বড় সমর্থক দিদেরোর এক সার্থক উক্তি এ-প্রসঙ্গে মনে পড়ছে। দিদেরো বলেছেন: জড়বাদ জগতের ব্যাখ্যা হিসাবে যে সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য তা বলা যায় না। তবে ধর্মীয় কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস সমাজ থেকে সরিয়ে দেয়ার ব্যাপারে জড়বাদের প্রচুর সার্থকতা এবং যতদিন এই অন্ধতা ও কুসংস্কার সরিয়ে দেয়ার এর চেয়ে ভালো হাতিয়ার না পাওয়া যায়, ততদিন জড়বাদকেই আমাদের জীবন-দর্শন বলে মানুষের সামনে তুলে ধরতে হবে। যে সমন্বয়-দর্শনের কথা আগে উল্লেখ করেছি, তার ভিতরে হয়তো মানুষের কল্যাণের এই জোরালো হাতিয়ার লুকিয়ে রয়েছে।

যুক্তির তরফ থেকে প্রাচীন ও আধুনিক জড়বাদের বিরুদ্ধে যে প্রবল আপত্তি, তার উল্লেখ সৃষ্টিও বিবর্তনের আলোচনায় করেছি। অভিনব-উৎপত্তিবাদীরা যেমন দেখিয়েছেন: প্রাণ ও মনের আদিসত্তা জড়বস্তু হলেও, প্রাণ ও মনকে একান্তভাবে জড়স্বভাব বলা চলে না, এ-কথা যদি সত্য হয়, তা হলে জড়কে বিশ্বের আদি উপাদান বলেও চলতি-জড়বাদ মানা যায় না, কারণ চলতি জড়বাদের মূলকথা জড়, প্রাণ ও চেতনের সাম্য; বৈষম্য নয়। আর এই বৈষম্য তুলে দিতে গিয়ে যদি আমরা বলি যে, জড়ের ভিতরই প্রাণ ও মন লুকিয়ে ছিলো তাহলে সে সত্তাকে আর জড় বলা যায় না, সে সত্তা একটা অজড় বস্তু যা নিষ্প্রাণ হয়েও সপ্রাণ, আর অচেতন হয়েও চেতন। যে-আধুনিক প্রাণবিদ্যা থেকে জড়বাদের প্রাথমিক প্রেরণা, সে-প্রাণবিদ্যা আজ তার ওপর করেছে মুদগর প্রহার।

আবার আজকের দিনের পদার্থবিদ্যা জড়বাদকে খানিকটা দুর্বল করে দিয়েছে। জড়কে নিশ্চল না বলে, চলমান বলায় আজকের দিনের পদার্থবিদ্যায় জড়পদার্থ ও মনের ব্যবধান খানিকটা দূর হয়ে গেছে। এর ফলে মনের যেমন জড়ে রূপান্তর সহজসাধ্য, তেমনি জড়েরও মনে রূপান্তর সহজসাধ্য। এক কথায় তার্কিক দৃষ্টিকোণ থেকে জড়বাদের ভিত্তি উনিশ শতকে যতোটা দৃঢ় ছিল, আজ আর তেমন নাই। তবে দ্বান্দ্বিক জড়বাদে আজকের দিনের মানুষের দৈহিক প্রয়োজন মেটানোর যে চেষ্টা, তার মূল্য প্রচুর, আগামী দিনের আদর্শ সমাজ-ব্যবস্থায় তার সম্ভাবনাও অজস্র।

দার্শনিক চিন্তায় অধ্যাত্মবাদের স্থান

জড়বাদের সংক্ষিপ্ত আলোচনার পর এবার আমরা অধ্যাত্মবাদ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করতে চাই। বিশ্বের দার্শনিক চিন্তায় অধ্যাত্মবাদের প্রভাব যে মোটেই সীমিত নয়, তা বলাই হয়তো বাহুল্য। আজকের দিনের দর্শনে অধ্যাত্মবাদের তেমন আদর না থাকলেও, অধ্যাত্মবাদ যে বিশ্বের দার্শনিক চিন্তার এক গুরুত্বপূর্ণ ও প্রেরণাদায়ক অধ্যায়, তা অস্বীকার করার যো নাই।

অধ্যাত্মবাদের নানা বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্যের ভিতর তার প্রয়োগ-পদ্ধতি ও তত্ত্বনির্ণয় প্রচেষ্টায় দু'টি বিশেষ ধারা দেখতে পাওয়া যায়। এ-দুটি ধারা মনের সামনে রেখে অধ্যাত্মবাদের আঁকাবাঁকা ইতিহাসের একটা সংক্ষিপ্ত সহজবোধ্য ছবি আঁকারই চেষ্টা করতে চাই।

অধ্যাত্মবাদের মূলকথার সঙ্গে ধর্মীয় অনুভূতি ও বিশ্বাসের খুব নিকট-যোগ। চিরাচরিত ধর্ম-বিশ্বাসের মূলকথা : বিশ্বের অসংখ্য বৈচিত্র্যের পেছনে এক ব্যাপক চেতন-সত্তার স্বীকৃতি। এই সর্বব্যাপী চেতন-সত্তারই নাম ধর্মশাস্ত্রে খোদা, অল্লাহ্‌তালা, ভগবান, গড্‌ ইত্যাদি নামেই বৈচিত্র্য, বস্তু আসলে এক। দর্শনশাস্ত্রে এই ব্যাপক চেতনারই নাম পরমসত্তা, এ্যাবসোলিউট বা ব্রহ্ম।

ধর্মীয় অনুভূতি বলতে এই এক সর্বব্যাপী চেতন-সত্তার অনুভূতিই বোঝায়। উইলিয়াম জেম্‌স তাঁর "ধর্মীয় অনুভূতির বৈচিত্র্য" নামক গ্রন্থে এ-সত্যের ওপর অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ ইতিহাসের আদিযুগ থেকে আজকের দিন পর্যন্ত কাল ও পরিবেশের ভিন্নতা সত্ত্বেও ধর্মীয় অনুভূতিতে এই একক সত্যের বাণীই বিঘোষিত।

আধুনিক বৈজ্ঞানিক সংশয়বাদের প্রসারের আগে বিশ্বাসবাদের সুদীর্ঘ ইতিহাসে দার্শনিকরা তাঁদের অধ্যাত্মবাদের ইঙ্গিত খুঁজে পেয়েছেন এই একত্ব-অনুভূতির ভিতর। এই একত্ব-অনুভূতিই ধর্মশাস্ত্রে নানাভাবে বর্ণিত ও ঘোষিত। তাই অধ্যাত্মবাদের প্রাচীন সমর্থকরা শাস্ত্রবাক্য-ব্যাখ্যার মাধ্যমে অধ্যাত্মতত্ত্ব প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন।

এ-পদ্ধতির এক বড় উদাহরণ প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারতের অধ্যাত্মবাদের ইতিহাস। উপনিষদের ভিতর যে ব্যাপক বিশ্বাত্মার অনুভূতির কথা বারবার নানাভাবে নানাছলে বর্ণিত, তাকেই এক দার্শনিক রূপ দিয়েছেন বাদরায়ন তার ব্রহ্মসূত্রে। উপনিষদ ও তার সার-সংগ্রহ ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যার মাধ্যমেই প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারতে দার্শনিক অধ্যাত্মবাদের সৃষ্টি।

আজকের দিনের অনেক সমালোচকই মনে করেন যে, ধর্মগ্রন্থের কতকগুলো কথার ভিত্তিতে দার্শনিক তত্ত্বনির্ণয়ের চেষ্টা নেহাৎ অযৌক্তিক। এ-প্রচেষ্টা তাঁদের

কাছে অযৌক্তিক মনে হওয়ার কারণ, আজকের দিনের রঙিন চশমার সাহায্যে তাঁরা পুরানো দিনের চিন্তাধারার স্বভাব বিশ্লেষণে সচেষ্ট। তাই তাঁরা বুঝতে পারেন না যে, ধর্মগ্রন্থের কথাগুলো শুধু কতগুলো প্রাণহীন কথাই নয়, তারা এক জাগ্রত, জীবন্ত অনুভূতিরই শাব্দিক রূপ। সোজা কথায়, ধর্মশাস্ত্রে যে একক তত্ত্ব-অনুভূতির কথা আছে, তাকে ভিত্তি করেই প্রাচীন কালে, বিশেষতঃ প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারতে, অধ্যাত্মবাদের পত্তন ও প্রতিষ্ঠা। এ-ধরনের অধ্যাত্মবাদীরা তাঁদের এই ধর্মীয় অনুভূতির আলোচনার মাধ্যমে আমাদের অনুভূতির অশেষ বৈচিত্র্য ও অফুরন্ত সংঘর্ষের স্বরূপ-নির্ণয় করারও চেষ্টা করেছেন।

প্রাচীন কালের অধ্যাত্মবাদীরা ধর্মীয় অনুভূতি নিয়েই দার্শনিক বিশ্লেষণ শুরু করেছেন বলে তাঁদের দর্শনে আগে ঈশ্বরের স্থান, পরে জগতের স্থান। ঈশ্বরের অনুভূতি থেকেই প্রাত্যহিক জগতের অনুভূতিতে অবতরণ তাদের দার্শনিক চিন্তার এক বড় বৈশিষ্ট্য।

মুসলিম দার্শনিকরা তাঁদের দার্শনিক চিন্তার শুরু থেকে প্রায় শেষ পর্যন্ত ধর্ম ও দর্শনের যে সমঝোতা আবিষ্কারের চেষ্টা করেছেন, তার মূলেও একই সত্যের প্রতীতি। আরিস্টটলের আবরণে প্লোটাইনাসের ভাবধারা প্রভাবিত হয়ে তাঁরা তাঁদের দর্শনে দিব্যদর্শনকে এক মুখ্য স্থান দিয়েছেন। মুতাজিলাবাদী ও আশারী-পন্থীরা তাঁদের অন্তর্দ্বন্দ্ব সত্ত্বেও এই প্রভাবে প্রভাবিত হয়েই রোজকেয়ামতে পুণ্যাত্মাদের আল্লাহতালার সাক্ষাৎ দর্শনের কথা অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করেছেন ও নিজেদের দার্শনিক মত-অনুসারে তার সঙ্গতি ও সম্ভাবনা ব্যাখ্যা করারও চেষ্টা করেছেন।

আজকের দিনের বৈজ্ঞানিক সংশয়বাদী আবহাওয়ায় এভাবে ঈশ্বরের সন্ধান পাওয়া ত দূরের কথা, আমাদের অভিজ্ঞতা নিংড়েও আকারে-ইংগিতে ঈশ্বরের সত্তার সন্ধান পাওয়া দুষ্কর। এক ফরাসী মনীষী এ ভাবেরই অভিব্যক্তি করে বলেছেন: বিশ্বের ইতিহাসে ঈশ্বরের স্পর্শ কোথাও নাই। সত্যিই ত! সকাল বেলা বাজার করা, দুপুর বেলা অফিসে যাওয়া, বিকাল বেলা ঘরবাড়ীর খোঁজ খবর নেয়া, সন্ধ্যাবেলা ক্লাবে গিয়ে খেলা-ধুলা পান-ভোজন, গভীর রাত্রে বাড়ী ফিরে প্রেয়সীর সঙ্গে ভাববিনিময়, আর সকাল থেকে সন্ধ্যা ও সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত সব সময়ই অর্থ, মান-সম্মান, প্রভাব-প্রতিপত্তির পেছনে ছুটা, এই যে তথাকথিত কর্মবহুল জীবন; এই যে কুকুরের বাঁকা লেজ সোজা করার অবিরাম ব্যর্থ প্রয়াস, এর সঙ্গে আল্লাহতালার যোগ কোথায়? কবে যে জীবনের শুরু হয়েছে তা মনে রাখার প্রয়োজন তো এ পরিবেশে নাই-ই, আর কবে যে তার শেষ তা তো

কোনও অবস্থায়ই জানার যো নাই। তাই আজকের দিনের সভ্য, শিক্ষিত মানুষের মতে গরমের দিন শেষ হবার আগেই শীতের অতি-প্রয়োজনীয় শুকনো ঘাসের ব্যবস্থা করাই বুদ্ধিমানের কাজ। অকস্মাৎ বিনামেঘে বজ্রপাতের মতো বৈচিত্র্যহীন জীবন-নাট্যের যবনিকা পতন। তারপর কি, কে জানে?

এ-রহস্যের অর্থ আবিষ্কার না করতে পেরে অনেকে মনে করেন: আমাদের বুদ্ধির অগোচর, সর্বব্যাপী আল্লাহতায়ালা বা ঈশ্বরেরই এটা বিধান। এ-বিধান মানুষের বুদ্ধির অগম্য। তবে এ-বিশ্বাসই কয়জনের আছে, আর কতদিনই বা থাকে। যুধিষ্ঠির ঠিকই বলেছেন:

রোজ রোজ এতো মানুষ মরছে তথাপি যারা বেঁচে আছে তারা মনে করে তাদের মৃত্যু নাই, তারা চিরকাল বেঁচে থাকবে; এটাই পৃথিবীর সবচেয়ে আশ্চর্য ঘটনা।

'অহন্যহনি ভূতানি
গচ্ছন্তি যমমন্দিরম্।
শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি
কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্॥"

তথাপি এ-বৈজ্ঞানিক সংশয়বাদের যুগেও কেউ কেউ যে কখনও কখনও আমাদের অভিজ্ঞতার জগৎ-বিশ্লেষণ করে তার পেছনে এক ব্যাপক চেতনা আবিষ্কার করার চেষ্টা করে থাকেন, এটা হয়ত বিস্ময়েরই বিষয়। তাঁরা বলেন: বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে আমরা প্রকৃতির অসংখ্য বৈচিত্র্যের পেছনে যে নিয়মগুলোর সন্ধান পেয়েছি, তাদের পেছনে কোনও এক চেতন সত্তা না থাকলে, তাদের ভিতর কোন সামঞ্জস্য থাকত না, বরং তাদের ভিতর সংঘর্ষ লেগেই থাকতো। এভাবে বিজ্ঞানের নিয়মের রাজত্বে বিশ্বাস থেকে এক অধ্যাত্ম-তত্ত্ব আবিষ্কারের চেষ্টা উনিশ শতক ও তার পরবর্তী পাশ্চাত্ত্য দর্শনে বিশেষভাবে দেখা যায়।

ধর্মশাস্ত্রে সহজ সরলভাবে যে কথা বলা আছে, তর্কযুক্তির সাহায্যে তা বুঝাতে গিয়ে আজকের দিনের অধ্যাত্মবাদীরা সাধারণতঃ মানুষের কাছে তাকে দুর্বোধ্য ও রহস্যাবৃত করেছেন। উইলিয়াম জেম্‌স ঠিকই বলেছেন: আধুনিক পাশ্চাত্ত্য অধ্যাত্মবাদ তার ধর্মবিশ্বাসের জন্যে নিরপেক্ষ দার্শনিকদের সমর্থন লাভ করেনি, আর তর্কের জটিলতার জন্যে সাধারণ ধর্মবিশ্বাসী মানুষও তার প্রতি আকৃষ্ট হয়নি।

মধ্যযুগীয় ভারতের অধ্যাত্মবাদকে দার্শনিক চিন্তাধারার রূপ দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করার যাঁরা চেষ্টা করেছেন, তাঁদের ভিতর শঙ্কর ও রামানুজের নাম সর্বাপেক্ষা

উল্লেখযোগ্য। যদিও তাঁদের দার্শনিক মতে আকাশ-পাতাল প্রভেদ, তথাপি তাঁদের দার্শনিক বিশ্লেষণ-পদ্ধতি মোটামুটি এক।

আমাদের সহজ অনুভূতির বিশ্লেষণে যাঁরা আধুনিক যুগে অধ্যাত্মবাদকে দার্শনিক মত হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছেন, তাঁদের দিশারী ও পথিকৃৎ অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধের দার্শনিক হেগেল। হেগেলের শিষ্যেরা তাঁর এই দার্শনিক মত ইউরোপ ও আমেরিকায় উনিশ শতকের শেষে ও বিশ শতকের প্রথম দিকে নানাভাবে ছড়াবার চেষ্টা করেছেন।

অধ্যাত্মবাদের দু'টি বিশেষ ধারা

আগেই বলেছি, অধ্যাত্মবাদের শেষকথা এক সর্বব্যাপী চেতনার স্বীকৃতি। প্রাচীন যুগে এই একক সত্তার স্বরূপ দার্শনিকরা নির্ণয় করেছেন শাস্ত্র-বর্ণিত অধ্যাত্ম-অনুভূতির মাধ্যমে, আর আজকের দিনের দার্শনিকরা যুক্তির সাহায্যে আমাদের বিচিত্র অভিজ্ঞতার জগৎ বিশ্লেষণ করে তার মূলে এক সর্বব্যাপী চেতনা আবিষ্কার করবার চেষ্টা করছেন।

একদল অধ্যাত্মবাদী দার্শনিক আছেন যাঁরা এই সর্বব্যাপী একক চেতনার ওপর এতো বেশী গুরুত্ব আরোপ করেছেন যে, তাদের কাছে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের তাত্ত্বিক মূল্য একরকম নাই, তা প্রায় সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত। আর একদল দার্শনিক আছেন, তাঁরা এই সর্বব্যাপী চেতনা ও আমাদের অভিজ্ঞতার জগৎ এ-দুটোরই তাত্ত্বিক মূল্য স্বীকার ক'রে দু'টোকে মিলিয়েই তত্ত্ব-নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন।

অবশ্য তাঁদের দু'দলের কাছেই সর্বব্যাপী একক চেতনার মূল্য আমাদের অভিজ্ঞতার জগতের চেয়ে অনেক বেশী। আমাদের অভিজ্ঞতার জগৎ চলমান, নশ্বর ও ক্ষণভঙ্গুর, তার দোষ-ত্রুটিরও শেষ নাই, আর এই সর্বব্যাপী একক চেতনা শাশ্বত, অবিনশ্বর ও সর্বপ্রকার দোষ-ত্রুটি-বর্জিত। সুতরাং এ-সর্বব্যাপী চেতনার মূল্য বিশ্ব-সংসারের চেয়ে অনেক বেশী তা বলাই নিষ্প্রয়োজন। এজন্যই এ দু'দলের অধ্যাত্মবাদীরাই এ-সর্বব্যাপী চেতনাকে জীবনের পরম বাঞ্ছিতব্য বলে মনে করে থাকেন। এ-সত্তার চেয়ে বড় কিছু তাঁদের মতে হয় না, এজন্য তাঁরা এ-সত্তার দু'টি নামকরণ করেছেন: তার একটি হলো ভূমা, আর একটি হলো ব্রহ্ম। এ-দু'টি কথারই অর্থ হলো সর্বোত্তম, অর্থাৎ যার চেয়ে বড় কিছু আর হয় না। এ-দু'টি শব্দের ভিতর দার্শনিক সাহিত্যে ব্রহ্ম শব্দেরই অধিকতর প্রচলন। এই একক সর্বব্যাপী শাশ্বত ও পরিপূর্ণ-স্বভাব

সত্তাকে যাঁরা বিশ্বের চরম তত্ত্ব বলে নিরূপণ করেন, সে-অধ্যাত্মবাদী দার্শনিকদের মতের প্রচলিত নাম ব্রহ্মবাদ।

নির্বিশেষ ও সবিশেষ একত্ববাদ

যে সব অধ্যাত্মবাদীরা শুধু পরম ও চরম সত্তাই বলেননি, বিশ্বজগতের সত্যিকার সত্তা নাই এ-কথাও বলেছেন, তাঁদের মতের নাম নির্বিশেষ একত্ববাদ। এ মতে ব্রহ্মই শুধু শাশ্বত চিরন্তন সত্য, আমাদের অনুভূতির জগতের সত্তা আছে বলেই মনে হয়, আসলে তার সত্তা নাই। আর যে সব অধ্যাত্মবাদীরা শুধু ব্রহ্মকে পরম ও চরম সত্য বলেন না, ব্রহ্মের অবিচ্ছেদ্য অভিব্যক্তি বা প্রকাশ হিসাবে বিশ্বজগতের সত্তাও আছে একথা স্বীকার করেন, তাঁদের মতের নাম সবিশেষ-একত্ববাদ।

সবিশেষ ব্রহ্মবাদের নানা রকম প্রকারভেদ দেখতে পাওয়া যায়। ব্রহ্মের সঙ্গে জগতের সম্বন্ধ নির্ণয় করতে গিয়ে নানা রকম সূক্ষ্ম পার্থক্যের অবতারণা সবিশেষ ব্রহ্মবাদীরা করেছেন। সে-জটিল আলোচনা মুলতবী রেখে নির্বিশেষ-ব্রহ্মবাদ ঐ সবিশেষ-ব্রহ্মবাদের মূল কথার একটু বিস্তারিত আলোচনা করতে চাই। চলতি কথায় বলে, অনেকে গাছ খুঁজতে খুঁজতে বন হারিয়ে ফেলে। অধ্যাত্মবাদের নানা অবান্তর মতের আলোচনা করতে গিয়ে আমরা যেন তার মূল কথা ভুলে না যাই সেজন্য আমরা সোজাসুজি, সহজভাবে নির্বিশেষ ও সবিশেষ-ব্রহ্মবাদের মূল বক্তব্য এখানে আলোচনা করতে চাই।

নির্বিশেষ-ব্রহ্মবাদের বিখ্যাত ব্যাখ্যাতা ও প্রচারক আচার্য শঙ্কর ও তাঁর অনুগামীরা। অষ্টম শতকে শঙ্করাচার্য থেকে উনিশ শতকে বিবেকানন্দ পর্যন্ত বহু অধ্যাত্মবাদী মনীষী নির্বিশেষ ব্রহ্মবাদের ব্যাখ্যা ও প্রচার নানাভাবে করেছেন। দশ শতকে রামানুজ থেকে শুরু করে আঠারো শতকে হেগেল ও তার আরো পরে তাঁর অনুগামীদের সকলে সবিশেষ ব্রহ্মবাদেরই সমর্থক ও প্রচারক।

এই নির্বিশেষ একত্ববাদ প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারতেই যে ছিল তা নয়, খ্রীস্টপূর্ব যুগে শঙ্করের বহু আগে প্লেটোর ভিতর এ মতের ইঙ্গিত দেখতে পাওয়া যায়। প্লেটো-প্রভাবিত মরমীবাদী প্লোটাইনাস (২০৪-৭০ খ্রীস্টাব্দ) এ-মতেরই এক বড় সমর্থক। ইসলামীয় জীবনধারার এক পরিপক্ব ফল সূফীবাদের এটা ছিল এক বড় কথা। বিখ্যাত মরমীবাদী স্পেন-দেশীয় দার্শনিক ইবনুল আরাবী (১১৬৫-১২৪০ খ্রীঃ) ও মরমীবাদী কবি ও দার্শনিক মৌলানা রুমী (১২০২-১২৭০) প্রভৃতির চিন্তাধারার সঙ্গে এ-মতের সাদৃশ্য মোটেই উপেক্ষণীয় নয়।

ইরানে ও ভারতে এ মতের প্রভাব সাদৃশ্য ও পার্থক্যের এক তথ্যপূর্ণ ও শিক্ষাপ্রদ আলোচনা আছে ইকবালের "ডিভেলপমেন্ট অব মিটাফিজিক্স্ ইন্ পার্সিয়া" গ্রন্থে। অনুসন্ধিৎসু পাঠকের দৃষ্টি সেদিকে আকর্ষণ করেই এ-তুলনামূলক আলোচনা শেষ করতে চাই।

উপনিষদে আছে, এ-ব্যাপক বিশ্ব-চেতনা যিনি আমাদের অন্তরাত্ম, তাকে 'নেতি', 'নেতি' 'এ নয়, এ নয়' বলেই বোঝানো যায়, 'ইতি' 'ইতি' অর্থাৎ এরকম বলে বোঝানো যায় না। এ প্রসঙ্গে স্পিনোজার কথা অতি স্বাভাবিকভাবেই মনে পড়ে। তিনি বলেছেন: চরম তত্ত্বের ওপরে বিশেষণ প্রয়োগ করলে তার সত্তা নির্ণয় হয় না, সত্তা নাশই হয়।

নির্বিশেষ ব্রহ্মবাদের মূল কথা

এজন্যই বেদান্ত-দর্শনে ব্রহ্মকে সচ্চিদানন্দ বলে অভিহিত করা হয়েছে। ব্রহ্ম শুধু আছেন, কাজেই তার স্বভাব সৎ। দুনিয়ার সমস্ত জিনিসকেই আমরা আছে বলে থাকি। বাড়ী আছে, ঘর আছে, ঘোড়া আছে, স্ত্রী-পুত্র পরিবার আমরা সকলেই আছি এই যে সব বস্তুর অনুভূতির সঙ্গে 'আছে' বা 'থাকার' যোগ, এরই নাম সৎ। ঘর-বাড়ী, গাছ-পাথর, 'স্ত্রী-পুত্র-পরিবার এদের সঙ্গে যোগ না করে যখন আমরা এই 'থাকা' কথাটির অর্থ বুঝতে পারি, তখনই আমাদের শুধু সত্তার জ্ঞান হয়। আমাদের অগণিত অনুভূতির বিষয় অনবরত বদলে যাচ্ছে; কখনও আমরা জানছি বাড়ী-ঘর, কখনো জানছি গাছ-পাথর আর কখনো জানছি স্ত্রী-পুত্র-পরিবার; কিন্তু তাদের সকলের সঙ্গে 'আছে' এ-অনুভূতির যোগ। এ-থাকার অনুভূতি তাই সর্বব্যাপী আর এই থাকার সঙ্গে অন্য যে-সব জিনিসের আকস্মিক যোগ, তাদের বাদ দিয়ে শুধু থাকা বা অস্তিত্ব জিনিসটাই হলো নির্বিশেষে পরমসত্তার স্বভাব ও স্বরূপ।

এই 'আছে' কথাটির মতোই যে অনুভূতির মারফত 'আছে' কথাটি আমরা জানি, তাও ব্যাপক। আমরা ঘর-বাড়ী জানি, গাছ-পাথর জানি, গ্রহ-নক্ষত্র জানি, আত্মীয়-স্বজন জানি। অনুভূতির এই বৈচিত্র্যের ভিতর তার বিষয় অনবরত বদলাচ্ছে, কিন্তু অনুভূতি বা জানার কোনও পরিবর্তন নাই। বিষয়ের পরিবর্তনই অনুভূতিতে প্রতিভাত, বিষয়-ভেদে অনুভূতির বৈচিত্র্য। তাই সত্তার স্বভাব হলো বিশুদ্ধ জ্ঞান, এরই আর এক নাম 'চিৎ' বা চেতনা।

আর এ বস্তুই আমাদের জীবনের পরম অভীষ্ট, পরম লভ্য, কারণ একমাত্র এ বস্তুই পূর্ণস্বভাব। যিনি পূর্ণ তাঁর অভাববোধ থাকে না, আর অভাববোধ না থাকলেই আনন্দ হয়, কাজেই ব্রহ্মের স্বভাব আনন্দ। ব্রহ্ম আনন্দময় নয়,

আনন্দস্বরূপ অর্থাৎ কোনরূপ অপূর্ণতা না থাকায় ব্রহ্মের স্বভাব আনন্দ। এক কথায়, নির্বিশেষ ব্রহ্মের স্বভাব সৎ, চিৎ ও আনন্দ। সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মে সন্ধি করে নির্বিশেষ ব্রহ্মকে তাই বলা হয় 'সচ্চিদানন্দ'।

এই নির্বিশেষ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের সঙ্গে অগণিত বৈচিত্র্যময় পরিবর্তনশীল জগতের সম্বন্ধ কি, এ-প্রশ্ন ওঠা অতি স্বাভাবিক। নির্বিশেষ ব্রহ্মই যদি একমাত্র সত্য হন, তাহলে আমরা যে জগতে বাস করি, তার কি একেবারেই সত্তা নাই? নির্বিশেষ-ব্রহ্মবাদের অনেক সমালোচক মনে করেন যে, নির্বিশেষ ব্রহ্মবাদের মতে আমাদের প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতা একেবারেই অসৎ অর্থাৎ তার কোনো সত্তাই নাই। আরও এক ধাপ এগিয়ে তাঁরা বলেন, যদি জগতের কোনও সত্তাই না থাকে, তা'হলে এ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের অনুভূতি কি করে সম্ভব। যা একেবারেই নাই, যেমন আকাশ-কুসুম, অশ্ব-ডিম্ব ও বন্ধ্যা-পুত্র, তার তো অনুভূতি কখনো হয় না। কিন্তু জগতের অনুভূতি আমাদের হয় না, এমন কথা যদি কেউ তর্কের খাতিরে বলেন, তাহলে তাকে সাধারণ মানুষের ভিতরে স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করতে না দিয়ে স্বাস্থ্যোন্নতি ও মনের স্বস্তির জন্যে অনুকূল কোন রম্য ও নির্জন আবহাওয়ায় রাখাই প্রয়োজন। এটাই নির্বিশেষ একত্ববাদের চলতি রসালো সমালোচনা।

নির্বিশেষ একত্ববাদে বিশ্বসত্তা

আসলে কিন্তু নির্বিশেষ-ব্রহ্মবাদীরা এমন কিছু অদ্ভুত কথা বলেন না। তাঁরা জগৎ ব্রহ্মের মতো সৎ-ও বলেননি, আর আকাশ-কুসুমের মতো অসৎ বা অলীকও বলেননি। তাঁদের মতে জগৎ একেবারে আছে এ কথাও বলা যায় না, আর জগৎ একেবারেই নাই, এ-কথাও বলা চলে না। জগতের সত্তা থাকা ও না থাকার মাঝামাঝি। নির্বিশেষ-ব্রহ্মবাদীদের মতে আছে ও নাই, থাকা ও না থাকার মাঝখানে এই যে বিস্ময়কর, অযৌক্তিক অথচ অনস্বীকার্য অস্তিত্ব, এরই নাম অনির্বচনীয় সত্তা। প্রাচ্যের নির্বিশেষ ব্রহ্মবাদীরা খুব স্পষ্ট করেই বলেছেন: জগতের সত্তা এক নিঃশ্বাসে উড়িয়ে দেয়া তাঁদের অভিপ্রায় নয়, জগতের সত্তা নির্বিশেষ-ব্রহ্মের সত্তার মতো নিরপেক্ষ নয়, একথা বলাই তাঁদের উদ্দেশ্য।

খ্রীস্ট-পূর্ব যুগে মনীষী প্লেটোও নির্বিশেষ-ব্রহ্মবাদীদের মতোই বলেছেন: আমাদের স্বাভাবিক অনুভূতির জগৎ যে একেবারে 'আছে' এ-কথাও বলা যায় না, আর যে একেবারে 'নাই' এমন কথাও বলা যায় না। জগতের 'সত্তা' বদলায় আর বদলানো মানে আগে যেটা ছিলো তা না থাকা এবং আগে যেটা ছিলো তার বদলে আর একটা কিছু থাকা। কাজেই বদলানো জিনিসটা 'থাকা' ও

'না থাকার' একটা অদ্ভুত সংমিশ্রণ। তাই প্লেটো বলেন: আমরা যে পরিবর্তনশীল জগতে বাস করি তা একেবারে 'আছে' বলারও জো নাই, তা একেবারে 'নাই' এ-কথা বলারও জো নাই।

নির্বিশেষ-ব্রহ্মবাদীরা বলেন: জগতে সত্তা আমাদের অনুভূতি-সাপেক্ষ। যতদিন আমরা ব্রহ্মকে জানি না, ততদিনই আমাদের জগতের অনুভূতি। যে মুহূর্তে আমরা ব্রহ্মকে জানি, জগতের সত্তা সেই মুহূর্তেই ব্রহ্মসত্তায় হারিয়ে যায়, আর আমরা নিজেরাও ব্রহ্মের সঙ্গে সঙ্গে এক হয়ে যাই। সাগরের ঢেউ যেমন বড়ো হতে হতে সাগরের ভিতর নিজের সত্তা হারিয়ে ফেলে, আমাদের অবস্থা অনেকটা সে রকমই।

ব্যবহারিক ও পারমার্থিক সত্তা

তাই নির্বিশেষ-ব্রহ্মবাদীরা বলেন: যতক্ষণ আমরা ব্রহ্মকে জানি না, অর্থাৎ অজ্ঞান-দশায়ই জগতের সত্তা আর আমরা যখন ব্রহ্মকে জানি অর্থাৎ জ্ঞান-দশায়ই, জগতের সত্তা হানি। একেই নির্বিশেষ-ব্রহ্মবাদীরা নাম দিয়েছেন ব্যবহারিক সত্তা। জগতের সত্তা অবস্থা-সাপেক্ষ, ব্রহ্মের সত্তা অবস্থা-নিরপেক্ষ। সাপেক্ষ সত্তার নামই ব্যবহারিক সত্তা আর নিরপেক্ষ-সত্তার নামই পারমার্থিক সত্তা। এক কথায়, জগতের সত্তা ব্যবহারিক, ব্রহ্মের সত্তা পারমার্থিক।

জগতের সত্তা যে অবস্থা-সাপেক্ষ, আমাদের অনুভূতির বিভিন্ন স্তর বিশ্লেষণ করেও নির্বিশেষ ব্রহ্মবাদীরা তা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। আমরা জাগ্রত জীবনে চোখের সামনে যে স্থূল জগৎ দেখতে পাই, রাত্রে ঘুমিয়ে যখন আমরা স্বপ্ন দেখি, তখন সে স্থূল জগতের সত্তা আমাদের কাছে থাকে না। তখন রাত্রে ঢাকার বিছানার ওপর বালিশে মাথা দিয়েই আমরা কল্পনায় লণ্ডনে হাজির হতে পারি। স্বপ্নের এমনই মহিমা। পাসপোর্টের কড়াকড়ি, কাষ্টমসের কড়া পাহারা, এ্যারোপ্লেনের দামী টিকিট সংগ্রহ না করেও অক্লেশে আমরা শুধু লণ্ডনে নয়, কতিপয় ভাগ্যবানের যেখানে আনাগোনা, সরাসরি সেই বাকিংহাম প্যালেসেও যেতে পারি। স্বপ্নেও স্থূল জগতের সত্তা নাই, আমাদের মনের সৃষ্ট এক সূক্ষ্ম জগৎ নিয়েই স্বপ্নের কারবার। স্বপ্নের এই অবাধ স্বাতন্ত্র্যের ভিত্তিতেই মধ্যযুগীয় ভারতীয় দার্শনিকরা দেহাত্মবাদ অপ্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। তাঁরা বলেছেন: স্বপ্নে যখন স্থূল দেহকে অগ্রাহ্য করেই আমাদের গতিবিধি তখন স্বপ্ন প্রমাণ করে আমাদের আসল সত্ত দেহাতীত।

স্বপ্নের এই সূক্ষ্ম জগৎ আমরা হারিয়ে ফেলি সুষুপ্তির অজ্ঞানলোকে। গভীর নিদ্রায় মগ্ন হয়ে আমরা যখন স্বপ্নও দেখি না, যখন আমরা সুখে-শান্তিতে

ঘুমোই তখন আমরা দুনিয়ার কোন কিছুই জানতে পারি না। অদৃষ্টের নিপীড়নে সদ্যমৃত-পুত্রশোকে শোকাতুরা জননী তার গভীর দুঃখ, ভোগী তার বিষয়ভোগের নেশা ও আমেজ, পণ্ডিত তার পাণ্ডিত্যের অহমিকা, মূর্খ তার সীমাবদ্ধজ্ঞানের দৈন্য, ধনবান তার ঐশ্বর্যের মোহ, দরিদ্র তার দারিদ্র্যের নিপীড়ন, রাজনীতি-বিশারদ তার ডিপ্লোমেসী, এমন কি প্রেমিক-প্রেমিকা তাদের প্রেমের কলহ গভীর নিদ্রায় বিস্মৃত। এমনই সুষুপ্তির মহিমা, এমন বৈষম-নিবারণী বটিকা কোনও ভেষজের ঔষধালয়ে সৃষ্টি হয়নি, হবে বলেও মনে হয় না।

তথাপি যাঁরা মনে করেন, গভীর নিদ্রায় কোন জ্ঞান থাকে না, তাঁরা ভুল করেন। গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত রোগীকে যদি জাগার পর জিজ্ঞাসা করা যায়: "ঘুমের ভিতর কেমন ছিলে?" সে বলে: "খুব সুখে-শান্তিতেই ঘুমোচ্ছিলাম আর অন্য কোন জ্ঞান ছিল না।" এই যে তার সুখ ও অজ্ঞানের স্মৃতি, এটাই প্রমাণ করে দেয়: নিদ্রায় আমরা অজ্ঞান-জনিত আনন্দ অনুভবই করি। পূর্বানুভূত বিষয়েরই স্মৃতি সম্ভব। অপ্রকৃতিস্থ লোকই মনে করে যে, আগে যা অনুভব করেনি, তা তার মনে পড়ছে। সুতরাং সুষুপ্তিতে স্বপ্নের সূক্ষ্ম জগতের সত্তা যদিও বিলুপ্ত, তথাপি সেখানে অজ্ঞানের আবরণে জ্ঞান বিদ্যমান।

নির্বিশেষ-ব্রহ্মবাদীরা বলেন: জীবের অজ্ঞান দশার এই তিনটি স্তর—জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি; এর অতীত জ্ঞান-দশার তাঁরা নাম দিয়েছেন তুরীয়-অবস্থা। তুরীয় কথার অর্থ চতুর্থ। এই চতুর্থ অবস্থায় সুষুপ্তির অজ্ঞানলোকও থাকে না। এই অবস্থায় জীব তার সীমিত সত্তা হারিয়ে ব্রহ্মের অনন্ত সত্তার সঙ্গে এক হয়ে যায়।

এভাবেই নির্বিশেষ-ব্রহ্মবাদীরা দেখাবার চেষ্টা করেছেন: ব্রহ্মের সত্তা অবস্থা-সাপেক্ষ নয়, কিন্তু জগতের সত্তা অবস্থা-সাপেক্ষ অর্থাৎ জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তিতেই জগতের সত্তা। আবার জাগ্রত অবস্থার সত্তা স্বপ্নে বিলুপ্ত, স্বপ্নের সত্তা সুষুপ্তিতে বিলুপ্ত। তুরীয় বা চতুর্থ অবস্থায় জগতের কোন সত্তাই নাই।

সর্বব্যাপী নির্বিশেষ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের এই স্বভাব ও তার সঙ্গে এই চির-চঞ্চল নশ্বর ও অপূর্ণ জগতের যোগসূত্র আবিষ্কার করতে গিয়ে নির্বিশেষ-ব্রহ্ম-বাদীরা নানা উপমার আশ্রয় গ্রহণ করছেন। তাদের ভিতর দু'টির কথা এ-প্রসঙ্গে মনে পড়ছে। একটি মায়াবী বা ম্যাজিসিয়ান আর একটি নট বা অভিনেতা।

মায়াবী যেমন তার ছলনা কৌশলের সাহায্যে নানা রকমের অবাস্তব ভেল্কি-বাজীর সৃষ্টি করে অগণিত দর্শককে মুগ্ধ ও বিস্মিত করে, ঠিক সে-রকম ব্রহ্ম তার অপূর্ব শক্তি মায়ার প্রভাবে তার নিজের ভিতর এই অবাস্তব বিশ্বসৃষ্টি করে

জীবকে মুগ্ধ ও বিস্মিত করছেন। মায়াবী দেখিয়ে দিচ্ছে, হঠাৎ একটি মানুষের গলা কাটা গেলো আবার পর-মুহূর্তেই সে বেঁচে উঠলো, আসলে কিন্তু কিছুই হয়নি। এ-ম্যাজিকের তত্ত্ব যে জানে, এ-ম্যাজিক তাকে বিভ্রান্ত করতে পারে না, আনন্দই দেয়। ঠিক তেমনি যাঁরা এ-বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে বিশ্বমায়াবীর ম্যাজিক বলে জানেন, তাঁরা এতে বিভ্রান্ত হন না, এ-ম্যাজিক তাঁদের অবাধ, অনাবিল আনন্দই দিয়ে থাকে।

এ-কথাই নির্বিশেষ-ব্রহ্মবাদীরা অভিনেতার উদাহরণের সাহায্যেও বুঝাতে চেয়েছেন। রাজার ছেলের বিপুল ঐশ্বর্য, কিন্তু অভিনয় দেখিয়ে আর দশজনকে মুগ্ধ করার উদ্দেশ্যে দারিদ্র্য-নিপীড়িত, ক্ষুধার্ত, অর্ধ-নগ্ন ভিখারীর ভূমিকায় রঙ্গ-মঞ্চে সে অবতীর্ণ। তার নগ্ন বেশ, নিদারুণ দুঃখের কাহিনী, অভাব-অভিযোগের তাড়না ও সকরুণ ক্রন্দন অভিনয়ে দর্শকদের মনে একটি দুঃখজনক অভিজ্ঞতার উদ্রেক করেছে, যারা খুব ভাব-প্রবণ তারা অভিনয়ের ভিক্ষুকত্বের সঙ্গে সত্যিকার ভিক্ষুকত্বের তফাৎ অভিনয়-চাতুর্যে প্রায় বিস্মৃত। তথাপি যে রাজপুত্র এ-অভি-নয়ের ভূমিকায় অবতীর্ণ, এই নিদারুণ দুঃখজনক অভিনয়ের ভূমিকার মাধ্যমে যে গভীর দুঃখ ও বেদনার অভিব্যক্তি, তা তার অন্তরে অনাবিল আনন্দের প্রবাহই সৃষ্টি করছে। সৃজনী প্রতিভার এমনই মহিমা। এ বিরাট বিশ্বের স্রষ্টা এক অনলস অভিনেতা। অনন্ত কাল ধরে এ বিশ্ব-রঙ্গমঞ্চে অগণিত ভূমিকায় তার অভিনয়। আমরা সকলেই সে অভিনয়ের অংশীদার, সে অভিনয়ের পেছনে যে সত্য, তার আমরা খোঁজ রাখি না, তাই অভিনয়কে সত্য ভেবেই আমাদের যত দুঃখ, যত অন্তর্দ্বন্দ্ব, যত রেষারেষি, হানাহানি। কিন্তু মিথিলার রাজা জনকের মতো যদি আমরা জানতাম যে, আসলে এ বিশ্ব এক অদ্ভুত অভিনয়, যার তাত্ত্বিক সত্তা নাই, তাহলে আমরা অচঞ্চল হয়ে বলতে পারতাম—

"মিথিলায়াং প্রদীপ্তায়াং
নমে দহতি কিঞ্চন"

[আমার রাজ্য মিথিলা দগ্ধ হলেও, তাতে আমার কিছু আসে যায় না, কারণ আমার পরম সত্তা সমস্ত দুঃখ ও ধ্বংসের বহু উর্ধ্বে।]

জনকের অনাসক্তির গল্পটি হলো এরূপ ঃ

মিথিলার অধিপতি জনক ছিলেন ব্রহ্মবিৎ। তাঁর ব্রহ্মবিদ্যা পরীক্ষা করার জন্যে আজন্ম-ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসী শুকদেব তাঁর কাছে এসে হাজির। তিনি এসে দেখলেন ঃ জনক রাজ-প্রাসাদে ভোগ-বিলাসে লিপ্ত। এ দেখে তাঁর সঙ্গে

ব্রহ্মতত্ত্ব আলোচনা করা দূরে থাকুক, শুকদেবের তাঁর সম্বন্ধে অত্যন্ত বিপরীত ধারণাই হলো। যাই হোক, নেহাৎ অবস্থার চাপে তিনি তাঁর সঙ্গে ব্রহ্মতত্ত্ব আলোচনায় প্রবৃত্ত হলেন। আলোচনা শুরু হতে না হতেই জনকের রাজধানী মিথিলা আগুনে পুড়তে আরম্ভ করলো, কিন্তু তার জন্য জনক ব্রহ্মতত্ত্ব-আলোচনা থেকে বিরত হলেন না। তাঁর সহকর্মী ও ভৃত্যদের যথাযথ উপদেশ দিয়ে তিনি শুকদেবের সঙ্গে ব্রহ্মতত্ত্ব আলোচনা চালিয়েই গেলেন, কারণ তিনি জানতেন তার আসল সত্তা নির্মল, অনাবিল সুখ-দুঃখ বর্জিত। সন্ন্যাসী শুকদেব রাজ্যসুখ-ভোগে মগ্ন জনকের এই অসাধারণ অনাসক্তি দেখে বিস্মিত হয়ে গেলেন। এই হলো এই গভীর উপদেশাত্মক আখ্যায়িকা। এর সঙ্গে অলৌকিকতার সংযোগ করে রস সৃষ্টি করতে গিয়ে আখ্যায়িকাকারেরা বলেছেন: জনক শুকদেবের জ্ঞান পরীক্ষার উদ্দেশ্যেই অগ্নিকাণ্ডের ম্যাজিক তৈরী করেছিলেন। "সারং গ্রাহ্য অসারস্য ফল্গু:" এই প্রাচীন প্রবাদ অনুসারে সারগ্রহণ ও অসার বর্জন করে বলা হয়তো শোভন ও সঙ্গত হবে যে, আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের অগণিত ওঠা-নামার ভিতর অনাসক্তি শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যেই এ অদ্ভুত আখ্যায়িকার সৃষ্টি।

মায়াবাদের বিশ্লেষণ

এই নির্বিশেষ একত্ববাদ বা ব্রহ্মবাদেরই আর এক নাম মায়াবাদ। বিশ্বের আদি সত্তা নির্বিশেষ ব্রহ্ম। এ-দৃষ্টিকোণ থেকে এ-মতের নাম নির্বিশেষ ব্রহ্মবাদ, কিন্তু নির্বিশেষ ব্রহ্মের মায়া-শক্তির প্রভাবেই এ বিশ্বজগতের, যা থেকেও নাই, সৃষ্টি। তাই নির্বিশেষ ব্রহ্মবাদেরই আর এক নাম মায়াবাদ।

নির্বিশেষ ব্রহ্মবাদীরা মেঘে ঢাকা সূর্যের দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেছেন: সূর্য যেমন সত্যি সত্যি মেঘাবৃত না হয়েও অজ্ঞলোকের কাছে মেঘাবৃত বলে প্রতিভাত হয়, ব্রহ্মও তেমনি তাঁর মায়া-শক্তির দ্বারা অজ্ঞানী জীবের কাছে তার সত্যিকার স্ব-প্রকাশ রূপ আবৃত করে রাখেন। এরই পারিভাষিক নাম ব্রহ্মের আবরণ-শক্তি। মায়া-শক্তির প্রভাবে তাঁর স্বরূপ আবৃত করে ব্রহ্ম সৃষ্টি করেন এ বিশ্ব-জগৎ, আসলে যা অবাস্তব, যার সত্যিকার সত্তা নাই, যার প্রতীয়মান সত্তাই আছে। এর নাম ব্রহ্মের বিক্ষেপশক্তি। আবরণ-শক্তির সাহায্যে ব্রহ্ম নিজের চিন্ময় সত্তা আবৃত করে রাখেন, আর বিক্ষেপ-শক্তির সাহায্যে এ আবৃত স্বভাবে তিনি বিরাট বিশ্ব সৃষ্টি করেন। এ-আবরণ ও বিক্ষেপ নিয়েই মায়ার সৃষ্টি ও তার খেলা এই জগৎ।

রজ্জু-সর্পের দৃষ্টান্ত

হঠাৎ অন্ধকারের ভিতর দড়িকে দেখতে না পেয়ে আমরা তাকে সাপ মনে করে দৌড়াতে শুরু করি। কিন্তু দু'চার পা এগুতে না এগুতে যখন দেখতে পাই জিনিসটা আসলে সাপ নয়, দড়ি, তখনই সাপের অনুভূতি চলে যায়, আর শুধু দড়িই থাকে। আগের মুহূর্তের সাপটিকে যদি প্রেম-আলিঙ্গন করার উদ্দেশ্যে অত্যন্ত আবেগের সঙ্গে দেখা করার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধও আমরা জানাই, ছাপানো কার্ডে লাঞ্চ বা ডিনারের দাওয়াত দেই, তবুও তাকে পাবার যো নাই, সে যে কোথায় গেল তা জানা নাই। কারণ আসলে সে দড়ি, সাপ নয়, একেই বলে রজ্জু-সর্প।

রজ্জুর সর্প যেমন সত্য নয়, মিথ্যা, এ-বিরাট বিশ্ব জগৎও তেমনি সত্য নয়, মিথ্যা। অনেকে মিথ্যা বস্তু বলতে মনে করেন তা কখনো আমাদের অনুভূতির বিষয় হয় না। এটা মিথ্যা কথাটির যা সত্যিকার অর্থ, তার পুরোপুরি উল্টো। আমরা যা অনুভব করি না তা কখনো মিথ্যা হয় না, মিথ্যা পদার্থটি অনুভূতির বিষয় হওয়া চাই-ই চাই। কিন্তু অনুভূতির বিষয় হলেও আসলে তা নাই, পরম সত্যের সঙ্গে মিথ্যার এখানেই পার্থক্য, আর যা একেবারে অসত্য, অলীক, তার সঙ্গে মিথ্যার এখানেই পার্থক্য। যা একেবারে অসৎ, তার অনুভূতি কখনো হয় না; আর যা একেবারে সৎ, তার অনুভূতি শাশ্বত। এ বিশ্ব-সত্তার অনুভূতি রজ্জু-সর্পের অনুভূতির মতোই এ দুই থেকেই পৃথক। এজন্যেই একে বলা হয় মিথ্যা, অর্থাৎ যা সৎ বা অসৎ কোনটির পর্যায়ে পুরোপুরি পড়ে না অথচ এ-দু'য়েরই ধর্ম এতে কিছুটা আছে। সৎ ও অসতের, সত্য ও অনৃতের এই যে অস্বাভাবিক, অযৌক্তিক ও বিস্ময়কর সংমিশ্রণ, এরই নাম মিথ্যা। আমাদের অভিজ্ঞতার জগৎ এ'রকমই এক অদ্ভুত সৃষ্টি থেকে না থাকার, আর না থেকেও থাকার দরুনই এর নাম মিথ্যা।

দড়িকে যখন আমরা সাপ বলে মনে করি, তখন যদি আমাদের জানা থাকতো যে এ সাপ নয়, দড়ি, আমরা শুধু একে দড়ি বলেই দেখছি তাহলে এ-সাপ আমাদের মনে কোনও বিভ্রান্তির সৃষ্টি করতে পারতো না। মায়াতীত নির্বিশেষ ব্রহ্ম এ বিশ্বমায়া সৃষ্টি করেও জানেন যে, আসলে এর সত্তা নাই, রজ্জু-সর্পের মতোই এর সৃষ্টি অবাস্তব, তাই ব্রহ্ম সম্পূর্ণরূপেই নির্বিশেষ স্বভাব, জগতের অতীত ও জগতের সব দোষ-ত্রুটি বর্জিত।

জীব যদি এ সত্য জানতে পারে তবে সে ব্রহ্মের মতোই ঠিক বুঝতে পারে যে, এ-বিরাট বিশ্ব আছে বলেই মনে হচ্ছে, কিন্তু আসলে এর সত্তা নাই, আর

এ-সত্য জেনেই বিশ্বের অপূর্ণতা ও দুঃখ দৈন্যের ভিতর সে অনাসক্তির অনাবিল আনন্দ অনুভব করে।

মরীচিকায় জলভ্রমের উদাহরণ

জলহীন বালুময় মরুভূমিতে বেড়াতে বেড়াতে তৃষ্ণার্ত লোক দেখতে পায় জলাশয়, কিন্তু তৃষ্ণার চাপে যতই সে এগোয়, ততই সে জলাশয় আলেয়ার মতো দূরে চলে যায়। এতে তার তৃষ্ণার নিবৃত্তি হয় না, বিভ্রান্তিই হয়। কিন্তু সে যদি আগে থেকেই জানে যে, এ-জলাশয় সূর্যকিরণে উত্তপ্ত মরুভূমির বালুকা ও প্রস্তর ছাড়া আর কিছু নয়, তা'হলে মরুভূমিতে চলার সময় এ-কল্পিত জলাশয় দেখে সে বিভ্রান্ত হয় না। সে জানে এ জলাশয় নয়, মরীচিকা, মৃগতৃষ্ণিকা। তখন এ-কল্পিত জলাশয় তাকে মোহগ্রস্ত ত করতে পারেই না, বরং তা তাকে আনন্দই দেয়। এ বিশ্বের সম্বন্ধে একই নীতি প্রযোজ্য। আমরা যদি এর সত্যিকার স্বভাব জানি, তাহলে এর অগণিত অসম্পূর্ণতা ও ত্রুটি-বিচ্যুতি আমাদের দুঃখ ত দেয়ই না বরং অনাবিল আনন্দই দিয়ে থাকে। এ অনুভূতিতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে জ্ঞানী পুরুষ মৃত্যুতেও বিচলিত হন না, গুরুতর দুঃখে বিচলিত হওয়া ত দূরের কথা।

প্রশান্ত, গম্ভীর দৃষ্টি নিয়ে বিষপানে সক্রেটিসের মৃত্যুবরণের যে অমর কাহিনী প্লেটোর 'সংলাপে' বর্ণিত, তার মূলে হয়তো এ-অধ্যাত্মতত্ত্বজ্ঞান, বিশ্বের এই মিথ্যাত্ব-প্রতীতি। আগেই বলেছি, প্লেটোবাদের এক বড় কথা বিশ্ব-মিথ্যাত্ব।

সবিশেষ ব্রহ্মবাদে জগতের সত্তা

সবিশেষ-ব্রহ্মবাদীরা এই বিশ্ব-মিথ্যাত্ববাদ স্বীকার করেন না। তাঁরা বলেন, হয় জগৎ সত্য হবে, না হয় অমৃত হবে, হয় সৎ হবে, না হয় অসৎ হবে। এ-দু'য়ের মাঝামাঝি এক অনির্বচনীয় সত্তা মোটেই স্বীকার করা যায় না। মধ্যযুগীয় ভারতে নির্বিশেষ-ব্রহ্মবাদের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ও সবিশেষ-ব্রহ্মবাদের এক বড় সমর্থক রামানুজ কটাক্ষ করে বলেছেন: অনির্বচনীয়বাদের মতো অনির্বচনীয় আর কিছু হতে পারে না।

বিশ্বমিথ্যাত্ববাদের এ-জাতীয় সমালোচনা আক্ষরিক অর্থেই সার্থক, এর ভাবগত মূল্য খুব নাই বলেই মনে হয়। আজকের দিনের বিজ্ঞানে আপেক্ষিক সত্যের প্রচুর সমর্থন। পুরানো দিনের ধর্মীয় চিন্তায়, নীতিশাস্ত্রে ও অধ্যাত্মবাদে, তা সবিশেষ-ব্রহ্মবাদই হোক আর নির্বিশেষ-ব্রহ্মবাদই হোক, নিরপেক্ষ-সত্তার অকুণ্ঠ

সমর্থন। এই নিরপেক্ষ-সত্তার আলোকে বিশ্বজগতের সাপেক্ষ-সত্তার মূল্যায়নের অপরিহার্য ফলই মিথ্যাত্ববাদের স্বীকৃতি।

স্থূল দৃষ্টিতে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, নির্বিশেষ ও সবিশেষ-ব্রহ্মবাদের দ্বন্দ্ব, তর্ক নিয়ে, থিওরী নিয়ে, কিন্তু এ-ধারণা খুবই ভুল। তাদের আসল দ্বন্দ্ব তাদের জীবন-দর্শন নিয়ে, মানুষের ধর্মীয় প্রেরণা ও নীতিবোধের চরম মূল্য নিয়ে।

সবিশেষ ব্রহ্মবাদের লক্ষ্য

নির্বিশেষ-ব্রহ্মবাদের শেষ কথা তত্ত্বজ্ঞান, আর এ-তত্ত্বজ্ঞানের ফল ব্রহ্মের সঙ্গে একতা, তাই নির্বিশেষ ব্রহ্মবাদের লক্ষ্য জীবের সসীম সত্তার লোপ। সবিশেষ ব্রহ্মবাদীরা বলেন: এ-লক্ষ্য মানুষের কখনো লোভনীয় হতে পারে না। রামানুজ বলেছেন: জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য আত্মনাশেরই নামান্তর।

যে সব অধ্যাত্মবাদীরা জন্ম-জন্মান্তরে বিশ্বাস করেন, তাঁরা বলুন: জন্ম-জন্মান্তরচক্রের ভিতর নিষ্পেষিত হয়ে জীব যখন ব্রহ্মকে জানে, তখনই যদি সে ব্রহ্মের সঙ্গে এক হয়ে তার স্বতন্ত্র সত্তা হারিয়ে ফেলে তা'হলে তার আনন্দের অনুভূতি হলো কোথায়। এটা তো অনেকটা মাথা-ব্যথা সারানোর জন্যে মাথা কাটারই সামিল। মধ্যযুগীয় বৈষ্ণব-দর্শনের ব্যাখ্যাতা কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর দার্শনিক কাব্য চৈতন্য-চরিতামৃতে নির্বিশেষ ব্রহ্মবাদের এ-আদর্শের কঠোর সমালোচনা করে বলেছেন: 'জ্ঞানী চুষে নিম্ব ফল', অর্থাৎ যারা শুধু অবিদ্যার আচরণ ভেদ করে ব্রহ্মের সঙ্গে একতা লাভে প্রয়াসী তারা ভক্তি ও প্রেম দ্বারা অনন্ত কাল ধরে ব্রহ্মের রসাস্বাদ থেকে বঞ্চিত।

যাঁরা জন্মান্তর স্বীকার করেন না, যাঁরা মনে করেন মানুষের আত্মার ভিতর দিয়েই ব্রহ্মের আত্মাভিব্যক্তি: তাঁরা মনে করেন জীব যদি ব্রহ্মের সঙ্গে এক হয়ে নিজের সত্তা হারিয়ে ফেলে তাহলে বিশ্ব-সৃষ্টির উদ্দেশ্যই ব্যর্থ ও ব্যাহত হয়ে গেল। বিশ্বের ভিতর ব্রহ্মের অভিব্যক্তির কোন অর্থই রইলো না।

জ্ঞান ও প্রেমের পার্থক্য

সহজ কথায় নির্বিশেষ-ব্রহ্মবাদীদের লক্ষ্য জ্ঞান, আর সবিশেষ-ব্রহ্মবাদীদের লক্ষ্য প্রেম। নির্বিশেষ-ব্রহ্মবাদীরা জ্ঞানমার্গের এবং সবিশেষ ব্রহ্মবাদীরা ভক্তি-মার্গের পথিক। জীব ও ব্রহ্মের ভিতর যদি কোন তফাতই না থাকে, তাহলে জীবের পক্ষে ভক্তি ও অনুরাগের সাহায্যে ব্রহ্মের রসাস্বাদ অসম্ভব। ব্রহ্মকে জানলে জীবের অজ্ঞান চলে যায়, সে তার দেহাতীত সত্তা উপলব্ধি করে, কিন্তু তখন জীব ব্রহ্মের সাথে এক হয় না, ব্রহ্মসত্তার ভেতরই নিজের সত্তা নিয়ে

বাস করে। এরই নাম বৈকুণ্ঠ বাস। এটাই বৈকুণ্ঠ কথার আক্ষরিক অর্থ, যেখানে কোন কুণ্ঠা বা দুঃখ নাই, সে-স্থানের নামই বৈকুণ্ঠ। ভক্তের লক্ষ্য বৈকুণ্ঠ বাস, অর্থাৎ ব্রহ্মের অনন্ত আনন্দময় সত্তার অনুভূতি ও উপলব্ধি।

সুফী আল্‌-মনসুর নির্বিশেষ-ব্রহ্মবাদীদের ভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে বলেছিলেন: "আনাল হক," "আমিই সত্য।" এরই নাম ফানাফিল্লা, অর্থাৎ আল্লার অনন্ত সত্তায় নিজের সসীম সত্তা হারিয়ে ফেলা। এরই প্রত্যুত্তরে ভক্তিবাদী বৈষ্ণবদের মতোই অন্য সুফীরা বলেছেন: 'ফানা বাকা', অর্থাৎ নিজের ক্ষুদ্র সত্তা হারিয়ে আল্লার বিরাট সত্তায় নিজেকে খুঁজে পাওয়া।

সবিশেষ ব্রহ্মবাদীরা বলেন: ব্রহ্ম শুধু সচ্চিদানন্দ স্বভাব নন, সচ্চিদানন্দময়। নির্বিশেষে সত্তা ব'লে কোন সত্তা তাঁরা স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে সব সত্তাই সবিশেষ বা বিশেষণযুক্ত। ব্রহ্মের সত্তা সর্বব্যাপী। সীমাবদ্ধ সত্তার সঙ্গে এখানেই তার তফাৎ। ব্রহ্ম শুধু চিৎ বা জ্ঞান স্বরূপ হতে পারেন না, কারণ ব্রহ্ম নিজের সত্তা নিজে অনুভব করেন। কাজেই ব্রহ্ম চিৎ-স্বভাব নন, চিন্ময়। আর ব্রহ্মে দুঃখ নাই বা ব্রহ্মকে আনন্দ স্বরূপও বলা যায় না, আনন্দ অনুভবের কর্তা কেউ না থাকলে আনন্দের অনুভবই হয় না। তাই ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ নন, আনন্দময়। উপনিষদে বিশ্বের নানা স্তরের আনন্দের সঙ্গে তুলনা করে ব্রহ্মের আনন্দকে পরমানন্দ বলা হয়েছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে: ব্রহ্মের সেই পরমানন্দের তুচ্ছ এক কণিকা নিয়েই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে এত ছুটাছুটি, এত মারামারি, এত হানাহানি। এক কথায়, সবিশেষ ব্রহ্মবাদীদের মতে ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দময়, সর্বব্যাপী পরম সত্তা।

রামানুজ ব্রহ্মের সঙ্গে জীব ও জগতের সম্বন্ধ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন যে, এ-বিরাট বিশ্ব যেন ব্রহ্মের শরীর, আর ব্রহ্ম যেন অনন্ত শরীরী। তবে জীবের সঙ্গে ব্রহ্মের এইটুকু তফাৎ যে, জীবের শুধু জড় শরীরই আছে, কিন্তু ব্রহ্মের শরীর দু'রকমের, তার একটি শরীর চেতন জীবদের নিয়ে, আর একটি শরীর জড় জগতের সব বস্তু নিয়ে। রামানুজ উপমার সাহায্যে বলেছেন: ব্রহ্ম যেন একটি বৃক্ষ, আর অগণিত জড়বস্তু ও চেতন জীব যেন সে ব্রহ্মবৃক্ষের শাখা, পত্র, ফুল ও ফল।

ব্রহ্মরস-আস্বাদের তাৎপর্য

প্রাচীন ও মধ্যভারতের সবিশেষ ব্রহ্মবাদে ভক্তি বা প্রেমের সাহায্যে জীবের ব্রহ্মরস আস্বাদের কথাই সাধারণত পাওয়া যায়। হেগেলের ও তাঁর শিষ্যদের

প্রচারিত আধুনিক ব্রহ্মবাদে জীবের এই ব্রহ্মমুখী পুনরাবর্তনের কথা বিশেষ পাওয়া যায় না। আধুনিক বিবর্তনবাদের সঙ্গে ব্রহ্মবাদের একটা নিকট-যোগ সাধন করতে গিয়ে এঁরা দেখাবার চেষ্টা করেছেন অগণিত মানুষের আত্মরাত্মা ও বাইরের জগতের অসংখ্য বস্তুর—এক কথায়, সারা বিশ্বের ইতিহাসের ভিতর দিয়ে ব্রহ্মের আত্মাভিব্যক্তি। প্রাচীন ব্রহ্মবাদের সঙ্গে আধুনিক ব্রহ্মবাদের সমন্বয় সাধন করে রবীন্দ্রনাথ তাই গভীর আবেগের প্রেরণায় বলেছেন :

সীমার মাঝে অসীম তুমি
বাজাও আপন সুর,
আমার ভিতর তোমার প্রকাশ
আমার ভিতর তোমার প্রকাশ
তাই এত মধুর।

জীব ও ব্রহ্মের সম্বন্ধ নির্ণয় করতে গিয়ে সবিশেষ ব্রহ্মবাদীরাও অনেক সময় জীব ব্রহ্মের তফাৎ ঠিক রাখতে পারেননি। তাঁরা কেউ কেউ শেষ পর্যন্ত এ-কথা বলতে বাধ্য হয়েছেন যে, সাগরের ঢেউয়ের শেষ পরিণতি যেমন সাগরে মিশে যাওয়ায়, ক্ষুদ্র স্রোতস্বতীর শেষ পরিণতি যেমন সমুদ্রের বারিধারায় আত্মবিলয়ে, ঠিক সে-রকম জীবের শেষ পরিণতিও ব্রহ্মবিলয়ে। তাঁদের কারো কারো মতে, ভেদ মানেই অপূর্ণতা, কাজেই পূর্ণতাই যদি জীবের শেষ লক্ষ্য হয়, তাহলে শেষ পর্যন্ত জীব ও ব্রহ্মে ভেদ থাকতে পারে না। বিশ শতকের আদি-প্রান্তে হেগেলের দু'জন প্রধান শিষ্য ইংরেজ দার্শনিক ব্র্যাডলি ও বোশাংকে এ মত প্রকাশ করেছেন।

জীব ও ব্রহ্মের সম্বন্ধ

তথাপি এ-কথা অনস্বীকার্য যে, সবিশেষ ব্রহ্মবাদে জীব ও ব্রহ্মের সম্বন্ধ ভেদও নয়, অভেদও নয়, ভেদাভেদ। অজ্ঞানী জীব নিজেকে দেহ বলে মনে করে ও ব্রহ্মকে জানে না, সে ব্রহ্ম থেকে একেবারে ভিন্ন। জ্ঞানী জীব যিনি দেহবোধ থেকে মুক্ত ও যাঁর ব্রহ্মানুভূতি হয়েছে, তিনি জানেন ব্রহ্মের সত্তাই তাঁর সত্তা। এ-দৃষ্টিকোণ থেকে ব্রহ্মের সঙ্গে জীবের সম্বন্ধ অভেদ বা অভিন্নত্ব। কিন্তু তথাপি জ্ঞানী জানেন ব্রহ্মের সত্তা অসীম, আর তাঁর নিজের সত্তা সসীম। কাজেই জ্যোতিঃশীল পদার্থ হওয়া সত্ত্বেও সূর্য ও জোনাকী পোকায় যে তফাৎ, জীব ও ব্রহ্মেও সেই তফাৎ। অতএব নির্বিশেষ ব্রহ্মবাদীদের মতে জীব ও ব্রহ্মের সম্বন্ধ শুধু ভেদও নয়, অভেদও নয়, ভেদ ও অভেদ এ দুই-ই।

ভেদ ও অভেদ, এ দুই পরস্পর-বিরোধী ধর্ম কি করে একাধারে সম্ভব হতে পারে, এ-রহস্যের তার্কিক সমাধান বের করতে অপারগ হয়ে মধ্যযুগের বাংলার

বৈষ্ণব দার্শনিক জীব গোস্বামী ও তাঁর পরবর্তী বৈষ্ণবাচার্য বলদেব বিদ্যাভূষণ বলেছেন : জীব ও ব্রহ্মের সম্বন্ধ শুধু ভেদাভেদ নয়, অচিন্ত্য ভেদাভেদ, অর্থাৎ এই ভেদাভেদের কোনও যৌক্তিক ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায় না।

প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারতের সবিশেষ ও নির্বিশেষ ব্রহ্মবাদীদের উভয়েই বলেছেন : ব্রহ্মের সৃষ্টির পেছনে কোন প্রয়োজন-বোধ নাই, এটা তাঁর লীলা। সৃজনী বিবর্তনবাদ আলোচনার প্রসঙ্গে আমরা লীলার কথা উল্লেখ করেছি।

সৃষ্টির উদ্দেশ্য বর্ণনায় বাদরায়ণ তাঁর ব্রহ্মসূত্রে বলেছেন : "লোকবত্তু লীলা-কৈবল্যম্।" এর অর্থ হলো এই যে, সংসারে যেমন দেখা যায় বাদশাহ তাঁর কোন প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও ছদ্মবেশে প্রজাদের অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য কখনো কখনো বেরিয়ে পড়েন, আর ছোট ছোট ছেলেমেয়ে যেমন বিনা প্রয়োজনেই খেলাধূলায় ব্যাপৃত থাকে, তেমনি দীন-দুনিয়ার মালিক ঈশ্বরও বিনা প্রয়োজনে বিশ্বসৃষ্টিতে নিরত। খ্রীস্টীয় যুগের শুরুতে প্লোটাইনাসে এ-ভাবেরই প্রতিধ্বনি। তাঁর মতে, জলের প্রাচুর্য থেকে যেমন স্বাভাবিকভাবেই ফোয়ারার উৎপত্তি, তেমনি ব্রহ্মের পূর্ণতার আতিশয্য থেকেই সৃষ্টির উদ্গিরণ।

নির্বিশেষ ব্রহ্মবাদ তাহলে নিছক একত্ববাদ। এজন্যেই এর নাম অদ্বৈতবাদ। দ্বৈত কথার অর্থ দুই বা দুইয়ের অধিক বহু, আর অদ্বৈত কথার অর্থ যেখানে দুই নাই তার বেশী ত নাই-ই। নির্বিশেষ ব্রহ্মবাদের মত হলো : আসলে সত্য একই, বহুতে তার মিথ্যা অভিব্যক্তি।

সবিশেষ ব্রহ্মবাদে এক ও বহু দুইয়ের সত্তাই সমভাবে স্বীকৃত। তাই সবিশেষ ব্রহ্মবাদে একত্ববাদ ও বহুত্ববাদের একটা সামঞ্জস্য দেখতে পাওয়া যায়। এজন্যই ভারতীয় দর্শনে এ মতের নানা রকম নামকরণ, তাদের ভিতর বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ও দ্বৈতাদ্বৈতবাদ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এ কথা বলাই বাহুল্য যে, সবিশেষ ও নির্বিশেষ ব্রহ্মবাদ উভয়েই নিছক বহুত্ব-বাদের বিরোধী। বিশ্বের একত্বে তারা দৃঢ় বিশ্বাসী, বহুর সঙ্গে একের সম্বন্ধ নিয়েই তাদের মত-বিরোধ।

অধ্যাত্মবাদের বিবর্তন

জড়বাদ ও অধ্যাত্মবাদের আলোচনার পর তত্ত্ব-নির্ণয়ে নিরপেক্ষ সত্তাবাদের আলোচনার পালা। ক্যান্টের পরবর্তী ও হেগেলের সমসাময়িক জার্মান দার্শনিক শেলিং জড় ও চেতনের তফাৎ স্বীকার করেননি। তাঁর মতে জড় ও চেতন এক নিরপেক্ষ সত্তার এপিঠ আর ওপিঠ। এজন্যেই শেলিং-এর মতের নাম অভেদ-বাদ। এ-নিরপেক্ষ সত্তাকে অধ্যাত্ম অনুভূতির মারফত আমরা জানতে পারি, একথাও

শেলিং স্বীকার করেছেন। হেগেলের দর্শনে জড় ও চেতনের তফাৎ স্বীকৃত, আর তারা দুই-ই এক বিশ্বচেতনার অভিব্যক্তি। শেলিং জড় ও চেতনের তফাৎ স্বীকার করেননি. তাদের দু'য়ের মূলে যে সর্বব্যাপী একক সত্তা, তা তাঁর মতে জড়পদ-বাচ্যও নয়, চেতনপদ-বাচ্যও নয়. কারণ তাতে জড়ত্বও নাই চেতনত্বও নাই। এভাবে জড় ও চেতনের অতীত, এক সর্বব্যাপী নিরপেক্ষ সত্তাই শেলিং এর মতে বিশ্বের মূলে।

তত্ত্ব স্বরূপ নির্ণয়ে হেগেলের মতো তাঁর ভিতর চেতন পক্ষপাত নাই। জড় ও চেতনের তফাৎ সরাসরি অস্বীকার করায় হেগেল কটাক্ষ করে বলেছেন: ''শেলিং-এর দর্শনে বিশ্বের অসংখ্য বৈচিত্র্য অস্বীকৃত। গভীর অন্ধকার রাত্রে সাদা কালো সব গরুকে যেমন কালোই দেখায়, তেমনি শেলি-এর উগ্র একত্ববাদে বিশ্বের অসংখ্য বৈচিত্র্য এক অজড়, অচেতন ঐক্যে পর্যবসিত।" হেগেলের মতে, শেলিং বস্তুর স্বরূপ-ব্যাখ্যা করেননি· বস্তুর বস্তুত্ব এক নিঃশ্বাসে উড়িয়ে দিয়েছেন।

শেলিংএর নিরপেক্ষ সত্তাবাদ অধ্যাত্মবাদ দ্বারা প্রভাবিত। ইন্দ্রিয়াতীত প্রজ্ঞার মারফত নিরপেক্ষ অজড়, অচেতন একক সত্তার অনুভূতি শেলিং স্বীকার করেছেন, আর এই অনুভূতিই সমস্ত ধর্মের মূল কথা, তাদের আদি প্রেরণা ও উৎস। ধর্মের মূল কথা একত্ববাদ, শেলিং দ্ব্যর্থহীনভাবে এ একত্ববাদেও তাঁর অনুরাগ দেখিয়েছেন।

নিরপেক্ষ সত্তাবাদ

আজকের দিনে আমরা বিজ্ঞান-প্রভাবিত ধর্মনিরপেক্ষ অথবা ধর্মবিরোধী এক ধরনের নিরপেক্ষ সত্তাবাদ দেখতে পাই। এর প্রবক্তারা শেলিংএর মতো মোটেই একত্ববাদী নন, তাঁরা নিছক বহুত্ববাদী। তাঁদের মতে, বিশ্বের মূল উপাদান এক নয়, বহু, অসংখ্য, অগণিত; তবে এ উপাদানগুলো এক জাতীয়। এ বিশেষ অর্থে তাঁরা নিজেদের মতকে একত্ববাদ বলে বর্ণনা করেছেন। ইংলণ্ডে বার্ট্রেণ্ড রাসেল ও আমেরিকায় হোল্ট প্রভৃতি কয়েকজন দার্শনিক নিজেদের নিরপেক্ষ সত্তাবাদী বলে দাবী করেন।

এঁদের মূল প্রেরণা আজকের দিনের বিজ্ঞান থেকে। জড়ের স্বরূপ আলোচনায় আমরা দেখিয়েছি, আজকের দিনের বিজ্ঞান নিউটনের মতো নিষ্ক্রিয়তাকে জড়ের স্বভাব বলে মনে করে না। আজকের দিনের বিজ্ঞানে জড় ক্রিয়াশীল ও চঞ্চল। কাজেই নিউটনীয় বিজ্ঞানের নিয়ম অনুসারে জড়কে নিষ্ক্রিয় ও

চেতনকে সক্রিয় বলা চলে না। জড় ও চেতন উভয়েই আজ সক্রিয়, সুতরাং এদিক দিয়ে এদের ভিতর কোনও অচল-আয়তন গড়ে তোলা চলে না।

তথাপি জড়ের সঙ্গে চেতনের পার্থক্য একেবারে অস্বীকার করা যায় না। চেতনে পূর্বানুভূতির স্মৃতি দেখতে পাওয়া যায়, জড়ের ভিতর ঠিক এ-রকমের স্মৃতি খুঁজে পাওয়া যায় না। বাঁকা লাঠিকে সোজা করে দিলে অবশ্য আপনা থেকেই আবার বাঁকা হয়ে যায়, কিন্তু এ পূর্বাবস্থা প্রাপ্তি স্মৃতি নয়, কারণ এখানে পূর্বানুভূতির জ্ঞান নাই। একে যদি বা স্মৃতি বলা যায়, তথাপি অচেতনের স্মৃতি আর চেতনের স্মৃতিতে যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান, তা অস্বীকার করা যায় না। অতএব জড় ও চেতনের মূল উপাদান একজাতীয় হলেও জড় ও চেতনের তফাৎ একেবারে অস্বীকার করা যায় না।

আজকের দিনের পদার্থ-বিদ্যা ক্রিয়াশীলতার দৃষ্টিকোণ থেকে জড় ও চেতনের তফাৎ সরিয়ে দিয়েছে, আর আজকের দিনের মনোবিদ্যায়ও শাশ্বত আত্মা বা আত্ম-চেতনার স্থান নাই। ব্যবহারবাদী মনোবিজ্ঞানীরা ত চেতনাকে একেবারে উড়িয়ে দিতে চেয়েছেন। এ চেষ্টার উগ্রতা সত্ত্বেও জড় চেতনের যে কিছুটা তফাৎ আছে, অন্ততঃ স্মৃতির ক্ষেত্রে যে তা অস্বীকার করা যায় না, এ কথা আধুনিক নিরপেক্ষ-সত্তাবাদীরা দেখিয়েছেন। এখানেই তাঁদের বৈশিষ্ট্য।

আসল কথা হলো এই যে, জড়বাদ বা অধ্যাত্মবাদ উভয়েই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে অত্যন্ত দোষযুক্ত। চেতনকে যেমন জড়ের পর্যায়ে নামিয়ে নিয়ে আসা অসম্ভব, তেমনি জড়কেও চেতনের পর্যায়ে নামিয়ে আনা অসম্ভব। আজকের দিনের পদার্থ-বিদ্যায় ও মনোবিদ্যায় জড় ও চেতনের নৈকট্যের যে ইঙ্গিত ও আভাস, তা থেকে আমরা এ সিদ্ধান্তেই উপনীত হতে পারি যে, জড় ও চেতনের মূলে এক নিরপেক্ষ উপাদান—যাকে জড়ও বলা যায় না, চেতনও বলা যায় না, যা জড়-ধর্মীও নয়, চেতন-ধর্মীও নয়। বিশ্বের অগণিত জড়বস্তু ও অগণিত চেতন-সত্তা এ কথাই প্রমাণ করে দেয় যে, এ নিরপেক্ষ উপাদন এক নয়, বহু। এ উপাদান সমজাতীয়, সন্দেহ নাই; কিন্তু বিশ্বের অনন্ত বৈচিত্র্যের জন্যে এর সংখ্যা কখনো সীমিত হতে পারে না।

আমাদের অভিজ্ঞতায় জড় ও চেতনের যে তফাৎ, তার কারণ একই নিরপেক্ষ উপাদান যখন মস্তিষ্ক ও স্নায়ুর সংস্পর্শে আসে তখনই তাতে চেতনার উৎপত্তি হয়, আর যেখানে মস্তিষ্ক ও স্নায়ু নাই সেখানে এই নিরপেক্ষ উপাদান জড়বস্তুর রূপ নেয়।

জড়কে আমরা সাক্ষাৎভাবে জানতে পারি না, চেতনার মারফতই জানি। কাজেই জড় সত্তা যে কি রকম, তার সাক্ষাৎ-জ্ঞান আমাদের নাই। শুধু অনুভূতি-

বিশ্লেষণে আমরা জানি যে, আমাদের মস্তিষ্ক ও স্নায়ুতে বাহির থেকে এক উত্তেজনা এসে সংবেদন উৎপাদন করে।

নিরপেক্ষ-সত্তাবাদ ও জড়বাদী জীবন-দর্শন

নিরপেক্ষ সত্তাবাদের জীবন-দর্শনে জড়বাদের প্রভাব প্রচুর। মানুষের দৈহিক প্রয়োজনের ওপর জড়বাদের যে পক্ষপাত, নিরপেক্ষ-সত্তাবাদেও তা বেশ দেখা যায়। তবে মানুষের বৃহত্তর জীবনে সামঞ্জস্য ও সমঝোতা যাতে আসে, তার ওপর নিরপেক্ষ-সত্তাবাদীরা বিশেষ জোর দিয়েছেন। দেহাত্মবাদের সঙ্গে এর যে অসঙ্গতি আছে, তা মনে হয় না। দেহাত্মবাদের নীতিবোধ যে সব সময় ব্যক্তিগত ইন্দ্রিয় সুখ ও স্বার্থপরতায় পর্যবসিত, একথা যাঁরা মনে করেন, তাঁরা ভুল করেন। অতি পুরানো দিনের দেহাত্মবাদের সমালোচকরা একথা ভালভাবেই জানতেন। তাই তাঁরা উগ্র স্বার্থবাদী, ব্যক্তিকেন্দ্রিক জড়বাদকে নাম দিয়েছেন দুষ্ট চার্বাক মত, আর সমাজ-সচেতন বৃহত্তর মানবতার স্বার্থ সম্বন্ধে সজাগ দেহাত্ম-বাদী মতকে নাম দিয়েছেন শিষ্ট চার্বাক মত। আজকের দিনে বহুত্ববাদী নিরপেক্ষ সত্তাবাদের দৃষ্টিভঙ্গী অনেকটা শিষ্ট চার্বাকেরই মতো। তাঁরা মানব কল্যাণ চান, তবে দেহাতীত ব্যাপক বিশ্বচেতনায় বিশ্বাসজনিত কোন ধর্মবোধ ও নীতি-বোধ তাঁরা স্বীকার করেন না। এখানেই তাঁদের জড়বাদ পক্ষপাত ও অধ্যাত্মবাদী জীবন-দর্শনের বিরোধিতা।

আধুনিক নিরপেক্ষ-সত্তাবাদের তাত্ত্বিক মূল্য কতখানি জানি না। জড়বাদী জীবন-দর্শন মোটামুটি স্বীকার করে, ধর্মপ্রভাবিত প্রচলিত দার্শনিক অধ্যাত্মবাদের বিরোধিতা করাই সম্ভবতঃ এ মতবাদীদের উদ্দেশ্য। অধ্যাত্মবাদ যে সাক্ষাৎভাবেই হোক আর পরোক্ষভাবেই হোক ধর্ম-প্রভাবিত, তা অস্বীকার করার উপায় নাই। আর আজকের দিনের নিরপেক্ষ সত্তাবাদ তার তত্ত্বদৃষ্টি ও জীবন-দর্শন· এ দু'য়ের ক্ষেত্রেই পুরোপুরি বিজ্ঞান-প্রভাবিত।

তত্ত্ব-নিরূপণের প্রয়োজনবোধ

তত্ত্ব-নিরূপণের চেষ্টা মানুষের জীবনযাত্রার সঙ্গে ইতিহাসের আদি যুগ থেকে গভীরভাবে জড়িত। মানুষ তার দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনে যেমন তার অভিজ্ঞতার জগতের সত্তায় বিশ্বাস করে, ঠিক তেমনি জীবনের গভীর প্রয়োজন মেটানোর জন্যে তার ভিতর তত্ত্ব-জিজ্ঞাসারও উদ্রেক। রাজ্যসুখ ভোগের ভিতর বুদ্ধের জীবনে বৈরাগ্যের অনুভূতি, এ সত্যের এক বড় ঐতিহাসিক উদাহরণ।

শুধু তর্কের দ্বারা তত্ত্ব-নির্ণয় হয়তো অসম্ভব। আচার্য শঙ্কর ঠিকই বলেছেন যে, শুধু তর্কের সাহায্যে তত্ত্বনির্ণয় সম্ভব নয় ; কারণ, এক তার্কিক যা প্রমাণ করবেন, তার চেয়ে বুদ্ধিমান তার্কিক তা অপ্রমাণ করে দেবেন। এভাবে তার্কিকে তার্কিকে বাক্-যুদ্ধ ইতিহাসের আদিযুগ থেকে চলে আসছে, আর চলবেও। তবে প্রয়োজনের দৃষ্টিকোণ থেকে যদি আমরা তত্ত্ব-নির্ণয়ের মূল্যায়ন করতে অভ্যস্ত হই, তাহলে আমরা এ-সমস্যার একটি সার্থক সমাধান খুঁজে পেতে পারি। বাচস্পতি মিশ্র ঠিকই বলেছেন : তত্ত্বজিজ্ঞাসার যদি জীবনের সঙ্গে কোনও যোগ না থাকে তা'হলে তা কাকের দাঁত পরীক্ষা করার মতোই একটা হাস্যকর, নিরর্থক ব্যাপার। বুদ্ধ ও শঙ্কর থেকে শুরু করে ক্যাণ্ট ও হেগেল পর্যন্ত, আর ক্যাণ্ট ও হেগেল থেকে উইলিয়াম জেমস্ ও কার্ল্ মার্কস্ পর্যন্ত মনীষীরা নানা দৃষ্টিকোণ থেকে দর্শনের সঙ্গে প্রয়োজনসিদ্ধির নিকট ও নিবিড় যোগ আবিষ্কার করবার চেষ্টা করেছেন।

এ-দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা দেখাবার চেষ্টা করেছি যে, জড়বাদী দৃষ্টির সার্থকতা জীবনে প্রচুর কিন্তু তথাপি তাকে জীবনের পক্ষে পর্যাপ্ত বলা চলে না ; মানুষের আত্মিক প্রয়োজন মেটাতে জড়বাদ অপারগ। তাই জড়বাদ ও অধ্যাত্মবাদের সমঝোতার মাধ্যমে সুষ্ঠু জীবন-দর্শন গঠনের অপরিহার্য প্রয়োজনের কথা আমরা আগেই বলেছি। এক কথায়, জীবনের অসংখ্য গ্লানি ও পরাভবের ভিতর সংশয়ের দুস্তর পারাবারে শান্ত, স্থির, ধীর প্রয়োজনবোধই হবে তত্ত্ব-নির্ণয়ে ধ্রুবতারার সঙ্কেত। তাকেই সামনে রেখে মানুষকে এগুতে হবে তার জটিল জীবন-সমস্যার সার্থক সমাধানে।

তত্ত্ব নির্ণয়ের আলোচনায় উপসংহারে সাম্প্রতিক দর্শনের দু'টি সুপরিচিত চিন্তা-ধারা সম্বন্ধে সংক্ষেপে দু'একটি কথা বলা প্রয়োজন। তাদের একটি, তত্ত্ব-নির্ণয়ের প্রচেষ্টা যে অত্যন্ত অসার ও অনাবশ্যক, তত্ত্ব-নির্ধারণের মাধ্যমে তা প্রমাণিত করতে চায়। এ-মতের নাম যৌক্তিক দৃষ্টবাদ। তাদের আর একটি তত্ত্ব-জিজ্ঞাসার সার্থকতা স্বীকার করে, কিন্তু সার্বভৌম ও সার্বজনীন কোন তত্ত্ব আছে তা স্বীকার করে না। এ-মতের নাম অস্তিত্ববাদ বা ব্যক্তিসত্তাবাদ।

যৌক্তিক দৃষ্টবাদ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ভিয়েনাতে স্লিক, নিওরেথ ও কার্ণপ এ তত্ত্ববিরোধী মত প্রচারের জন্য একটি দল গঠন করেন। সমসাময়িককালে অক্‌সফোর্ডে

অধ্যাপক এ. জে. এয়ার এ-মতের একজন বড় সমর্থক হয়ে ওঠেন। আমেরিকায়ও এ-মতের অনুগামী ও অনুরাগী কিছু আছেন।

এ মতের সমর্থকরা দেখাবার চেষ্টা করেছেন যে ঃ দর্শন-শাস্ত্রে যাকে তত্ত্ব বলা হয়, তার কোন অর্থ হয় না। তাই তর্কশাস্ত্র তাঁদের মতে কতগুলো অর্থহীন কথার তুবড়ী রচনা করে। ভাষা বিশ্লেষণ দ্বারা তারা এ-সিদ্ধান্ত প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন। তাঁরা বলেন ঃ আম মিষ্টি, এ-কথাটির অর্থ খুঁজে পাওয়া যায়। কারণ আম ও মিষ্টি এ-দুইটি কথারই অর্থ আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সত্য। কিন্তু দর্শন-শাস্ত্রে যাকে তত্ত্ব বলা হয়, তার কোন অর্থ খুঁজে পাওয়া যায় না ; যেমন আমরা যখন বলি ঈশ্বর সর্বশক্তিমান, তখন এ-কথার কোন অর্থই হয় না। কারণ শক্তির ধারণা আমাদের আছে, কিন্তু সর্বশক্তিমানের ধারণা আমাদের নাই। সর্বশক্তিমান কথাটি একটি কথার মারপ্যাঁচ ছাড়া আর কিছুই নয় ; এর বাস্তব সত্তা কিছুই নাই। এভাবে দর্শনে তত্ত্ব-বিষয়ক যে-সব বর্ণনা আছে, সেগুলো বিশ্লেষণ করে যৌক্তিক দৃষ্টবাদীরা বলেন, তত্ত্ব বিষয়ক বাক্যের কোন অর্থই হয় না।

যৌক্তিক দৃষ্টবাদের কথা ভাবলে ঈসফের উপাখ্যানের শেয়াল ও আঙ্গুরের কথা মনে পড়ে। তাতে আছে, শেয়াল আঙ্গুরের নাগাল না পেয়ে তাকে টক বলেছিল। আমার বিশ্বাস যৌক্তিক-দৃষ্টবাদের কিছুটা জ্ঞান যদি চতুর শেয়ালের থাকতো, তাহলে টক মিষ্টি কোন আঙ্গুরের সত্তাই সে স্বীকার করতো না। দর্শনের মূল তত্ত্বগুলো যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয় এবং বুদ্ধি যে তার পুরোপুরি নাগাল পায় না, এ-ধারণা সুবিদিত। ক্যাণ্ট তাঁর শুদ্ধবুদ্ধি সমীক্ষণে দেখিয়েছেন ঃ আমাদের তত্ত্ব-সম্বন্ধীয় ধারণাগুলোর বাস্তব সত্তা নাই, তাদের বাস্তব সত্তা আছে এ-কথা অস্বীকার করলে তাদের ওপর বিরুদ্ধ ধর্ম চাপাতে হয়, আর দু'টি বিরুদ্ধ-ধর্মের একত্র সমাবেশ মানুষের বুদ্ধির অগম্য। সোজা কথায় ক্যাণ্টের বক্তব্য হলো ঃ বুদ্ধির সাহায্যে তত্ত্ব সম্বন্ধে আমরা যে ধারণা করি তার অর্থ সহজ বুদ্ধিতে সাপও হয়, আর ব্যাঙও হয়। কিন্তু এ-তত্ত্ব-নির্ণয়ের চেষ্টাকে উপেক্ষা করা যায় না। ক্যাণ্ট নিজেই বলেছেন ঃ এ তত্ত্বানুসন্ধিৎসা মানুষের স্বভাবসিদ্ধ। বুদ্ধির অতীত প্রজ্ঞার সাহায্যে মানুষ এ তত্ত্বকে জানতে পারে, একথা আমরা আগেই বলেছি। সুতরাং যৌক্তিক দৃষ্টবাদীরা যে কথা বলতে চেয়েছেন তার ভিতর নিছক নতুন কথা কিছু নাই শুধু সকলের জানা কথাটিকে খুব উগ্র করে বলাতেই তাঁদের স্বকীয়তা ও ভ্রান্তি।

সাম্প্রতিক অস্তিত্ববাদ

অস্তিত্ববাদীরা তত্ত্ব নির্ণয়ের সঙ্গে প্রয়োজনবোধের নিকট-যোগ আবিষ্কার ক'রে একটি গভীর সত্যের প্রতি আজকের দিনের বিভ্রান্ত মানবতার দৃষ্টি আকর্ষণ

করেছেন। টেকনোলজির প্রভাবে আজকের দিনের বৈজ্ঞানিক সভ্যতায় সাধারণ মানুষের যন্ত্রে যে উত্তরোত্তর রূপান্তর, তার বিরোধিতা করে ও বৃহত্তর মানবতার ক্ষেত্রে ব্যক্তির নিজস্ব মূল্যবোধের ওপর অঙ্গুলি নির্দেশ ক'রে ব্যক্তি স্বাধীনতাকেও তাঁরা রক্ষা করার চেষ্টা করেছেন। এ কথা তাঁরা ঠিকই বলেছেন যে, মানুষ যতক্ষণ অন্যের মতো চিন্তা করে, অন্যের মতো কাজ করে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার সত্যিকার সত্তা থাকে না, ততক্ষণ সে অন্যেরই নিষ্প্রাণ ছায়া। তার ভিতর যখন স্বকীয়তাবোধ জাগে, তখনই সে নিজের মতো ভাবতে ও চলতে শুরু করে, আর এ থেকেই তার সত্যিকার সত্তার উৎপত্তি। তখন থেকেই তার ধর্ম, নীতি, দর্শন, সমাজবোধ, এক কথায় তার সমস্ত সত্তা তার নিজেরই ভাবে রঙীন হয়, তখন সে আর গড্ডালিকা-প্রবাহের মতো অন্যের অবিকল কপি হয় না।

অস্তিত্ববাদে ব্যক্তিত্ববোধ বিভিন্ন ভাবধারায় প্রবাহিত, তাই অস্তিত্ববাদীরা কেউ কেউ নিরীশ্বরবাদী ও কেউ কেউ ঈশ্বরবাদী। রাষ্ট্রনীতিতেও তাঁদের স্বাতন্ত্র্য পরিস্ফুট। তাঁদের মিল ব্যক্তির মাহাত্ম্য ঘোষণায়, আর সব ব্যাপারে তাঁদের স্বাতন্ত্র্য ও স্বকীয়তা সুস্পষ্ট।

উনিশ শতকের শেষার্ধে ডেনমার্কের ধর্ম-প্রচারক কির্কেগার্দ হেগেলীয় দর্শনের সার্বভৌম বুদ্ধিবাদের বিরোধিতা ক'রে আধুনিক যুগের অস্তিত্ববাদের সূচনা করেন। তিনি ছিলেন ধর্মবিশ্বাসী। আজকের দিনের প্রসিদ্ধ অস্তিত্ববাদী দার্শনিক সার্ত নিরীশ্বরবাদী। তিনি ফ্রান্সের একজন বড় গল্পলেখক। আখ্যায়িকার মাধ্যমে অস্তিত্ববাদের মূলকথা তিনি খুব জনপ্রিয় ক'রে তুলেছেন। এ কথা সকলেরই জানা, তিনি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত হয়েও তা গ্রহণ করেননি।

অস্তিত্ববাদে যে জীবনবোধ, তাকে আমরা জানাই অকুণ্ঠ সমর্থন। তবে অস্তিত্ববাদে নৈর্ব্যক্তিক, সার্বভৌম দৃষ্টির বিরুদ্ধে যে জেহাদ, মনে হয় তা গ্রহণ-যোগ্য ত নয়ই, বরং আজকের সঙ্কটময় মুহূর্তে মানুষের স্থায়ী কল্যাণেরও প্রতিবন্ধক। শুধু ব্যক্তিকে বড় ক'রে তুলে, তার জীবনকে তার বৃহত্তর সমাজ থেকে বিচ্যুত ক'রে বাহ্যসংযোগ-বর্জিত একটি চিন্তার দ্বীপে আবদ্ধ ক'রে রাখলে মানুষের নিজের জীবনে স্বস্তি হয় না, আর মানুষে-মানুষে সমঝোতাও বাড়ে না। মানুষে-মানুষে, মানব-গোষ্ঠীতে মানব-গোষ্ঠীতে, দেশে-দেশে, জাতিতে জাতিতে, বৃহত্তর মানবতার সর্বক্ষেত্রে সমঝোতার প্রয়োজন যে আজ সর্বাধিক, তা চিন্তাশীল

ব্যক্তিমাত্রেই অসঙ্কোচে স্বীকার করবেন। তাই আজ প্রয়োজন এই সমঝোতা ও সহমর্মিতার ভিত্তিতে অস্তিত্ববাদের নব-রূপায়ণ।

অস্তিত্ববাদের সার্থক পরিণতি

মনে হয়, জড়বাদ ও অধ্যাত্মবাদের যে সমঝোতার কথা আগে আমরা বলেছি, তার ভিতর দিয়েই এ সমঝোতা ফিরে আসবে। আর অধ্যাত্মবাদ ও দেহাত্মবাদের সমন্বয়ের মাধ্যমে বিজ্ঞান ও টেকনোলজির দে'য়া প্রাচুর্যের ভিতর ব্যক্তি তার নিজস্ব সত্তা খুঁজে পেয়ে মানবতাকে তার প্রগতির পথে আর এক ধাপ এগিয়ে দেবে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

স্রষ্টার সন্ধানে

সারা বিশ্বের দার্শনিক চিন্তায় অধ্যাত্মবাদ এক মুখ্য স্থান অধিকার করে রয়েছে, আর অধ্যাত্মবাদের সঙ্গে ঈশ্বরের ধারণার যোগ অতি নিকট ও নিবিড়। তাই ঈশ্বরের ধারণা ও তার বিবর্তনের ইতিহাস, ঈশ্বরের প্রমাণ ও জীবজগতের সঙ্গে তার সম্বন্ধ আলোচনা করা প্রয়োজন।

আজকের দিনের সভ্য ও শিক্ষিত মানুষ তাঁদের চিন্তাধারায় ও জীবনযাত্রায় ঈশ্বরকে শুধু যে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দিতে নারাজ তা-ই নয়, তাঁরা অনেক সময় ঈশ্বরের সত্তাই স্বীকার করেন না, অথচ জগতের প্রাচীন চিন্তাধারা ও জীবনযাত্রা-পদ্ধতিতে প্রায় সর্বত্রই ঈশ্বরের স্বীকৃতি। বিশ্বের প্রাচীন চিন্তা বিশেষভাবে ধর্ম-প্রভাবিত, আর আসলে ধর্ম একটা ব্যক্তিগত অনুভূতি ও জীবনযাত্রা-পদ্ধতি হলেও মানুষের ইতিহাসে ধর্মের সামাজিক ও গোষ্ঠীগত রূপ অতি প্রকট। তাই ধর্মের প্রভাব বলতে আমরা ঐতিহাসিক ধর্মের প্রভাবই বুঝি, আর এই ঐতিহাসিক ধর্মগুলোর ভিতর একমাত্র বৌদ্ধধর্ম ছাড়া আর সকল ধর্মেই ঈশ্বর যে শুধু স্বীকৃত তাই নয়, জীবনের চরম মূল্যবোধেরও উৎস ও আকর; শুধু ইহলোকে নয়, পরলোকেও মানুষের পরম আশ্রয় বলে বিবেচিত।

বৌদ্ধ ধর্মে ঈশ্বর অস্বীকৃত সন্দেহ নাই; যদিও বুদ্ধের নিজের উক্তি থেকে তিনি ঈশ্বর মানতেন কি মানতেন না তার কোনও সঠিক সংকেত পাওয়া যায় না। তবে তিনি দুঃখ-নিবৃত্তির জন্য যে মধ্যপথের নির্দেশ দিয়েছেন, তাতে ঈশ্বরের কোন স্থান নাই। আর বুদ্ধের শিষ্যেরা, বিশেষতঃ পরবর্তী বৌদ্ধ-দার্শনিকরা ঈশ্বরের সত্তা অপ্রমাণ করবার জন্য ব্রাহ্মণদের সঙ্গে যে কোমর বেঁধে বাগ্‌যুদ্ধে লেগেছিলেন এ কথাও খুবই সত্য। বৌদ্ধ ধর্ম ও দর্শনে ঈশ্বরের স্থান না থাকলেও ঈশ্বরকে পেলে ও জানলে যে দুঃখবিমুক্তি হয়, তার অকুণ্ঠ স্বীকৃতি তাতে আছে। এরই নাম নির্বাণ বা বাসনার নিবৃত্তি।

এ-আলোচনা থেকে একথা সুস্পষ্ট যে, বিশ্বের ধর্ম-প্রভাবিত প্রাচীন চিন্তাধারায় ও জীবন-দর্শনে ঈশ্বরের স্থান এক রকম সর্বগ্রাসী। 'বিসমিল্লাহ্' বলে আল্লাহ্‌তা'লাকে স্মরণ ক'রে সব কাজ শুরু করার তাই বিধান। প্রাচীন সংস্কৃত

সাহিত্যে এরই নাম মঙ্গলাচরণ। মানুষের ভাবজগতে ও কর্মজীবনের বিভিন্ন স্তরে ঈশ্বরের এই ব্যাপকতা স্মরণ করেই প্রাচীন পুরাণকার বলেছেন :

বেদে রামায়ণে চৈব
পুরাণে ভারতে তথা
আদাবন্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্বত্র গীয়তে ॥

["বেদে, রামায়ণে, পুরাণে, মহাভারতে এক কথায় সর্বশাস্ত্রে, আদিতে, অন্তে ও মধ্যভাগে সর্বত্র এই হরির গুণগান।"]

ঈশ্বরের ধারণার উৎপত্তি

স্রষ্টার ধারণা মানুষের মনে কি ভাবে, কোথা থেকে এলো, এ নিয়ে আধুনিক সংশয়বাদী দার্শনিকদের ভিতর কত বাগ্-বিতণ্ডা, কত আলোচনা, কত বাগাড়ম্বর। তাঁরা কেউ কেউ বলেন : মানুষের পূর্ব পুরুষেরা মরে গেলে ভূত প্রেত হয়ে তাদের আত্মীয়স্বজনকে উৎপীড়ন করতে আসে, ইতিহাসের এক আদিম যুগ থেকে এ বিশ্বাস ছিল। এজন্যেই মৃতের শ্রাদ্ধশান্তির ব্যবস্থা। কালক্রমে এই সবগুলো ভূতকে একত্র ক'রে তারা এক সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের ধারণা করেছে, এটাই কোনও কোনও উর্বরমস্তিষ্ক পণ্ডিতের মত। এ যেন মূষিকের পর্বত প্রসব। কোথায় অসংখ্য অগণিত ভূত-প্রেত, আর কোথায় অশেষ কল্যাণগুণনিদান সর্বশক্তিমান ঈশ্বর!

এ মতের গূঢ়ার্থ হলো : ভয় থেকেই ঈশ্বর-বিশ্বাসের উৎপত্তি। মানুষ যখন ইহজীবনে অপারগ হয়, যখন পরিণত বয়সে তার চুল পাকে, দাঁত পড়ে যায়, সোজা কোথায়, যখন সে সর্বপ্রকারে অক্ষম হয়, তখন সে "ঈশ্বর" "ঈশ্বর" করে। মৃত্যুর পর পরকাল বলে যদি কিছু থাকে, সেখানে ঈশ্বরই তাকে বাঁচাবেন, আর পাপের শাস্তি বলে যদি কিছু থাকে তবে ঈশ্বরই তার প্রশংসায় গলে গিয়ে তাকে পাপ থেকে উদ্ধার করে স্বর্গে তার অনন্ত সুখভোগের ব্যবস্থা ক'রে দেবেন, চলতি ধর্মের চেহারা যে অনেকটা এ-রকমই তা অস্বীকার করা চলে না। ভয় ও দুর্বলতা থেকেই এ ধারণার উৎপত্তি। কিন্তু যে-ধর্মবুদ্ধি মানুষকে তার মৃত্যুকালে সক্রেটিসের মতো অবিচল রাখে তার সম্বন্ধে হয়তো এ কথা বলা চলে না, আর তা-ই সম্ভবতঃ আসল ধর্ম।

আবার কেউ কেউ বলেন : ঈশ্বর-বিশ্বাস একটি বড় কুসংস্কার। এ-কুসংস্কার খুব ভালো ক'রে প্রচার করা হয় ইহলোকের সুখভোগে বঞ্চিত সর্বহারাদের শোষণের জন্যে। আধুনিক দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ী জড়বাদের আলোচনায় আমরা এ-মতের উল্লেখ করেছি। মেকিয়্যাভেলীর (১৪৬৫—১৫২৭) প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'দি প্রিন্স'-এ

নিঃস্ব ও বঞ্চিত জনসাধারণকে পরলোকে অনন্ত সুখের প্রলোভন দেখিয়ে শান্ত রাখার নির্দেশ শাসকবর্গকে দেওয়া হয়েছে। ধর্মের ইতিহাসে গরীব-দুঃখীর জন্যে গভীর সমবেদনার যেমন ইঙ্গিত পাওয়া যায়, তেমনি শোষণের চিত্রও পাওয়া যায়।

আবার অনেকে মনে করেন, অযৌক্তিক ও অলৌকিক বিশ্বাস থেকেই আদিম অবৈজ্ঞানিক যুগে ঈশ্বরের ধারণার আদি-পর্বের সূচনা। তাঁরা বলেন : সেই অবৈজ্ঞানিক যুগে গ্রহ, তারা, নক্ষত্র, এক কথায় প্রকৃতির অসংখ্য পদার্থের পিছনেই প্রাণ আছে বলে মানুষ বিশ্বাস করতো। এ থেকেই নানা দেব-দেবীতে বিশ্বাসের উৎপত্তি। সক্রেটিসের পরবর্তী দার্শনিক এ্যানাক্সেগোরাস চন্দ্র সূর্যকে নিষ্প্রাণ প্রস্তরখণ্ড বলার অপরাধে অতিকষ্টে এথেন্স থেকে পালিয়ে প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন। সক্রেটিসের বিরুদ্ধেও এ-অভিযোগ আনা হয়েছিলো। তাঁর জবানবন্দীতে তিনি আত্মপক্ষ সমর্থনে এথেন্সের বিচারকমণ্ডলীকে বলেছিলেন, এ্যানাক্সেগোরাসের মতো চন্দ্র-সূর্যকে তিনি নিষ্প্রাণ পদার্থ বলে মনে করেন না, এ-ঘটনা যদি সত্য হয়, তাহলে সক্রেটিস যে চন্দ্র-সূর্যকে দেবতা বলে মনে করতেন, তাতে সন্দেহ করার কোন সঙ্গত কারণ নাই।

বহু দেব দেবীতে বিশ্বাস

প্রাচীন গ্রীসে ও রোমে, ইরানে ও ভারতে যে এ জাতীয় বহু দেব-দেবীতে বিশ্বাস প্রচলিত ছিল, তা সুধীজনের সুবিদিত। তবে মজার কথা এই যে, এসব দেবতার সঙ্গে অনেক সময় ছোট ছোট মানব গোষ্ঠীর একটা যোগও ছিল। তা'রা মনে করতো : তাদের দেবতা বিপদে-আপদে, পূজার বিনিময়ে তাদের রক্ষা করবেন। দুই মানবগোষ্ঠীতে যখন যুদ্ধ লাগতো, তখন এ-যুদ্ধে যারা জয়ী হতো পরাজিতদের তা'রা তাদের দেবতাকে মেনে নিতে বাধ্য করতো। মিসরের প্রাচীন ইতিহাসে দেবতার 'মাহাত্ম্য নিয়ে ঝগড়া'-বিবাদের কথা প্রচুর। রোমে খ্রীস্টধর্ম প্রচারের পর প্যাগান যুগের পুরানো দেব-দেবীর প্রতি অনাস্থার জন্যেই নতুন খ্রীস্টানরা মধ্য-য়ুরোপের বর্বর দস্যুদের দ্বারা উৎপীড়িত হচ্ছে এ আশঙ্কার মূলেও দেব-দেবী সম্বন্ধে এ-জাতীয় ধারণা। ঋগ্বেদের কোন কোন অংশে ইন্দ্রের যে বর্ণনা, তা থেকে মনে হয় ইন্দ্রকে স্তুতি করার অন্যতম কারণ ইন্দ্রের তার স্তাবকদের শত্রুদের পরাজিত করার ব্যবস্থা। ইতিহাসের এক আদি পর্যায়ে দেব-দেবীর ধারণা যে এভাবে গড়ে উঠেছিল, তা হয়তো সন্দেহ করা চলে না।

এ-মতের সমর্থকরা সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের ধারণা কিভাবে বহু দেব-দেবী থেকে গড়ে উঠলো, তারও এক ইতিহাস বের করবার চেষ্টা করেছেন। তাঁরা মনে করেন, বহু দেব-দেবীতে বিশ্বাস আস্তে আস্তে চলে গিয়ে শেষ পর্যন্ত মানুষ বিশ্বের নিয়ন্তা ঈশ্বরের দ্বিত্বে বিশ্বাসী হয়। এ-মতেরই নাম 'ঈশ্বর-দ্বিত্ববাদ', আর বহু দেব-দেবীতে বিশ্বাসের নাম 'ঈশ্বর বহুত্ববাদ'। এমতে ঈশ্বর-বহুত্ববাদের স্বাভাবিক পরিণতি ঈশ্বর-দ্বিত্ববাদ ; তার এক বড় উদাহরণ প্রাচীন ইরানীয় ধর্মের ভালোর কারণ এক ঈশ্বর আর মন্দের কারণ আর এক ঈশ্বর, এ-দুই ঈশ্বরে বিশ্বাস।

দুই ঈশ্বরের কল্পনা

যিনি মানুষের ভালো করে অনবরত তাকে কল্যাণের পথে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন, সেই কল্যাণময় ঈশ্বরের নাম 'আহুরা মযদা', আর যে শক্তি মানুষকে ভুলপথে, অমঙ্গলের পথে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, সে বিরোধী শক্তির নাম 'আহরিমান'। খ্রীস্টধর্মে ও ইসলামে এ অকল্যাণের শক্তি ঈশ্বর-বিরোধী শয়তান নামে বর্ণিত। যে বৌদ্ধধর্মে ঈশ্বরের স্থান নাই, সেখানেও বুদ্ধের জীবন-চরিতকাররা তাঁর সাধনায় বিঘ্নকারী 'মার'-এর কথা উল্লেখ করেছেন। এ 'মার' যে শয়তানেরই নামান্তর ও প্রতিরূপ, তাতে সন্দেহ করার বিশেষ কারণ নাই। হয়তো বা বেদান্তের দার্শনিক চিন্তায় এ-মারেরই রূপান্তর মায়াতে।

একেশ্বরবাদের উৎপত্তি

এই ঈশ্বর-দ্বিত্ববাদ থেকেই এ-মতে একেশ্বরবাদের উৎপত্তি ও পরিণতি। বিশ্বে যে অশুভ শক্তি রয়েছে, আসলে সেটা মানুষের কল্যাণের জন্যেই, এবং বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহতা'লা মানুষকে এ বিরোধী শক্তিকে দমন করবার ক্ষমতাও দিয়েছেন, এ-বিশ্বাস থেকেই ঈশ্বর-দ্বিত্ববাদের একেশ্বরবাদে পরিণতি। দার্শনিক মনোবৃত্তি সম্পন্ন কেউ কেউ আবার মানুষের অন্তর্নিহিত দুর্বলতারই বাহ্যরূপ এই শয়তান, এমন পরিকল্পনাও করেছেন। আল্লাহ্‌তালার নির্দেশে শয়তানের প্রথম সৃষ্ট মানুষ আদমকে সেজ্‌দা (প্রণিপাত) না করার দার্শনিক ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে মওলানা রুমী বলেছেন : এ আখ্যায়িকার অর্থ মানুষের মনের ভিতর শুভ ও অশুভর চিরন্তন দ্বন্দ্ব ছাড়া আর কিছুই নয়।

যাই হোক, এমতে এভাবেই একেশ্বরবাদের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন এবং এর আগের নানারূপের ধর্ম-বিশ্বাসের জটিল গতির সার্থকতা একেশ্বরবাদের বিবর্তনে অর্থাৎ ঈশ্বরের ধারণার একেশ্বরবাদই হলো লক্ষ্য ; তার পূর্ববর্তী স্তরগুলো হলো মানুষের স্বাভাবিক দুর্বলতা-প্রসূত প্রচেষ্টা, অন্ধকারে হাতড়ে বেড়ানোর

মতো। বহু দেব-দেবীতে বিশ্বাসের অন্ধকারে নিরুদ্দেশভাবে হাতড়ে বেড়িয়ে হঠাৎ যেন মানুষ হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলো যেটা তার লক্ষ্য সে একেশ্বরবাদের উপর। এখান থেকেই তাই সত্যিকার ধর্মজীবন শুরু।

ঋগ্বেদে বহুদেবত্ববাদ ও একত্ববাদ

বহু দেবদেবীতে বিশ্বাসের পরিণতি ঈশ্বর-দ্বিত্ববাদ আর ঈশ্বর-দ্বিত্ববাদের পরিণতি একেশ্বরবাদ, একথা সাধারণভাবে স্বীকার করা গেলেও, একেশ্বরবাদের পরিণতি যে সোজাসুজি এভাবে সব সময় হয়েছে তাও বলা চলে না। তার এক ব্যতিক্রম বেদের বহু দেবদেবীতে বিশ্বাসের সঙ্গে একেশ্বরবাদের স্বীকৃতি। বেদের প্রাচীনতম অংশ ঋগ্বেদে শুধু বহু দেবদেবীর কথাই নাই, তার সঙ্গে সঙ্গে এক ঈশ্বর যে সারাজগতে পরিব্যাপ্ত ও তার সত্তা যে জগতের অতীত, এ-কথাও আছে। ঋগ্বেদের পুরুষ সূক্তে আছে এক বিশ্বচেতনার কথা। রূপকের সাহায্যে যেখানে বলা হয়েছে :

সহস্রশীর্ষঃ পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ
সভূমিং সর্বতো বৃত্বা
অত্যতিষ্ঠৎ দশাঙ্গুলম্।

[সেই পরম পুরুষের সহস্র শির, সহস্র চক্ষু ও সহস্র পদ। তিনি সমস্ত বিশ্বে পরিব্যাপ্ত হয়েও তার বাইরে আছেন।]

আবার এই ঋগ্বেদেই আছে :

"একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি
অগ্নির্যম ঃ মাতরিশ্বা ইতি।"

[বিশ্বের পিছনের সত্তা এক ; জ্ঞানী পুরুষেরা তাকে অগ্নি, যম, মাতরিশ্বা ইত্যাদি নাম দিয়ে থাকেন।]

প্রাচ্যবিদ্যাবিৎ পণ্ডিত ম্যাক্সমূলার ঋগ্বেদের বহু-দেবত্ববাদ ও একত্ববাদের আপাতবিরোধ মীমাংসা করতে গিয়ে বলেছেন : বৈদিক ধর্মসাধনার এক বৈশিষ্ট্য হলো : বহু-দেবদেবীতে বিশ্বাসের সঙ্গে আরাধ্য দেবদেবীতে ঈশ্বরত্বের আরোপ। যাই হোক, বৈদিক ধর্ম সাধনার এই জটিলতা এ-কথাই প্রমাণ করে যে, সব সময় সরল ঋজু পথে বহুদেবত্ববাদ থেকে একেশ্বরবাদের বিবর্তন হয়নি, তাদের সমন্বয়ের চেষ্টাও হয়েছে। সে-চেষ্টা শেষ পর্যন্ত কতটা সার্থক হয়েছে, তা বলা কঠিন।

ঈশ্বরের ধারণার বিশ্লেষণে আমরা একেশ্বরবাদ বা বিশ্বচেতনার একত্বকে মুখ্যস্থান দেবো। কারণ এ একত্ববোধই হলো মানুষের ধর্মীয় চেতনার মূলকথা।

ঈশ্বরের সর্বজ্ঞত্ব ও সর্বশক্তিমত্তা

এই পরিপ্রেক্ষিতে ঈশ্বরের ধারণা বিশ্লেষণ করলে মনে হয়, ঈশ্বর সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান ও সর্বব্যাপী। ঈশ্বর সীমাবদ্ধ হতে পারেন না, কারণ তা হলে সসীমের যাবতীয় দোষত্রুটি ও অপূর্ণতা তাঁর ওপর আরোপিত হবে। আর ঈশ্বর যদি অসীম-অনন্তই হন, তা'হলে তাঁর জ্ঞান, শক্তি ও সত্তা কখনো সীমিত হতে পারে না। অতএব ঈশ্বর অনন্ত সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান ও সর্বব্যাপী।

ঈশ্বরের কারণ-ধর্ম

উনিশ শতকের শেষের দিকে খ্রীস্টধর্ম-প্রভাবিত যুক্তিবাদী ঈশ্বর-তত্ত্বের এক বিশিষ্ট ব্যাখ্যাতা অধ্যাপক মার্টিনো কারণের স্বরূপ বিশ্লেষণ ক'রে দেখিয়েছেন: কারণ আসলে ইচ্ছা ছাড়া আর কিছু নয়, তাই ঈশ্বরকে যখন জগৎ-কারণ বলা হয় তখন সে কথার অর্থ: ঈশ্বরের ইচ্ছা থেকেই জগতের উৎপত্তি।

বহু প্রাচীন ন্যায়দর্শনে কারণের স্বভাবের এইভাবে বিশ্লেষণ দেখা যায়। কার্যের উৎপত্তির পূর্বে তার জ্ঞান, তাকে উৎপন্ন করার ইচ্ছা ও সে ইচ্ছার প্রয়োগ এ তিনটি ধর্মই কার্যের যিনি কর্তা তাঁর ভিতর থাকে। ঈশ্বর বিশ্বের কারণ ব'লে বিশ্বের স্বভাব তিনি জানেন, অতএব তিনি সর্বজ্ঞ। আর ঈশ্বরের ইচ্ছা বাধা-রহিত ব'লে তাঁর অনন্ত শক্তি। কাজেই মার্টিনোর মতে, ঈশ্বর জগতের কারণ, একথা স্বীকার করলেই তিনি যে অনন্ত জ্ঞান ও শক্তির আধার তা স্বীকার করতে আমরা বাধ্য। আর ঈশ্বর সর্বব্যাপী না হলে তাঁর সত্তা তো অনন্ত হতেই পারে না। সুতরাং সর্বজ্ঞ, সর্বব্যাপী ও সর্বশক্তিমান ঈশ্বরই জগৎ-কারণ।

সর্বজ্ঞত্ব ও সর্বশক্তিমত্তার ব্যাখ্যায় বুদ্ধি-সঙ্কট

ঈশ্বরের সর্বজ্ঞত্ব ও সর্বশক্তিমত্তা নিয়ে দার্শনিক মহলে ও যুক্তিবাদী ধর্ম-ব্যাখ্যাতাদের ভিতর অনেক রসালো আলোচনা দেখতে পাওয়া যায়। ক্যাথলিক চার্চের প্রসিদ্ধ দার্শনিক ও ধর্ম-ব্যাখ্যাতা সেণ্ট টমাস একুইনাস ও ইসলামের বড় সমর্থক ইমাম গাজ্জালী আরিস্টটলের লজিকের প্রতি তাঁদের গভীর আনুগত্যের দরুন একথা স্বীকার করেছেন: ঈশ্বর সর্বশক্তিমান হলেও আরিস্টটলের লজিকের মূলনীতি পাল্টাবার ক্ষমতা তাঁর নাই। আরিস্টটল বলেছেন: একই বস্তুতে তার স্বকীয় ধর্ম ও তার বিপরীত ধর্ম এক সঙ্গে থাকতে পারে না, যেমন গোলাপফুল যদি লাল হয় তা'হলে লালের ঠিক বিপরীত রং তাতে থাকতে পারে না, অথবা মানুষ যদি মরণধর্মী হয় তা'হলে সে কখনো অমর হতে পারে না। সোজা কথায়,

বিরুদ্ধ ধর্মের একত্র সমাবেশ ঈশ্বরেরও ক্ষমতার বাইরে ; তবে তাঁরা বলেছেন : এতে ঈশ্বরের সর্বশক্তিমত্তার হানি হয় না। বস্তুর অন্তর্নিহিত স্বভাব অনুসারে যা অসম্ভব, তাকে সম্ভব করা সর্বশক্তিমত্তার আওতার বাইরে। সর্বশক্তিমত্তা বলতে যা সম্ভব, তাই করা বোঝায়, অসম্ভবকে সম্ভব করা বোঝায় না। কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসিদ্ধ দার্শনিক অধ্যাপক ম্যাক্‌টাগার্ট আরিস্টটলের পূর্ববর্ণিত নীতি পাল্টাবার ক্ষমতা ঈশ্বরের নাই ব'লে তাঁর সত্তাই স্বীকার করেননি।

ঈশ্বরের সর্বশক্তিমত্তার এ-জাতীয় কোন আজগুবী ব্যাখ্যা হতে পারে কি না জানি না। তথাকথিত যুক্তির চশমা দিয়ে ঈশ্বরের স্বরূপ নির্ণয় করতে যাওয়াতেই হয়তো এ-জাতীয় বিড়ম্বনা ও বিভ্রান্তির সৃষ্টি।

ঈশ্বরের সর্বজ্ঞত্ব নিয়ে মধ্যযুগীয় চার্চের ধর্ম-ব্যাখ্যাতারা বেশ কিছু ফাঁপরে পড়েছিলেন মনে হয়। ঈশ্বর যদি সর্বজ্ঞই হন, তা'হলে তিনি আমাদের ভূত, ভবিষ্যৎ সবই আগে থেকে জানেন। তাই যদি হয়, তা'হলে আমাদের স্বাধীন চেষ্টার কোন মূল্য থাকে না, কারণ আমাদের অদৃষ্ট তা'হলে আগে থেকেই নির্ধারিত। আর মানুষের ভাগ্য যদি আগে থেকেই নির্ধারিত হয়ে থাকে তাহলে ধর্ম ও অধর্ম পাপ ও পুণ্যের কোন তফাৎ শেষ পর্যন্ত থাকে না। মহাভারতে আছে : এভাবে অনুপ্রাণিত হয়েই দুর্যোধন তাঁর পুঞ্জীভূত পাপের সাফাই গাইতে গিয়ে বলেছিলেন, পাপ বা পুণ্য কোনটিরই দায়িত্ব মানুষের নাই, কারণ অন্তর্যামী ঈশ্বর মানুষকে যা করাচ্ছেন সে তাই করছে ; অতএব আসলে সে পাপেরও কর্তা নয়, পুণ্যেরও কর্তা নয়—

"জানামি ধর্মং ন চ মে প্রবৃত্তিঃ।
জানাম্যধর্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ॥
ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন।
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি॥"

সুতরাং ঈশ্বরকে সর্বজ্ঞ বলাতে ধর্ম ও নীতিবোধে যে বিপর্যয় হবার সম্ভাবনা, তা থেকে অব্যাহতি পাবার উদ্দেশ্যে অনেকেই বলেছেন, ঈশ্বর সর্বজ্ঞ হলেও তিনি স্বেচ্ছায় আমাদের ভবিষ্যৎ জানেন না বা জানার চেষ্টা করেন না। এভাবেই যুক্তির মাপকাঠিতে ঈশ্বরের সর্বজ্ঞত্ব ও সর্বশক্তিমত্তার একটা গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা ধর্ম ব্যাখ্যাতারা করেছেন।

ঈশ্বরের কারণ-ধর্ম ও কল্যাণ-গুণ

কিন্তু এখানেই সমস্যাটি শেষ হলো না। ঈশ্বরকে সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান বলাই যথেষ্ট নয়। সর্বশক্তিমত্তা ও সর্বজ্ঞত্বের সঙ্গে ঈশ্বরের পূর্ণত্বও সমভাবে

স্বীকার্য। ঈশ্বর অনন্ত বলে তাঁর পূর্ণতাও অসীম, সীমাহীন। মার্টিনো ঈশ্বরের সর্বজ্ঞত্ব ও সর্বশক্তিমত্তাকে তাঁর কারণ-ধর্ম বলে বর্ণনা করেছেন। ঈশ্বরের পূর্ণতা মার্টিনোর মতে তাঁর নৈতিক ধর্ম। সহজ কথায় মার্টিনো ঈশ্বরের গুণাবলীকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন: কারণ-ধর্ম ও নৈতিক ধর্ম। নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে ঈশ্বরের পূর্ণতাকে বিশ্লেষণ ক'রে ঈশ্বর-বিশ্বাসী দার্শনিকরা বলেছেন: ঈশ্বর ন্যায়পরায়ণ ও করুণাময় উভয়ই। ঈশ্বর যদি ন্যায়পরায়ণ না হন, তা'হলে তিনি পুণ্যের পুরস্কার ও পাপের শাস্তি দিতে পারেন না; আর তিনি যদি পাপের শাস্তি ও পুণ্যের পুরস্কার না দেন, তবে ধর্মের কোন মূল্যই থাকে না। ইহ-সংসারে তো সারা ইতিহাস জুড়েই পাপীদের সব সুখসুবিধা আর পুণ্যাত্মাদের পদে-পদে পরাভব ও পরাজয়, আর রোজ-কেয়ামতেও যদি পাপীরা তাদের পাপের শাস্তি আর পুণ্যাত্মারা তাদের পুণ্যের পুরস্কার না পান, তা' হলে ধর্মানুষ্ঠানের আর সার্থকতা কি রইলো? তা'হলে ধর্ম-অনুরাগীদের ইহকাল তো কপালপোড়াই, পরকালও ঝরঝরে। তাই ঈশ্বরের পূর্ণতার অপরিহার্য ফল তাঁর ন্যায়পরায়ণতা।

ঈশ্বরের ন্যায়পরায়ণতা ও করুণা

কিন্তু এতেও আর এক বড় বিপদ। ঈশ্বর যদি কড়া বিচারকদের মতো আইনের নাগপাশে সবসময় আটকা পড়ে থাকেন, তবে তিনি যতই পূর্ণ হোন না কেন, তিনি অত্যন্ত নির্দয় ও নিষ্ঠুর। পাপীকে যদি পাপ থেকে মুক্তি দে'য়ার ক্ষমতা ঈশ্বরের না থাকে, ঈশ্বর যদি সব সময় মেপে-জুকে গাণিতিক হারে পাপীদের শাস্তি দেন তাহলে তো তাকে অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও নির্দয় না বলে আর উপায় নেই। যাঁরা সেক্সপিয়ারের 'মার্চেন্ট অব ভেনিস' পড়েছেন, তাঁরা খুব ভালো করেই জানেন, তথাকথিত ন্যায়নীতির অজুহাতে মানুষের জীবন্ত শরীর থেকে এক পাউণ্ড তাজা মাংস দাবী করার জন্যে সাইলক কি বিপদে পড়েছিল। আমরা যদি ঈশ্বরকে শুধু ন্যায়পরায়ণ বলি, তাঁকে পরম করুণাময় বলে স্বীকার না করি, তাহলে তাঁরও চেহারা হবে একটি সর্বশক্তিমান সাইলকের মতো।

তাই ঈশ্বর-বিশ্বাসীরা ঈশ্বরকে যেমন একদিকে ন্যায়পরায়ণ বলে কল্পনা করেছেন, তেমনি তাঁকে করুণাময় বলেও কল্পনা করেছেন। কঠোর নীতিবোধ ও পরম কারুণিকত্ব এক সঙ্গে ঈশ্বরে কি ক'রে থাকতে পারে, তা সহজবুদ্ধিতে বোঝা খুবই কঠিন। স্বামী বিবেকানন্দ তাই বলেছেন: সামান্য জড়শক্তি, তা যদি পদার্থবিদ্যার আবিষ্কার-অনুসারে একসঙ্গে কেন্দ্র-অভিমুখী ও কেন্দ্র-বহির্মুখী হতে পারে, তবে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, যাঁর শক্তির শেষ নাই, একসঙ্গে কেন ন্যায়পরায়ণ

ও করুণাময় হতে পারবেন না। এ-সব ভক্তির কথা, অনুরাগের কথা, বিশ্বাসের কথা, যুক্তির মাপকাঠিতে এর ঠিক ঠিক মূল্যায়ন হয়তো হয় না।

ধর্ম ও দর্শনে ঈশ্বর সম্বন্ধে যে বর্ণনা দেখা যায়, তা বিশ্লেষণ করলে মনে হয়, শক্তি, জ্ঞান, প্রেম ও কর্মের দৃষ্টিকোণ থেকেই মানুষ ঈশ্বর সম্বন্ধে নানা রকমের ধারণা করতে অভ্যস্ত হয়েছে।

ঈশ্বরের ধারণায় রাজতান্ত্রিক শক্তিবাদ

চলতি ধর্মে ঈশ্বর সম্বন্ধে যে ধারণা, সাধারণতঃ দেখা যায় তার মূল কথা শক্তি। নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রের যুগে দণ্ডমুণ্ডের কর্তা স্বেচ্ছাচারী বাদশাহ্দের কথা শুনা যায়। রাগলে চোখের পলকে তাঁরা যে কোন মানুষের মৃত্যুর ব্যবস্থা করতে পারতেন, আর খুশী হলে তার নানারকম সুখ-সুবিধার ব্যবস্থাও করতে পারতেন। ঈশ্বরকে সাধারণতঃ এ-ধরনের বাদশাহ্দের চেয়ে অনেক শক্তিশালী সর্বশক্তিমান পুরুষ বলে কল্পনা করা হয়েছে। এজন্যেই চলতি ধর্মে ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট রাখার কত অপ্রাকৃত ব্যবস্থা। গভীর ঈশ্বর-বিশ্বাসী পরম-সূক্ষ্ম বিচারক ক্যাণ্ট ধর্মের এ অপব্যবহার দেখেই বলেছিলেন: চলতি ধর্মে নানা রকমের ঘুষ দিয়ে ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট রাখার ব্যবস্থা অত্যন্ত নিন্দনীয়।

ঈশ্বর কথার অর্থ বিশ্লেষণ করলেই এই শক্তি-প্রবণতার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ঈশ্বর কথার অর্থই হলো: যিনি শাসক, আর শাসক কথার অর্থই হলো: যার প্রচুর শক্তি, যার ইচ্ছার প্রভাবে অন্যে কম্পিত-কলেবর। আরিস্টটল তাঁর তত্ত্ব-বিদ্যায় বিজ্ঞলোকের লক্ষণ দিতে গিয়ে বলেছেন: বিজ্ঞলোক অন্যের হুকুম তামিল করে না, তার হুকুমই অন্যে তামিল করে। সব জ্ঞানীর সেরা বিজ্ঞতম ঈশ্বর যে এ-দৃষ্টিকোণ থেকে এ-রকম একটা অখণ্ড প্রতাপান্বিত শাসক হবেন, তাতে আর আশ্চর্য কি? তাঁরই শাসনে চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, তারা, নক্ষত্র, তাঁর ইচ্ছার জন্ম-মৃত্যু, তাঁর ইচ্ছায় অনন্ত স্বর্গ ও অনন্ত নরক।

যে আদিম যুগে বৈজ্ঞানিক গুণের অভাবে মানুষ প্রকৃতির হাতের পুতুল ছিলো, তখন অলৌকিক উপায়ে এই অসহায়তা থেকে মুক্তি পাবার জন্যেই অনন্ত শক্তিমান ঈশ্বরকে বিশ্বের মহাশাসক রূপে কল্পনা।

মহাভাবুকদের ঈশ্বর

যাঁরা আবার খুব ভাবুক ছিলেন, সামাজিক জীবনের দ্বন্দ্ব-সংঘাত থেকে দূরে থেকে ভাবনাশ্রয়ী জীবনযাপনই ছিলো যাঁদের পেশা, তাঁরা আবার ঈশ্বরকে বিশ্বের পিছনে এক নিশ্চল পরিপূর্ণ তত্ত্ব বলেই কল্পনা করেছেন। আরিস্টটলের

ঈশ্বরের ধারণা অনেকটা এ-রকমই, সে-ঈশ্বর সকলকে চালান কিন্তু তিনি নিজে চলেন না। উপনিষদের ঈশ্বরের ধারণাও অনেকটা এ-রকমই। সে-স্থির নিশ্চল মহাবস্তু ভূমা বা ব্রহ্ম জীবনের সবচেয়ে বড় লভ্য কিন্তু তথাপি তাঁর স্বভাব স্থিতি, তিনি অপরিবর্তনশীল, আর যে তাঁকে জানে সেও পরিবর্তনের অতীত হয়ে যায়। এই হলো মুষ্টিমেয় জ্ঞানীদের পরিকল্পিত ঈশ্বরের ধারণা। শক্তিবাদীদের ঈশ্বরের ধারণা অতি ব্যাপক, জ্ঞানীদের স্থির ঈশ্বরের ধারণা খুবই সীমিত।

প্রেমিকের ঈশ্বর

শক্তিবাদীদের ঠিক উল্টো ধারণা, যাঁরা প্রেমিকের দৃষ্টিকোণ থেকে ঈশ্বরকে দেখবার চেষ্টা করেছেন তাঁদের ভিতর অত্যন্ত প্রবল। তাঁরা ঈশ্বরকে অনন্ত প্রেমের আকর বলেই পরিকল্পনা করেছেন। সৌন্দর্যের প্রতি আমাদের স্বাভাবিক আকর্ষণ, তাই ঈশ্বরকে তাঁরা পরিকল্পনা করেছেন পরম সুন্দররূপে। ঈশ্বরের অনন্ত শক্তি যে তাঁরা স্বীকার করেন না তা নয়, তবে ঈশ্বরের আসল রূপ শক্তি নয়, প্রেম। তাঁর প্রেম দিকে দিকে বিচ্ছুরিত, শুধু আমাদের অন্তর শুদ্ধ নয় বলেই আমরা সে প্রেমের অনুভূতি থেকে বঞ্চিত। খ্রীস্টানদের মতে, এ-প্রেমময় ঈশ্বর পাপীদের মুক্তি দেবার জন্যে যীশুরূপে মানব শরীরে অবতীর্ণ হয়ে ক্রুশবিদ্ধ হয়েছেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর সতেরো শতকে লেখা চৈতন্য-চরিতামৃতে খ্রীস্টান ধর্মের মূল কথারই প্রতিধ্বনি করে বলেছেন: ঈশ্বরের আবির্ভাব তাঁর ভক্তদের প্রতি প্রেম বিতরণের জন্যে, পাপীর দণ্ড বিধান ও পুণ্যাত্মার পুরস্কারের জন্যে নয়। এ-প্রেমের দৃষ্টিতে ঈশ্বরকে দেখতে গিয়ে তাঁর সর্বজ্ঞত্ব, সর্বশক্তিমত্তা ইত্যাদি ঐশ্বর্য একেবারেই বিস্মৃত হয়ে তিনি তাঁকে পরম প্রেমাস্পদ বলেই মেনে নিয়েছেন।

সতত কর্মশীল

আজকের কর্মপ্রবণতার যুগে পুরানোদিনের শক্তিবাদীদের মতো ঈশ্বরকে মহাশক্তিধর শাসক মনে না ক'রে অনন্ত-কর্মের উৎস বলে পরিকল্পনা করা হয়েছে। ঈশ্বরের শক্তি অনন্ত বিশ্বে অভিব্যক্ত, একথা আমরা বের্গসঁর সৃজনী বিবর্তনবাদের আলোচনায় দেখিয়েছি। এটা আজকের দিনের শক্তিবাদী মনোবৃত্তিরই প্রতিধ্বনি। এ-শক্তিবাদে প্রশাসকত্বের স্থান নাই, যে নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র থেকে তার প্রেরণা, তা আজ অচল। কাজেই আজকের দিনের পরিকল্পনায় ঈশ্বরের অনন্ত শক্তি মানুষের ভিতর অদম্য শুভ প্রেরণা জাগিয়ে দেয়, যার সাহায্যে মানুষ তার পরিবেশকে সুপথে পরিচালিত করতে সক্ষম হয়। উপনিষদ-পরবর্তী

যুগে সে দিনের সমাজে শুভকর্মের প্রেরণা জাগাবার জন্মে ঈশ্বরকে সতত কর্মশীল বলে পরিকল্পনা, তার উজ্জ্বল উদাহরণ, গীতায় সতত কর্মশীল, অনলস অথচ সর্বতোভাবে অভাব-বোধ রহিত ঈশ্বরের কল্পনা। আজকের দিনের বৈজ্ঞানিক শক্তিবাদের প্রেরণায় সেই চির কর্মচঞ্চল অথচ পরিপূর্ণ ঈশ্বর সত্তারই আবার কল্পনা ও রূপায়ণ।

এভাবে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে ঈশ্বরের ধারণা মানুষ আবহমান কাল থেকে করে এসেছে। এ-ধারণাকে প্রমাণ করবার চেষ্টাও সে করেছে প্রচুর, তাতে সে কতটা সফল হয়েছে জানি না।

অনেক ধর্মশাস্ত্রে আছে, ঈশ্বর অপ্রমেয় ও প্রমাণাতীত। এ মতে সূর্যের আলোকে যেমন অন্য আলো দিয়ে প্রকাশ করা যায় না তেমনি ঈশ্বরকেও অন্য কোনও প্রমাণের দ্বারা প্রমাণ করা যায় না। তথাপি ঈশ্বরবাদী দার্শনিকরা বুদ্ধির দ্বারা ঈশ্বরের সত্তা প্রমাণের অসাধ্য সাধন করবার চেষ্টা যে করেছেন, দর্শনের ইতিহাসের পাতায় পাতায় তার প্রমাণ প্রচুর।

দর্শনের ইতিহাসে, যাঁরা ঈশ্বর মানেন আর যাঁরা মানেন না তাঁদের ভিতর অনেক সময় ঝগড়া-বিবাদও যথেষ্ট হয়েছে। খ্রীস্টপূর্ব যুগের শেষ পর্বে ও খ্রীস্টীয় যুগের আদি পর্বে ভারতীয় দর্শনে হিন্দু ও বৌদ্ধ দার্শনিকদের ভিতর ঈশ্বরের সত্তা প্রমাণ ও নিরাশ নিয়ে যে তুমুল বাগ্‌যুদ্ধ, তার তুলনা দার্শনিক চিন্তার ইতিহাসে বিরল।

ঈশ্বরের চলতি প্রমাণ

ঈশ্বরের সত্তা সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ প্রমাণ তিনটি। তাদের যথাক্রমে নাম দেওয়া যেতে পারে—(১) কারণ-প্রমাণ, (২) উদ্দেশ্য-প্রমাণ ও (৩) সত্তা-প্রমাণ।

কারণ-প্রমাণ

কার্যকারণ সম্বন্ধে বিশ্বাস আমাদের স্বভাবসিদ্ধ। কোনও ঘটনা ঘটলেই আমরা তার কারণ আবিষ্কার করবার চেষ্টা করি, আর যতক্ষণ পর্যন্ত তার কারণ আবিষ্কার করতে আমরা পারি না ততক্ষণ সে-ঘটনা আমাদের কাছে দুর্বোধ্য থেকে যায়। হঠাৎ যদি রাস্তায় আমরা দেখি একটি মৃতদেহ পড়ে আছে, তখনই আমরা মনে করি হয়ত আশ্রয়হীন কোন নিঃস্ব লোক রাস্তায় মারা গিয়েছে। অথবা কোনও আকস্মিক দুর্ঘটনা ঘটেছে, কোনও অসতর্ক মুহূর্তে গাড়ীচাপা পড়ে হয়তো রাস্তায় তার মৃত্যু ঘটেছে অথবা কোন দুরভিসন্ধিসম্পন্ন লোক তাকে মেরে পুলিসের দৃষ্টি এড়িয়ে যাবার জন্যে তার মৃতদেহ লুকিয়ে রাস্তায় এনে

রেখে দিয়েছে। এ-রকম নানাভাবে আমরা এ-ঘটনার কারণ বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করতে পারি।

সোজা কথায়, বিশ্বের বিচিত্র ঘটনা-প্রবাহের কারণ আবিষ্কারের চেষ্টা আবহমান কাল থেকে মানুষের স্বভাবসিদ্ধ। আমাদের কারণ আবিষ্কারের শক্তিও হয়তো সীমাবদ্ধ। তাই অনেক ঘটনারই কারণ আবিষ্কারে আমরা অক্ষম। কিন্তু তা বলে কারণ আবিষ্কারের প্রেরণা যে আমাদের ভিতর রয়েছে তা অস্বীকার করা যায় না।

এই কারণেরই আর এক নাম "কেন"। আমাদের সমস্ত বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের মূলে এই 'কেন'-এর আবিষ্কারের চেষ্টা। ভক্ত-কবি খুব আবেগের সঙ্গে বলেছেন, "ডাক দেখি তোর বৈজ্ঞানিককে, ক'টা 'কেন'র জবাব দিতে সে পারে? কথা ঠিকই। অনেক 'কেন'রই জবাব দর্শনে ও বিজ্ঞানে পাওয়া যায় না। কিন্তু তা বলে এই 'কেন'র উত্তর দেবার যে চেষ্টা বিজ্ঞান ও দর্শনে পরিস্ফুট, তার সার্থকতা অস্বীকার করা চলে না।

লাইব্‌নিজের পর্যাপ্তকারণ নিয়ম

কার্যকারণ বিশ্লেষণের মাধ্যমে যাঁরা ঈশ্বরের সত্তা প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন, তাঁরা সব 'কেন'র শেষ উত্তর ঈশ্বর—এ-কথা বলার চেষ্টা করেছেন। প্রসিদ্ধ জার্মান দার্শনিক লাইব্‌নিজ বলেছেন: আমি যে এই কলম দিয়ে এই বই লিখছি, তার কারণ, আপাতঃদৃষ্টিতে আমার ইচ্ছা, সেই ইচ্ছার কারণ আরো কিছু। এভাবে কার্যকারণ-ধারা বিশ্লেষণ করতে করতে শেষ পর্যন্ত আমরা জানি যে, আমার লেখার কারণ ঈশ্বরের ইচ্ছা। লাইব্‌নিজ এ-সত্যের নাম দিয়েছেন পর্যাপ্তকারণ নিয়ম।

ন্যায়দর্শনে কারণ-প্রমাণ

ন্যায়দর্শনে আছে, মাটির ঘটের কর্তা যেমন কুম্ভকার, ঠিক সে রকমই ক্ষুদ্র অঙ্কুর থেকে শুরু করে এই বিরাট পৃথিবীর যাবতীয় অনিত্য পদার্থের একজন স্রষ্টা আছেন, তাঁরই নাম ঈশ্বর। আমাদের মনে রাখা উচিত, কর্তা ছাড়া কার্য হয় না। ন্যায়দর্শনের ভাষায়—

"ক্ষিত্যঙ্কুরাদিকং সকর্তৃকং কার্য্যত্বাৎ ঘটবৎ"।

অঙ্কুর থেকে পৃথিবী পর্যন্ত পদার্থগুলো যে কার্য, তার প্রমাণ তাদের অবয়ব বা অংশ; অবয়ব বা অংশ দিয়ে যা তৈরী, তা-ই কার্য। আর সে-সব কার্যের একজন কর্তাও দরকার। পৃথিবীর বেলা এ-নিয়মের ব্যতিক্রম হতে পারে না।

আপত্তি হতে পারে, ঘটের কর্তা কুম্ভকারের তো শরীর আছে সুতরাং বিশ্বজগতের কর্তা ঈশ্বরেরও শরীর থাকা উচিত ; আর তাঁর যদি শরীরই থাকে, তা'হলে তিনি আর ঈশ্বর হতে পারেন না। শরীর থাকলে তিনি জন্ম-মৃত্যুর অধীন হবেন, আর জন্ম-মৃত্যুর অধীন হলে তিনি তো আমাদের মত সসীম হবেন, ঈশ্বর হতে পারেন না।

এ-প্রশ্নের উত্তরে ন্যায়দর্শনের ব্যাখ্যাতারা বলেন, কার্য থাকলে তার কর্তা থাকবে এটাই হলো নিয়ম। সেই কর্তা যে শরীরীই হবে, এমন কোনও কথা নেই। তিনি শরীরীও হতে পারেন, অশরীরীও হতে পারেন, তাতে যুক্তির ব্যাঘাত হয় না। কাজেই জগৎ-কারণ ঈশ্বর অশরীরী হওয়াতে তাঁর কর্তৃত্বহানি হয় না।

মধ্যযুগের চার্চীয় দর্শনে কারণ-প্রমাণ

মধ্যযুগের চার্চীয় দর্শনে কার্যকারণ-নিয়মের সাহায্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করার চেষ্টা প্রচুর। প্রসিদ্ধ চার্চীয় দার্শনিক সেণ্ট টমাস্ একুইনাস, ঈশ্বর যে বিশ্বের আদি কারণ, তা প্রমাণ করবার চেষ্টা নানাভাবে করেছেন। একুইনাস ও তাঁর মতানুসারীদের মতে বিশ্বে কার্যকারণ-ধারার একটা শেষ সীমারেখা থাকা প্রয়োজন। তা না হলে কার্যকারণ-নিয়ম নিরর্থক হয়।

সেই পুরানো দিনের ন্যায় দর্শনের মাটির ঘটের দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা চলে, ঘটের কর্তা তো কুম্ভকার বোঝা গেল। কুম্ভকারেরও তো একজন কর্তা আছেন, সে কর্তারও আর একজন কর্তা খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু এভাবে যদি আমরা বস্তুর একটি আদি বা চরম কারণ স্বীকার না করি, তাহলে শেষ পর্যন্ত আমরা কোন স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি না। যুক্তির এ-দোষের পারিভাষিক নাম অনবস্থা, অর্থাৎ কোন স্থির সিদ্ধান্তে না পৌঁছা। কিন্তু আমরা যদি বিশ্বের এক চরম কারণ স্বীকার করি, যার আর কোন কারণ নাই, তিনি নিজেই নিজের কারণ, অর্থাৎ স্বয়ম্ভু, তাহলে এ-যুক্তির বিপর্যয় ঘটে না।

সব কারণের মূলে যদি এক আদি কারণ স্বীকার না করা হয়, তা'হলে শেষ পর্যন্ত কারণ-ই স্বীকার করা চলে না। 'খ' যদি 'ক'-এর কারণ হয়, আর 'গ' যদি 'খ'-এর কারণ হয়, আর এইভাবে যদি কার্যকারণ-ধারা অবিশ্রান্তভাবে চলে, তাহলে শেষ পর্যন্ত এই ঘটনা-প্রবাহের কোন কারণই খুঁজে পাওয়া যায় না। এই অবস্থায় 'খ'-কে বিনা শর্তে 'ক'-এর কারণ বলা যায় না, আর 'গ'-কেও বিনা শর্তে 'খ'-এর কারণ বলা যায় না। তাই সত্যিকার কারণ যদি কিছু থাকে,

তা'হলে তা শর্তহীনভাবে কারণ হবে। আর এই স্বতন্ত্র, স্বাধীন কারণের নামই আদি কারণ, যার সত্তা অন্যের উপর নির্ভর করে না। সুতরাং কার্যকারণ নিয়মের শেষ পরিণতি এক আদি কারণের স্বীকৃতিতে, আর এই আদি কারণের নামই ঈশ্বর বা আল্লাহ্‌তালা, বিশ্বের ধর্মশাস্ত্রে যাঁর এত প্রশস্তি।

একুইনাসের কারণ বিশ্লেষণ

একুইনাস্ এই কারণ-প্রমাণকেই একটু পরিবর্তিত করে তাকে আরও কয়েকটা রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেছেনঃ কার্যপ্রবাহের বিশ্লেষণ করে শেষ পর্যন্ত আমরা যেমন স্বীকার করতে বাধ্য হই, ঠিক তেমনি আমরা দেখতে পাই এ-জগতের অগণিত ঘটনা প্রবাহ একটি আর একটির উপর নির্ভরশীল, তাদের কোন নিরপেক্ষ সত্তা নেই। তাই শেষ পর্যন্ত তারা কোন নিরপেক্ষ সত্তার উপর নির্ভরশীল। আর এই বিশ্বের সব ঘটনাই অন্যের উপর নির্ভরশীল বলে তাদের সত্তা কখনো সুনিশ্চিত হতে পারে না। সহজ কথায়, তাদের সত্তা থাকতেও পারে, না-ও থাকতে পারে। অতএব তাদের পিছনে কোন স্থির সুনিশ্চিত অবশ্যম্ভাবী সত্য থাকা দরকার। এই সুনিশ্চিত, অপরনিরপেক্ষ স্বতন্ত্র, স্বাধীন সত্তার নাম ঈশ্বর। একুইনাসের কারণ-বিশ্লেষণ আলোচনা করলে উপনিষদের কথা মনে পড়ে: উপনিষদে আছেঃ অনিত্যের পিছনে নিত্য, অধ্রুবের পিছনে যে ধ্রুব সত্য কিছু আছে, তারই নাম ঈশ্বর। অনিত্যের সত্তা নিত্যে, অধ্রুবের সত্তা ধ্রুবে, অনিশ্চিতের সত্তা নিশ্চিতে, এই-কথাই একুইনাসের বক্তব্য। এই গভীর ধর্মবিশ্বাসকে যুক্তির সাহায্যে তিনি প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন।

উদ্দেশ্য-প্রমাণ

ঈশ্বরের চারতি প্রমাণগুলোর ভিতর সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক উদ্দেশ্য প্রমাণ। এই বিশ্বের ঘটনাবলী যান্ত্রিক বা আকস্মিক পদ্ধতিতে সংঘটিত নয়, এর পিছনে কোন অদৃশ্য হস্তের ইঙ্গিত লুকায়িত, এই হলো উদ্দেশ্য-প্রমাণের মূল বক্তব্য। সৃষ্টিতত্ত্বের আলোচনায় আমরা বিশ্বের নানা ধর্মশাস্ত্রে সৃষ্টির পিছনে সৃষ্টিকর্তার মহান উদ্দেশ্যের স্বীকৃতির কথা বলেছি। উদ্দেশ্য-প্রমাণ ধর্মশাস্ত্রের এই উক্তিরই যুক্তির মাধ্যমে এক রূপায়ণ।

প্লেটো ও আরিস্টটলের উদ্দেশ্যবাদ

এই প্রমাণ যে অতি প্রাচীন, দর্শনের ইতিহাস আলোচনায় তার সঙ্কেত পাওয়া যায়। প্লেটোর দর্শনে, বিশেষতঃ আরিস্টটলে এই উদ্দেশ্যবাদের অভিব্যক্তি

দেখতে পাওয়া যায়। বোধ হয় তার আরও কিছু পরে বাদরায়ণের ব্রহ্মসূত্রে এই উদ্দেশ্যবাদের উল্লেখ দেখা যায়।

এই প্রমাণের মূল বক্তব্য এই যে, বিশ্বের ঘটনাবলীর ভিতর যে শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা দেখা যায়, তা থেকে মনে হয়, এই জগৎ কোন চেতন সত্তার উদ্দেশ্যেরই অভিব্যক্তি। দিনের পর রাত, রাতের পর দিন, প্রাকৃতিক ঋতুর ক্রমিক আবর্তন, সৃষ্টির পর স্থিতি, আর স্থিতির পর ধ্বংস, প্রাচীন কালের দার্শনিকরা যার নাম দিয়েছেন 'রচনা', একথাই বুঝিয়ে দেয় যে বিরাট বিশ্ব তার স্রষ্টার ইচ্ছারই অভিব্যক্তি উদ্দেশ্যবিহীন অচেতন থেকে এর উৎপত্তি কখনো সম্ভব নয়, কখনো সম্ভব হতে পারে না। যাঁরা বলেন, এই জগৎ যান্ত্রিক পদ্ধতিতে আকস্মিকভাবে সৃষ্ট, তাঁদের কথা শুনলে মনে হয়: ইতিহাসের এক আদিযুগে বৃটিশ মিউজিয়ামের বড় লাইব্রেরীতে চঞ্চল বানরের হাতে যদি ইংরেজী বর্ণমালা দিয়ে দেওয়া হতো তবে তার অনবরত ওলট-পালটের ফলে যুগ-যুগান্তের পর বৃটিশ মিউজিয়ামের সব ভালো ভালো ইংরেজী বই আপনা থেকেই লেখা হয়ে যেতো তার জন্যে শেক্সপীয়ার, মিল্টনের দরকার হতো না। এ কল্পনা যেমন অতি উদ্ভট ও অবাস্তব, ঠিক তেমনি বিশ্বের আকস্মিক উদ্দেশ্য-বিহীন সৃষ্টিও অতি উদ্ভট ও অবাস্তব।

উদ্দেশ্যবাদের সাহায্যে ঈশ্বরের সত্তা প্রমাণের আবেদন এত ব্যাপক যে, যাঁরা ঈশ্বর মানেন না এমন নাস্তিক দার্শনিকরাও এ-প্রমাণের আকর্ষণ পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে পারেননি। প্রসিদ্ধ নাস্তিক দার্শনিক হিউম-ও উদ্দেশ্যবাদের সাহায্যে ঈশ্বরের সত্তা প্রমাণের চেষ্টাকে একেবারে অযৌক্তিক মনে করেননি। কিন্তু তথাপি তাঁর কাছে এ-প্রমাণ গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়নি। কারণ বিশ্বে অশুভ সত্তা প্রচুর: সর্বশক্তিমান কল্যাণময় ঈশ্বর যদি বিশ্বের স্রষ্টা হনও তা'হলে এ-সংসারে এত অশুভ, এত অমঙ্গল কেন? বার্ট্রেণ্ড রাসেলও নাস্তিকতার সমর্থনে অনুরূপ যুক্তি দিয়েছেন।

এন্‌সেলমের সত্তা-প্রমাণ

এবার আমরা ভাবনার ভিত্তিতে ঈশ্বরের সত্তা-প্রমাণের একটু বিশ্লেষণ করতে চাই। মধ্যযুগীয় চার্চের দার্শনিক সেণ্ট এন্‌সেলম ও আধুনিক যুগের দার্শনিক দেকার্তে এই সত্তা প্রমাণের বড় সমর্থক। এন্‌সেলম বলেন, আমাদের মনের ভিতর ঈশ্বর বা অনন্ত সত্তার যে ধারণা আছে, তাই দেখিয়ে দেয় যে, ঈশ্বর আছেন। ঈশ্বরের সত্তা অনন্ত, সীমিত নয়, ঈশ্বর ছাড়া জগতের অন্য

জিনিসের সত্তা সীমিত। এই সমস্ত সীমিত সত্তাবান বস্তুগুলো শুধু আমাদের মনে ভাবনার আকারে নেই, মনের বাইরের জগতেও বস্তুর আকারে রয়েছেন। সীমিত সত্তাবান পদার্থের, যেমন টেবিল-চেয়ারের ধারণা আমাদের মনে রয়েছে, তেমনি মনের বাইরেও টেবিল-চেয়ার আছে। এখন আমরা যদি মনে করি : অনন্ত সত্তাবান ঈশ্বর শুধু আমাদের মনে ধারণার আকারেই রয়েছেন, আমাদের মনের বাইরে তার কোন সত্তা নেই, তা'হলে ঈশ্বর তো সীমিত সত্তাবান পদার্থের চেয়েও ছোট হয়ে পড়বেন। টেবিল এবং চেয়ারের মতো অত্যন্ত ছোট জিনিসেরও ভাবসত্তা ও বাহ্যসত্তা দুই-ই আছে, আর অনন্ত ঈশ্বরের শুধু ভাব-সত্তাই আছে, বাহ্য-সত্তা নেই, এ কি করে হয়? এ-প্রকল্প স্বীকার করলে অনন্ত সত্তা সীমিত সত্তার চেয়ে ছোট হয়ে যায়। তাই এ-কল্পনা নেহাৎ অযৌক্তিক। অতএব আমাদের ভিতর ঈশ্বরের অনন্ত সত্তার যে ধারণা, তাই প্রমাণ করে দেয়, ঈশ্বর সত্যি সত্যিই আছেন।

আবার ঈশ্বরের ভাবনা থেকেই একটু অন্যভাবে ঈশ্বরের সত্তা প্রমাণ করা যায়। অনন্ত ঈশ্বর যদি শুধু মনের ভাবনা মাত্রই হন, তা'হলে আমরা দুটি অনন্ত কল্পনা করতে পারি। এক অনন্ত শুধু আমাদের মনের ভাবনা, আর এক অনন্ত শুধু আমাদের মনের ভাবনা নয়, মনের বাইরেও তার সত্তা আছে। এ-দু'টি অনন্তের ভিতর দ্বিতীয়টি প্রথমটির চেয়ে বড়। কারণ প্রথমটি তো মনের ভাবনা মাত্র, দ্বিতীয়টি মনের ভাবনাও বটে, আর বাহ্য-সত্তাও বটে। তাই এ থেকে এ-কথাই প্রমাণ হয় যে, দ্বিতীয় অনন্ত প্রথম অনন্তের চেয়ে বড়, কিন্তু অনন্তের কল্পনা-অনুসারে অনন্তের চেয়ে বড় আর কিছু হতে পারে না। অতএব এ থেকে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, অনন্ত ঈশ্বর শুধু আমাদের মনের ধারণা হতে পারেন না, আমাদের মনের বাইরেও তাঁর সত্তা আছে।

দেকার্তের স্বাতন্ত্র্য

সেণ্ট এন্‌সেল্‌ম মানুষের মনে অনন্ত ঈশ্বরের ধারণা আছে এ-কথা অনেকটা বিনা প্রমাণেই মেনে নিয়েছেন। দেকার্তের বৈশিষ্ট্য হলো এখানে যে, তিনি মানুষের মনে যে অনন্তের ধারণা আছে, আর এই অনন্তের ধারণাকে খণ্ডিত করেই মানুষের সীমার ধারণা, এ-কথা খুব ভালো ক'রে দেখাবার চেষ্টা করেছেন। এ বিষয়ে আলোচনা আমরা আগেই করেছি, তাই তার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনে ঈশ্বর-প্রমাণ

কারণ-প্রমাণ, উদ্দেশ্য-প্রমাণ, ও সত্তা-প্রমাণ, এই তিনটি হলো পাশ্চাত্য দর্শনে আবহমান কাল থেকে প্রচলিত ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণের তিনটি পদ্ধতি।

প্রাচ্য দর্শনে কারণ-প্রমাণ ও উদ্দেশ্য-প্রমাণের কথা পাওয়া যায়, আর তার সঙ্গে সঙ্গে আর একটি প্রমাণও পাওয়া যায় যার নাম শাস্ত্র-প্রমাণ। ধর্মশাস্ত্র, যেমন কোরান, বাইবেল ও বেদ, সর্বজ্ঞানের আকর বলে স্বীকৃত। অনেক দার্শনিক মনে করেন, এই ধর্মশাস্ত্রের একজন স্রষ্টা থাকা প্রয়োজন। সে-স্রষ্টা কোন মানুষ হতে পারে না, কারণ মানুষ যতই বড় হোক না কেন, তার জ্ঞান সীমিত। তাই সব জ্ঞানের আকর ধর্মশাস্ত্রের স্রষ্টা, সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ স্বয়ম্ভু ঈশ্বর। এ-প্রসঙ্গে কোরানের সৃষ্টি নিয়ে মুতাযিলা-পন্থী ও আশারী-পন্থীদের মত-বিরোধের কথা স্মরণীয়।

ক্যাণ্টের নৈতিক প্রমাণ

ইমানুয়েল. ক্যাণ্ট তাঁর দর্শন-সমীক্ষণে পাশ্চাত্য দর্শনে আবহমান কাল থেকে প্রচলিত কারণ-প্রমাণ, উদ্দেশ্য-প্রমাণ ও সত্তা-প্রমাণ, এই তিনটি প্রমাণের অযৌক্তিকতা বিস্তারিতভাবে দেখিয়েছেন। তিনি বলেছেন: ঈশ্বরকে জগতের কারণ বললে বিশ্বের এক আদি কারণ স্বীকার করে নিতে হয়, আর আদিকারণ কার্য কারণ-নিয়মের ব্যতিক্রম ছাড়া আর কিছুই নয়। সব ঘটনার যদি কারণ থাকে, তা'হলে আদি কারণ বলে কিছু হতে পারে না, আদি কারণের অর্থ কারণহীন কারণ। এ-স্বীকৃতি তাই কার্যকারণ-নিয়মের মূলেই কুঠারাঘাত করে। উদ্দেশ্য প্রমাণ সম্বন্ধে ক্যাণ্ট বলেছেন: জগতের রচনা, নিয়ম ও শৃঙ্খলা আমাদের মনে বিশ্বের স্রষ্টার কথা মনে করিয়ে দেয় সত্য, কিন্তু সৃষ্টি যদি স্রষ্টার উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিয়ামক হয় তা হলে বিশ্বসৃষ্টির উপাদান আগে থেকেই থাকা দরকার। একজন সূত্রধর যেমন হাতিয়ার ও মাল-মশলা, যেমন বাটালী ও কাঠ ইত্যাদির উপর নির্ভরশীল ঠিক তেমনি এ-জাতীয় স্রষ্টা সৃষ্টির উপাদানের দ্বারা সীমিত, কাজেই তাঁকে অনন্ত শক্তিমান ঈশ্বর বলা চলে না। সত্তা-প্রমাণের বিরুদ্ধে কটাক্ষ করে, ক্যাণ্ট বলেছেন: আমাদের মনের ভিতর ঈশ্বরের ধারণা আছে বলেই আমরা যদি বলতে পারি ঈশ্বর সত্যিই আছেন, তা হলে পকেটে এক শো টাকা আছে মনে করে পকেটে হাত দিলেই এক শো টাকা আমাদের পাওয়া উচিত। সত্তা-প্রমাণের ভিত্তি ক্যাণ্টের মতে এতই দুর্বল। তাই চলতি এই তিনটি প্রমাণ ক্যাণ্টের মতে অপ্রমাণেরই সামিল।

ক্যাণ্টের দর্শনে দু'টি আপাতঃবিরোধী ভাব দেখতে পাওয়া যায়: একটি বিচার-প্রণোদিত, আর একটি বিশ্বাস-প্রণোদিত। আগেই বলেছি, চুল-চেরা বিচারের সাহায্যে ক্যাণ্ট দেখিয়েছেন, ঈশ্বরের সত্তা যে-সমস্ত চলতি প্রমাণের সাহায্যে প্রমাণিত করার চেষ্টা হয়েছে, তাদের ভিত্তি অতি দুর্বল, নিরপেক্ষ

বিচারে সেগুলো গ্রহণযোগ্য নয়। তবে এতে সত্যিকার ধার্মিকদের বিচলিত হবার কোনও কারণ নাই। যুক্তির যেখানে পরাভব বিশ্বাসের সেখানেই সার্থকতা। ক্যাণ্ট তাই বিচার-বুদ্ধির সাহায্যে নয়, নীতিবোধের সাহায্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন। এরই নাম হলো নৈতিক প্রমাণ।

ক্যাণ্ট বলেন: নীতিবোধের মূলকথা সদিচ্ছা। সে-সদিচ্ছা সগৌরবে গৌরব-উজ্জ্বল। টাকা-কড়ি, মান-যশ বিদ্যা-বুদ্ধি, প্রভাব-প্রতিপত্তি, দুনিয়ার সব জিনিসই অবস্থা-বিশেষে ভাল, অবস্থা-বিশেষে খারাপ। মান-যশ, প্রভাব-প্রতিপত্তি, ধন-দৌলত, বিদ্যা-বুদ্ধি এদের অপব্যবহারের দৃষ্টান্ত মানুষের ইতিহাসে প্রচুর। তাই একমাত্র সদিচ্ছা বা শুভবুদ্ধিই সব অবস্থায় ভালো বলা চলে। এ-শুভবুদ্ধি শুধু কর্তব্যবোধ-প্রণোদিত, তা টাকা-কড়ি চায় না, মান-যশ চায় না, ধন-দৌলত চায় না, শুধু কর্তব্যের খাতিরে কর্তব্য করে যেতে চায়। এ-শুভবুদ্ধি তাই সর্ব-প্রকারে ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জিত। "কর্তব্য করে যাও, ফলের দিকে তাকিয়ো না"—গীতার এই নির্দেশের সঙ্গে ক্যাণ্টের নীতি-শাস্ত্রের খুবই মিল।

এ শুভবুদ্ধি-প্রণোদিত হয়ে কাজ করা খুবই কঠিন। মানুষের আপ্রাণ চেষ্টায়ও তা সম্ভব নয়, সেইজন্যেই ক্যাণ্ট আত্মার অমরত্বে বিশ্বাসী। মৃত্যুর পর মানুষের বিদেহী আত্মা অনন্তকাল এ শুভবুদ্ধির সাধনায় প্রবৃত্ত থাকে, কিন্তু অদম্য সাধনা ও সংগ্রামের পর মানুষ যখন এ শুভবুদ্ধিতে প্রতিষ্ঠিত হয় তখন সে যদি শাশ্বত শান্তি লাভ না করে তাহলে তো শেষ পর্যন্ত নৈতিক জীবনের কোন অর্থই রইল না, নৈতিক জীবন ত তা'হলে নিরুদ্দেশ পণ্ডশ্রমেই পর্যবসিত হলো। অথচ নৈতিক সাধনার ফল হিসাবে মানুষ যদি সুখ শান্তির প্রার্থী হয়, তা'হলে তার শুভবুদ্ধিই রইলো না, অশুভবুদ্ধির দাসত্বই তাকে শেষ পর্যন্ত স্বীকার করে নিতে হলো। এটাই হলো নৈতিক জীবনের এক বড় দ্বন্দ্ব। নৈতিক সাধনার পুরস্কার হিসাবে সুখ চাওয়ার উপায় নেই; আর নৈতিক সাধনার চরম পরি-ণতিতে যদি শাশ্বত সুখ না পাওয়া যায় তাহলে নৈতিক সাধনার মতো অবাঞ্ছনীয় জিনিস আর কিছুই হতে পারে না। একমাত্র ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসের সাহায্যেই নৈতিক জীবনের এই দ্বন্দ্বের সমাধান সম্ভব। নৈতিক জীবনের চরম পরিণতির মুহূর্তে সর্বশক্তিমান ও সর্বগুণান্বিত ঈশ্বর মানুষ সুখ না চাইলেও অপার করুণায় অভিভূত হয়ে স্বেচ্ছায় তাকে অনন্ত সুখের অধিকারী করেন। এটাই নৈতিক জীবনের নিগূঢ় রহস্য। সুখ চাওয়ায় যে দৈন্য, তার কাছে নতি স্বীকার না ক'রেও নৈতিক পূর্ণতার ফলে মানুষ এভাবে ঈশ্বরের অনুগ্রহে অনন্ত সুখের অধিকারী হয়, এটাই হলো নৈতিক জীবনের এক বড় দ্বন্দ্বের সমাধান।

মার্টিনোর নৈতিক প্রমাণ

ক্যান্টের অনেক পরে, মার্টিনো নীতিবোধের ভিত্তিতে ঈশ্বরের সত্তা প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন। মার্টিনো মনে করেন : মানুষের মনের ভিতর শুভ কাজ করার একটা প্রেরণা আছে, সে-প্রেরণার ফলে ভালো কাজ করার জন্যে সে যেন একটা বাধ্যবাধকতা অনুভব করে। সাধারণ মানুষের জীবনে এ-সত্যের উপলব্ধি অনেক সময় হয় না; কিন্তু যতই মানুষের মনে নীতিবোধ জাগতে থাকে, ততই সে ভাল করার জন্যে একটা আন্তরিক প্রেরণা, একট বাধ্যবাধকতা অনুভব করে। সে বাধ্যবাধকতার চাপে সে জেনে শুনে হাসি-মুখে দুঃখ বরণ করে, মহৎ উদ্দেশ্যে প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দেয়, অতি প্রিয় আত্মীয়-স্বজন, অনুরাগী বন্ধু-বান্ধব কেউ তাকে ভাল পথে চলা থেকে অজস্র বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও ফিরিয়ে নিয়ে আসতে পারে না।

এ বাধ্যবাধকতার উৎস কোথায়? মার্টিনো বলেন : প্রত্যেক বাধ্যবাধকতার ক্ষেত্রেই তার একটি বাহ্য উৎস থাকে। যেমন, পুলিস যখন আমাকে জোর করে ধরে নিয়ে গিয়ে আদালতে হাকিমের সামনে হাজির করে, এ বাধ্যবাধকতার উৎস আমার বাইরে, পুলিসের কড়াকড়ি ও জোর-জবরদস্তির জন্যেই আমি এভাবে চলতে বাধ্য হয়েছি। নৈতিক জীবনের বাধ্যবাধকতারও এমন একটি বাহ্য কারণ থাকা প্রয়োজন। মার্টিনোর মতে, এই বাহ্য কারণ আমি তো নিজে হতে পারি না, আর আমি যে মানবগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত তার অন্য কেউও হতে পারে না, কারণ আমাদের সকলের সম্বন্ধেই এ-নৈতিক বাধ্যবাধকতার প্রশ্ন উঠতে পারে। অতএব এ বাধ্যবাধকতার কারণ আমি নিজে নই, আমার বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন কেউ নয়, আমার সমাজের অন্য লোক কেউ নয়, এ বাধ্যবাধকতার কারণ সর্বশক্তিমান অনন্তকল্যাণ-গুণের আধার ঈশ্বর। তিনিই সব মানুষের মনে শুভ প্রেরণা জাগিয়ে তাদের সুপথে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছেন, কেউ সে-আহ্বানে সাড়া দেয়, কেউ দেয় না। এ থেকেই মানুষে মানুষে নীতিবোধে এত পার্থক্য।

ঈশ্বরের অস্তিত্ব যুক্তির সাহায্যে প্রমাণ করবার যে চেষ্টা ধর্মপ্রাণ দার্শনিকরা দীর্ঘযুগ ধরে করে এসেছেন, 'হিং টিং ছটের' মত তার একটা ছক এখানে আঁকার চেষ্টা করা গেলো। এবার এ-প্রমাণ-পদ্ধতির সার্থকতার একটু বিশ্লেষণ করে দেখা যাক।

ঈশ্বর-প্রমাণের অপূর্ণতা

ঈশ্বরকে বিশ্বের আদি কারণ মানায় যে বাধা, তা ক্যাণ্ট খুব ভাল করেই দেখিয়েছেন। তার চেয়ে হয়ত সহজ সরলভাবে দেখিয়ে দিয়েছিলো একজন

ধর্ম-প্রচারকের ছোট ছেলে, যে তার বাবাকে বলেছিল, "ঈশ্বরই যদি জগৎ সৃষ্টি করে থাকেন, তা' হলে তাঁকে সৃষ্টি করলো কে?" আর ঈশ্বরের বেলায়ই যদি কার্যকারণ নিয়মের ব্যতিক্রম হয়, তাহলে অন্যের বেলায় কেন হবে না? তাই অনেক দার্শনিক শুধু কারণ-প্রবাহই স্বীকার করেন, ঈশ্বরকে জগৎ-কারণ বলে মানেন না। বৌদ্ধদর্শন তার এক অতি বড় দৃষ্টান্ত।

উদ্দেশ্যবাদের পক্ষে-বিপক্ষে অনেক কথা আমরা বিবর্তনবাদের আলোচনায় বলেছি, এখানে তার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। আমাদের অভিজ্ঞতার বিশ্লেষণে জগতের পিছনে কখনো কখনো উদ্দেশ্যের সঙ্কেত পাওয়া যায়, সন্দেহ নাই; আবার অনেক ঘটনার বিশ্লেষণে জগতের পিছনে যে কোন উদ্দেশ্যই নাই, জগৎ যে এক আকস্মিক নিরুদ্দেশযাত্রা তাও মনে হয়। সুতরাং উদ্দেশ্য-প্রমাণেই বা আস্থা রাখা যায় কি ক'রে?

অনন্তের যে ধারণা আমাদের মনে রয়েছে এরই কোন সঠিক প্রমাণ নেই। সুতরাং সে-ধারণার ভিত্তিতে ঈশ্বরের সত্তা প্রমাণ করার চেষ্টাও নিরর্থক।

ঈশ্বরের অনুভূতির সার্থকতা

ঈশ্বরের ধারণা তখনই আমাদের ঠিক ঠিক হয়, যখন আমরা ঈশ্বরকে জানতে পারি। এই ইন্দ্রিয়াতীত অনুভূতি ঈশ্বর-বিশ্বাসের মূল ভিত্তি, এটাই ঈশ্বরের সত্তার আসল প্রমাণ। আকাশে সূর্য যে আলো দেয়, তার প্রমাণ যেমন আমাদের অনুভূতি, ঈশ্বরের সত্তারও প্রমাণ ঠিক সে রকমই অনুভূতি। ধী-বিদ্যার বিশ্লেষণে আমরা বোধি বা স্বজ্ঞার আলোচনায় এ-অনুভূতির কথা বলেছি। বহু সুফীসাধক এই অনুভূতির কথা মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন।

এই তত্ত্বানুভূতিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে উপনিষদের ঋষি উদাত্ত কণ্ঠে বলেছেন:

শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা
আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ
ত্বমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেহয়নায়।"

[পৃথিবীর মানুষ ও স্বর্গের দেবতারা তোমরা সব শুন, তোমাদের সকলের উপাদান এক মরণের অতীত অমৃত সত্তা, আমি সেই জ্যোতির্ময় সত্তাকে জেনেছি যাকে জানলে মানুষ মৃত্যুর পারে চলে যায়। এ ছাড়া মরণজয়ী হবার আর কোন উপায় নাই।]

ঈশ্বর-অনুভূতির সর্বজনীনতা

এ-প্রসঙ্গে এ কথাও মনে রাখা দরকার যে, এ-অনুভূতি কারো একলার সম্পত্তি নয়, সকলেরই সেই অনুভূতি হতে পারে, শুধু সাধনার দরকার। এটাই সব মরমীবাদীর মত। কঠ উপনিষদে নচিকেতার সাধনা দ্বারা আত্মজ্ঞান-লাভের কাহিনীর উপসংহারে তাই আছে: আত্মবিদ্যা অনুশীলন করলে যে কেউ নচিকেতার মতো আত্মজ্ঞান লাভ করতে পারে, আত্মজ্ঞান নচিকেতার একচেটিয়া সম্পত্তি নয়।

ঈশ্বরবাদের তিনটি প্রধান ধারা

ঈশ্বর-বিশ্বাসের যৌক্তিকতা বিশ্লেষণের পর আমরা ঈশ্বরবাদের বিভিন্ন ধারা সম্বন্ধে আলোচনা করতে চাই।

ঈশ্বরের সঙ্গে জীব ও জগতের, সোজা কথায়, মানুষ ও জগতের, সম্বন্ধ-নির্ণয়ে আমরা সাধারণত: তিনটি ভিন্ন মত দেখতে পাই। তাদের প্রথম দু'টি পরস্পর-বিরোধী, আর তৃতীয়টি এ-দু'য়েরই সমন্বয়। প্রথম মতে, ঈশ্বর জীবজগতের সম্পূর্ণ অতীত। এ-মতের নাম দে'য়া যেতে পারে অতিক্রান্তিবাদ বা অতিক্রান্ত ঈশ্বরবাদ। দ্বিতীয় মতে, অর্থাৎ এর উল্টো মতে, ঈশ্বরের সত্তা জীবজগতে পরিব্যাপ্ত ও পর্যবসিত। এ-মতের নাম দে'য়া যেতে পারে অনুস্যূতিবাদ বা অনুস্যূতঈশ্বরবাদ। তৃতীয় মতে, ঈশ্বর শুধু জীবজগতে পরিব্যাপ্তই নন, তাঁর সত্তা জীবজগতে পরিব্যাপ্ত হয়েও তার বহু উর্ধ্বে। এ-মতের নাম দে'য়া যেতে পারে অতিক্রান্ত-অনুস্যূতিবাদ বা অতিক্রান্ত-অনুস্যূত-ঈশ্বরবাদ। এই তিনটি প্রচলিত মতের একটু বিস্তারিত আলোচনা আমরা এখন করতে চাই।

ঈশ্বরের অতিক্রান্তিবাদ

ঈশ্বর অসীম ও অনন্ত, জীবজগৎ সান্ত ও সীমিত। ঈশ্বর পূর্ণ ও দোষবর্জিত, জীবজগৎ অপূর্ণ ও দোষযুক্ত। এভাবেই ঈশ্বর ও জীবজগতের স্বভাবে আকাশ-পাতাল ব্যবধান। তাই ঈশ্বর বিশ্বের স্রষ্টা, একথা মেনে নিয়ে বলতে হয়: তার সৃষ্ট জগতের, তার সৃষ্ট জীবের তিনি সম্পূর্ণরূপে অতীত। সৃষ্টি ও স্রষ্টার এই তফাৎ স্বীকার না করলে স্রষ্টা স্রষ্টা থাকতে পারে না, সৃষ্টিও সৃষ্টি থাকতে পারে না। তাই ঈশ্বরের অনন্ত মহিমা, তাঁর সর্বজ্ঞত্ব, তাঁর সর্বশক্তিমত্তা, তাঁর পূর্ণতা তাঁর কল্যাণগুণনিদানতা অক্ষুণ্ণ রাখবার উদ্দেশ্যে অনেক দার্শনিক ঈশ্বরের সত্তা, তাঁর স্বভাব, তাঁর সৃষ্ট জীব-জগতের সম্পূর্ণরূপে অতীত বলে বলেছেন। ঈশ্বর

বিশ্বের ভিতর পরিব্যাপ্ত হলে দুনিয়ার যত দোষ-ত্রুটি, যত অসম্পূর্ণতা সমস্ত তাতে আরোপিত হবে। ঠিক একই কারণে ঈশ্বরের সত্তা জীবের বা মানুষের অন্তর্নিহিত হলে মানুষের সব দোষ-ত্রুটি, যত অপূর্ণতা সমস্ত তাতে আরোপিত হবে। এ-মতের অনুগামী ও ব্যাখ্যাতারা সূর্য ও সূর্যের আলোকে উদ্ভাসিত আমাদের চক্ষুর দৃষ্টান্তের সাহায্যে ঈশ্বরের সঙ্গে জীবন জগতের তফাৎ বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। তাঁরা বলেছেন, সূর্যের আলো ছাড়া যখন আমরা দেখতে পারি না, তাই সূর্য আমাদের সকলের চক্ষু, তথাপি আমাদের চোখের নানা দোষত্রুটি সূর্যে আরোপ করা যায় না, ঠিক এভাবেই ঈশ্বরে জীব-জগতের দোষ-ত্রুটিও আরোপ করা যায় না।

তাই জীবের শেষ লক্ষ্য ঈশ্বরের সান্নিধ্যলাভ। জীব কখনও ঈশ্বরের অংশ হতে পারে না, আর জীবের ঈশ্বরত্ব লাভ সুদূরপরাহত। তাই জীবের চরম লক্ষ্য ঈশ্বরের সেবকত্ব। ঈশ্বর প্রভু, জীব তার সেবক ঈশ্বর দিন-দুনিয়ার মালিক, জীব তাঁর বান্দা।

বিভিন্ন ধর্মের ভিতর তাদের নানা শাখা-প্রশাখায়, নানা সাধনার স্তরে এই মতের স্বীকৃতি দেখতে পাওয়া যায়। ভারতীয় দর্শনে তেরো শতকে দাক্ষিণাত্যের ধর্মানুরাগী, ধর্মপ্রচারক, দার্শনিক মধ্বমুনি এই ঈশ্বর অতিক্রান্তিবাদের একজন বড় সমর্থক ছিলেন। খ্রীস্টীয় সতেরো ও আঠারো শতকে বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে কিছুটা তাল মিলিয়ে চলার উদ্দেশ্যে অনেক খ্রীস্ট ধর্মব্যাখ্যাতাই ঈশ্বর-অতিক্রান্তিবাদ প্রচার করেছেন। স্বয়ং নিউটন এ-মতের এক বড় সমর্থক ছিলেন বলে মনে হয়। তিনি বলেছেন: সৃষ্টির আদিমতম মুহূর্তে ঈশ্বর গ্রহ-তারা নক্ষত্র সৃষ্টি করে মহাশূন্যে তাদের নিক্ষেপ করেছেন, আর তারা ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাঁরই ইচ্ছার প্রভাবে, প্রাকৃতিক নিয়ম সে-ইচ্ছারই অভিব্যক্তি।

সতেরো শতকে আধুনিক বিজ্ঞান যখন প্রমাণ করে দিলো যে, অলৌকিক কোন ঘটনা থাকতে পারে না, কারণ সারা জগতই প্রাকৃতিক নিয়মে চালিত ও নিয়ন্ত্রিত, তখন সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের ইচ্ছার সঙ্গে প্রাকৃতিক নিয়মের একটা সামঞ্জস্য বিধান করার প্রয়োজন ধার্মিক লোকেরা অনুভব করলেন। তাঁরা তখন বলতে আরম্ভ করলেন: ঈশ্বর-বিশ্বাসের সঙ্গে অলৌকিক ঘটনার কোন যোগসূত্র নাই, সমস্ত ঘটনাই প্রাকৃতিক নিয়মে সংঘটিত। তবে এ-মতের সঙ্গে ঈশ্বর-বিশ্বাসের কোন বিরোধ নাই, কারণ প্রাকৃতিক নিয়মগুলো ঈশ্বরের ইচ্ছা ছাড়া আর কিছুই নয়। আঠারো শতকের প্রথম ভাগে বার্কলি জড় বাহ্যজগতের সত্তা বেমালুম উড়িয়ে দিয়েও দেখাতে চেয়েছেন: প্রাকৃতিক নিয়মগুলো বিশ্ব-স্রষ্টা ঈশ্বরের ইচ্ছা ছাড়া আর কিছুই নয়।

একদিন অলৌকিক ঘটনায় বিশ্বাসই ছিল ধর্মবিশ্বাসের এক মূল কথা। অলৌকিক ঘটনার সম্ভাবনা প্রমাণ করার উদ্দেশ্যেই এগারো শতকের প্রসিদ্ধ মুসলিম দার্শনিক ইমাম গাজ্জালী কার্যকারণ নিয়মের বাধ্যবাধকতা অস্বীকার করেছিলেন। বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে যখন অলৌকিক ঘটনায় বিশ্বাস অযৌক্তিক হয়ে হয়ে দাঁড়ালো, তখন প্রকৃতির নিয়মগুলোকে ঈশ্বর-ইচ্ছার অভিব্যক্তি ব'লে মেনে নিয়ে বিশ্বাস চালু রাখা হোল। এভাবেই আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগের শুরুতে য়ুরোপে অতিক্রান্ত-ঈশ্বরবাদের সূচনা ও প্রচার।

প্রকৃতির নিয়মগুলোর ভিতর ঈশ্বরকে সাক্ষাৎভাবে পাওয়া যায় না. আর কোন বৈজ্ঞানিক উপায়েও প্রকৃতির নিয়মের ভিতর ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় না। ধর্মবুদ্ধি চিন্তাশীল লোকেরা আধুনিক বিজ্ঞানের চাপে একথা তাই মেনে নিলেন যে, ঈশ্বর হঠাৎ একদিন তাঁর স্বতন্ত্র স্বাধীন ইচ্ছায় মহাশূন্যে বিশ্ব সৃষ্টি করলেন, আর সেই বিশ্বকে চালু রাখার জন্যে তার উপর অলঙ্ঘ্য অব্যর্থ প্রাকৃতিক নিয়মের এক ইস্পাতের কাঠামো ও চাপিয়ে দিলেন—যার ফলে তিনি সারা দুনিয়ার বাইরে থেকেও তার প্রশাসক ও পরিচালক।

বিশ্বসৃষ্টির জন্য ঈশ্বর দুনিয়ার স্তরে একটুক্ষণের জন্য করুণায় নেমে এসেছিলেন, আর তাঁর সে-কাজ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি আবার স্বর্গে দিব্য সিংহাসনে চলে গেছেন। সহজ কথায় এই হলো ঈশ্বরের অতিক্রান্তিবাদের সারমর্ম।

অতিক্রান্তিবাদের বিরুদ্ধে আপত্তি

অতিক্রান্তিবাদের বিরুদ্ধে মূল আপত্তি দুটি: একটি ধর্মীয়, আরেকটি বৈজ্ঞানিক। জগতের বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্রে ও ধার্মিক মহাপুরুষদের জীবনে ঈশ্বর-প্রেমই ধর্মের লক্ষ্য, এ-কথা বার বার বিঘোষিত দেখতে পাওয়া যায়। প্রেম প্রেমিক ও প্রেমিকার, আশেক ও মা'শুকের ভিতর এক নিকট সম্বন্ধ স্থাপন করতে চায়, এ-কথা সর্বজনবিদিত। ঈশ্বর যদি সম্পূর্ণরূপে জীব ও জগতের অতীত হন, তা'হলে ঈশ্বরের সঙ্গে জীবের এই নিকট সম্বন্ধ স্থাপনের কোনও সম্ভাবনা থাকতে পারে না। তাই অতিক্রান্তিবাদ সত্য হলে বহু সাধনায় জীব বড় জোর ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করতে পারে, তাঁর সঙ্গে প্রেমে একাত্মতা লাভ করতে পারে না। তাই বৈষ্ণব ধর্মের ব্যাখ্যাতারা বলেছেন: সেব্য-সেবক ভাব ঈশ্বর-অনুরাগের আদি পর্ব, শেষ পরিণতি নয়। এই তো গেল ঈশ্বর অতিক্রান্তিবাদের বিরুদ্ধে ধর্মীয় আপত্তি।

অতিক্রান্তিবাদের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় আপত্তি বৈজ্ঞানিক। একদিন বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার সঙ্গেই ঈশ্বরকে বিশ্বের অতীত, তার আকস্মিক স্রষ্টা বলে কল্পনা করা হয়েছিল। কিন্তু আজকের দিনের বিজ্ঞানের সঙ্গে ঈশ্বরের এই ধারণাকে মোটেই খাপ খাওয়ানো যায় না। বিজ্ঞানের বিবর্তনবাদ আকস্মিক সৃষ্টিবাদকে উড়িয়ে দিয়েছে। আজ আমরা এ-কথা বিশ্বাস করি না: সর্বশক্তিমান ঈশ্বর একদিন বিশ্বসৃষ্টি করে তাঁর দে'য়া প্রাকৃতিক নিয়মের উপর সে-সৃষ্টি পরিচালনার ভার দিয়ে স্বর্গে তার স্বর্ণসিংহাসনে স্বমহিমায় পুনরায় প্রতিষ্ঠিত। এ-ধারণা বিবর্তনের নীতির নেহাৎ বিরোধী। বিবর্তনবাদ অনুসারে বস্তুর অভিব্যক্তির বীজ অনেকটা তার নিজেরই ভিতরে, যেমন আমাদের দেহকোষগুলো নিজেরই প্রভাবে বাহির থেকে অভিব্যক্তির উপাদান সংগ্রহ করে বেড়ে চলেছে। কাজেই আজকের দিনের মনোবৃত্তি নিয়ে যদি ঈশ্বরের কল্পনা করতে হয়, ত'াহলে তাকে দুনিয়ার বাইরে আকাশের উপর রাখা চলে না, আকাশ থেকে নামিয়ে তাঁকে নিয়ে আসতে হবে তারই সৃষ্ট এই মাটির পৃথিবীতে, আর এই মাটির পৃথিবীর ধুলোর স্পর্শে তাঁর বিশুদ্ধি টিকবে কি-না তা সত্যিই ভেবে দেখার কথা।

তাই অতিক্রান্ত ঈশ্বরবাদের প্রতিক্রিয়া হয়েছে ঈশ্বরের অনুস্যূতিবাদে। অতিক্রান্তিবাদীদের মতে ঈশ্বর পঙ্কিল, পাপময় জগতের পুরোপুরি বাইরে, এ-জগতে থেকে তাঁর সে পাপমুক্ত মহান স্বরূপের নাগাল পাওয়াই আমাদের পক্ষে অসম্ভব; আর অনুস্যূতিবাদীদের মতে ঈশ্বর সারা জগতে পরিব্যাপ্ত, তাই তাঁর বিশ্বের অতীত কোন সত্তাই আসলে নাই।

বিশ্ব ঈশ্বরের সত্তায়ই পরিব্যাপ্ত, ঈশ্বর ছাড়া তার আর কোন উপাদান নাই, এটাই হলো অনুস্যূতিবাদের মূল কথা। এইজন্যে এ-মতের আর এক নাম সর্বেশ্বরবাদ, ইংরেজীতে যাকে বলে 'প্যানথিজ্‌ম্'।

এই অনুস্যূতিবাদের কথা উপনিষদে বার বার ঘোষিত। সুপ্রাচীন ছান্দোগ্য উপনিষদে এ-মত শাণ্ডিল্যবিদ্যা নামে বর্ণিত। ঋষি শাণ্ডিল্য এ-তত্ত্ব জেনে মুক্তি লাভ করেছিলেন শোনা যায়। শাণ্ডিল্যবিদ্যায় অতি সংক্ষেপে সর্বেশ্বরবাদের মূল কথা বর্ণিত। সেখানে আছে:

"সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত।"

এর অর্থ হলো: "এ-জগতের সব বস্তুই, সেই পরম সত্তা, ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুই নয়। সেই পরম সত্তা থেকেই জগতের জন্ম, সেই পরম সত্তাতেই জগতের স্থিতি, আর সেই পরম সত্তাতেই জগতের লয়। কাজেই আমরা যাকে ভালো বলি, তার প্রাপ্তিতে উল্লসিত না হয়ে, আর যাকে মন্দ বলি তার প্রাপ্তিতে বিচলিত না হয়ে শান্তভাবে সেই পরম তত্ত্বের উপাসনাই কর্তব্য।"

মওলানা রুমী ও ইবনুল আরাবী প্রভৃতি মরমীবাদীরা যে এ-মতের সমর্থক ছিলেন, নির্বিশেষ একত্ববাদের আলোচনায় আমরা তা আগেই ইঙ্গিত করেছি। সর্বেশ্বরবাদ নিয়ে ইকবালেরও দার্শনিক চিন্তার সূচনা।

পাশ্চাত্য দর্শনে স্পিনোজার ভিতর এই অনুস্যূতিবাদের অকুণ্ঠ সমর্থন পাওয়া যায়। স্পিনোজার মতে, পরম তত্ত্ব ঈশ্বর সারা জগতে পরিব্যাপ্ত : জ্যামিতির ত্রিভুজের সঙ্গে তার ত্রিকোণের যে সম্বন্ধ, ঈশ্বরের সঙ্গেও জগতের সেই সম্বন্ধ।

অনুস্যূতিবাদে জগতের দুইরূপ

অনুস্যূতিবাদের মতে, জগৎকে আমরা দুই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে পারি। একটি হলো অজ্ঞানের দৃষ্টি, আর একটি হলো জ্ঞানের দৃষ্টি। অজ্ঞানের দৃষ্টিতে আমাদের ভিতর ঈশ্বরের অনুভূতি নাই, ঈশ্বর তখন আমাদের কাছে শুধু একটি কথার কথা· তখন আমরা ঈশ্বরকে দেখি না, জগৎকেই দেখি, গাছ-পাথরই দেখি, তার পিছনে কোনও তত্ত্ব দেখি না। কিন্তু যখন আমরা জ্ঞানের দৃষ্টিতে জগৎকে দেখি, তখন আমাদের কাছে জগৎ আর থাকে না, গাছ-পাথর আর থাকে না, তখন আমাদের এক সর্বব্যাপী চিন্ময় ঈশ্বর সত্তারই উপলব্ধি হয়। এজন্যে অনেকে মনে করেন, অনুস্যূতিবাদের মতে ঈশ্বরই আছেন, জগৎ নাই। সেজন্যে তাঁরা এ-মতের আর এক নাম দিয়েছেন বিশ্ব-নিষেধবাদ, অর্থাৎ বিশ্বমিথ্যাত্ববাদ—যার আলোচনা আমরা আগে করেছি।

ঈশ্বরের অনুস্যূতিবাদ বা সর্বেশ্বরবাদের বিরুদ্ধে অনেক রকম আপত্তি সমালোচকদের মুখে শোনা যায়। তাঁরা অনেকেই মনে করেন, এ-মত অত্যন্ত ধর্ম-বিরোধী। গাছ-পাথর, ঘটীবাটী সবকেই যদি আমরা ঈশ্বর বলে মনে করি, তা'হলে ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব আর রইল কোথায়? মুসলিম দর্শনে আশারী-পন্থীরা মুতাযিলাপন্থীদের ঈশ্বরের সর্বব্যাপিত্বের বিরুদ্ধে এই আপত্তিই তুলেছিলেন। তাঁরা বলেছেন, ঈশ্বর সর্বব্যাপী হতে পারেন না, তা'হলে তিনি অত্যন্ত অপবিত্র স্থানেও আছেন, এ-কথা স্বীকার করতে হয়, আর অপবিত্র স্থানে থাকলে ঈশ্বরের সত্তা তাতে অপবিত্রই হয়ে যাবে। সর্বেশ্বরবাদের বিরুদ্ধে পাশ্চাত্য ঈশ্বরবাদীদের ভিতর এ-জাতীয় উগ্র সমালোচনা প্রচুর।

কিন্তু এ-আপত্তি অমূলক বলেই মনে হয়। কারণ ঈশ্বর-অনুস্যূতিবাদ বা সর্বেশ্বরবাদের মতে, দুনিয়ার সমস্ত জিনিস তাদের জড় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যরূপে ঈশ্বর বলে বিবেচিত হয়নি। এ-মতে জ্ঞানের দৃষ্টি নিয়ে জগৎকে আমরা যখন দেখি তখনই জগৎ ঈশ্বরের সঙ্গে এক হয়, অজ্ঞানের দৃষ্টিতে নয়। সুতরাং সর্বেশ্বরবাদ দুনিয়ার সসীম, অপূর্ণ বস্তুসমূহকে ঈশ্বর বলে উপাসনা করে, এ-কথা বলা অসঙ্গত।

সর্বেশ্বরবাদে নীতি ও ধর্মের পরিণতি

অনেকে আবার বলেছেন যে, সর্বেশ্বরবাদীদের মতো আমরা যদি সব বস্তুকে ঈশ্বর বলে ধরে নেই, তা' হলে ভালো-মন্দের, পাপ-পুণ্যের, শুভ-অশুভের তফাৎ আর থাকে না, অথচ এ-তফাৎই নৈতিক বোধের ভিত্তি. তাই তাঁদের মতে সর্বেশ্বরবাদ অত্যন্ত নীতি-বিরোধী। এ-সমালোচনাও সমর্থনযোগ্য নয়। আজকের দিনে অনেকেই বলে থাকেন, ভালোমন্দের তফাৎ আপেক্ষিক, অবস্থা-সাপেক্ষ। এক অবস্থায় যাকে ভালো বলা যায়, আর এক অবস্থায় তাকে মন্দও বলা চলে, এক অবস্থায় যাকে আমরা মঙ্গলকর বলে মনে করি, অন্য অবস্থায় তা অমঙ্গলকর বলে বিবেচিত। সুতরাং ভালো-মন্দের শুভ-অশুভর, পাপ-পুণ্যের কোন অবস্থা-নিরপেক্ষ মাপকাঠি নাই। অতএব সর্বেশ্বরবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা যখন দুনিয়ার সব জিনিসকে ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত করে দেখতে অভ্যস্ত হবো, তখন যদি পাপ-পুণ্য, শুভ অশুভ ও ভালো-মন্দের তফাৎ চলে যায় তাতে ক্ষতি কি? নৈতিক জীবনের শুরুতেই আমরা পাপ-পুণ্যের তফাৎ দেখি, মঙ্গল-অমঙ্গলের তফাৎ দেখি, শুভ-অশুভর তফাৎ দেখি; কিন্তু আমরা যখন নৈতিক পূর্ণতা লাভ করি, তখন আমাদের দৃষ্টির কাছে পাপ ও পুণ্য, শুভ ও অশুভ, ভালো ও মন্দ বলে কিছু থাকে না। এ মনোভাবে অনু-প্রাণিত হয়েই এক দার্শনিক বলেছেন: পশুর নীতিবোধ নাই, পশু নীতিশাস্ত্রের আওতায় পড়ে না, কারণ ভালো-মন্দের বোধই তার নাই; আর ফেরেস্তারাও নীতিশাস্ত্রের আওতার বাইরে, কারণ তাঁরা ভালো-মন্দের অতীত।

ভালো-মন্দের তফাৎ, পাপ-পুণ্যের তফাৎ, মঙ্গল-অমঙ্গলের তফাৎ সামনে রেখে মানুষ ভাল হবার চেষ্টা করতে পারে, কিন্তু তার দৃষ্টি যখন খুব উপরে ওঠে, তখন এ তফাৎ তার কাছ থেকে চলে যায়, তখন সব জিনিসকেই সে ভালো দেখে। ভালোর প্রতি আকর্ষণ আর মন্দের প্রতি বিকর্ষণ মানুষের ইতিহাসে অনেক কলহ-বিবাদ, অনেক রেষারেষির এক বড় কারণ। যাঁদের দৃষ্টি উদার, মানুষের অজস্র দুর্বলতাকে যাঁরা অনুভূতির উচ্চস্তর থেকে দেখতে অভ্যস্ত হয়েছেন, তাঁরা মন্দকে ঘৃণা করেন না, বরং তাকে সহানুভূতির চোখে দেখে থাকেন। বুদ্ধের মৈত্রীর হয়তো এখানেই চরম সার্থকতা।

নীতিবোধ ও ধর্মবোধের একদল ব্যাখ্যাতা খুব জোরের সঙ্গে বলেছেন, শুভাশুভের অতীত অবস্থা একটি আছে—যেখানে ভালো-মন্দের, বিধি-নিষেধের তফাৎ থাকে না। ধর্ম-প্রভাবিত দার্শনিক চিন্তায় এ অবস্থার নাম নিস্ত্রৈগুণ্য; যিনি এই পথের পথিক তাঁর কাছে ভালোও নাই, মন্দও নাই—তিনি এ-দু'য়েরই অতীত।

নৈতিক জীবনের চরম পরিণতিতে পাপের জ্ঞান থাকাটাই অপূর্ণতার লক্ষণ, যেমন পাপের জ্ঞান না থাকাটাই তার আদি পর্বে অপূর্ণতার লক্ষণ। আধুনিক পদার্থ-বিদ্যায় আছে: খুব নীচু আওয়াজ যেমন আমরা শুনতে পাই না, খুব জোরালো আওয়াজও আমরা তেমনি শুনতে পাই না। খুব নীচু আওয়াজ আমরা শুনতে পাই না, কারণ তা আমাদের শ্রবণ ইন্দ্রিয়ের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে না, আর খুব উঁচু আওয়াজও আমরা শুনতে পাই না, কারণ তা গ্রহণ করার ক্ষমতা আমাদের শ্রবণ-ইন্দ্রিয়ের নাই। ঠিক তেমনি বলা যেতে পারে, নৈতিক জীবনের নিম্নস্তরে পাপ-পুণ্যের তফাৎই আমরা ধরতে পারি না, আর তার অতি উচ্চস্তরে সে-তফাৎ আমাদের নজরেই পড়ে না।

অনুস্যূতিবাদের চরম সার্থকতা

আমাদের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ অনুভূতি নিঃস্বার্থ প্রেম, সর্বেশ্বরবাদ সে প্রেমের দৃষ্টি, সে শুভবুদ্ধি আমাদের ভিতর জাগিয়ে দেয়। আমরা যখন সব বস্তুকে ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত করে দেখি, তখন ছোট-বড়র-জ্ঞান, পাপ-পুণ্যের জ্ঞান, আর তার অপরিহার্য ফল রেষারেষি ও সংঘর্ষ, আমাদের কাছে থাকে না। এ-অনুভূতি আমাদের ধর্মীয় বোধ ও নীতিবোধের চরম পরিণতি।

বিশ্বে যত মহাপুরুষ, তাঁদের সকলের জীবনেই পাপী-তাপীর প্রতি গভীর সমবেদনা দেখতে পাওয়া যায়। এ থেকে এ-কথাই প্রমাণিত হয় যে, নীতি-বোধ ও ধর্মীয় বোধের চরমস্তরে পাপ-পুণ্যের তফাৎ, ভালো-মন্দের তফাৎ, শুভ-অশুভের তফাৎ থাকে না। কাজেই যাঁরা নিজেদের জীবনে পাপ পুণ্যের দ্বন্দ্বে, ভালো-মন্দের দ্বন্দ্বে বিপর্যস্ত, তাঁরাই এ দু'য়ের তফাৎকে নীতি ও ধর্মের শেষ কথা বলে মনে করেন। কিন্তু যাঁরা নৈতিক ও ধর্মীয় জীবনে পূর্ণতা লাভ করেছেন, তাঁরা পাপ-পুণ্যের, ভালো-মন্দের, শুভ-অশুভর দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত, আর তাঁদের সার্বিক প্রেমের, কল্যাণবোধের দৃষ্টিতে পাপ-পুণ্যের তফাৎ তিরোহিত, তাঁদের কাছে সবই ভালো, সবই মঙ্গলময়। স্পিনোজা এ দৃষ্টিকোণ থেকেই বলেছেন: আমরা যাকে মন্দ বলি, সেটা অজ্ঞানের প্রভাবে চরম-তত্ত্বের স্বাভাবিক কল্যাণময় স্বরূপের বিকৃতি ছাড়া আর কিছুই নয়।

অনুস্যূতিবাদে অতিক্রান্তি

যাই হোক, ঈশ্বরের অনুস্যূতিবাদের ভিতর অতিক্রান্তির কথাও আছে। অতিক্রান্তিবাদে ঈশ্বরকে জগতের দোষ-ত্রুটির সঙ্গে না মিশিয়ে ফেলার যে চেষ্টা, তা ঈশ্বর-অনুস্যূতিবাদেরও পুরোপুরি সার্থক, কারণ ঈশ্বরের অনুভূতিতে ভালো-

মন্দের দ্বন্দ্বে জর্জরিত অপূর্ণ, দোষ-যুক্ত জগৎ ত আর থাকে না, তখন আমরা যে জগৎ দেখি, তা ঈশ্বরের পূর্ণতা দ্বারাই পরিব্যাপ্ত। সে জগৎ আমাদের অভিজ্ঞতার জগতের পুরোপুরি বাইরে, তাই আমাদের অভিজ্ঞতার জগতের দোষ-ত্রুটি সেখানে নাই। সুতরাং যাকে আমরা ঈশ্বর-অনুস্যূতিবাদ বলি, তা একদিকে যেমন অনুস্যূতিবাদ, আর একদিকে তেমনই উৎক্রান্তিবাদ।

পাশ্চাত্ত্য ঈশ্বরবাদী দার্শনিকরা এ সমন্বয়ের প্রতি এতই আকৃষ্ট যে, তাঁরা একে বিশেষ অর্থে ঈশ্বরবাদ বলে অভিহিত করেছেন। তাঁদের বক্তব্য হলো: ঈশ্বর-অতিক্রান্তিবাদ ও ঈশ্বর-অনুস্যূতিবাদের কোনটাই সত্যিকার ঈশ্বরবাদ নয়, অনুস্যূতি ও অতিক্রান্তির সমন্বয়ই সত্যিকার ঈশ্বরবাদ। এখন আমরা এ মতের একটু আলোচনা করতে চাই।

অতিক্রান্তি ও অনুস্যূতির সমন্বয়

ঈশ্বরের অতিক্রান্তি ও অনুস্যূতির সমন্বয়ের সমর্থকরা মনে করেন যে, ঈশ্বরের সম্বন্ধে তাঁদের ধারণা খুবই যুক্তিসঙ্গত, কারণ তাঁরা সর্বেশ্বরবাদীদের মতো ঈশ্বরকে জগতের সঙ্গে পুরোপুরি এক করে ঈশ্বরের মাহাত্ম্য ক্ষুণ্ণ করেননি, আর অতিক্রান্তিবাদীদের মতো তাঁরা ঈশ্বরকে একেবারে বিশ্বের বহু ঊর্ধ্বে তুলে মানুষের সঙ্গে তাঁর নিকট, নিবিড় যোগস্থাপনের পথও বন্ধ করেননি।

এ-দৃষ্টিকোণ থেকেই এ-মতের আর এক নাম অংশ-অংশিত্ববাদ। ঈশ্বর অংশী, আর সারা বিশ্ব তার অংশ, এটাই হলো এই সমন্বয়বাদীদের মত। গীতাতেও এ-মতের সুস্পষ্ট উল্লেখ। সেখানে আছে: "একাংশেন স্থিতো জগৎ" অর্থাৎ ঈশ্বরের সত্তার এক অংশে সারা বিশ্বজগৎ বিদ্যমান। তাই ঈশ্বরের সত্তা জগতেই পর্যবসিত নয়, জগতের সত্তা ঈশ্বরে পর্যবসিত। ঋগ্‌বেদেও এ-মতের সুস্পষ্ট উল্লেখ। এ সারা বিশ্ব ও তার বিভিন্ন শ্রেণীর জীবেরা সেই ব্রহ্মের একপাদ, অর্থাৎ তার এক চতুর্থাংশ, আর এ-বিশ্বের অতীত অমৃতময় স্বর্গলোকে তার সত্তার বাকী তিন পাদ অর্থাৎ তিন-চতুর্থাংশ অবস্থিত। গণিতের ভগ্নাংশের সাহায্যে ঈশ্বরের সত্তার মাপ-জোঁক করার এখানে যে চেষ্টা, তাকে নিশ্চয়ই আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করা চলে না। এ-বর্ণনা রূপক, আর এ রূপকের আসল অর্থ: ঈশ্বরের সত্তা শুধু বিশ্বে পরিব্যাপ্ত-নয়। বিশ্বের অতীতও।

সমন্বয়বাদে ধর্ম ও নীতিবোধ

এ-মতের অনুগামীরা আরও বলেন: ঈশ্বরকে কিছুটা জগতের ভিতরে ও কিছুটা জগতের বাইরে রাখার ফলে পাপ-পুণ্যের তফাৎ তারা ভাল করেই

রাখতে সক্ষম, আর এ পাপ-পুণ্যের অনুভূতি যদি সত্যিই নীতিবোধের দৃঢ় ভিত্তি হয়, তা'হলে নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে অতিক্রান্তি ও অনুস্যূতির সমন্বয়বাদ খুবই গ্রহণযোগ্য। তাঁরা মনে করেন পাপ ও পুণ্যের বোধ ছাড়া ধর্ম অনুষ্ঠানও হয় না, কারণ তাঁদের মতে পাপের শাস্তি আর পুণ্যের পুরস্কার ধর্মের অপরিহার্য অঙ্গ ও উপাদান। তাই ঈশ্বর-অনুস্যূতিবাদীদের মতো তাঁরা ধর্ম ও নীতিবোধকে উড়িয়ে দেন না। সহজ কথায়, এ-সমন্বয়বাদ যুক্তির, নীতিবোধের ও ধর্মীয়-বোধের দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রহণযোগ্য। এক কথায়, ঈশ্বরের সম্বন্ধে তার বুদ্ধির সাহায্যে মানুষ এর চেয়ে উচ্চতর ধারণা আর কিছু করতে পারে না, এটাই হলো এ-সমন্বয়বাদীদের মূল বক্তব্য।

সমন্বয়বাদে যুক্তিদোষ

আমরা আগেই দেখিয়েছি যে, ঈশ্বর-অনুস্যূতিবাদ বা সর্বেশ্বরবাদ বলে যা পরিচিত, তার ভিতরও ঈশ্বরের অতিক্রান্তির কথা আছে, তারও নৈতিক ও ধর্মীয় ভিত্তি দৃঢ়। কাজেই সেই আলোচনার এখানে পুনরাবৃত্তি করতে চাই না। শুধু যুক্তির তরফ থেকে এ-জাতীয় সমন্বয়বাদের বিরুদ্ধে যে আপত্তি উত্থাপিত হয়েছে, তার কথা এখানে একটু আলোচনা করতে চাই।

অনেকে বলেন : ঈশ্বরের উপর অংশ-অংশিত্বের ফরমুলা চাপানো যায় না। ঈশ্বরের এক অংশে যদি জগৎ থাকে, তা'হলে ত সেই অংশে জগতের দোষ ও অপূর্ণতা থেকেই গেল। কিন্তু সবচেয়ে আশঙ্কার কথা এই যে, ঈশ্বরের যদি অংশ থাকে, তা'হলে অন্য সব অংশবান পদার্থের মতো ঈশ্বরও অনিত্য ও পরি-বর্তনশীল হয়ে পড়বেন। তাই জড়-জগতে প্রযোজ্য অংশ-অংশিত্বের ফরমুলা ঈশ্বরের উপর চাপানো যায় না। চেতন ঈশ্বরের কোন অংশ নাই, কাজেই তাঁর এক ভাগে জগৎ আছে, আর এক ভাগে নাই, এ-উক্তি হয় নেহাত রূপক, আর না হয় নেহাত জড়বাদী দৃষ্টিরই ঈশ্বরের উপর আরোপ। তবেই সর্বেশ্বরবাদ ঈশ্বরের অনুস্যূতি ও উৎক্রান্তির যে ইঙ্গিত পাওয়া যায়, তার মাধ্যমেই সম্ভবতঃ ঈশ্বরের সঙ্গে জীব-জগতের যোগসূত্র বুদ্ধির মাধ্যমে কিছুটা বোঝা যায়।

ঈশ্বরের স্বরূপ মানুষের বুদ্ধির অগম্য, এ-কথাই জগতের সমস্ত ধর্মশাস্ত্রে বার বার বর্ণিত ও বিঘোষিত। আমরা আমাদের বুদ্ধির সাহায্যে সে-সত্তার শুধু একটু ইঙ্গিত পাবার চেষ্টা করতে পারি। ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে দর্শনশাস্ত্রে প্রচলিত মতগুলোর ভিতর এ-চেষ্টাই অল্প-বিস্তর বর্তমান। বুদ্ধির সাহায্যে ঈশ্বরের সম্বন্ধে আমাদের যে ধারণা হয়, তার ভিত্তিতে অনুভূতির মাধ্যমে ঈশ্বরের

সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ-যোগ, এ-কথা ঈশ্বরের প্রমাণ-আলোচনায় আমরা দেখাবার চেষ্টা করেছি।

ঈশ্বরবাদে মন-গড়া মুস্কিল

অতিক্রান্তি-অনুস্যূতিবাদীরা কখন কখন আবার এক মনগড়া মুস্কিলে পড়ে' এক তথাকথিত সমাধান পাবার জন্তে মাথার ঘাম পায়ে ফেলেছেন। তাঁদের একদল সোজাসুজি সরলভাবে ঈশ্বরের উৎক্রান্তি ও অনুস্যূতি মেনে নিয়েছেন। কিন্তু তাঁদের আরেক দল চলতি ধর্মীয় নীতিবোধের চাপে এ-মত করেননি। তাঁরা মনে করেন, মানুষের ভিতর ঈশ্বর যদি থাকেন, তা'হলে মানুষের ইচ্ছা ঈশ্বরের দ্বারা পরিব্যাপ্ত হয়ে যাবে, ফলে মানুষ তার পাপ-পুণ্যের জন্ম নিজে দায়ী থাকবে না, ঈশ্বরই দায়ী হবেন। কাজেই এ দলের দার্শনিকরা বলেন: ঈশ্বর সারাবিশ্বে অনুস্যূত, কিন্তু মানুষের হৃদয়ে নন। তাই অতিক্রান্তি ও অনুস্যূতির ফরমূলা এ মতে শুধু জগৎ সম্বন্ধেই প্রযোজ্য।

মানুষের পাপ-পুণ্যের দায়িত্ব থেকে ঈশ্বরকে অব্যাহতি দেওয়ার জন্ম, এঁরা আবার আর এক কৌশল উদ্ভাবন করেছেন। তারা বলেন: ঈশ্বর সর্বজ্ঞ হলেও তিনি মানুষের ভবিষ্যৎ জেনেও জানেন না। সর্বজ্ঞ কথার অর্থ যদি এই হয় যে ঈশ্বর মানুষের ভবিষ্যৎ জানেন, তা'হলে তো তার ভবিষ্যৎ ঈশ্বর আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছেন, আর তা'হলে তো তার পাপ-পুণ্যের দায়িত্ব মানুষের নাই। এই ধর্মসঙ্কট থেকে অব্যাহতি পাবার উদ্দেশ্যে এই দলের মনীষীরা বলেছেন: ঈশ্বর স্বেচ্ছায় মানুষকে তার উন্নতির সুযোগ দেবার জন্মে সর্বজ্ঞ হয়েও তার ভবিষ্যৎ জানেন না। এটা অনেকটা ছোট ছেলে যেমন অনেক সময় তার চোখে হাত চেপে মাকে বলে, 'মা তুমি নাই', তারই মতো। যাই হোক, ঈশ্বর নিজের ইচ্ছায় এ-বন্ধন মেনে নিয়েছেন, কাজেই এ-বন্ধন থাকা সত্ত্বেও তিনি আসলে বন্ধন-মুক্ত। ধর্মীয় প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উনিশ শতকের শেষের দিকে মার্টিনো, ফ্লিন্ট প্রভৃতি দার্শনিকরা ঈশ্বর-অনুস্যূতিবাদের এ-নতুন ব্যাখ্যা দিয়েছেন এবং তারই নাম দিয়েছেন সত্যিকার ঈশ্বরবাদ।

ঈশ্বরের ধারণার চরম সার্থকতা

এ-আলোচনা দীর্ঘতর না করে হয়তো বলা চলে যে, মানুষের যে আত্মিক প্রয়োজনে ঈশ্বরের প্রতি তার অনুরাগের উদ্রেক, যে অনুরাগের পরিণতিতে তার জীবনের সত্যিকার সাফল্য ও সার্থকতা, সে প্রয়োজনবোধের তাগিদেই ঈশ্বরের ধারণার নানাভাবে রূপায়ণ। এ-ধারণা একাধারে বুদ্ধি-প্রসূত, আবেগ-প্রসূত ও প্রয়োজন-প্রসূত, তার শুধু যৌক্তিক ব্যাখ্যা হয় না।

নানা ধর্মমত ও দার্শনিক চিন্তার জটিল পরিবেশের ভিতর ঈশ্বরের ধারণায় এই সার্থক সঙ্কেত পেয়েই ভক্তকবি আবেগ-আপ্লুত হৃদয়ে বলেছেন :

"রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজু কুটিল—
নানা পথ জুষাং।
নৃনামেকো গম্যস্ত্বমসি
পয়সামর্ণব ইব॥"

["হে ভগবান, তাদের রুচির বৈচিত্র্যই মানুষের ঋজু কুটীল নানা পথে তোমাকে সন্ধান করার কারণ, কিন্তু এটা খুব আশার কথা যে পৃথিবীর সব জলাশয়ের, সব জলের শেষ পরিণতি যেমন সাগরে, তেমনি ঈশ্বর, তুমিই সর্বজীবের শেষ আশ্রয়, তাদের শেষ গতি।"]

নিরীশ্বরবাদের মূল্যায়ন

ঈশ্বরের আলোচনা শেষ করার আগে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে নিরীশ্বরবাদের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে একটি কথা বলা প্রয়োজন। আমাদের মনে রাখা দরকার যে, ঈশ্বর মতের বিষয় নয়, অনুভূতির বিষয়। কাজেই শুধু ধর্মের বুলি আওড়ালেই ধর্মানুষ্ঠান হয় না। ঈশ্বরের সত্তা স্বীকার না করেও যদি মানুষ যথার্থ ধর্মীয় বোধের মূলে যে সংযম ও প্রেমের সাথক ইঙ্গিত, জীবনে তা অনুশীলন করে, তবে সে আপাতঃদৃষ্টিতে নিরীশ্বরবাদী হয়েও ধার্মিক। হয়তো এজন্যেই অনেক প্রেরণা-দায়ক দার্শনিক মতে, এমন কি বৌদ্ধধর্মের মতো প্রেম ও মৈত্রীর ধর্মে, ঈশ্বরের কথা সাক্ষাৎভাবে নাই। এ থেকেই বুঝা যায় যে, ধর্মের সার্থকতা মতে নয়, চরিত্রে, বাহ্য আচরণে নয়, অনুভূতিতে।

"ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম"

["ধর্ম বা ঈশ্বরের তত্ত্ব মতবাদে নাই, আছে অন্তরে, মানুষের গভীর অনুভূতিতে।"]

এ-প্রাচীন উক্তি সত্যিই গভীর ও তাৎপর্যপূর্ণ।

চতুর্দশ অধ্যায়

মূল্যবোধ

প্রয়োজনবোধ থেকেই যে তত্ত্ব নির্ণয়ের সার্থক সঙ্কেত পাওয়া যেতে পারে, একথা আমরা বার বার বলেছি। এ প্রয়োজনবোধেরই চরম সার্থকতা মানুষ খুঁজেছে স্রষ্টার ধারণার ভিতর। তাই স্রষ্টার ধারণা বিশ্লেষণের পর প্রয়োজন-বোধের আলোচনা খুবই স্বাভাবিক ও যুক্তিসঙ্গত। প্রয়োজনবোধেরই আর এক নাম মূল্যবোধ। মূল্যবোধ থেকেই প্রয়োজনবোধের উৎপত্তি। প্রাত্যহিক জীবনে যাকে আমরা যতখানি মূল্য দেই, তারই প্রয়োজন আমাদের কাছে ততখানি।

সাম্প্রতিক দর্শনে মূলবোধ এক প্রধান আলোচ্য বিষয়। অনেকের মতে, দর্শন ও বিজ্ঞানের তফাৎ এইখানে যে, বিজ্ঞান শুধু ঘটনার স্বরূপ ও স্বভাব আলোচনা করে, তার মূল্যায়ন করে না, আর দর্শন বস্তুর শুধু স্বভাব ও স্বরূপ বিশ্লেষণ করে না, তার মূল্যায়নও করে। এই মূল্যায়নই তার প্রধান কাজ, এখানেই তার বৈশিষ্ট্য। মূল্যবোধের আলোচনা দর্শনের এক প্রধান ভাগ বলে আজ তাই স্বীকৃত। এর এক লম্বা নামও দেয়া হয়েছে, একে বলা হয়, "এক্সিওলোজী" বা মূল্যতত্ত্ব। মানবিদ্যা বা মূল্যবোধবিদ্যা, এ-নামও হয়তো এ-আলোচনাকে দেয়া যেতে পারে।

দর্শনের স্বরূপ আলোচনায় আমরা দেখিয়েছি যে, পুরানো দিনের প্রাচ্যদর্শনে প্রয়োজনবোধ থেকেই দর্শনের উৎপত্তি স্বীকৃত। প্লেটো ও আরিস্টটলের মতো সেখানে দর্শনকে শুধু জ্ঞান-পিপাসা বলেই বর্ণনা করা হয়নি। কাজেই সে-অতীত যুগের প্রাচ্য দর্শনে তত্ত্ববোধ ও মূল্যবোধ অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধে জড়িত, এর কোন্‌টি অঙ্গ বা অবয়ব আর কোন্‌টি অঙ্গী বা অবয়বী তা বলাই কঠিন। এখানে ছোট-বড়োর প্রশ্ন আসলে ওঠে না। তাই এ-বিভাগ রুচি-সাপেক্ষ, তাত্ত্বিক নয়।

প্লেটো আরিস্টটলের প্রভাবে প্রভাবিত আধুনিক পাশ্চাত্ত্য দর্শনে তত্ত্ববোধ ও মূল্যবোধের সাক্ষাৎ যোগ নাই, তাই সেখানে তত্ত্ববোধের আলোচনার পরই মূল্যবোধের আলোচনা। আজকের দিনের প্রয়োজনবাদী পরিবেশে নিছক তত্ত্বালোচনায় মানুষের ঔদাসীন্য। তাই সাম্প্রতিক দর্শনে মূল্যবোধের আলোচনার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপিত। এ-মতেরই বিশেষ প্রতিক্রিয়া 'প্রাগ্‌মাটিজ্‌মে' বা প্রয়োজনবাদে।

তত্ত্ব যদি আমাদের জীবনের তাগিদ মেটাতে না পারে, তা'হলে তত্ত্ব-জিজ্ঞাসার সার্থকতা খুবই সীমিত। তাই প্রয়োজনবোধের সঙ্গে তত্ত্বের যোগ আবহমানকাল দার্শনিকরা বের করার চেষ্টা করছেন। তত্ত্ব-জিজ্ঞাসার উৎপত্তি প্রয়োজনবোধ থেকেই হোক, আর তা শুধু জ্ঞান-পিপাসা থেকেই হোক, তত্ত্বজ্ঞানের ফল যে মানুষের জীবনে সর্বাধিক এ-কথা অনেক দার্শনিকই অসঙ্কোচে স্বীকার করেছেন। তাই জ্ঞান-পিপাসার মাহাত্ম্য স্বীকার ক'রেও প্লেটো দেখিয়েছেন: আদর্শ রাষ্ট্র গঠনে ও পরিচালনায় দার্শনিক তত্ত্ববোধ অপরিহার্য প্রয়োজন। সেজন্তে প্লেটোর নির্দেশ: আদর্শ রাষ্ট্রে হয় ভাবুক দার্শনিকের মাথায় রাজমুকুট পরিয়ে দিতে হবে অথবা বাদশাহ্‌র মাথার মুকুটের উপরই দার্শনিকতার সিল-মোহর লাগিয়ে দিতে হবে। দু'রকমের কথায় মারপ্যাঁচের ভিতর প্লেটোর আসল বক্তব্য যে এক, তা বলাই বাহুল্য।

ক্যাণ্টের দর্শনে মূল্যবোধ

আধুনিক পাশ্চাত্ত্য দর্শনে মূল্যবোধের স্বাতন্ত্র্য ও সার্থকতা ক্যাণ্টের চিন্তাধারায় বিশেষভাবে বিঘোষিত। বুদ্ধির সাহায্যে তত্ত্বনির্ণয়ে অপারগ হয়ে ক্যাণ্ট একমাত্র শুভবুদ্ধি বা সদিচ্ছারই নিজস্ব মূল্য অকুণ্ঠভাবে স্বীকার করেছেন। তিনি বলেন: "বিদ্যা, ধন, বুদ্ধি, অর্থ, মান, প্রতিপত্তি অবস্থা-বিশেষে ভালো অবস্থা-বিশেষে মন্দ, কিন্তু শুভবুদ্ধি সব অবস্থাতেই ভালো। ইহ-পরকালে আর কিছুরই এমন নিজস্ব মূল্য নাই।" কিন্তু এই নিজস্ব মূল্যবোধের সার্থকতা দেখাতে গিয়ে ক্যাণ্ট শেষ পর্যন্ত ঈশ্বরের সত্তা মেনে নিয়েছেন। সুতরাং সোজাসুজি না হোক, পরোক্ষভাবে ক্যাণ্টকেও মেনে নিতে হয়েছে: আমাদের জীবনে মূল্যবোধের শেষ পরিণতি ঈশ্বর-বিশ্বাস। নানা রকম জটিল যুক্তি-তর্কের ভিতর না গিয়ে সহজভাষায় বলা চলে, এ কথার অর্থ হলো এই যে, নিজস্ব মূল্যবোধের উৎস, আদিকারণ ঈশ্বর।

এ-কথা ঠিকই যে, জীবনের তিক্ত-মধুর বিচিত্র অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে শেষ পর্যন্ত আমরা এ-ধারণায়ই উপনীত হই যে, ধন-দৌলত, মান-সম্মান প্রভাব-প্রতিপত্তি, আত্মীয়-পরিজন এসবের নিজস্ব মূল্য কিছুই নাই; এরা যদি আমাদের পূর্ণতা ও তত্ত্ববোধের পথে এগিয়ে দেয় তবেই এরা ভালো, আর এরা যদি আমাদের পূর্ণতা ও তত্ত্ববোধের পথে এগিয়ে না দেয় তা'হলে এরা মন্দের পর্যায়েই। তাই জীবনে বার বার ভুলপথে চলার তিক্ত অভিজ্ঞতা হঠাৎ একদিন এ ভুল-পথে চলা থেকে বিরত হয়ে তত্ত্বজ্ঞানের পথে এগোবার চেষ্টা।

এ যেন এক নতুন জীবনের সূচনা। বৌদ্ধশাস্ত্রে এই তত্ত্বজ্ঞানার্থীর নাম স্রোতাপন্ন, অর্থাৎ তত্ত্ববিদ্যার স্রোতে যিনি গা ঢেলে দিয়েছেন, সে-ই নবীন সাধক।

উপনিষদে চরমতত্ত্ব ও মূল্যবোধ

চরমতত্ত্বের মূল্যই যে জীবনে সর্বাধিক, তার এক উদাত্ত ও আবেগপূর্ণ বর্ণনা ছোটবেলা ছান্দোগ্য উপনিষদের নারদ ও সনৎকুমারের সংলাপে পড়েছিলাম। নিজস্ব মূল্যবোধ সম্বন্ধে এমন প্রেরণাদায়ক বর্ণনা খুব বেশী পড়েছি বলে মনে হয় না। এ-আলোচনার ভিতর তত্ত্ববোধের যে বিবৃতি, তা এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করতে চাই।

সে-পুরোনো যুগের নানাবিদ্যায় পারদর্শী হয়ে নারদ হাজির হয়েছিলেন সনৎকুমারের কাছে তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্যে। চতুর্বেদ, ইতিহাস, পুরাণ, বেদ-বিদ্যা, নক্ষত্র-বিদ্যা, ভূত-বিদ্যা, বাকোবাক্য বা তর্কশাস্ত্র, সে-দিনের বিদ্যার নানা বিভাগের জ্ঞান-লাভ করেও নারদ দুঃখে অভিভূত হয়ে সনৎকুমারকে বলেছিলেন, "আপনার মতো মহাপুরুষদের কাছে শুনেছি আত্মজ্ঞান হলে মানুষ দুঃখের পারে চলে যায়; কিন্তু আমি এতো বিদ্যা আয়ত্ত করেও দুঃখের ভিতর ডুবে আছি। আপনি আমাকে দুঃখের পারে নিয়ে যান।"

এ-দুঃখের অভিজ্ঞতা থেকেই নারদ বুঝেছিলেন যে, এ-সব বিদ্যার নিজস্ব কোন মূল্য নাই। সনৎকুমার নারদের এই অভিজ্ঞতাকে সমর্থন জানিয়ে বলেছিলেন, "তুমি ঠিকই বলেছো। তুমি কতকগুলো কথার মারপ্যাঁচই আয়ত্ত করেছো, পরম সত্য জাননি। সেই সত্যেরই নিজস্ব মূল্য আছে, অন্য কিছুর নয়।"

দীর্ঘ সংলাপের মাধ্যমে সনৎকুমার আমাদের মূল্যবোধের তারতম্যের এক বিরাট তালিকা এঁকে নারদকে বুঝিয়ে দিলেন যে, বিশ্বের পিছনে যে সর্বব্যাপী তত্ত্ব তারই মূল্য সর্বাধিক, তারই নাম ভূমা। ভূমা কথার অর্থ বৃহৎ, যার চেয়ে বড় আর কিছু হয় না। 'সনৎকুমারের মতে এই ভূমা নিজের মহিমায় 'স্বে মহিম্নি' প্রতিষ্ঠিত।

সনৎকুমার বলেছেন: "গরু অশ্ব, হস্তী, হিরণ্য, দাস, ভার্যা, ক্ষেত্র ও বাস-গৃহকে মানুষ তার মহিমা বলে মনে করে থাকে, কিন্তু এদের নিজস্ব কোন মহিমা নাই। ভূমার মহিমা এর ঠিক উল্টো, তা তার নিজস্ব স্বকীয় মহিমা। এর চেয়ে বড় কিছু হয় না:

> 'গো অশ্ব মহিমেত্যাচক্ষতে হস্তি হিরণ্য; দাসভার্যং
> ক্ষেত্রাণ্যায়তনানীতে নাহমেবং ব্রবীমি"।

এ-ভূমাকে যাঁরা জানেন, তাঁদের আর অন্য কিছুর প্রয়োজন থাকে না, তাঁরাই সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র। এ-অবস্থারই পারিভাষিক নাম স্বারাজ্য। আর যিনি এ অবস্থা লাভ করেন, তাঁকে বলা হয় স্বরাট "স স্বরাড্ ভবতি।"

ইসলামে মূল্যবোধ

এ থেকেই দেখানো হলো পরম তত্ত্বেরই মূল্য নিজস্ব, তার অতিরিক্ত মূল্য আর কিছুরই নেই। ইসলামে যে আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো উপাসনা সর্বতোভাবে নিষিদ্ধ, তার মূলেও এই মূল্যবোধ। আল্লাহ্‌তাআলার চেয়ে বড় কিছু নাই, তিনিই চরমতত্ত্ব ও মানুষের জীবনের পরম বাঞ্ছিত, অতএব তিনিই একমাত্র উপাস্য, মাবুদ, অন্য কিছু নয়, হতে পারে না।

এক উপনিষদে আছে :

"স তদ্বনং ইতি উপাসিতব্যঃ"

সেই চরম তত্ত্বকে বন বলে উপাসনা করবে।

বন কথার অর্থ জঙ্গল নয়। বন কথার অর্থ জঙ্গল ধরে নিলে আজকের দিনের মানুষের মনোবৃত্তিরই পুনরাবৃত্তি করে বলা যায়, তত্ত্বের জঙ্গলে না ঢুকাই ভালো। কিন্তু সে-যুগের মনোভাব ছিল উল্টো, তাই তাঁরা বন কথাকে এক বিশেষ অর্থে ব্যবহার করেছেন। ভাষ্যকার শঙ্কর বলেছেন : বন কথার অর্থ ভজনীয়, অর্থাৎ বাঞ্ছিত :

"তদ্বনং সম্ভজনীয়মিত্যর্থঃ।"

সত্য, শুভ ও সুন্দর

যাই হোক, এভাবে চরম সত্য বিশ্বের প্রাচীন ধর্মীয় ও দার্শনিক চিন্তায় জীবনের শ্রেষ্ঠ মান বলে স্বীকৃতি লাভ করেছে, আর তার সঙ্গে যোগ করা হয়েছে শুভবুদ্ধি ও সৌন্দর্যবোধের। কিছুদিন আগেরও শাশ্বত মূল্যবোধ-প্রভাবিত পরিবেশে শাশ্বত মানকে স্বীকৃতি দিতেই আমরা নারাজ। আমেরিকার দার্শনিক শিক্ষা-বিজ্ঞানী ডিউয়ী এ আধুনিক মনোবৃত্তির প্রতিধ্বনি করেই সম্প্রতি বলেছেন, স্থির শাশ্বত মান বলে কিছু নাই ; বর্ষার আকাশের মেঘের মতো সব মূল্যবোধই গতিশীল, স্থির নয়, স্থির হতে পারে না।

শাশ্বত ও অশাশ্বত মান

এ-আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীকে আমি যুক্তিসঙ্গত মনে করি না, সার্থক জীবন-যাত্রার জন্যে পর্যাপ্তও মনে করি না। তাই শাশ্বত মূল্যবোধের ভিত্তিতে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের পরিবর্তনশীল, চলমান মূল্যবোধকে আমি যাচাই করতে চাই।

শাশ্বত মূল্যবোধকে যাঁরা উড়িয়ে দেন, আমি তাঁদের খাতায় নাম লিখিয়ে বাহবা নিতে চাই না, কারণ এঁরা আধুনিকতা ও যৌক্তিকতার নামে অনবরত অন্ধকারে হাতড়ে বেড়ানোকেই মানুষের পরম লক্ষ্য বলে বিবেচনা করেন। বিশ্বের অতি অল্পসংখ্যক লোক, যাঁরা শাশ্বত মূল্যবোধের তাগিদে অগণিত মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের চলমান মূল্যবোধকে একেবারে উড়িয়ে দিতে চান, তাঁদের মতও আমার কাছে সমর্থনযোগ্য বলে মনে হয় না; কারণ জীবনের বিচিত্র, নানা রঙে রঙীন, আঁকাবাঁকা, তিক্ত-মধুর অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে মেঘে-ঢাকা আকাশে হঠাৎ বিদ্যুৎ-চমকানোর মতোই আমরা বাস্তব জীবনে শাশ্বত মূল্যের স্পর্শ যেন অনুভব করি। আর সে-প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত হয়েই বলি:

"নিত্যোঽনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাং
একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাঃ
তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্"

[অনিত্যের ভিতর যিনি নিত্য, সব চেতনার যিনি আকর ও উৎস, যিনি এক হয়েও এ-বহুময় জীবনের বিধাতা, সেই পরম তত্ত্ব যাঁরা অন্তরে অন্তরে অনুভব করেন, তাঁরাই শাশ্বত শান্তির অধিকারী হন, অন্যেরা নয়।]

সত্যের সুন্দরে রূপায়ণ

জীবনের প্রয়োজনবোধের তাগিদেই এ-চরম সত্যের অনন্ত সুন্দরে রূপায়ণ। এ সৌন্দর্যের অনুভূতির কথা দার্শনিক চিন্তার একেবারে আদিযুগে খুব পাওয়া যায় না। প্লেটোর ভিতর এর কিছুটা ইঙ্গিত ও অভিব্যক্তি। প্লোটাইনাসে তার আরো একটু রূপায়ণ। উপনিষদ ত এ-সুন্দরের সম্বন্ধে একেবারে নীরব।

হৃদয়ের আবেগ ও সৌন্দর্যবোধ

হৃদয়ের অনুভূতির আবেগে মানুষ তার প্রেমাস্পদকে চিরদিনই সুন্দর করে দেখার চেষ্টা করেছে। এ-সৌন্দর্যানুভূতির প্রেরণা হৃদয়ের আবেগ, তর্ক-যুক্তি নয়। ক্যান্ট তাই সৌন্দর্যবোধকে যুক্তির কাল্পনিক প্রয়োগ বলেই ধরে নিয়েছেন। তত্ত্বজ্ঞান-পিপাসার চরম পরিতৃপ্তি যেমন চরম সত্যের অনুভূতিতে, তেমনি আমাদের হৃদয়ের এই আবেগের চরম পরিণতি পরম প্রেমাস্পদকে অনন্ত সৌন্দর্যের আধার বলে জানাতে। হৃদয়াবেগ-প্রভাবিত দার্শনিক চিন্তায় অনন্ত সৌন্দর্য তাই জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ মান বলে স্বীকৃত। বৈষ্ণব দর্শনে ও সুফীদের অনুভূতিতে এ-অনন্ত সৌন্দর্য ও প্রেম চরম সত্য ঈশ্বরে আরোপিত।

সত্য ও শুভের সমন্বয়

নৈতিক প্রচেষ্টার মূলে যে শুভবুদ্ধি ও ধর্মীয় অনুভূতিতে যার পরিণতি, তার আলোকে এই চরম সত্যেরই অনন্ত কল্যাণময়ত্বে পরিণতি। ঈশ্বরের আলোচনায় আচার্য রামানুজের পরিভাষায় ঈশ্বরকে অনন্ত কল্যাণ-গুণনিদান বলে আমরা আগেই বর্ণনা করেছি। ধর্ম-প্রভাবিত সমস্ত দার্শনিক চিন্তায় বিশ্বের আদি উপাদান ও জীবনের পরম সত্তা ঈশ্বরের জ্ঞানেই যে মানুষের সমস্ত দুঃখের নিবৃত্তি ও অনন্ত আনন্দের রসাস্বাদ তা প্রায় সব সময়েই স্বীকৃত। এ থেকেই একথা সুস্পষ্ট যে তত্ত্ব শুধু চরম সত্যই নয়, অনন্ত কল্যাণময়ও।

সুতরাং অনন্ত কল্যাণগুণ ও অনন্ত সৌন্দর্যের আধার ও চরম সত্তা ঈশ্বরই যে সমস্ত মূল্যবোধের উৎস, আকর ও শেষ পরিণতি, এ-কথাই অধ্যাত্মবাদী দর্শনের সংক্ষেপে মূল বক্তব্য। এভাবেই মানুষের দৈনন্দিন জীবনের মূল্যবোধের একটা মাপকাঠি অধ্যাত্মবাদী দর্শনে বের করার চেষ্টা।

মূল্যবোধের স্বকীয়তা ও বাস্তবতা

আগেই বলেছি, এ-মূল্যবোধ অনুসারে জীবনের চরম মান চঞ্চল ও গতিশীল নয়, শাশ্বত ও সনাতন। এ-মূল্যবোধ ব্যক্তির কল্পনা নয়, এর একটা নৈর্ব্যক্তিক সত্তাও আছে, যা নিয়ে আজকাল অনেক বাগ্‌বিতণ্ডা। যাঁরা মূল্যবোধকে ব্যক্তির কল্পনা বলে মনে করেন, তাঁদের মতে মূল্যবোধ মানসকেন্দ্রিক, মোটেই বস্তুকেন্দ্রিক নয়; আর যাঁরা মানুষের অনুভূতি পুরোপুরি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল বলে মনে করেন, তাঁদের মতে মূল্যবোধ মানসকেন্দ্রিক নয়, পুরোপুরি বস্তুধর্মী।। বিষয়ের সত্তা মানসকেন্দ্রিক না বস্তুকেন্দ্রিক, এ-প্রশ্ন যেমন দর্শনের একটি মৌলিক প্রশ্ন, মূল্যবোধের কাল্পনিকতা ও বাস্তবতার প্রশ্নও ঠিক সে রকমই। তত্ত্ব-নিরূপণে আমরা এ বাস্তবধর্মী ও মানসকেন্দ্রিক দৃষ্টির বিরোধ সমন্বয়ের চেষ্টা করেছি। সেই একই ফরমুলা একটু রূপান্তরিত করে এখানে প্রয়োগ করতে চাই; নিছক আয়ুর্বেদীয় পদ্ধতিতে আমাদের দর্শনের ঔষধালয়ে তৈরী সব তিক্ত ঔষধেরই এক মিষ্টি অনুপান: মধু।

আম কি সত্যিই মিষ্টি, না আমার মুখেই আমের স্বাদ? এ-প্রশ্ন যেমন করা চলে, ঠিক তেমনি টাকার কি কোনও নিজস্ব মূল্য আছে, না আমাদের মানসিক অবস্থার উপর তার মূল্য নির্ভর করে? এ-প্রশ্নও তোলা যায়। এর উগ্র উত্তরও দু'রকমের হতে পারে, আর দু'টিকে মিশিয়ে একটা আপোষ করাও হয়তো সম্ভব। শোনা যায় আধুনিক যুগের এক উগ্র বস্তুবাদী সংস্কারক বলেছিলেন: সোনার উপর যাতে মানুষ অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ না করে, সেজন্যে অতি নগণ্য জায়গাকে

তিনি সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে রাখার ব্যবস্থা করবেন। এ থেকেই বোঝা যায়, অত্যন্ত বস্তুবাদী দৃষ্টির সঙ্গেও ভাববাদী কল্পনাকে খানিকটা যোগ করে দেয়া চলে। আসলে হয়তো মূল্যবোধ শুধু বস্তুধর্মীও নয়, শুধু মনোধর্মীও নয়, উভয়-ধর্মীই। তারুণ্যের রঙীন চশমায় সহজ বাস্তব দৃষ্টিতে যা অসুন্দর তাও সুন্দর, যা কুরূপ তাও সুরূপ হয়ে ওঠে সন্দেহ নাই, তথাপি তা সংগঠিত হয় বাস্তব সংবেদনের ভিত্তিতে। তরুণ-তরুণীর প্রেমের অভিসারের কিছুটা বাস্তব ভিত্তি একান্ত উগ্র কল্পনা-বিলাসী ছাড়া সকলেই স্বীকার করবেন। তাই মধ্যযুগীয় হিন্দুদের অধ্যাত্মবাদী প্রেমতত্ত্বে কৃষ্ণের সঙ্গে রাধার, আর রাধার সঙ্গে কৃষ্ণের যোগ অপরিহার্য বলে বিবেচিত।

মূল্যবোধ, স্বাধীন ইচ্ছা ও অমরত্ব

এই শাশ্বত মূল্যবোধে আস্থা-স্থাপনের জন্যেই জগতের প্রাচীন দার্শনিক চিন্তায় দু'টি সত্যে বিশ্বাস: (১) মানুষের স্বাধীন ইচ্ছায়, এবং (২) মানুষের আত্মার অমরত্বে। অনেকেই মানুষের স্বাধীনতা ও মানবাত্মার অমরত্ব তর্ক-যুক্তির সাহায্যে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু আসলে এ-দুটি সত্যে বিশ্বাস শাশ্বত মূল্যবোধেরই অপরিহার্য ফল। এ জগতের পিছনে যদি সর্বব্যাপী অনন্ত কল্যাণ ও সৌন্দর্যের আধার শাশ্বত সত্য কিছু থাকে, আর তার সঙ্গে নিকট যোগ স্থাপন যদি মানুষের জীবনের পরম লক্ষ্য হয়, তা'হলে সে তত্ত্বে পৌঁছবার জন্যে যে সাধনা ও তপস্যার দরকার, তা করার ক্ষমতা আমাদের থাকা চাই। আর সে-সাধনায় সিদ্ধিলাভের জন্যে মিথ্যা, পাপ, গ্লানি ও কদর্যতার বিরুদ্ধে অনন্তকাল সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়াও দরকার। মানুষের যদি স্বাধীন ইচ্ছা বলে কিছু না থাকে, আর দেহপাতের সঙ্গেই যদি মানুষের সত্তা মুছে যায়, তা'হলে এ-লক্ষ্যে পৌঁছার সম্ভাবনা কোথায়? তাই ক্যাণ্ট ঠিকই বলেছেন: মানুষের স্বাধীন ইচ্ছায় ও তার আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস যুক্তিতর্কের মারফত প্রমাণ করা যায় না, এটা তার নৈতিক জীবনেরই অপরিহার্য দাবী।

কদরবাদ ও জবরবাদ

চলতি ধর্মবিশ্বাসের মারফত মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাকে উড়িয়ে দিয়ে পাপ-পুণ্যের দায়িত্ব থেকে তাকে অব্যাহতি দেবার চেষ্টার কথা আগেই বলেছি। ধর্মের নামে অন্যের উপর অত্যাচার চালাবার উদ্দেশ্যেও কখনো-কখনো মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা উড়িয়ে দেয়া হয়েছে। কথিত আছে, হযরত ওসমানের ইন্তিকালের কিছুকাল পর উম্মীয় খলিফারা মধ্যপ্রাচ্যে জনসাধারণের উপর যে অত্যাচার

চালিয়েছিলেন, তার সমর্থনে তাঁরা ধর্মশাস্ত্রের প্রেরণাদায়ক উক্তি উদ্ধৃত ক'রে দেখাবার চেষ্টা করেছিলেন যে : মানুষ নিজে কিছু করতে পারে না, সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌তালার ইচ্ছায়ই সব ঘটে। জীবনের বিনিময়ে এ-নির্যাতনের প্রতিবাদ করে জুহানী (মৃত্যু: ৬৯৯ খ্রী:) ও গাইলান (মৃত্যু: ৭২৩ খ্রী:) মোতাজিলা-পন্থীদের যুক্তিবাদের পথ সহজ ও সুগম করেছিলেন। এ-স্বাধীন ইচ্ছার সমস্যার সমাধানের ভিত্তিতেই মুসলিম দর্শনে কদরবাদ ও জবরবাদের সৃষ্টি। কদরবাদীরা মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা আছে এ কথা স্বীকার করেন, জবরবাদীরা তা করেন না।

হিন্দুদের চলিত ধর্মীয় ধারণার ভিতর এ-দু'রকমের মতের কথা শোনা যায়। কদরের নাম তাঁরা দিয়েছেন পুরুষকার বা পুরুষের চেষ্টা, আর জবরের নাম দিয়েছেন দৈব বা অদৃষ্ট। এ-দৈবেরই চলতি নাম ভাগ্য বা নসিব। যাঁরা দৈব স্বীকার করেন, তাঁরা পুরুষকারকে হেয় প্রতিপন্ন করার নানাভাবে চেষ্টা করেছেন। এ-মনোভাব থেকেই "ভাগ্যং ফলতি সর্বত্র, নচ বিদ্যা নচ পৌরুষঃ"—"কপালে যা আছে তাই হয়, বিদ্যায়ও কিছু হয় না, আর পৌরুষেও কিছু হয় না"—এই পরিচিত উক্তির সৃষ্টি। আবার যাঁরা পুরুষ-কারবাদী, তাঁরা দৈব ও অদৃষ্টকে হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে বলেছেন :

"উদ্যোগিণং পুরুষসিংহমু পৈতি লক্ষ্মীঃ
দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষা বদন্তি।"

[উদ্যোগী পুরুষের প্রবল চেষ্টার ফলই জীবনে সাফল্য ও সার্থকতা। যারা কাপুরুষ, দুর্বলচিত্ত, তারাই ভাগ্যের উপর নির্ভর করে আকাশের দিকে তাকিয়ে হা করে বসে থাকে।]

একদিকে অজ্ঞাত—অজ্ঞেয়, অদৃষ্ট, আর একদিকে সহজবুদ্ধিগম্য পুরুষকার, মানুষের যত্ন-চেষ্টা এ দুই বিরোধী শক্তির ভিতর একটা সামঞ্জস্য বিধানের জন্যেই গীতায় নিষ্কাম কর্মের ধারণার সৃষ্টি ও রূপায়ণ, যার মূল কথা : কর্মেই মানুষের অধিকার, ফলে নয়। কর্ম-অনুষ্ঠানের ব্যাপারে পুরুষকারকে আর কর্মফল লাভের ব্যাপারে অদৃষ্টকে প্রাধান্য দিয়ে গীতায় অদৃষ্ট ও পুরুষকারের সামঞ্জস্য সাধনের চেষ্টা।

ধর্মে ও দর্শনে স্বাধীন ইচ্ছার স্বীকৃতি

তথাকথিত ধর্মবিশ্বাসের মাধ্যমে যেমন পুরুষকারকে একেবারে উড়িয়ে দেয়া হয়েছে, ঠিক তেমনি আবার ধর্মবিশ্বাসের নৈতিক ব্যাখ্যার মারফত মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা প্রমাণ করার চেষ্টাও হয়েছে। পরম কল্যাণময় সৃষ্টিকর্তা মানুষকে সৃষ্টি করে ভালো-মন্দ দু'টি করার ক্ষমতাই তাকে দিয়েছেন, যাতে সে ভালো-মন্দের বিপরীত অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে শেষ পর্যন্ত মন্দকে ছেড়ে ভালোকে

গ্রহণ করতে পারে। এভাবে অনুপ্রাণিত হয়েই কবি মানুষের তরফ থেকে বসুন্ধরাকে সম্বোধন করে বলেছেন :

"বসুমতী, কেন তুমি এতই কৃপণা,
কত খোঁড়াখুঁড়ি করি' পাই শস্যকণা।
বিনা চাষে শস্য দিলে কিবা তাতে ক্ষতি ?"
শুনিয়া ঈষৎ হাসি কহে বসুমতী,
"আমার গৌরব তাহে সামান্যই বাড়ে,
তোমার গৌরব তাহে একেবারে ছাড়ে॥"

ধর্মবিশ্বাসের সাহায্যে মানুষের স্বাধীন ইচ্ছার সমর্থন ও প্রত্যাখ্যান যেমন হয়েছে, ঠিক তেমনি দার্শনিক তত্ত্বদৃষ্টির সঙ্গে যোগ রেখে অনেকে এই একই কাজ করেছেন। যাঁরা জড়বাদের বিরোধিতা করতে চান তাঁরা অনেক সময় বলেন : মানুষের ভিতর যখন জড়সত্তা ছাড়া আর কিছুই নাই, আর সে-জড়সত্তা যখন স্বাতন্ত্র্যবর্জিত, তখন জড়বাদের মতে মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা বলে কিছু নাই, থাকতে পারে না। শুধু জড়বাদের কেন, অতি উঁচু দরের অধ্যাত্মবাদের বিরুদ্ধেও এ-জাতীয় আপত্তি অনেকে উত্থাপন করেছেন। সর্বেশ্বরবাদের মতে যখন ঈশ্বর সারা জগতে পরিব্যাপ্ত, তখন মানুষের স্বাধীনতা বলে কিছু নাই ; এ আপত্তির কথা আমরা আগেই আলোচনা করেছি। তাই হেগেলীয় অধ্যাত্মবাদ বা সবিশেষ ব্রহ্মবাদের দোহাই দিয়ে অনেকে বলেন : শুধু এ-মতের সাহায্যেই ব্যক্তির স্বাধীন ইচ্ছার একটা সঙ্গত ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায়। এ-মতের সমর্থকরা বলেন : জীব যখন ঈশ্বরের অংশ আর ঈশ্বরের স্বভাব যখন পূর্ণ স্বাধীনতা, তখন জীবেরও আংশিক স্বাধীন ইচ্ছা স্বীকার্য। আমাদের অভিজ্ঞতার ভিতরও এ-মতের সমর্থন। আমাদের সহজ অভিজ্ঞতা বলে যে, আমরা যা চাই তাই করতে পারি না, অর্থাৎ আমরা ঢাকায় বসে বিলাতের 'পিকাডেলী স্কোয়ার' দেখতে পাই না। কিন্তু আমাদের চোখ ভালো থাকলে আমরা আমাদের চোখের সামনের গাছপালা ত দেখতে পারি, কিন্তু চোখ বন্ধ করে থাকলে আমরা কিছু দেখি না, দেখার জন্য আমাদের চোখ মেলা চাই-ই চাই। অনেকের মতে, এই অংশ-অংশিত্ব-বাদেই মানুষের স্বাধীন ইচ্ছার ও স্বাধীন চেষ্টার একটা সঙ্গত ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায়।

মনোবিদ্যায় স্বাধীন ইচ্ছা

এঁরা আরো বলেন যে, মনোবিজ্ঞানের মারফত স্বাধীন ইচ্ছার কোন সঙ্গত ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায় না। তাঁদের মতে, মনোবিদ্যার বিশ্লেষণের মাধ্যমে

স্বাধীন ইচ্ছার সমর্থনও পাওয়া যায়, আর প্রত্যাখানও পাওয়া যায়। মনোবিদ্যা বলে : মানুষের ইচ্ছার পিছনে তার উদ্দেশ্যের প্রেরণা, আর তার সব ইচ্ছাই যদি উদ্দেশ্য-নির্ধারিত হয়, তাহলে মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা বলে কিছু থাকে না। ঠিক এ উদ্দেশ্যের আর একটু বিশ্লেষণ করে কেউ কেউ বলেন : যে-উদ্দেশ্যের প্রেরণায় আমরা কাজ করি, সে-উদ্দেশ্য তো আমাদের নিজেরই সৃষ্টি, কাজেই আমাদের ইচ্ছার পিছনে যে উদ্দেশ্যের প্রেরণা, তা আমাদের স্বকীয় প্রেরণা ; অতএব এতে আমাদের স্বাধীন ইচ্ছার মোটেই হানি হয় না।

এঁরা আরো বলেন : নীতিশাস্ত্র তো বিনা প্রমাণে মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা মেনে নেয়, স্বাধীন ইচ্ছা না মানলে তো পাপ থেকে বিরত থাকার ও পুণ্য-অনুষ্ঠান করার ক্ষমতাই যে আমাদের আছে তা মানা যায় না আর পাপ-বর্জন ও পুণ্য অনুষ্ঠানের স্বাধীনতার উপরই তো নীতিশাস্ত্র প্রতিষ্ঠিত।

সহজ কথায়, নীতিশাস্ত্রে স্বাধীন ইচ্ছার যৌক্তিক সমর্থন নাই, তাতে স্বাধীন ইচ্ছায় বিশ্বাস আছে। মনোবিদ্যার সাহায্যে স্বাধীন ইচ্ছার সপক্ষে ও বিপক্ষে দু'দিকেই যুক্তি দেয়া যেতে পারে, আর দার্শনিক মতের ভিতরও জড়বাদ ও সর্বেশ্বরবাদে স্বাধীন ইচ্ছার সমর্থন খুঁজে পাওয়া যায় না। সুতরাং, শেষ পর্যন্ত স্বাধীন ইচ্ছার যৌক্তিক সমর্থন মানুষকে ব্রহ্ম বা পরমতত্ত্বের অংশ বলে গ্রহণ করলেই পাওয়া যায় ; অন্য কোন মতে পাওয়া যায় না।

স্পিনোজায় মানুষের স্বাতন্ত্র্যবোধ

মানুষের স্বাধীন ইচ্ছার এ-জাতীয় সাফাই শুনলে ঘোড়ার আগে গাড়ী দাঁড় করিয়ে দেবার কথাই মনে পড়ে। মানুষের স্বাধীন ইচ্ছার একটা অনুভূতি তার আছে। এ-অনুভূতির বশবর্তী হয়েই সে তার নীতিবোধ গড়ে তোলে, তার ধর্মীয় প্রেরণাকে সার্থক করে। তাই কোনো দার্শনিক মতের সাহায্যে এ-ধারণা সমর্থনের অপরিহার্য প্রয়োজন হয় না। এ-স্বাতন্ত্র্যবোধের সাহায্যে তার যখন তত্ত্বজ্ঞান হয়, তখন কারো কারো মতে, মানুষের স্বাতন্ত্র্যবোধ থাকতেও পারে, আবার কারো কারো মতে, না-ও থাকতে পারে। যেমন, স্পিনোজা দেখিয়েছেন যে, যতই আমরা সংযত জীবন যাপন করি ততই আমরা প্রকৃতির দাসত্বমুক্ত হই, আর এই স্বাতন্ত্র্যবোধের পরিণতি হয় ঈশ্বরের ইচ্ছায় আত্মসমর্পণে, যখন আমরা বুঝি মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা বলে কিছু নাই : পাহাড়ের উপর থেকে একটা পাথর ছুঁড়ে ফেললে তা যেমন অবস্থার চাপে নীচের দিকে গড়িয়ে আসে, ঠিক তেমনি মানুষের ইচ্ছাও বিশ্বের অগণিত ঘটনা দ্বারাই নির্ধারিত। এ-স্বাধীন ইচ্ছার

বোধ যখন মানুষের চলে যায়, তখন প্রিয় বস্তুর প্রতি আসক্তি ও অপ্রিয় বস্তুর প্রতি বিরক্তি তার থাকে না; তখন সে তত্ত্বজ্ঞানজ শাশ্বত আনন্দ ও অমরত্ব লাভ করে।

স্পিনোজার বিরুদ্ধে অনেকে অনৈতিকতার অভিযোগ এনেছেন। তাঁদের মতে, মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা স্বীকার না করে তিনি নীতিশাস্ত্র গড়ে তুলেছেন, এটাই তাঁর বড় অপরাধ। কিন্তু এ আপত্তিকারীরা বোঝেন না যে. স্পিনোজা মানুষের স্বাভাবিক স্বাধীন ইচ্ছাবোধ অস্বীকার করেন নাই, তার তাত্ত্বিকতাই অস্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন: মানুষ যখন তার আবেগ সংযত ক'রে বিষয়ের দাসত্ব থেকে অব্যাহতি পায়, তখন তার স্বাধীন ইচ্ছা বলে কিছু থাকে না, তখন সে বুঝে জ্যামিতির ত্রিভুজের স্বভাব থেকেই যেমন তার ত্রিকোণের উৎপত্তি, ঠিক তেমনি বিশ্বের আদিম সত্তা থেকেই যে দুই সীমাহীন ধারা বস্তুপ্রবাহ ও ভাবনাপ্রবাহ, নিয়ে আমাদের জগৎ, তার উৎপত্তি।

এভাবেই হয়তো মানুষের স্বাতন্ত্র্যবোধ ও স্বাধীন ইচ্ছার একটা সঙ্গত ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। আমার বিবেচনায় স্বাধীন ইচ্ছার আদি পর্বের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয় ক্যান্টের নীতিশাস্ত্রে, আর তার শেষ পর্বের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয় স্পিনোজার দর্শনে, মানুষের পূর্ণত্বের ব্যাখ্যায় ও বিশ্বসত্তার সঙ্গে তার যোগসূত্র আবিষ্কারে।

ক্যান্টে আত্মার অমরত্ব

এবার আমরা শাশ্বত মূল্যবোধের সঙ্গে যে দ্বিতীয় ধারণার অপরিহার্য যোগ, তার একটু আলোচনা করতে চাই। আগেই বলেছি, এ-ধারণা মানবাত্মার অমরত্বে বিশ্বাস।

ক্যান্টে আমরা মানবাত্মার অমরত্বের এক সুন্দর সমর্থন দেখতে পাই। এ-আলোচনায় আমরা নেহাত প্রয়োজনের তাগিদেই ক্যান্টের মতের উল্লেখ বার-বার করেছি। ক্যান্ট আধুনিক পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক চিন্তার এক মুকুটমণি। বুদ্ধিবাদী আধুনিক পাশ্চাত্ত্য দর্শনে ক্যান্টের প্রভাব প্রায় সর্বতোমুখী। সেই ব্যক্তিগত আলোচনা স্থগিত রেখেও বলা যায়: ক্যান্টের দার্শনিক চিন্তার বৈশিষ্ট্য তার আপাতঃবিরোধী দ্বিমুখী পদ্ধতি ও মনোবৃত্তি। আগাগোড়া তাঁর দার্শনিক চিন্তায় এ-দ্বিমুখিতার প্রকাশ, পরিচয় ও অভিব্যক্তি।

মানবাত্মার অমরত্ব প্রমাণেও এ-নিয়মের ব্যতিক্রম নাই। ক্যান্ট দেখিয়েছেন: যুক্তির সাহায্যে মানুষের আত্মার অমরত্ব যেমন প্রমাণ করা যায়, তেমনি অপ্রমাণও করা যায়। তবে এতে ভয় পাবার কোনো কারণ নাই। তার আবাল্য অভ্যস্ত

খ্রীস্টধর্মীয় সংস্কারের প্রভাবেই হয়তো তিনি মানবাত্মার অমরত্বের সমর্থন মানুষের বিশুদ্ধ নীতিবোধের ভিতর পেয়েছেন। এই বিশুদ্ধ নীতিবোধের আলোচনা আমরা আগেই করেছি। বিশুদ্ধ নীতিবোধের প্রতিষ্ঠা এক জীবনের সীমিত চেষ্টায় সম্ভব নয়। আর বিশুদ্ধ নীতিবোধে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই যদি অসম্ভব হয়, তা'হলে শেষ পর্যন্ত তার সার্থকতাই তো কিছুই রইলো না। এ-প্রশ্নের উত্তর ও সমাধান ক্যাণ্ট খুঁজে পেয়েছেন তাঁর ধর্মীয় সংস্কার-অনুমোদিত মানবাত্মার অমরত্বে বিশ্বাসে।

অমরত্ব ও জন্মান্তরবাদ

ধর্ম ও দর্শনে মানুষের আত্মার অমরত্বের দু'রকমের ধারণা দেখতে পাওয়া যায়। এক মতে, মানুষের আত্মার আদিও নাই, অন্তও নাই, একেই বলে জন্মান্তর-বাদ। প্লেটো ও পীথাগোরাসের দর্শনে এ-মতের সমর্থন দেখতে পাওয়া যায়। হিন্দু ও বৌদ্ধ দর্শনে এ-মতের প্রচুর আলোচনা। এর সঙ্গেই কর্মবাদের যোগ, যার মূলকথা : মানুষ তার কর্ম-অনুসারেই তার নিজের অদৃষ্ট গড়ে তোলে আর তার শুভ ও অশুভ কর্মের ফলেই জন্ম-জন্মান্তর চক্রে তার আবর্তন। তত্ত্বজ্ঞানেই এই আবর্তনের শেষ, এরই নাম মুক্তি।

ইহুদী, খ্রীস্টান ও ইসলাম ধর্মে আত্মার অমরত্বের পুরোপুরি স্বীকৃতি আছে, জন্মান্তরের স্বীকৃতি নাই। রোজ-কেয়ামতে বা প্রলয়ের দিনে মানুষকে তার পাপ-পুণ্যের শেষ ফল পেতে হবে ; তাই আত্মার অমরত্বের স্বীকৃতি অপরিহার্য।

ঈশ্বরের অস্তিত্বের মতোই মানুষের আত্মার অমরত্ব, তার দেহাতীত সত্তা যুক্তি দ্বারা সম্ভবত প্রমাণ করা যায় না। শুধু যুক্তির মারফত তার সম্বন্ধে একটা ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তথাপি অন্তর্নিহিত সংস্কার ও বিশ্বাসের চাপে অনেকে যুক্তির দ্বারা আত্মার অমরত্ব ও অবিনশ্বরত্ব নিঃসংশয়ে প্রমাণ করা যায়, এ-ধারণার পোষণ করেন। শোনা যায় অধ্যাপক ম্যাকটেগার্ট-ও এ-জাতীয় মত পোষণ করতেন। তিনি একা কেন, পুরানো দিনের অনেক দার্শনিকেরই, শুধু দার্শনিকের নয়, অনেক মনীষীরই, এ-মতের প্রতি প্রচুর পক্ষপাত।

অনুভূতির সাক্ষ্য

শুধু প্রমাণ প্রয়োগের দ্বারা নয়, একেবারে সাক্ষাৎ অনুভবের মাধ্যমে অনেকে পূর্বজন্মের অস্তিত্ব প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন। পতঞ্জলির যোগসূত্রে আছে, সাধনার দ্বারা আমরা যদি আমাদের সংস্কার প্রত্যক্ষ করতে পারি, তা'হলে

আমাদের পূর্বজন্মের জ্ঞান হয়। সাধনা ও তপস্যা, বিশেষতঃ সর্বপ্রাণীর প্রতি অদ্রোহ বা মৈত্রী অভ্যাসের দ্বারা মানুষ তার পূর্বজন্ম স্মরণ করতে পারে, প্রাচীন স্মৃতিকার মনু এ-কথা বিশ্বাস করতেন।

তার পরিবেশের প্রভাবেই হয়তো কালিদাসের কাব্যে জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসের ছাপ প্রচুর। মানুষ যে-জিনিস আগে থেকে জানে না তারও অস্ফুট স্মৃতি তার ভিতর কখনো-কখনো দেখা যায়, একথা কবি কালিদাস মানতেন। আর যেহেতু পূর্ব অভিজ্ঞতা ছাড়া স্মৃতি সম্ভব নয়, তাই এ-জাতীয় স্মৃতি পূর্বজন্মের অনুভবেরই ফল। এটাই কালিদাসের পূর্বজন্মের সমর্থনের বড় যুক্তি। আজকের দিনের মনস্তত্ত্বে এ-জাতীয় স্মৃতি অপ্রাকৃত মানসিক অবস্থার ফল বলেই বর্ণিত।

কালিদাস তাঁর অভিজ্ঞান-শকুন্তলাম্ নাটকে বলেছেন, কোন মনোরম দৃশ্য দেখে ও শ্রুতিমধুর শব্দ শুনে মানুষের মনে অনেক সময় যে উৎকণ্ঠা, তা তার পূর্বজন্মের বন্ধুত্বেরই অস্ফুট ও অজ্ঞাত স্মৃতি।

ন্যায়দর্শনে পূর্বজন্মের প্রমাণ

গোতম তাঁর ন্যায়দর্শনের সূত্রে পূর্বজন্মের অনেক প্রমাণ দেবার চেষ্টা করেছেন। তা যে আজকের দিনের মানুষের যুক্তিবাদী মনোবৃত্তির মোটেই সমর্থন পাবে না, তা বলাই বাহুল্য।

সদ্যোজাত শিশুর মায়ের স্তন্যপানের যে প্রবৃত্তি ও জন্মের পর যে ভীতি-বিহ্বল ক্রন্দন, এটাই গোতমের মতে তাঁর পূর্বজন্মের অভিজ্ঞতার অস্ফুট স্মৃতি। পূর্বজন্মে তার পান ও আহারের যে অভ্যাস ছিল, তারই প্রভাবে তার এ-জীবনের প্রথম মুহূর্তে স্তন্যপানের প্রবৃত্তি। আর পূর্বজন্মে অপরিচিত স্থানে অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতিতে তার মনে যে ভয়ের উদ্রেক, তারই ফলে জন্মের পর তার ক্রন্দন। সাম্প্রতিক মনস্তত্ত্বে শিশুর এসব চেষ্টাকে স্বাভাবিক অজ্ঞাত ব্যবহার বলেই ধরে নেয়া হয়েছে। এ-সব অজ্ঞাত চেষ্টা থেকেই অপেক্ষাকৃত পরিণত বয়সে তার জ্ঞাত চেষ্টা, আর বার বার অভ্যাসের ফলে সেই জ্ঞাত চেষ্টারই অজ্ঞাত চেষ্টায় আবার রূপান্তর, এটাই সাম্প্রতিক মনস্তত্ত্ব চেষ্টার বিবর্তনের ধারা।

আধুনিক রাশিয়ায় প্রখ্যাত মনোবিদ্যাবিৎ প্যাভলভের একমুঠো ভাত থালায় রেখে ঘণ্টা বাজিয়ে কুকুরকে দাওয়াত জানানোর নিরীক্ষার কথা যদি গোতম জানতেন তা'হলে হয়তো শিশুর আদি প্রচেষ্টা ব্যাখ্যার মাধ্যমে পূর্বজন্ম ব্যাখ্যায় তিনি অগ্রসর হতেন না। প্যাভ্লভের মত গ্রহণযোগ্য কি-না জানি না, শুধু সাম্প্রতিক মনোবৃত্তির সঙ্গে জন্মান্তরে বিশ্বাসের যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান, তা দেখাবার উদ্দেশ্যেই এখানে তার উল্লেখ।

গোতম পূর্বজন্ম প্রমাণ করতে গিয়ে আর এক চিত্তাকর্ষক যুক্তি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ইহ সংসারে সব মানুষই আসক্তি ও আকর্ষণ নিয়ে জন্মায়, অনাসক্ত বা বীতরাগ হয়ে কাউকে জন্মাতে দেখা যায় না : "বীতরাগ জন্মাদর্শনাৎ"। এই আসক্তি পূর্ব অভিজ্ঞতারই ফল। জন্ লক যেমন বলেছেন : মানুষের মনে তার জীবনের আদিতম মুহূর্তে কোন অভিজ্ঞতারই ছাপ নেই, গোতম তা স্বীকার করেন না।

অমরত্বের পেছনে নীতিবোধ

জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসের মূলেও আছে গভীর নীতিবোধ। আমার পাপের জন্যে আমি দায়ী, অন্যের পাপের জন্যে নয়। ঠিক এ-নিয়মেই বলা যায়, আমার পুণ্যের কৃতিত্বও আমারই। এ-নীতিবোধ থেকেই মানুষের জীবনের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে পূর্বজন্মের ধারণার সৃষ্টি। যাঁরা এই জন্মান্তরবাদ স্বীকার করেন না, তাঁরা অন্যের পাপের ফল মানুষ ভোগ করে, এ কথা কখন কখন স্বীকার করেছেন। যেমন খ্রীস্টান ধর্মের প্রচলিত ব্যাখ্যায় এ-কথা আছে যে, মানুষের আদি-পিতা আদমের পাপের ফল সব মানুষকেই ভোগ করতে হচ্ছে। আর সেই পাপ থেকে মানুষকে অব্যাহতি দেবার জন্যেই যীশুর আবির্ভাব ও ক্রুশবিদ্ধ হয়ে দেহত্যাগ।

এভাবে প্রাচীন যুগে নীতিবোধের সমর্থনে আত্মার অমরত্বের স্বীকৃতি। রোজ-কেয়ামতের ধারণাও এ নীতিবোধেরই ফল। মানুষকে তার কৃতকর্মের ও ভাল-মন্দের ফল একদিন ভোগ করতে হবে, এ বিশ্বাস থেকেই রোজ-কেয়ামতের ধারণার সৃষ্টি, আর এ-ধারণার সঙ্গে তাই আত্মার অমরত্বের অপরিহার্য যোগ।

মার্টিনোর অমরত্ব ব্যাখ্যা

ক্যাণ্টকে অনুসরণ করে তাঁরই মতের প্রতিধ্বনি মার্টিনো তাঁর আত্মার অমরত্ব প্রমাণে করেছেন বলে মনে হয়। বুদ্ধিবাদী খ্রীস্টধর্মের ব্যাখ্যায় প্রভাবিত হয়ে তিনি দেখিয়েছেন : আত্মার অমরত্বের সঙ্গে মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার গভীর যোগ। তিনি প্রথমতঃ দেখিয়েছেন : মৃত্যুতে যে দেহের নাশ, তা দেহের পরিবর্তন মাত্র, একে দেহের বিনাশ বলা যায় না। ঠিক এ-রকমেই মৃত্যুতে আত্মারও নাশ হয় না। মৃত্যুর অর্থ পরিবর্তন, বিনাশ নয়। মার্টিনো সেদিনের বিজ্ঞানের জড়ের অবিনাশিত্বের থিওরীতে বিশ্বাসী ছিলেন বলে মনে হয়। তবে এ-দেহ সত্তার বিশ্লেষণ আত্মার অমরত্ব প্রমাণে তাঁকে শুধু একটু প্রেরণা দিয়েছে, এটা

তাঁর লক্ষ্য নয়, তাঁর লক্ষ্য আত্মার অমরত্ব প্রমাণ। মার্টিনো বলেছেন: মানুষ তার জীবনে অনন্ত জ্ঞান চায়, অনন্ত সুখ চায়, পূর্ণতা চায়, কিন্তু এগুলো ইহজীবনে তার পক্ষে লভ্য নয়, আর ইহজীবনের পর যদি তার সত্তাই না থাকে, তা'হলে এগুলোর পিছনে ছুটে বেড়ানোই নিরর্থক। ঈশ্বর-বিশ্বাসীর পক্ষে মূল্য-বোধের এ-ব্যর্থতা স্বীকার করা অসম্ভব। তাই ঈশ্বর-বিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত হয়ে মার্টিনো আশাবাদ পোষণ করে বলেছেন: মৃত্যুর পরও মানুষের অনন্ত সত্তা ও অনন্ত জীবন, আর সেই অনন্ত জীবনের মাধ্যমে তার শুভ আকাঙ্ক্ষার পূর্ণ পরিণতি ও সার্থকতা। হোফডিং এ-মূল্যবোধে গভীর বিশ্বাসের নাম দিয়েছেন: 'মানসংরক্ষণ'; তাঁর মতে এটাই ধর্মীয় চেতনার মূল কথা।

মানবাত্মার অমরত্ব ও অবিনাশিত্বের এ বিশ্বাসবাদী অণুষ্ঠ সমর্থন রবীন্দ্রনাথের এক অনুপ্রেরণাদায়ক উক্তি মনে করিয়ে দেয়:

"জীবনে যত পূজা হলো না সারা
জানি হে, জানি তাও হয়নি হারা।
যে ফুল না ফুটিতে ঝরেছে ধরণীতে,
যে নদী মরুপথে হারালো ধারা,
জানি হে, জানি তা-ও হয়নি হারা।"

পঞ্চদশ অধ্যায়

শেষ কথা

তত্ত্ববিদ্যার আঁকাবাঁকা ও এলোমেলো আলোচনা শেষ করার আগে আগামী দিনের মানুষের জীবনে দর্শনের উপযোগিতা ও প্রয়োজনের সম্বন্ধে দু'চার কথা বলতে চাই। প্রাচীন দর্শনের পরিভাষায় একেই বলে উপক্রম ও উপসংহারের সঙ্গতি। প্রাচীনকালের ধর্মব্যাখ্যাতারা বলেছেন: শাস্ত্রের নানা আলোচনার ভিতরে ঐক্য কোথায় তা বোঝবার এক বড় সঙ্কেত তার উপক্রম বা প্রাথমিক আলোচনার সঙ্গে তার উপসংহার বা শেষকথার সঙ্গতি। শাস্ত্রের শুরুতে যে আলোচনা, তার শেষেও যদি সে-আলোচনা থাকে, তা'হলে বুঝতে হবে এটাই তার মূল বক্তব্য, আসল আলোচ্য বিষয়। ধর্মব্যাখ্যাতারা যে অনেক সময় ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে ইনিয়ে-বিনিয়ে কথা বললেও তাঁদের আসল কথা মোটেই ভুলে যান না, উপক্রম ও উপসংহারের সঙ্গতি তার এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সব সময় এ-সঙ্গতি তাঁরা রাখতে পারেননি দেখে তাঁদের সমর্থকরা আবার বলেছেন: তাঁদের আগের কথা ও পরের কথার ভিতর গরমিল থাকলে পরের কথাই গ্রাহ্য ও গ্রহণীয়।

লৌকিক ব্যাপারেও এ ব্যাখ্যা-পদ্ধতি একেবারে হয়তো উপেক্ষণীয় নয়। হঠাৎ একটি অপরিচিত লোক বন্ধুত্বের ভাণ ক'রে ছুটির দিন রবিবার সকাল বেলা এসে হাজির। বেশভূষা ও কথা বলার ভঙ্গী দেখে মনে হলো: তিনি একজন ভদ্র ও শিক্ষিত লোক। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি থেকে শুরু করে ইন্তিকালের পর করণীয় জানাজা ও ফাতেহা পর্যন্ত হরেক রকমের কথা তিনি অনেকক্ষণ ধরে বৈঠকখানায় বসে আলোচনা করলেন। আপাতঃদৃষ্টিতে তাঁর ভিতর বিষয়-বস্তুর কোনো সঙ্গতি পাওয়া গেল না। অনেক ভেবে-চিন্তে বোঝা গেলো: তাঁর অর্থাভাবের কথা জানাতেই তিনি এসেছিলেন। কারণ আলোচনার শুরুতে তিনি অর্থাভাবের উল্লেখ করলেন, আর চলে যাওয়ার সময়ও এই একই কথার পুনরাবৃত্তিতেই তাঁর আলোচনা শেষ। এ থেকেই বোঝা যায়, তাঁর আসল বক্তব্য: অর্থাভাব, বাকী আলোচনা তারই খোলস, তিতো দাওয়ারই মিঠা অনুপান।

দর্শনের মাহাত্ম্য ও আত্মপ্রশংসা

যাই হোক, এটাই যদি কোনো জটিল আলোচনার বিষয়-নির্ণয়ের এক বিশ্বাস-যোগ্য পদ্ধতি হয়, তা'হলে আমাদের বর্তমান আলোচনায়ও এ-নিয়মের ব্যতিক্রম

হয়নি, এ-কথা হয়তো বলা চলে। যেন-তেন-প্রকারেন দর্শনের সাফাই গাওয়াতেই আমাদের আলোচনা শুরু, আর সেই সাফাই গাওয়াতেই তার শেষ। বিরূপ সমালোচকরা একে আত্মপ্রশংসা ও আত্মপ্রচার বলে হয়তো অভিহিত করতে পারেন, কিন্তু আত্মপ্রশংসা ও আত্মপ্রচার না ক'রে উপায়ই বা কি? স্বয়ং মনীষী দেকার্তে আত্মপ্রশংসা বা আত্মমাহাত্ম্য জ্ঞাপন ক'রে আধুনিক দর্শনের গোড়াপত্তন করেছেন। তাঁর মতে, দুনিয়ার সব-কিছুর সত্তা অস্বীকার্য, শুধু আমার 'আমিত্বে'র সত্তা অনস্বীকার্য। আমরা তো তাঁরই তল্পীবাহক, তাই তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করাই আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক, হয়তো শোভনীয়ও।

প্রাত্যহিক জীবনে প্রশংসার মাহাত্ম্য একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না। জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর কর্মক্ষেত্রে প্রেরণা যোগাবার এমন উত্তেজক টনিক খুবই বিরল; বোধ হয় রৌপ্যমুদ্রা বা সিলভার টনিকের চেয়েও এর প্রভাব অধিক। তবে মুস্কিলের কথা এই যে, অতিরিক্ত মাত্রায় এ-টনিক সেবনের ফল খুবই ভয়াবহ, সাম্প্রতিক নিদ্রা-আনয়নকারী নৈশ-বটিকার মতোই। এজন্যেই ধর্মশাস্ত্রে 'আলহামদুলিল্লাহ্' বলে সব প্রশংসা আল্লাহ্তালাকে অর্পণ করার বিধি ও নির্দেশ।

এ-দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের দীর্ঘ, সরল ও জটিল, ভাব-গম্ভীর অথচ অবস্থা-বিশেষে তরল ও হাস্যরসাত্মক আলোচনার উপসংহারে দর্শনের প্রয়োজনীয়তা ও উপযোগিতা সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন।

নিরপেক্ষ সমালোচানর প্রয়োজনীয়তা

আধুনিক পাশ্চাত্য দার্শনিকদের বিশেষ অনুগ্রহে ও বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি-সম্পন্ন সুধী ব্যক্তিদের আগ্রহাতিশয্যে এ-কথা আমরা খুব ভালো ক'রেই জেনে গেছি যে, দর্শনের আসল কাজ নিরপেক্ষ বিচার ও বিশ্লেষণ। কথাটি যে খুব ঠিক, তাতে সন্দেহ নাই। তবে তথাকথিত নিরপেক্ষ আলোচনা যখন বাগেশ্রীর সুরের মতো খুব উঁচু পর্দায় ওঠে, তখন যে তার ফল খুব ভালো হয় না, একথা সকলের জানা নাই। এখানেই যত মুস্কিল।

নিরপেক্ষ সমালোচনা অন্ধবিশ্বাস দূর করবার এক বড়ো হাতিয়ার। কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের কুপ্রভাব থেকে নিরপেক্ষ দৃষ্টি মানুষকে এ-বৈজ্ঞানিক যুগে অনেকটা মুক্ত করেছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু আজও জাতিতে-জাতিতে, দেশে-দেশে, সম্প্রদায়ে-সম্প্রদায়ে, ধর্মে-ধর্মে মানুষের ভিতর নানা অপ্রাকৃত ভিত্তিতে প্রচুর অন্তর্দ্বন্দ্ব, বাদ-বিসংবাদ ও রেষারেষি। এ-দৃষ্টিকোণ থেকে নিরপেক্ষ দৃষ্টির প্রয়োজন আজও মোটেই সীমিত নয়, পর্যাপ্ত ও প্রচুরই বলা চলে।

তবে এর নিরপেক্ষ দৃষ্টি দার্শনিক চিন্তার না বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তির ফল, তা একটু ভেবে দেখার দরকার। যদিও দার্শনিকদের কেউ কেউ আজও বলে থাকেন যে, বিজ্ঞানের বিচারের ভিতর যে-সব দোষ-ত্রুটি আছে, দর্শন তা সরিয়ে দেবার চেষ্টা করে, তা'হলেও একথা দিনের আলোর মতো সুস্পষ্ট যে, নিরপেক্ষ বিচারের প্রেরণা বিজ্ঞানের কাছ থেকেই আধুনিক দর্শন পেয়েছে। আঠারো শতকের শেষের দিকে মনীষী ক্যাণ্ট বিজ্ঞানের সত্যের মতো দার্শনিক সত্য নিঃসংশয়ে গৃহীত হতে পারে কি-না এ-প্রশ্নেরই সদুত্তর তাঁর ঐতিহাসিক তাৎপর্যপূর্ণ দার্শনিক সমালোচনায় পাবার চেষ্টা করেছেন।

এ-কথা তো সব শিক্ষিত লোকেরই জানা যে, আধুনিক বিজ্ঞানই অনেক ধর্মীয় কুসংস্কারের উপর মুদগর প্রহার ক'রে মানুষের স্বাধীন চিন্তার পথ প্রশস্ত করেছে। সূর্য পৃথিবীর চারধারে ঘুরছে, না পৃথিবীই সূর্যের চারধারে ঘুরছে, এ-কথা বলায় যে মহা-অপরাধ হয়েছিল, তার ফলে কোপারনিকাসের, বিশেষতঃ গ্যালিলিওর কি অবস্থা হয়েছিল তা আজ সব শিক্ষিত লোকেরই জানা। পুঞ্জীভূত কুসংস্কার দূর করার ব্যাপারে বিজ্ঞানের প্রবল প্রভাবের দৃষ্টান্ত দেয়া নিষ্প্রয়োজন, কারণ তা সকলেরই জানা। আজকের দিনের মানুষের মনোবৃত্তি, জীবনযাত্রা-পদ্ধতি, এমন কি আশা-আকাঙ্ক্ষাও মুখ্যতঃ বিজ্ঞান-প্রভাবিত। তাই মানুষের ভিতর নিরপেক্ষ দৃষ্টি জাগিয়ে তার অন্ধতা ও কুসংস্কার দূর করাই যদি দর্শনের কাজ হয়, তা'হলে সে কাজ দর্শনের চেয়ে বিজ্ঞানের দ্বারাই অনেক ভালভাবে সাধিত হয়েছে, আর ভবিষ্যতেও হবে বলে আশা করা যেতে পারে। মানুষের জীবনে দর্শনের নিরপেক্ষ দৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেও এ-কথা বলা অযৌক্তিক ও অসঙ্গত হবে না, মনে করি।

শুষ্ক তর্কের অসারতা

আজকের দিনে দার্শনিকদের এ-কথা মনে রাখা খুবই প্রয়োজন যে, দর্শনের ইতিহাসে জীবন-সমস্যার সমাধানে বিচার-বুদ্ধির প্রয়োগের অনেক উজ্জ্বল উদাহরণ যেমন পাওয়া যায়, তেমনি জীবনের সঙ্গে সম্বন্ধ-বর্জিত, নীরস শুষ্ক-তর্কের অবতারণাও কখনো-কখনো দেখা যায়। আগামী দিনের দর্শনে জীবনের সঙ্গে সম্বন্ধ-বর্জিত এ-জাতীয় অসার ও শুষ্ক তর্ককে সরিয়ে দিয়ে যে নিরপেক্ষ বিচার-বুদ্ধির মানুষের জীবনযাত্রার সঙ্গে যোগ নিকট, তাকেই প্রাধান্য দিতে হবে। স্বাধীন চিন্তার নামে জীবনের সঙ্গে সম্বন্ধ-বর্জিত কতকগুলো আলোচনা কতিপয় বুদ্ধিজীবীর কৌতূহল চরিতার্থ করবার জন্যে দর্শনে আমদানি করার কোনও

লাভ নাই। এটাই আজকের দিনের দর্শনের সবচেয়ে বড় শিক্ষা। ক্যান্ট ও হেগেলের পরবর্তী পাশ্চাত্য দর্শনে বুদ্ধির বিরুদ্ধে যে প্রতিক্রিয়া ও ইচ্ছাশক্তির যে অকুণ্ঠ সমর্থন, তা এই অতিবাস্তব ও অতিপ্রয়োজনীয় সত্যের উপরই অঙ্গুলি নির্দেশ করে। এ-কথা অনস্বীকার্য যে, অন্ধকুসংস্কার যেমন অবাঞ্ছনীয়, তেমনি কর্মজীবনের বিপরীত পথে যার গতি এমন নিরর্থক চিন্তাও অবাঞ্ছনীয়।

বুদ্ধিবাদ ও প্রয়োজনবোধে সামঞ্জস্য

প্রাচীন ভারতে যখন দার্শনিক চিন্তার নামে এ-জাতীয় তর্কের ছড়াছড়ি, তখনই তথাগত বুদ্ধ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে স্বাধীন চিন্তা ও প্রয়োজনবাদের একটা সামঞ্জস্য বিধান করেছিলেন—যার ফলে সেদিনের দর্শনের গতি মানুষের কল্যাণের পথে নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল। প্রাচীন ভারতের দর্শনের উপর বুদ্ধের এই শুভ প্রভাব আজকের দিনের দার্শনিকদের ভালো করে মনে রাখা প্রয়োজন। তারই আলোকে তাঁরা আধুনিক জটিল পরিবেশে প্রয়োজন-বোধ ও বুদ্ধিবাদের ভিতর একটা সফল, সার্থক যোগসূত্র বের করতে পারবেন, আশা করি। এটাই হবে মানুষের কল্যাণে দর্শনের আজ সবচেয়ে বড় দান।

তথাকথিত স্বাধীন চিন্তার উপর দর্শনের আদি যুগ থেকেই শুধু সাধারণ মানুষের নয়, দার্শনিকদেরও কিছু বিতৃষ্ণা ছিল, তার উদাহরণ দর্শনের স্বরূপ বিশ্লেষণে আগেই দিয়েছি। প্রাচীন গ্রীসের প্রথম দার্শনিক থেলিসের সম্বন্ধে একটি প্রচলিত আখ্যায়িকা এর এক মুখরোচক উদাহরণ।

থেলিস ছিলেন সে-যুগের এক বড় দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক। সে যুগে বিজ্ঞজন বলে ছিল তাঁর খ্যাতি। তবে তাঁর সাংসারিক অবস্থা সচ্ছল ছিল না ব'লে লোকে বলত; তাঁর দার্শনিকতাই তাঁর দারিদ্র্যের জন্যে দায়ী। সম্ভবতঃ ধন-সম্পত্তি ও দার্শনিক চিন্তা এ-উভয়ের প্রতি সমভাবে আকৃষ্ট ছিলেন বলেই থেলিস দারিদ্র্য থেকে অব্যাহতি পাবার এক চমৎকার উপায় বের করেছিলেন।

এক বছর জলপাই-এর ফসল প্রচুর হবে এ-কথা আগে থেকে বুঝতে পেরে থেলিস জলপাই-এর সব তেল-কল অতি অল্প টাকায় ভাড়া করেছিলেন। অন্য-লোক তাঁর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেনি। কারণ তাঁরা আগে থেকে বুঝতে পারেননি যে, এবার এত জলপাই-এর ফসল ফলবে। যথাসময়ে প্রচুর জলপাই-এর ফসল ফললো, আর তার তৈলও তৈরী হলো প্রচুর। চড়া দামে সে-তৈল বিক্রি ক'রে থেলিস বড়লোক হয়ে গেলেন। এভাবেই তিনি দর্শনের বদনাম দূর ও নিজের সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা করতে, এক ঢিলে দুই পাখী মারতে, সক্ষম হলেন।

আজকের দিনের প্রগতিবাদী পরিবেশে দার্শনিকরা যদি বিনা শর্তে পুঁজিবাদের কাছে আত্মসমর্পণ করেন, তার ফল কি হবে জানি না,—যদিও থেলিসের দর্শনের সঙ্গে কর্মজীবনের সংযোগ সাধনের চেষ্টা প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই।

এ-আখ্যায়িকা যে অতি প্রাচীন, তাতে সন্দেহ করার কারণ নাই। খ্রীস্ট-পূর্ব যুগে স্বয়ং আরিস্টটল তাঁর 'পলিটিক্স'-এ এ-কাহিনীর এক রসালো বর্ণনা দিয়ে বলেছেন: "দার্শনিকেরা যে ইচ্ছা করলে ধনী হতে পারেন, থেলিস তাই প্রমাণ করেছেন, তবে সচরাচর দার্শনিকেরা ধনী হতে চান না, এটা তাঁদের বৈশিষ্ট্য।" যাক, এ-বিষয়ে বেশী কথা না বলাই ভালো, কারণ আজ সে-গুড়ে বালি।

উগ্র সংশয়বাদের কুফল

আর একটি হাস্যরসাত্মক আখ্যায়িকা এ-প্রসঙ্গে মনে পড়ছে। তাও নীরস ও অসার তর্কের সমালোচনা প্রসঙ্গেই। খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয় শতকের গ্রীক দার্শনিক পীরোর সম্বন্ধে এ-আখ্যায়িকা প্রচলিত। কারো কারো মতে, পীরো আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের সময় তাঁর সৈন্যদলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। কিন্তু তাঁর দার্শনিক মত ছিল উগ্র সংশয়বাদী। কোনো জ্ঞানকেই তিনি সংশয়রহিত ও বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে করতেন না। তিনি এ শিক্ষা পেয়েছিলেন তাঁর এক বৃদ্ধ গুরুর কাছে। শোনা যায় তাঁর সেই বৃদ্ধ গুরু একদিন সকালবেলা বেড়াবার সময় পা পিছলে গর্তের ভিতর আটকে যান। তখন সে-পথ দিয়ে তাঁর উপযুক্ত মুরীদ পীরোও যাচ্ছিলেন। কিন্তু কোন জ্ঞানই বিশ্বাসযোগ্য নয় ভেবে বৃদ্ধকে গর্ত থেকে তোলার কোন চেষ্টা পীরো করেন নাই; অন্য লোকে তাঁকে গর্তের ভিতর থেকে তুলে নিয়ে আসে। লোকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে পীরো বললেন: কোনো জ্ঞানই যখন বিশ্বাসযোগ্য নয়, তখন তাঁর গুরু যে গর্তে আটকে আছেন এ-কথাও বিশ্বাসযোগ্য নয়। পীরোর গুরু তাঁর উপযুক্ত মুরীদের এ-আচরণে অত্যন্ত উল্লসিত হয়েছিলেন, কিন্তু অন্য লোকে এ আচরণকে হৃদয়হীনতার পরিচয় মনে ক'রে পীরোর নিন্দা করেছিলেন।

এ-আখ্যায়িকা যে নিছক কল্পনা, তাতে সন্দেহ নাই, যিনি সংশয়বাদী হয়েও সৈনিকের কাজে নিযুক্ত ছিলেন, তাঁর পক্ষে এ-জাতীয় আচরণ অসম্ভব। শুষ্ক অসার, নীরস তর্কের কুফল দেখানোর জন্যেই কোন উর্বর-মস্তিষ্কের কল্পনাপ্রসূত এই আখ্যায়িকার সৃষ্টি ও পরিবেশন।

যাই হোক, স্বাধীন চিন্তাকে প্রয়োজনসিদ্ধির পথে, জীবনের তাগিদ মেটানোতে প্রয়োগের নির্দেশ জগতের দার্শনিক চিন্তায় শুরু থেকেই ছিল এবং সেই অতি

প্রয়োজনীয় ঐতিহ্যকেই আগামীদিনের দার্শনিক চিন্তায় বাস্তবায়িত করতে হবে এইটাই হবে আমার মতে আগামী দিনের দার্শনিক চিন্তার সার্থক রূপায়ণ।

দর্শনে মধ্যপথ

দর্শনের থিয়োরীর দ্বন্দ্ব থেকে এ-শিক্ষাই পাওয়া যায় যে, সত্যকে মানুষ তার জীবনে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে থাকে। এ-বিরোধী দৃষ্টিগুলোর সার্থক সমন্বয়-সাধনই দর্শন অতীতে করেছে, আর আগামী দিনেও এটাই হবে মানুষের জীবন-সমস্যার সমাধানে তার বড় দান।

এ-বিরোধ-সমন্বয়ের চেষ্টার অপরিহার্য ফল, আমাদের জীবনদর্শনে মধ্যপথের সার্থকতার স্বীকৃতি ; এর ভিতরই রয়েছে মানুষের উন্নতির অব্যর্থ হাতিয়ারের সঙ্কেত ও সন্ধান। মানুষের ইতিহাসের অফুরন্ত ওঠা-নামার ভিতর এই সত্যই লুক্কায়িত, এটাই তার ইতিহাস-দর্শনের বড় শিক্ষা।

ধর্মে মধ্যপথের সন্ধান

এ-মধ্যপথেই ধর্মের সবচেয়ে বড় নির্দেশ। তথাগত বুদ্ধ মধ্যপথে ধীর পদক্ষেপের মাধ্যমেই নির্বাণের আলোর সন্ধান পেয়েছিলেন। এই মধ্যপথের প্রতি অনুরাগ দেখাতে গিয়েই বৌদ্ধদর্শনের এক বড় শাখার নাম দেয়া হয়েছে মাধ্যমিক অর্থাৎ মধ্যমপন্থী দর্শন। গীতার কর্মযোগে, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির, ত্যাগ ও ভোগের মাঝখানে এই মধ্যপথেরই আর এক স্বীকৃতি। ইসলামের ভিতর আগাগোড়া এই মধ্যপথের নির্দেশ। আর ইসলামের শেষ নবী হজরত মুহম্মদের (দঃ) ঐতিহাসিক জীবন এ-আদর্শেই রূপায়িত। হজরত ঈসা (আঃ) তাঁর বিরূপ সমালোচকদের বিরুদ্ধে কটাক্ষ ক'রে বলেছিলেন: "মনে করো না ঃ পুরানো দিনের নবীদের বাণীর বিরুদ্ধে আমার জেহাদ, কারণ আমি তাঁদের জীবন-নীতি ধ্বংস করতে আসিনি, তাকে পূর্ণ করতেই এসেছি।" এর অর্থ-ও মধ্যপন্থী সমন্বয়বাদ। এক কথায়, এ-মধ্যপথই ধর্ম ও দর্শনের মিলনক্ষেত্র।

মধ্যপথ ও সহ-অবস্থিতি

আজকের দিনের বিজ্ঞানের দৌলতে সারা জগতে নানাভাবের বৈচিত্র্য ও বিনিময়, সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানের দেয়া অফুরন্ত ভোগ-ঐশ্বর্যের প্রাচুর্যের ভিতর এক ব্যাপক বিরাট ধ্বংসের সম্ভাবনা। এ-সঙ্কট ও সম্ভাবনাময় মুহূর্তে মানুষের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে তার বাস্তব জীবনে এই মধ্যপথের রূপায়ণে। অত্যন্ত অপরিহার্য কারণেই এ-মধ্যপথের স্বীকৃতিরই অস্ফুট আভাস আজ পাওয়া যাচ্ছে শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থিতির সমর্থনে।

নিরপেক্ষ প্রয়োজনবাদী দৃষ্টি নিয়ে মানুষের ব্যাপক জীবনে এ-মধ্যপথের অভ্যাস ও অনুশীলন ছাড়া এ-নীতি সার্থক ও সফল হতে পারে না। এই অত্যন্ত বাস্তববাদী আদর্শে'র কর্মজীবনে প্রয়োগের জন্তেই চাই বিজ্ঞান ও দর্শনের সমঝোতা।

আগামী দিনের মানব-সভ্যতায় দর্শনের দাম

আবহমানকাল থেকেই দর্শন সর্বজনীন ও সার্বভৌম দৃষ্টির সমর্থক। এই দৃষ্টির চরম সার্থকতা দার্শনিক একত্ববাদে সুস্পষ্ট। এই ধর্ম-প্রভাবিত একত্বনিষ্ঠ অধ্যাত্মবাদের সঙ্গে বিজ্ঞানের দেয়া জড়বাদের সামঞ্জস্য কি ক'রে সম্ভব হতে পারে, তার ইঙ্গিত আমরা আগেই করেছি। তারই পুনরাবৃত্তি ক'রে বলি: দর্শনের দেয়া সর্বজনীন ও সার্বভৌম দৃষ্টি মানুষের মধ্যে জাগাবে প্রেম, আর সেই প্রেমের সঙ্গে বিজ্ঞানের দেয়া অফুরন্ত শক্তির সংযোগে মানুষের ভবিষ্যৎ হবে সদৃঢ় ও সুরক্ষিত, উজ্জ্বল ও ভাস্বর। এখানেই আগামী দিনের আদর্শ সভ্যতায় দর্শনের সাফল্য ও সার্থকতা। দর্শন ও দার্শনিকদের সম্বন্ধে এ-অনাবিল, অপরাজেয় আশাবাদ পোষণ ক'রেই বর্তমান আলোচনার সীমারেখা টেনে দিতে চাই।

———